ছন্দ-জিজ্ঞাসা

প্রবোধচন্দ্র সেন

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ
১৫ বৈশাখ ১৩৬১

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা ॥ ১এ কলেজ রো । কলিকাতা-৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ । কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর : শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
সুশীল প্রিন্টার্স
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন । কলিকাতা-৬

অবুহ বুহাণং মজ্ঝে
কব্বং জো পঢ়ই লক্খণবিহূণং।
ভুঅগ্গ-লগ্গ খগ্গহিঁ
সীসং খুলিঅং ণ জাণেই॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১১

বুধমধ্যে লক্ষণবিহীন কাব্য লৈয়া।
যে পড়ে অবুধ সেই কহি বিবরিয়া॥
ভুজঅগ্রে লগ্ন খড়্গ খণ্ডে নিজ শীর্ষ।
তাহা না জানয়ে, শ্লাঘাহেতু মানে হর্ষ॥

—নরহরি চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ

ছন্দজ্ঞান বিনা কাব্য রচে যেই জন।
পণ্ডিত-সভায় সেই লজ্জার ভাজন॥

—নরহরি চক্রবর্তী, ছন্দঃসমুদ্র

These rules are not imperative or compulsory precepts, but observed inductions from the practice of poets. He that can break them *with success*, let him.

—George Saintsbury, *Manual of English Prosody*

আমার ছন্দের আলোচনা এখনও শেষ হয় নি ; আমার নিজেরই যা বক্তব্য আছে তার সমস্ত কথা এখনও বলা হয় নি। সুতরাং আমার সমস্ত কথা বলা না হওয়া পর্যন্ত আমার আলোচনার মধ্যে যে অপূর্ণতা থাকবেই তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর আমার সব কথা বলা হবার পরেও যে বাংলা ছন্দের সব কথা বলা শেষ হবে না সে বিষয়েও আমি সচেতন আছি।

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মবিজয়ী অশোক।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত।

India's National Anthem

ধম্মপদ-পরিচয়।

বাংলার ইতিহাস-সাধনা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা।

রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি।

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ।

ছন্দপরিক্রমা।

ভারতনায়ক।

ভারতাত্মা কবি কালিদাস।

সম্পাদনা,

রবীন্দ্রনাথ প্রণীত 'ছন্দ'।

ভূমিকা

আজকাল বাংলা সাহিত্যে ছন্দচর্চার অনুরাগ বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ অনুরাগ গতানুগতিকও নয়, আকস্মিকও নয়। এ অনুরাগ উদ্‌ভূত হয়েছে স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে বাংলা ছন্দের স্বরূপনির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষা ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোবৃত্তি থেকে। এই আকাঙ্ক্ষা ও মনোবৃত্তিকে শক্তি জুগিয়েছে আধুনিককালীন বাংলা কাব্যছন্দের বিচিত্র ও অবিরাম বিকাশের বিস্ময়। বর্তমান 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী রচনার মূলেও ছিল এই উভয়বিধ প্রেরণা, অপরিমেয় ছন্দোবৈচিত্র্যের বিস্ময় ও স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় লেখকের মনে কি ভাবে দেখা দিয়েছিল তার ইতিহাসটুকু 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থের নিবেদন-অংশে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। কেননা, ওই গ্রন্থখানি অনেকাংশে এই 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা'র উপক্রমণিকা রূপেই পরিকল্পিত।

সুদীর্ঘকাল ধরে ছন্দ-চর্চায় ব্যাপৃত আছি। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ছন্দ-প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। অথচ এগুলি এখনও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নি। ফলে আমার ছন্দচিন্তার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সহজসাধ্য নয়। পক্ষান্তরে অন্য সব ছান্দসিকেরই মতামতের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের রচিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাকারে সংকলিত প্রবন্ধাবলী থেকে। আমি বার বার অনুরুদ্ধ হয়েও এখনও এ কাজে হাত দিতে পারি নি। এই অপরাধবোধকে কিছু পরিমাণে লঘু করার অভিপ্রায়ে 'ছন্দপরিক্রমা'র পরিশেষে আমার ছন্দ-প্রবন্ধাবলীর একটা কালানু-ক্রমিক তালিকা যোগ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু নিজের লেখার তালিকা দিলেই লেখকের কর্তব্য শেষ হয় না। লেখা সংকলন ও প্রকাশের দায়িত্বও তাঁরই। এই দায়িত্ব পালনের অভিপ্রায়েই এই 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ প্রকাশে উদ্‌যোগী হয়েছি।

এই গ্রন্থে মোট উনিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হল। প্রবন্ধগুলি দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে (১৩২৯-৩০) আছে সাময়িক পত্রের আট সংখ্যায় প্রকাশিত মোট তিনটি প্রবন্ধ, আর দ্বিতীয় পর্বের (১৩৩৮-৩৯) ষোলটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকার সতেরো সংখ্যায়। দুই পর্বের কালব্যবধান প্রায় আট বৎসর। ফলে স্বভাবতঃই এই দুই পর্বের রচনাধারার মধ্যে প্রকৃতিগত ও লক্ষ্যগত কিছু

পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাই এই দুই ধারার রচনাবলীর পরিচয়ও দুই ভাগেই দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম পর্বের প্রবন্ধগুলি প্রকাশের পর পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হল, আর দ্বিতীয় পর্বের প্রকাশসমাপ্তির পরে অতিক্রান্ত হয়েছে চল্লিশ বৎসরেরও কিছু বেশি সময়। এতদিন পরে এই লেখাগুলি প্রকাশের কোনো প্রয়োজন আছে কি না আর যদি থাকে তবে তা কি, এ প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্বও গ্রন্থকারের। গ্রন্থকারের মতে প্রকাশের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। দীর্ঘকাল ধরে ছন্দজিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছ থেকে যে তাগাদা আসছে—তা সে অনুরোধ রূপেই হক আর অভিযোগ রূপেই হক—তাতে এই লেখাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাবোধ লেখকের মনে দৃঢ়তর হয়েছে।

নিজের লেখাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে পাঠকের কাছে সহজপ্রাপ্য করে দেবার যে দায়িত্ব লেখকের উপর আসে তাকে বলতে পারি সাহিত্যঋণ। বহু বিলম্বে হলেও নিজেকে কিছু পরিমাণে ঋণমুক্ত করাও এই প্রবন্ধসংকলন প্রকাশের অন্যতম অভিপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম, করুণানিধান, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বহু হিতৈষীর ইচ্ছা ও অনুরোধ যথাসময়ে রক্ষা করতে না পারার অপরাধে এতদিন আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। উভয় পর্বের রচনা-প্রকাশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও পরম হিতৈষী অন্নদাশংকর রায় মহাশয় বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে এই ছন্দ-প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা আমাকে বলেছিলেন। কবিমনীষীর অভিপ্রায় রক্ষার দায়িত্বকে ঋষিঋণ বলেই মনে করা যায়। এই ঋণশোধও 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' প্রকাশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থখানি পাঠকসমাজের কাছে উপস্থাপিত করছি।

এই ঋণশোধের ব্যাপারটা ব্যক্তিগত প্রেরণার দিক্ বটে, কিন্তু তা সাহিত্যিক প্রয়োজন-নিরপেক্ষ নয়। এই প্রয়োজন দ্বিবিধ, কিছু রচনাগুলির গুণগত আর কিছু ইতিহাসগত। যার কোনো গুণ নেই তার ঐতিহাসিক মর্যাদাও থাকে না। ইতিহাসের স্মৃতিশালায় নির্গুণের কোনো স্থান নেই। ইতিহাসের দৃষ্টিতে অবশ্য দুর্গুণও গুণ বলেই স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, এখানে রচনাগুলির সদ্‌গুণের কথাই বলা হচ্ছে, দুর্গুণের নয়। দুই পর্বের রচনাগুলির এই গুণ প্রকৃতিভেদে ও লক্ষ্যভেদে দু-রকম। এবার একে একে দুই ধারার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

3

প্রথম পর্ব (১৩২৯-৩০)

এই পর্বে স্থান পেয়েছে মাত্র তিনটি প্রবন্ধ। তার মধ্যে প্রথম দুটি বস্তুতঃ একই প্রবন্ধের দুই অংশ রূপে এক সঙ্গে রচিত (১৩২৮ ফাল্গুন)। তারপরে এ-দুটিকে একটু মেজেঘষে 'প্রবাসী'তে পাঠানোও হয়েছিল একই সঙ্গে। এ দুই প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের আদর্শে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ছন্দ-ব্যাকরণ রচনা করা। তাই আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খলরূপে বিন্যস্ত করার ও তার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস লক্ষিত হবে এই দুই প্রবন্ধের সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন পূর্বগামীর লেখা থেকে তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ করেছি সাগ্রহে, কিন্তু আলোচনার পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। আর পরিভাষা-রচনায় ও ছন্দের শ্রেণীবিন্যাসে নিজের পথ নিজে রচনা করে চলেছি নির্ভীক পদক্ষেপে। ভয় যে আমার ছিল না তা নয়। এতটা সাহসিকতা দেখানো ঠিক হল কিনা, পাঠকসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কিনা সে ভয়। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল এ ভয় ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন। এগুলি পাঠকসমাজে যে এতই সাদর স্বীকৃতি লাভ করবে তাও ছিল আমার প্রত্যাশার অতীত। যাক সেকথা। এই পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার সঙ্গে আমার আরও একটা লক্ষ্য ছিল। আমি চেয়েছিলাম এই ব্যাকরণকেই বিষয়োপযোগী ভাষা ও সহজবোধ্য পরিভাষার যোগে সাহিত্যিক রূপ দিয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। এ বিষয়ে মনে একটু আত্মপ্রত্যয় ছিল, তাই ওই ব্যাকরণবর্গীয় রচনাও তখনকার দিনের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা 'প্রবাসী'তে পাঠাতে সাহসী হয়েছিলাম। কাঁচা হাতের প্রথম রচনা বলে কুণ্ঠাবোধ করি নি। পূর্বগামী শশাঙ্কমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ, কারও ভাষাই আমার কাছে বিষয়োপযোগী বলে মনে হয় নি। তিনজনের ভাষা তিন প্রকৃতির, কিন্তু সকলের ভাষাই অতিসাহিত্যিক, একটু বেশি মাত্রায় কাব্যঘেঁষা ; ছন্দের ন্যায় প্রাকরণিক বিদ্যার বাহন হবার যোগ্য নয়। তাঁদের পরিভাষাও ছিল অযত্নকৃত, অযুক্তিসিদ্ধ, অপ্রাকরণিক। এই দুই অভাব পূরণের অভিপ্রায়ই আমাকে সংযত সাহিত্যিক ভাষা ও সহজবোধ্য প্রাকরণিক পরিভাষা রচনায় প্রবর্তিত করেছিল। আমার এই প্রচেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। ছন্দ-ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েও নীরস ব্যাকরণ ও নিছক গণিতের পথে আমি চলি নি। অকুণ্ঠ ব্যাকরণ ও নির্ভুল গণিতকেও সাহিত্যগুণান্বিত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

সুনির্দিষ্ট যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীতে পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনা এবং যথাযোগ্য ভাষা ও পরিভাষা যোগে যথার্থ ছন্দসাহিত্যের সূত্রপাত, আমার বিশ্বাস এই উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রবন্ধযুগল অগ্রণীত্বের অধিকারী। পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হিসাবে, অন্ততঃ আমার রচনায়, এ-দুটি এখনও অনতিক্রান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে 'ছন্দ-পরিক্রমা'র (১৩৭২) প্রথম অধ্যায়টি এবং জগদীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'-এর (১৩৮০) ছন্দ-প্রকরণটি এই প্রবন্ধদ্বয়ের অনুবর্তী ও পরিপূরক বলে গণ্য হতে পারে। আর সাহিত্যগুণের বিচারে এ-দুটিকে উত্তরকালীন 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' পুস্তিকা (১৩৩৮) ও 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের (১৩৫২) অগ্রদূত বলে মনে করা যায়। মোট কথা, প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ রচনা আর সাহিত্যগুণান্বিত প্রাকরণিক ভাষা রচনা, এই দুই ধারাতেই এ রচনা-দুটির স্থান পুরোভাগে। এখানেই এ-দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

এই বিষয়গত পূর্ণাঙ্গতা ও রচনাগত সাহিত্যগুণের কথা মনে করে অনেকেই তৎকালে এই প্রবন্ধ-দুটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িক পত্রে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৃষ্টিতে এ-দুটির কিছু অপূর্ণতা ও বিশ্লেষণগত কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। নিজের এই অতৃপ্তিবশেই তখন এই রচনা-দুটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে উৎসাহ বোধ করি নি। 'বাংলা ছন্দ ও সংগীত' নামক তৃতীয় প্রবন্ধটি অংশতঃ এই অতৃপ্তিরই ফল। তাই কোনো কোনো বিষয়ে (বিশেষতঃ যতির প্রকৃতি ও তারতম্য-ভেদ এবং যতিলোপ প্রসঙ্গে) এটিতে প্রথম রচনা-দুটির অপূর্ণতা নিরসনের প্রয়াস করা গিয়েছিল। এ হিসাবে এটিকে অংশতঃ প্রথম দুই প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সংগীতের মুক্তি' (১৩২৪ ভাদ্র) এবং 'ছন্দ' (১৩২৪ চৈত্র) নামে দুটি প্রবন্ধ পড়ে আমার ধারণা হয় যে, তাঁর ছন্দ রচনা তথা বিশ্লেষণ-প্রণালীর মূলে সাংগীতিক রীতির প্রেরণা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে কাজ করে থাকে। এই ধারণার বশেই সংগীত ও ছন্দের সাদৃশ্য ও পার্থক্যের স্বরূপনির্ণয়ে আগ্রহান্বিত হই। এই আগ্রহেরই পরিণতি ঘটেছে উক্ত তৃতীয় প্রবন্ধটিতে। এই উপলক্ষে ছন্দ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে নূতন আলোকপাতের প্রয়াস করা হয়েছে, তার মূল্যটুকুও উপেক্ষণীয় নয় বলেই মনে করি। আমার ছন্দচিন্তায় তার প্রভাব এখনও কিছুমাত্র ক্ষীণ হয় নি।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধ-তিনটিতে স্বীকৃত পরিভাষা, বিশ্লেষণ-

প্রণালী ও মতামত এখন আর পুরোপুরি স্বীকৃতিযোগ্য বলে মনে করি না। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, দীর্ঘকালের ব্যবধানেও আমার মৌলিক অভিমতগুলি অপরিবর্তিতই আছে, বরং অনেক স্থলে দৃঢ়তরই হয়েছে। অনেকগুলি গৌণ অভিমত-সম্পর্কেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুগত মূল্য আজও অনেকাংশে অব্যাহত আছে বলে মনে করি। বস্তুতঃ আমার আধুনিকতম ছন্দচিন্তার দৃঢ় ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল ওই তিন প্রবন্ধেই। ওই তিন প্রবন্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া আমার আধুনিকতম ছন্দচিন্তা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির দোষগুণ বিচার সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। এত দিন পরেও যে এগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি, এটাও তার অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় পর্ব (১৩৩৮-৩৯)

প্রথম পর্বের প্রায় আট বৎসর পরে আবার ছন্দচর্চায় ব্রতী হই। প্রথম পর্বে তিনটি বড় প্রবন্ধ আট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল একমাত্র 'প্রবাসী' পত্রিকায় আর এই পর্বের প্রধান অবলম্বন ছিল 'বিচিত্রা'। এই পর্বের ষোলটি প্রবন্ধের মধ্যে নয়টিই প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। বাকি সাতটি প্রকাশিত হয় 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থে এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চপুষ্প, পরিচয়, প্রবাসী (দুই সংখ্যায় একটি), পূর্বাশা ও উত্তরা, এই ছয় পত্রিকায়।

এ পর্বের রচনাগুলির লক্ষ্য ও প্রকৃতি ছিল প্রথম পর্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রথম পর্বের প্রবন্ধগুলির ত্রুটি ও অপূর্ণতা তখনও আমার মনকে পীড়িত করছিল। তাই এ সময়ে আমার লক্ষ্য হল অপেক্ষাকৃত ত্রুটিহীন ও পূর্ণতর ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার ভূমিকা হিসাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে পূর্বকৃত ত্রুটি-মোচন ও সেদিকে পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ। প্রথম পর্বের প্রবন্ধগুলি প্রকাশের পরে প্রায় আট বৎসর যাবৎ নানা জনের কাছ থেকে আমি শুধু অবিমিশ্র অভিনন্দন ও সমর্থনই লাভ করেছি। এ সময়ে কেউ ছন্দ-আলোচনায় এগিয়ে এলেন না, কারও কাছ থেকে গঠনাত্মক সমালোচনার সহায়তাও পেলাম না। এটা আমার ভাল লাগেনি। গঠনাত্মক সমালোচনায় নিজের চিন্তাশোধনের ও পূর্বসিদ্ধান্তের পুনর্বিচার করার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলি লেখার সময়ে আমার প্রধান ভরসা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের উপরে। কিন্তু তাঁর অকাল তিরোধানের (১৩২৯ আষাঢ়) ফলে আমি তাঁর গঠনাত্মক মতামত

জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। যা হক, নূতন উদ্যমে ছন্দচর্চায় প্রবৃত্ত হয়ে এবার আমি কিছু তীক্ষ্ণ ভাষার আশ্রয় নিলাম। আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল না। স্বয়ং কবিগুরু এগিয়ে এলেন তীক্ষ্ণতর ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে। তারপর যে ছন্দবিতর্ক শুরু হল তা আমার পক্ষে প্রীতিকর ছিল না। কারণ, প্রথমতঃ বিতর্কটা ঠিক তথ্যযুক্তির পথ ধরে চলে নি; আমার পারিভাষিক যুক্তি তাঁর কাছে সহজ-বোধ্য করা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং কবিগুরুর সঙ্গে তর্ক করতে আমার মনে দ্বিধাসংকোচের অবধি ছিল না, অথচ আমি সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতেও পারছিলাম না। এই বিতর্ক উপলক্ষে উভয় পক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হয়ে গেল। কিন্তু এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে (কবি কালিদাসের ভাষায়) 'পরিণাম-রমণীয়'ই হয়েছিল। কবিগুরু যেভাবে সস্নেহে এই বিতর্কের অবসান ঘটালেন, আমার পক্ষে তা পরম আনন্দ ও গৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে। এই বিতর্কের বাহ্য ইতিহাস অন্যত্র বিবৃত করেছি। তার আভ্যন্তর স্বরূপের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে 'অনুষঙ্গ' বিভাগে সংকলিত কয়েকটি চিঠিপত্র ('পত্রধারা-১') থেকে। এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, এই ছন্দবিতর্কে আমার ভূমিকাকে কেউ কেউ কিছু অতিকৃত রূপ দিয়েছেন। যেমন ছান্দসিক সুধীভূষণ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় আমাকে বলেছেন, 'বাংলা ছন্দ-কুরুক্ষেত্রের গাণ্ডীবধন্বা'। এরকম অভিধায় শুধু যে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি তা নয়, তাতে ঐতিহাসিক সত্যেরও অপলাপ করা হয়। একথা সত্য যে, এই ছন্দ-বিতর্ক বহুজনের মধ্যে ও নানা পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা স্থায়ীও হয়েছিল বেশ কিছুকাল। (মোটামুটি ১৩৩৮-৪১)। কিন্তু আমার বিতর্ক সীমা ছাড়িয়ে যায় নি, সে বিতর্ক ছিল শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং তার প্রকাশক্ষেত্র 'বিচিত্রা'। একমাত্র ব্যতিক্রম 'উত্তরা' পত্রিকায় (১৩৩৯ ভাদ্র) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ, কিন্তু তাও রবীন্দ্রনাথেরই মতামত-বিষয়ক। এই বিতর্কের যুগে বিভিন্ন পত্রিকায় বহুজনের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখক ও পাঠকদের মধ্যে ছন্দচর্চার আগ্রহ দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ফলে আমাদের ছন্দচিন্তাও অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল।

এই পর্বের ষোলটি প্রবন্ধের মধ্যে সাতটি বিতর্কবিষয়ক, বাকি নয়টি কিন্তু তর্কমুক্ত স্বাধীন রচনা। তর্কের মূল বিষয় ছিল দুটি—অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ। ছন্দবিতর্ককেও তাই দুই ধারায় বিভক্ত করা যায়। 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের

স্বরূপ' প্রবন্ধকে (রচনা ১৩৩৮ ভাদ্র, প্রকাশ ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ) উপলক্ষ করে প্রথম তর্কধারার সূত্রপাত হয়। আর দ্বিতীয় ধারার পরিণামে রচিত হয় 'বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দেব স্বরূপ' প্রবন্ধটি (১৩৩৯ ভাদ্র)। এই বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী সংকলিত হয়েছে তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সং)। উভয়ের মধ্যে বিতর্কের বিষয় ও প্রকৃতিব বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে 'ছন্দ' গ্রন্থের পাঠ-পরিচয় বিভাগে। এখানে তাব বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিতর্কিত বিষযে রবীন্দ্রনাথেব মতামত জানা যায তাঁর গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি থেকে। আমাব মতামত এতদিন সহজপ্রাপ্য ছিল না, তাই রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলির পুরো তাৎপর্গ তথা বিতর্কিত বিষযের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধিও সহজ ছিল না। এই গ্রন্থে আমা৷ প্রবন্ধগুলি সংকলিত হওযাতে আমাব একটি বহুবিলম্বিত কর্তব্য সম্পন্ন হল। এই হিসাবে 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা'কে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের পরিপূরক বলে গণ্য করা যায।

অন্য নযটি প্রবন্ধেব মধ্যে তিনটি বিতর্কেব পূর্ববর্তী আর ছয়টি বিতর্কের সমকালীন। পূর্ববর্তী তিনটির প্রথমটি ('বাংলা ছন্দের বিবর্তন') মূলতঃ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশযেব সভাপতিত্বে বঙ্গীয সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে (১৩৩৮ ভাদ্র ১৩) প্রদত্ত দীর্ঘ ভাষণেব সংক্ষিপ্ত সারমর্ম। বিদ্যাভূষণ মহাশযেব অনুরোধে সাধুভাষায অনুলিখিত ও পবে পবিষৎ পত্রিকায প্রকাশিত (৩৮শ বর্ষ ৩য সংখ্যা, কার্যবিবরণ, পৃ ২২-২৩)। পত্রিকায লেখাটির কোনো নাম ছিল না। গ্রন্থে গ্রহণকালে একটি নাম দেওয়া হল এবং মূল সাধুভাষাকে চলিত ভাষায রূপান্তবিত কবা গেল। বিতর্কপূর্ব কালের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' (রচনা ১৩৩৮ কার্তিক ২০, পরিমার্জনা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ ৯)। এটি প্রথম প্রকাশিত হয 'জযন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থে (১৩৩৮ পৌষ ১১)। তার কিছুকাল পরেই এটি আর একটু পরিমার্জিত হযে স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে পুনঃপ্রকাশিত হয়।[১] এই দুই প্রবন্ধ বাদে তর্কমুক্ত বাকি সাতটি প্রবন্ধ রচিত হয় প্রথম পর্বের তিন প্রবন্ধের অনুবৃত্তি রূপে। পূর্বোক্ত 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' আর এই সাত প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল প্রথম পর্বের

১ এই দুই প্রবন্ধ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য গ্রন্থকারের 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' গ্রন্থ (১৩৭৯ পৌষ) 'প্রসঙ্গ' বিভাগ, পৃ 14-15।

লেখাগুলির ত্রুটি ও অপূর্ণতা-মোচন। ফলে পূর্বপ্রকাশিত কোনো কোনো মত ও পরিভাষা বর্জন করে নূতন মত ও পরিভাষা প্রকাশ করতে হয়। নিষ্প্রয়োজন হলেও বলা উচিত যে, এই প্রবন্ধগুলিতে আমার ছন্দচিন্তার যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটে নি। বিশ্লেষণঘটিতই হক আর পরিভাষাঘটিতই হক, আমার চিন্তা পরিণত রূপ লাভ করেছে 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থে ও তার পরবর্তী প্রবন্ধাবলীতে। আমার বিরুদ্ধে অনেকের একটা বড় অভিযোগ এই যে, আমি ক্রমাগতই মত ও পরিভাষা পরিবর্তন করে চলেছি। তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি পরিবর্তনের আর বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নেই, যদিও আরও কিছু নূতন কথা বলবার ইচ্ছা এখনও আছে। আমার বিশ্বাস দীর্ঘকাল পূর্বে যে-লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি যাত্রা করেছিলাম সে লক্ষ্যের কাছে আমি পৌঁছুতে পেরেছি। আমার আরও বিশ্বাস এই গ্রন্থের সতর্ক পাঠকরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে, প্রথম পর্বের ন্যায় দ্বিতীয় পর্বের লেখাগুলিতে আমার যে সব মত ব্যক্ত হয়েছে বর্তমানে আমি তার থেকে খুব বেশি দূরে সরে আসি নি, আমার বিকশিত চিন্তার মুকুলিত রূপেরই পরিচয় পাওয়া যাবে এসব প্রবন্ধে। চিন্তাবিবর্তনের পথরেখা অঙ্কিত হয়ে আছে এগুলিতে। তা ছাড়া আরও একটা বড় কথা এই যে, ছন্দ সম্বন্ধে আমি এখনও যেসব মতামত পোষণ করি তার অধিকাংশই সঞ্চিত আছে এই গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায়। এটাই এ গ্রন্থের প্রধান মূল্য। এজন্যই এ সব প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে সংকলনের প্রয়োজন বোধ করেছি। এই গ্রন্থে ব্যক্ত যে সব মত পরে বর্জন করেছি যথাকালে তা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া পাঠক যদি বিভিন্ন প্রবন্ধে পরস্পর-বিরোধী মত লক্ষ্য করেন তবে ধরে নিতে হবে পূর্বপ্রকাশিত মত পরে ত্যাগ করা হয়েছে এবং পরবর্তী মতটাই স্বীকার্য। ইতিহাস-রক্ষার প্রয়োজনেই পরিত্যক্ত মতটা গ্রন্থ থেকে নিষ্কাশিত হয় নি।

পরিভাষা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। পাঠকসাধারণের অভিযোগটা কিন্তু পরিভাষা-পরিবর্তন সম্বন্ধেই বেশি প্রবল। এ বিষয়ে আমার পাল্টা অভিযোগ এই যে, আমাদের পাঠকরা প্রাকরণিক বিদ্যার ক্ষেত্রেও যে-কোনো এক গ্রন্থ পরিভাষা নির্বিচারে স্বীকার করে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চান, বিচার-বিবেচনা করে এক পরিভাষা ছেড়ে অন্য পরিভাষা গ্রহণ করতে যে মানসিক শ্রম প্রয়োজন সে শ্রমস্বীকারে তাঁরা কুণ্ঠিত। এটা মানসিক আলস্য বা জড়তারই লক্ষণ। বিজ্ঞানজগতে কিন্তু হামেশাই পরিভাষা পরিবর্তিত হয়, সেখানে কিন্তু এরকম

অভিযোগ ওঠে না, উন্নততর পরিভাষা গ্রহণে আগ্রহই দেখা যায়। নূতন পরিভাষা গ্রহণকালে আমি সর্বদাই যথাসাধ্য তথ্যযুক্তি দিতে চেষ্টিত হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব তথ্যযুক্তির পুনর্বিচার করতে কেউ এগিয়ে আসেন নি। অথচ নূতন পরিভাষা গ্রহণে একটা অলস বিমুখতা প্রায়শঃ লক্ষ করেছি। নূতন পরিভাষার দোষক্রটি কেউ দেখিয়ে দিলে তা মেনে নিতে আমি সর্বদাই রাজি ছিলাম, এখনও আছি। আমার পরিভাষার দোষক্রটি আমিই দেখেছি, আমিই সংশোধন করেছি, এটাই আমার দোষ বা গুণ। তা ছাড়া পরিভাষাগুলিকে পাঠকের কাছে সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য করার অবিরাম প্রয়াসের ফলেও কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। এটাকে অবশ্য গুণ বলেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, ক'টি পরিভাষা পরিবর্তিত হয়েছে এবং ক'বার? তিনটি মুখ্য আর বোধ হয় দু-তিনটি গৌণ পরিভাষা। গৌণ পরিভাষার পরিবর্তন নিয়ে কোনো অভিযোগ শুনি নি। যত অভিযোগ তিনটি মুখ্য পরিভাষা সম্পর্কে। তার মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়েছে দু'বার (অক্ষরবৃত্ত = যৌগিক, মিশ্র কলাবৃত্ত), আর দুটি পরিবর্তিত হয়েছে একবার করে (মাত্রাবৃত্ত = কলাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত = দলবৃত্ত)। এই সামান্য পবিবর্তন হযেছে পঞ্চাশ বৎসরে। তা ছাড়া সর্বশেষ পরিভাষাগুলি চালু আছে দশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরে। তবু যদি অভিযোগ নিরস্ত না হয় তবে আমার পক্ষে আক্ষেপ করা ছাড়া আর কি করবার আছে? এই আক্ষেপবশতঃই এত কথা বলতে হল, নতুবা নীরব থাকাই ছিল শ্রেয়ঃ ও আমার অভিপ্রেত।

এবার বক্তব্য বিষয়ের দিকে যাই। দ্বিতীয় পর্বের 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' লেখাটিই সর্বাধিক বিতর্কিত প্রবন্ধ। এটিকে উপলক্ষ করেই দীর্ঘকালব্যাপী বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এটিকে নিয়ে মোট সাতটি প্রবন্ধ এই বিতর্কগুচ্ছের অন্তর্গত। অন্য নয়টি লেখার মধ্যে 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' সর্বাধিক আলোচিত ও অভিনন্দিত। তার কারণ স্বল্প পরিসরের মধ্যে এটির সর্বাঙ্গীণতা ও সাহিত্য-গুণান্বিত ভাষা। বাকি প্রবন্ধগুলিতে বিষয়গত সামগ্রিকতাও নেই, রচনাগত সাহিত্যগুণও নেই। আছে স্বচ্ছ সরল বিষয়োপযোগী ভাষায় ছন্দ-ব্যাকরণের এক একটি বিষয়কে সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জসরূপে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা। তাই এগুলি তৎকালে ব্যাপক ভাবে পঠিত হলেও কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করে নি, উল্লেখযোগ্য অভিনন্দনলাভও করে নি। কিন্তু আসলে এগুলির দ্বারাই আমার

ছন্দচিন্তা পরিণতির দিকে চালিত হয়েছিল এবং ভাবী ছন্দ-ব্যাকরণের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। তাই আশা করি বর্তমানেও এগুলি মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে না।

অনুষঙ্গ

আমার ছন্দচিন্তার ব্যক্তিগত ইতিহাসটুকুর কালপরিধি ষাট বৎসরেরও (১৯১৪-৭৪) কিছু বেশি। স্বাধীন ছন্দচিন্তার সূত্রপাত হয় আরও কিছুকাল পূর্বে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আধুনিকতম স্বাধীন বিচারবুদ্ধিপ্রসূত ছন্দোবিশ্লেষণ আরম্ভ হয় বিংশ শতকের গোড়া থেকেই। এই সময়ে যাঁরা বাংলা ছন্দের স্বরূপনির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য স্বয়ং ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধু আধুনিকতম ছন্দশিল্পের স্রষ্টাই নন, আধুনিকতম ছন্দচিন্তার প্রবর্তকও তিনিই। তাঁর ছন্দপ্রবন্ধাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়েছে তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬২) 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগের শেষাংশে। এই প্রবন্ধাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (বর্তমানে মুদ্রণাধীন) পাঠপরিচয় বিভাগের 'কালক্রম' অংশে। বর্তমান লেখকের প্রথম চার পর্বে (১৩২৯-৭১) লেখা ছন্দপ্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হয়েছে 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থের পরিশেষে, আর পঞ্চম পর্বের (১৩৭২-৮১) তালিকা দেওয়া হল এই গ্রন্থের 'অনুষঙ্গ' বিভাগের শেষাংশে। তাছাড়া, বর্তমান লেখকের ছন্দপ্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে যেসব উল্লেখযোগ্য ছন্দপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (১৩০৭-২৯), তারও একটা তালিকা এই 'অনুষঙ্গ' বিভাগে যথাস্থানে দেওয়া গেল। ওসব প্রবন্ধের লেখকদের মধ্যে যাঁদের লেখার, বিষয়গতই হক বা ইতিহাসগতই হক, বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে করি তাঁরা হলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শশাঙ্কমোহন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাখালরাজ রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ছন্দচর্চায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে এঁদের সকলের রচনার সঙ্গেই আমার যথাসময়ে ও যথাযোগ্যভাবে পরিচয় ঘটেছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম রাখালরাজের প্রবন্ধ। এই মূল্যবান প্রবন্ধটির সন্ধান যে আমি পাই নি তার কারণ এটি প্রকাশিত হয়েছিল অখ্যাত (ও আমার পক্ষে অলভ্য) 'পরিচারিকা' পত্রিকায় এবং আমার প্রথম প্রবন্ধাবলী (১৩২৯-৩০) রচিত হয়েছিল সুদূর কুমিল্লা শহরে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তাঁর বিখ্যাত *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে (১৯২৬) প্রবোধচন্দ্রের পূর্বগামীদের নামের

তালিকায় (পৃ ২৮৯) রাখালরাজের নাম উল্লেখ করেন নি। রাখালরাজের প্রবন্ধটির প্রতি যথাসময়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে এটির গুরুত্ব উপলব্ধি আমার পক্ষে দু:সাধ্য হত না এবং আমার প্রথম প্রবন্ধের ভূমিকায় এটির নাম অনুল্লিখিত থাকত না। সবচেয়ে বড় কথা, যথাসময়ে এটির সন্ধান পেলে আমার ছন্দচিন্তার অগ্রগতি দ্রুততর হত। 'ছন্দপরিক্রমা' প্রকাশের (১৯৬৫ মে) পরে যখন বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমপরিণতির ইতিহাস রচনায় আগ্রহী হই তখন এই প্রবন্ধটির সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করি। 'পরিচারিকা' পত্রিকা সহজপ্রাপ্য নয়। আমার অনুরোধে শ্রীমান্ শঙ্খ ঘোষ ও শ্রীমান্ আশিস্ সেনগুপ্ত যথাক্রমে কলকাতা সাহিত্য-পরিষৎ ও কুচবিহার সাহিত্যসভার গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'পরিচারিকা' পত্রিকা থেকে রাখালরাজের প্রবন্ধটি নকল করে পাঠান ১৯৬৫ সালের শেষ ভাগে। এঁরা উভয়েই আমার স্নেহভাজন। আমার জন্যে বহু শ্রমস্বীকার করে তাঁরা এই প্রবন্ধের অনুসন্ধান করেছেন ও তার যথাযথ প্রতিলিপি করে পাঠিয়েছেন। উভয়কেই আমার আশীর্বাদ জানাই। যা হক, এই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধটিকে বর্তমান গ্রন্থের 'অনুষঙ্গ' বিভাগে পুনঃপ্রকাশ করা গেল। আশা করি তাতে তরুণ ছন্দজিজ্ঞাসুদের সন্ধিৎসাতৃপ্তির সহায়তা হবে। আর বাংলা ছন্দচিন্তার ইতিহাসে রাখালরাজের যথাযোগ্য স্থাননির্দেশেরও সহায়তা হবে। এখানে বলা যেতে পারে যে, অবকাশ পেলে আমার নিজেরই এ কাজ করার অভিপ্রায় আছে। আসল কথা এই যে, পূর্বগামীদের ছন্দচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতেই 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা'র প্রথম পর্বের রচনাগুলির গুণাগুণ বিচারের সহায়তা হতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁদের প্রবন্ধাবলীর তালিকা দেওয়া গেল। আর, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলির মূল্যনিরূপণের সহায়তা হতে পারে সমকালীন ছন্দ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। এই সমকালীন ছন্দপ্রবন্ধের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের পূর্বোক্ত পাঠপরিচয় বিভাগে। তাই এই বইএ সে তালিকা দেওয়া হল না।

যখন সাময়িক পত্রিকায় 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল সে সময়ে ও তার কিছু পরে সাহিত্যের নেপথ্যভূমিতে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছিল সে সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকের মনে কিছু কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে 'অনুষঙ্গ' বিভাগের প্রথম 'পত্রধারা' অংশে। পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তিই এই পত্রধারার আসল লক্ষ্য নয়। আধুনিক

দৃষ্টিতে এগুলি তৎকালীন ছন্দ-আলোচনার ঐতিহাসিক নিদর্শন বা পটভূমি বলে গণ্য হতে পারে। এটাই উক্ত পত্রধারা সংযোজনের আসল অভিপ্রায়।

পরিভাষা

ছন্দের মতো প্রাকরণিক বিদ্যার পক্ষে সুষ্ঠু পরিভাষা রচনা একটি প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। সুষ্ঠু পরিভাষা একাধারে স্বচ্ছ চিন্তার প্রতীক এবং সমগ্র ছন্দশাস্ত্রের সংহত রূপ। আমি যখন প্রথম ছন্দচর্চায় প্রবৃত্ত হই তখনই সুষ্ঠু পরিভাষা রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। পরে ছন্দচিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠুতর পরিভাষার প্রয়োজনবোধ হয়। অবশেষে নূতন করে আর-এক প্রস্থ পরিভাষা রচনা করে সেগুলির উপযোগিতা দেখিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় (১৩৫৫ মাঘ)। এই প্রবন্ধের কপি প্রায় পঞ্চাশ জন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের অভিমত জানতে চাই। উত্তরে কারও কাছ থেকেই কোনো সুনির্দিষ্ট অভিমত পাওয়া যায় নি। যাঁদের কাছ থেকে কোনো-না-কোনো রকম উল্লেখযোগ্য উত্তর পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের মতামত সংকলিত হল 'পত্রধারা' দ্বিতীয় পর্যায়ে। বাংলা ছন্দ-পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের এই আনুকূল্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের মতামতের ঐতিহাসিক মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। তাই এগুলিকে পাঠকসমাজের গোচর করা গেল।

এই নবপরিভাষা রচনার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে 'ছন্দপরিক্রমা'র ভূমিকায় (পৃ ১৮-১৯)। আর উক্ত 'ছন্দ-পরিভাষা' প্রবন্ধটি পরিমার্জিত রূপে সংকলিত হয়েছে ও-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে। এখানে বাংলা ছন্দের তিন ধারার তিনটি পারিভাষিক নাম সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা সংগত মনে করি। চারজন ছান্দসিক এই তিন ধারার কি নাম দিয়েছেন নীচে তালিকা-আকারে তা দেখানো হল।

রাখালরাজ	প্রবোধচন্দ্র	সুনীতিকুমার	কালিদাস রায়
অক্ষরমাত্রিক	অক্ষরবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত : syllabic	অক্ষরমাত্রিক
মাত্রাবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত : moric	স্বরমাত্রিক
স্বরমাত্রিক	স্বরবৃত্ত	স্বরবৃত্ত : stressed	পাদকমাত্রিক

এখানে 'মাত্রা' শব্দের দুই অর্থ সুস্পষ্ট। 'অক্ষরমাত্রিক' শব্দে 'মাত্রা' মানে unit। যে ছন্দে এক অক্ষরই এক unit হিসাবে গণনীয় তাকেই বলা হয়েছে

অক্ষরমাত্রিক। মাত্রা শব্দের এই অর্থ ব্যাকরণসম্মত, সুতরাং নির্দোষ। পক্ষান্তরে 'মাত্রাবৃত্ত' শব্দের 'মাত্রা' মানে mora বা কলা। এই অর্থ ছন্দশাস্ত্রসম্মত। সুতরাং এই অর্থ স্বীকারেও বাধা নেই। কিন্তু একই সঙ্গে এক শব্দকে দুই অর্থে ব্যবহার অযৌক্তিক। রাখালরাজ কিন্তু তাই করেছেন। পারিভাষিক সমতা রাখতে হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছন্দকে বলা উচিত 'মাত্রামাত্রিক'। এরকম নামের স্ববিরোধিতা সুস্পষ্ট। 'মাত্রাবৃত্ত' না বলে যদি বলা হত 'কলামাত্রিক' তাহলে রাখালরাজের নামকরণে সমতা রক্ষিত হত। কালিদাস রায়ের নামকরণে সমতা আছে।

স্বরমাত্রিক এবং স্বরবৃত্ত নামের 'স্বর' শব্দেও অর্থগত অনিশ্চয়তা দেখা যায়। প্রবোধচন্দ্রের মতে স্বরবৃত্ত মানে syllabic ; স্বর মানে syllable। রাখালরাজ স্বরমাত্রিক শব্দের ব্যাখ্যা দেন নি, সম্ভবতঃ তাঁর মতেও স্বর মানে সিলেব্‌ল্। কিন্তু সুনীতিকুমারের মতে স্বর মানে stress, স্বরবৃত্ত stressed। তিনি প্রবোধচন্দ্রকৃত স্বরবৃত্ত নামটাই গ্রহণ করেছেন, এবং বলেছেন 'it has been happily named' কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের অভিপ্রেত অর্থটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় নি। কালিদাস রায় 'স্বর' শব্দটা গ্রহণ করেছেন কলা (mora) অর্থে। দেখা যাচ্ছে স্বর শব্দের মানে কারও মতে syllable, কারও মতে stress, কারও মতে mora বা কলা। রাজশেখর স্পষ্ট করেই বলেছেন, স্বরবৃত্ত নামের উদ্দিষ্ট অর্থ জানি না।

সিলেব্‌ল্-এর বাংলা প্রতিশব্দ সম্বন্ধেও এই অনিশ্চয়তা। প্রবোধচন্দ্রের (হয়তো রাখালরাজেরও) মতে সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ স্বর ; সুনীতিকুমারের মতে অক্ষর এবং কালিদাস রায়ের মতে পাদক। আরও লক্ষিতব্য রাখালরাজ, প্রবোধচন্দ্র ও কালিদাস রায়, কেউই 'অক্ষর' শব্দকে সিলেব্‌ল্ অর্থে গ্রহণ করেন নি। ব্যতিক্রম শুধু সুনীতিকুমার।

এখানে অন্যান্য ছান্দসিকের মতামতের প্রসঙ্গ উত্থাপন অনাবশ্যক। শুধু এই চার জনের প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়, তিন শ্রেণীর ছন্দের নামকরণে কত মতপার্থক্য, একই নামের অর্থে কত অনিশ্চয়তা। এইজন্যেই পরবর্তীকালে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত নামের বদলে মিশ্রকলাবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত এই তিন নাম গ্রহণ করতে হয়েছে। কলামাত্রিক, দলমাত্রিক বললেও আপত্তির কারণ নেই। তবে বোধ করি কলামাত্রক, দলমাত্রক বলাই অধিকতর

ব্যাকরণসম্মত, সর্বভারতীয় ভাষায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কলাবৃত্ত, মিশ্র কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত, এই তিন নামে অর্থগত অনিশ্চয়তা নেই, আর নূতনত্বের বাধা ছাড়া মেনে নেবার অন্য বাধাও দেখি না। কারও কারও কাছে নূতন মনে হলেও আসলে কিন্তু এগুলির বয়স কম নয়। আশা করি বেঁচে থাকলে দীর্ঘকাল পরে এগুলি আর কারও কাছেই নূতন থাকবে না। নয়া পয়সাও এখন আর নয়া নেই।

পরিশেষে বলা উচিত যে, বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের সর্বত্র বানানের সমতারক্ষা বা ভ্রমসংশোধন করা সম্ভব হয় নি। এখানে কয়েকটিমাত্র শব্দের কথা বলাই যথেষ্ট। 'পংক্তি' বানান নির্ভুল নয়, 'পঙ্‌ক্তি' লেখাই সমীচীন। চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক ইত্যাদি ব্যাকরণসম্মত নয়, হওয়া উচিত চতুর্মাত্রক, পঞ্চমাত্রক ইত্যাদি। আশ্রেতা-আশ্রিত না লিখে লেখা উচিত আশ্রয় আশ্রিত, আশ্রেতা ধ্বনি হবে আশ্রয়ধ্বনি। ছন্দোগুরু, ছন্দোরীতি, ছন্দোবিশ্লেষ, কিন্তু ছন্দ-জিজ্ঞাসা, ছন্দ-বিতর্ক, ছন্দ-জ্ঞান—বাংলায় এসব ক্ষেত্রে সন্ধিস্থাপন বৈকল্পিক বলেই মনে করি। সন্ধি করা না করা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই নিজের ভাষাবোধ ও অভিরুচির উপরে নির্ভর করেছি। পক্ষান্তরে ছন্দপতন, ছন্দচর্চা, ছন্দতত্ত্ব ইত্যাদি স্থলে বিসর্গের অস্তিত্ব সমভাবে অস্বীকার করাই বাংলাভাষার প্রকৃতিসম্মত বলে মনে করি।

গ্রন্থশেষে একটি বর্ণানুক্রমিক দৃষ্টান্ত-তালিকা ও একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা যোজনার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতাবশতঃ তা সম্ভব হল না। এজন্য গ্রন্থখানির যে অপরিহার্য অঙ্গহানি হল তার জন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করি।

স্বীকৃতি

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে যখন এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছিল তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সুধীরের মেধাবী মনের সহায়তাই ছিল আমার উৎসাহের প্রধান উৎস। ছন্দশিক্ষাদানে সে-ই আমার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র। এই প্রবন্ধগুলি রচনার সময়ে তার নিত্যসাহচর্য ও সহকারিতা যে আমার কত বড় সম্বল ছিল সে স্মৃতি আমার মনে আজও অমলিন রয়েছে। সে কথা স্মরণ করে এ গ্রন্থের প্রথম পর্বটি তাকেই উৎসর্গ করলাম। দ্বিতীয় পর্বের প্রবন্ধগুলি রচনা ও প্রকাশের সময়ে অনুরূপ সাহচর্য ও সহকারিতা পেয়েছি

আমার ভ্রাতৃস্থানীয় শ্রীবিকাশচন্দ্র নন্দীর কাছে। তার পরের পর্যায়ে যাঁদের কাছে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য আমার সোদরপ্রতিম শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী। তাই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বটি উৎসর্গ করলাম এই দুইজনের যুক্ত নামে।

প্রথম ও দ্বিতীয়, এই উভয় পর্বেই আমার রচনাগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য বারবার অনুরোধ এবং কখনও কখনও অনুযোগ করতেন আমার অর্ধশতাব্দীরও অধিক কালের পরম সুহৃদ্ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। এতদিন পরে তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারাতে আমি যতখানি তৃপ্ত হয়েছি, আশা করি এই গ্রন্থ পেয়ে তিনিও ততখানি আনন্দিত হবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজে অনেকেই আমাকে সাগ্রহে সহায়তা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন আমার দুই জামাতা শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীদ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আর দুই কন্যা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুগতা সেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আছেন শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শ্রীনীলরতন সেন, শ্রীরামবহাল তেওয়ারী, শ্রীজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা ও শ্রীমতী পম্পা মজুমদার। গুরুতর দৃষ্টিক্ষীণতা সত্ত্বেও প্রথম পর্বের প্রুফ দেখার দায়িত্ব আমি নিজেই নিয়েছিলাম। দ্বিতীয় পর্ব ও অনুষঙ্গ বিভাগের প্রুফ দেখা প্রভৃতি মুদ্রণঘটিত সবরকম দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ শঙ্খ ঘোষ। তাঁর ছন্দজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তাই তাঁর উপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। আর, জিজ্ঞাসা-প্রকাশক শ্রীমান্ শ্রীশকুমার কুণ্ড যে অপরিসীম উৎসাহ, দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্য ও যত্ন নিয়ে, এমনকি ক্ষতিস্বীকারের ঝুঁকি নিয়েও এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতারও সীমা নেই। এঁদের সকলের সমবেত সহায়তার প্রতিদানে আমি শুধু জানাতে পারি আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভকামনা।

প্রবোধচন্দ্র সেন

বিষয়ক্রম

প্রথম পর্ব ১৩২৯-১৩৩০

সংযোজন

দ্বিতীয় পর্ব ১৩৩৮-১৩৩৯

অনুষঙ্গ

প্রথম প

১৩২৯-১৩৩

শ্রীমান্ সুধীর সেন

পরমকল্যাণীয়েষু

বাংলা ছন্দ

বাংলার সাহিত্যসম্পদ্ আজ নিঃস্ব বাঙালিকেও বিশ্বসমাজে বরেণ্য করেছে। আর সাহিত্যের এই রসপ্রবাহই বাংলার গ্রামে গ্রামে দরিদ্র কুটীরবাসীর দ্বারে দ্বারে এক নবজীবনের আনন্দবার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাঙালি জাতীয় জীবনের সার্থকতা লাভ করে ধন্য হবে। কেবল যে রসমাধুর্যই বাঙালির কাব্যসাহিত্যকে সম্পদ্‌শালী করে তুলেছে তা নয়, ছন্দপ্রাচুর্যও তাকে অপূর্ব বৈচিত্র্য ও শ্রী দান করেছে। বাংলা সাহিত্যের এই ছন্দশাখা যে কত অসংখ্য বর্ণের বিচিত্র কুসুমরাশিতে রমণীয় হয়ে উঠেছে তাই দেখিয়ে পাঠকগণকে একটু আনন্দদান করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু গোড়া থেকেই এ কথা বলে রাখা ভাল যে, সাহিত্যজীবনের নব নব উন্মেষে বাংলার কাব্যোদ্যানে এই অসংখ্য বর্ণহীন ফুলগুলি একে একে কি করে ফুটে উঠেছে ইতিহাসের দিক্ দিয়ে তা দেখানো কিংবা ছন্দের নৃত্যলীলা ও সুরবৈচিত্র্য কেমন করে কাব্যের রসকে বা ভাবের অনির্বচনীয়তাকে রসজ্ঞের অন্তরের মণিকোঠায় পৌঁছিয়ে দেয় সেই তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়। যোগ্যতর ব্যক্তি তত্ত্বরসপিপাসুর এ পিপাসা নিবৃত্ত করবেন। আমি কেবল সাদা কথায় সিধে রকমে বাংলার সমস্ত ছন্দগুলিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে, তাদের শ্রেণীবিভাগ করে এবং তাদের গায়ে এক-একটা নামের লেবেল এঁটে দিয়েই খালাস পাব। এই বিচিত্র ছন্দরাশিকে গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলে পাঠক চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারবেন, দীনা বাংলাভাষা ছন্দসম্পদে নিতান্তই দীনা নয় এবং পৃথিবীর কোনো ভাষাই এ বিষয়ে বাংলা ভাষার চাইতে অধিকতর ঐশ্বর্যশালিনী কি না সন্দেহের বিষয়।

বাংলা ছন্দের আলোচনা যে আর কখনও হয় নি তা নয়। বহু দিন থেকেই মাসিক পত্রিকাতে ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধ মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার অধিকাংশই ছন্দের আংশিক আলোচনা মাত্র। বাংলার কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৩২৪ সালে চৈত্রসংখ্যা 'সবুজপত্রে'

'ছন্দ'-নামক প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের প্রাণশক্তি কোথায়, ছন্দের ধ্বনিবৈচিত্র্য কিরূপ বিচিত্র উপায়ে কাব্যের ভাবকে ফুটিয়ে তোলে এবং মোটামুটি বাংলা ছন্দকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। এর আগেও তিনি সবুজপত্রে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু আমাকে নিতান্ত সভয়ে বলতে হচ্ছে যে, যদিও রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধে ছন্দরসজ্ঞদের চিন্তার বহু উপাদান জুগিয়েছেন এবং যদিও তিনি বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বটি বিশদরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন, তবু এ বিষয়ে আলোচনার আরও অনেক কথা বাকি রয়ে গেছে। তার পর বাংলা ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ১৩২৫ সালের বৈশাখসংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ছন্দ সরস্বতী' শীর্ষক রচনায় বাংলা ছন্দের বিস্ময়জনক জাদুশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি রচনাটি ঠিক সাধারণ প্রবন্ধের আকারে লেখেন নি, রূপকের মায়াজালের আড়াল থেকে ছন্দের ভেলকিবাজি দেখিয়েছেন। তাই তাঁর ছন্দের নামকরণ বা শ্রেণীবিভাগ রূপকের আড়ালে দাঁড়িয়েই স্বীয় রূপজ্যোতিতে পাঠককে মুগ্ধ করেছে। বিশেষরূপে এই দুটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধের নিকট যথাযোগ্য ঋণ স্বীকার করে আমি আসল কথার অবতারণা করছি। জানি না আমার এই নব নামকরণ ও সূত্রবিন্যাস সুধীসমাজে আদৃত হবে, না আমি "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

অক্ষর ও মাত্রা

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকার সংস্কৃত ছন্দকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগের নাম বৃত্ত, আর এক ভাগের নাম জাতি।

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।

—গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরী ১।৪

যেসকল ছন্দে সাধারণতঃ অক্ষরের সংখ্যা গুনে ছন্দের পরিমাণ স্থির করতে হয় সেগুলোকে বলে 'বৃত্ত', আর বিশেষভাবে মাত্রার পরিমাণের উপর যেসব ছন্দ নির্ভর করে সেগুলোর নাম 'জাতি'।

বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ।

—গঙ্গাদাস, 'ছন্দোমঞ্জরী' ১।৪

অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি বৃত্ত ছন্দ, গাথা, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি জাতি ছন্দের অন্তর্গত। এ স্থলে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে 'জাতি' ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত' নামেও পরিচিত হয়ে থাকে। সুতরাং জাতিকে যদি মাত্রাবৃত্ত নাম দেওয়া যায়, তা হলে শুধু বৃত্তকেও 'অক্ষরবৃত্ত' নাম দিয়ে মাত্রাবৃত্ত থেকে তার পার্থক্য রক্ষা করা প্রয়োজন। বাংলা ছন্দেরও দুটি প্রধান ভাগকে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত অভিধা দেওয়া যায়।

কিন্তু কি করে এ দুটো শ্রেণী ভাগ করা যায় তা দেখানোর আগে 'অক্ষর' ও 'মাত্রা' এ দুটো পরিভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। প্রথমেই মনে রাখা উচিত, ছন্দশাস্ত্রের অক্ষর আর ব্যাকরণশাস্ত্রের অক্ষর এক জিনিস নয়। ব্যাকরণে অক্ষর বা বর্ণ কাকে বলে তা পাঠশালার ছাত্রদের থেকে শুরু করে কারও অজানা নেই। কিন্তু ছন্দের অক্ষর তা নয়। ছন্দশাস্ত্রের মতে শব্দের অন্তর্গত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে সিলেব্‌ল্ তারই নাম অক্ষর। যথা, বাগর্থাবিব— যে কোনো পাঠশালার ছাত্র বলে দিতে পারে ব্যাকরণের দিক্ থেকে এখানে এগারোটি বর্ণ আছে। কিন্তু ছন্দশাস্ত্রবিদরা বলবেন এখানে পাঁচটি মাত্র অক্ষর আছে, কেন না এখানে বা গ-র্থা-বি-ব— বাগ্‌যন্ত্রের এই পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রয়াস থেকে এই সমগ্র কথাটা উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন সংখ্যার দিক্ দিয়ে বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণপ্রয়াসের unit বা একককে বলা যায় 'অক্ষর', তেমনি কালের দিক্ দিয়ে উচ্চার্য শব্দের ওজন বা পরিমাণের একক বা unitকে বলা যায় 'মাত্রা'। যথা – অর্থ এবং অথ, সংখ্যার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে এই দুটো শব্দের প্রত্যেকটিতেই দুটো করে অক্ষর আছে। কিন্তু আর-এক দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে প্রথম শব্দটি ওজনে দ্বিতীয় শব্দটির দেড়গুণ, কেন না প্রথমটার ঘাড়ে একটা রেফের বোঝা চাপানো হয়েছে। বস্তুতঃ প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করতে দ্বিতীয়টির দেড়গুণ সময় লাগে। এখন দেখতে হবে এই কাল বা ওজনের দিক্ থেকে একক বলব কাকে। সকলেই জানে বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করতে গেলে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরের দ্বিগুণ সময় নেয়। আসলেও হ্রস্বস্বরকে দ্বিগুণ করেই দীর্ঘস্বর হয়। তা ছাড়া হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণেও হ্রস্বস্বরের সমান সময়ই লাগে। অ আর ক, এই দুটো বর্ণ উচ্চারণ করলেই এ কথার সত্যতা টের পাওয়া যাবে। সুতরাং হ্রস্বস্বর ও হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জনকে

মাত্রার একক বা একমাত্রিক বর্ণ বলা যেতে পারে এবং দীর্ঘস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিমাত্রিক বর্ণ বলা যায়। শুধু তাই নয়, একমাত্রিক বর্ণের পরে যুক্তবর্ণ, অনুস্বার এবং বিসর্গ থাকলে একমাত্রিক বর্ণটিও দ্বিমাত্রিক হয়ে যায়। যথা— পূর্বোক্ত 'অর্থ' শব্দটি। এখানে রকার ও থকারের যুক্তবর্ণ পরে থাকায় পূর্ববর্তী অকারটিকে দ্বিমাত্রিক বলে ধরতে হবে; কেননা অকারের উপর ভর দিয়েই রেফ থ-এর মাথায় উঠেছে; কাজেই অকারের শক্তি দ্বিগুণ। এই হিসাবেই দেখা যাবে অর্থ শব্দের অকারে দুই মাত্রা, আর থকারে এক মাত্রা, সবসুদ্ধ তিন মাত্রা; কিন্তু 'অথ' শব্দে দুই মাত্রা। বন— দুই মাত্রা, বর্ণ— তিন মাত্রা। ব্রণ— এখানেও দুই মাত্রা, কেননা ব্ ও র্ অকারের উপর ভর দিয়ে নিজেদের ওজন তার উপর চাপিয়ে দেয় নি, বরং অকারই নিজের কুক্ষিতে ওই দুই বর্ণকে আশ্রয় দান করেছে। এইরূপ বিশ্ব, পূর্ব, দুঃখ, কংস প্রভৃতি শব্দে তিন মাত্রা; আনন্দ, অনন্ত, তরঙ্গ প্রভৃতি শব্দে চার মাত্রা। ছন্দের পরিভাষায় একমাত্রিক বর্ণকে 'লঘু' ও দ্বিমাত্রিক বর্ণকে 'গুরু' বলে। ছন্দে ত্রিমাত্রিক বর্ণের ব্যবহার হয় না।

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ।

—গঙ্গাদাস, 'ছন্দোমঞ্জরী' ১।১১

সুতরাং দেখা গেল অক্ষরের হিসাবে যা এক অক্ষর, মাত্রার হিসাবে তা একমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক দু-ই হতে পারে। পূর্বের দৃষ্টান্তটাই আবার ধরা যাক। বা-গ-র্থা-বি-ব—অক্ষরের হিসাবে এখানে পাঁচ অক্ষর বটে, কিন্তু মাত্রার হিসাবে আট মাত্রা; কারণ বা-গ-র্থা-বি-ব পদটিতে প্রথম তিন অক্ষর গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং পরের দুই অক্ষর লঘু বা একমাত্রিক।

অক্ষরবৃত্ত

এই তো গেল সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের হিসাবনিকাশ। কিন্তু বলা বাহুল্য সংস্কৃতের হিসাব বাংলায় অবিকল খাটে না।

প্রথমতঃ, অক্ষরবৃত্তের কথা। বাংলা অক্ষরবৃত্তে সাধারণতঃ শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বর অর্থাৎ হলন্ত-উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণও এক অক্ষর বলেই গণ্য হয়, যদিও সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে এমন বর্ণ অক্ষর বলে গণ্য হতে পারে না। যথা—

× ×
পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
×
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল ॥

—মদনমোহন, 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ, প্রভাতবর্ণন

এ স্থলে প্রথম ছত্রের চতুর্থ ও অষ্টম এবং দ্বিতীয় ছত্রের ষষ্ঠ অক্ষর সংস্কৃত নিয়মে অক্ষররূপে পরিগণিত হতে পারে না, কেননা তাদের স্বরান্ত উচ্চারণ হয় না। কিন্তু বাংলায় তারাও অক্ষর, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, শব্দের অন্তে অ-স্বর ব্যঞ্জন থাকলে তার পূর্ববর্তী বর্ণের আমরা দীর্ঘ উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু বাংলা অক্ষরবৃত্তে অ-স্বর ব্যঞ্জনবর্ণ যদি শব্দের মধ্যে স্থান পায় তবে বাংলা ছন্দ তার মর্যাদা রক্ষা করে না, তাকে অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে সমান তালে সমান ওজনে উচ্চারণ করে যায়। এখানে ছোট বড় সব সমান, পূর্ণ সাম্য। যথা—

× × ×
১। নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
× × । ×
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
× । ×
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
। ×
বধিল সম্মুখ-রণে?

—মধুসূদন, 'মেঘনাদবধ', প্রথম সর্গ, পংক্তি ৮০

× । ।
২। দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃকুলবধূ;
× × ×
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?

—মধুসূদন, 'মেঘনাদবধ', তৃতীয় সর্গ, পংক্তি ৭৮

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-দুটিতে ×-চিহ্নিত কোনো বর্ণেরই স্বরান্ত উচ্চারণ হবে না,

তথাপি এগুলো বাংলা অক্ষরবৃত্তে এক-একটি অক্ষর বলে গণ্য হয়েছে। তার কারণ উদ্‌ধৃত ছত্র-কয়টি পড়লেই বোঝা যাবে এগুলোর পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হচ্ছে। সুতরাং এ বর্ণগুলোর স্বরান্ত উচ্চারণ না হওয়াতে প্রতি পংক্তিতে ওজনের যে কমতি পড়ে যায়, পূর্ববর্তী স্বরগুলোর দীর্ঘ উচ্চারণে তার পূরণ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং ছন্দপতন হয় নি। কিন্তু তা বলে এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা চলবে না। কারণ পরে যুক্তবর্ণ থাকা সত্ত্বেও দণ্ডচিহ্নিত অক্ষরগুলো দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য হয় নি। আসল কথা, এখানে হসন্ত, স্বরান্ত এবং যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণ, সকলেই এক ওজনে উচ্চারিত হচ্ছে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সকলকেই সমান আসন দিচ্ছি। এই সাম্যরক্ষা দোষই হক আর গুণই হক, এইটেই হচ্ছে বাংলা অক্ষরবৃত্তের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটুকু না থাকলে এ ছন্দের কোনো মূল্যই থাকত না। কারণ এই সাম্যরক্ষার ক্ষমতাই অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিকে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠিয়ে নিতে পারে বা নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে নামিয়ে আনতে পারে। বস্তুতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বর্ণের জাতিভেদ না মানলেও সে কোনো বর্ণেরই অমর্যাদা করে না, যদিও প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে বিশদ করছি। যথা—

১। ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন-ছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘ ধারা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', বর্ষশেষ

২। স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', রাত্রি

উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্ত-দুটো পড়লেই বোঝা যাবে ছন্দের তন্ত্রী কত উঁচু সুরে বাঁধা হয়েছে। দ্বিতীয়টির ধ্বনিস্তর প্রথমটির চাইতেও উপরে। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—যুক্তাক্ষরের প্রাধান্য। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, প্রথম দৃষ্টান্তটিতে গুরুস্বর আছে মাত্র আটটি আর দ্বিতীয়টিতে আছে

বালোটি। এইজন্যই দ্বিতীয়টির ধ্বনিগাম্ভীর্য এত বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে
টো উদাহরণেই তো গুরুস্বরের চাইতে লঘুস্বর অনেক বেশি, ছন্দের গাম্ভীর্য
তাদের উপর নির্ভর না করে গুরুস্বরগুলোর উপরেই নির্ভর করে কেন ? এর উত্তর
এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গুরুস্বরকে লঘুস্বরের সঙ্গে একাসনে না বসিয়ে লঘুস্বরকেই
গুরুস্বরের সঙ্গে একাসনে বসায়। সুতরাং পাঁচটা স্বরের মধ্যে যদি একটাও
গুরুস্বর থাকে তবে ওই একটিমাত্র গুরুস্বরই বাকি চারটি লঘুস্বরকে এমন শক্তি
ও গাম্ভীর্য দান করে যে, ওই চারটি লঘুস্বর থেকেই অতি গুরুগম্ভীর ধ্বনি উদ্‌গত
তে থাকে ; তখন মোট মাত্রাপরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এবং তার ধ্বনি
আকাশের অতি ঊর্ধ্বস্তরে উঠে যায়। যথা—

×　　　×
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', রাত্রি

এই পদটিতে দশটি অক্ষরের মধ্যে মাত্র দুটি গুরুস্বর সবগুলোকে আঘাত করে
কি এক শক্তির সঞ্চার করছে আর তাদের মধ্য থেকে কি গম্ভীর আওয়াজ নির্গত
করছে তা অনায়াসেই বোঝা যায়। যদি লেখা হত—

আলোড়িয়া ঘন তমোরাশি

তবে অমনি সমগ্র ধ্বনিস্তরটাই অনেক নীচে নেমে যেত। মেঘনাদবধ
কাব্যখানি পড়লেই দেখা যায় কবি কেমন অবলীলাক্রমে নিজের প্রয়োজনমতো
ছন্দের দুন্দুভিতে যুক্তবর্ণের করাঘাত করে কাব্যের ধ্বনিকে আকাশের উচ্চ হতে
উচ্চতর স্তরে তুলে নিয়েছেন, আবার নিজের প্রয়োজনমতো অযুক্তাক্ষরের প্রয়োগ
দ্বারা ধ্বনির স্তরকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছেন। ভাবের ওঠানামার সঙ্গে
সঙ্গে ধ্বনির এই ওঠানামার শক্তিই অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে
এমন মহীয়ান্ করে তুলেছে। এইজন্যই বাংলার সমস্ত মিত্রাক্ষর এবং
অমিত্রাক্ষর কাব্যগ্রন্থে, কাব্যনাট্যে এবং গম্ভীর কবিতামাত্রেই এই ছন্দের ব্যবহার
হচ্ছে।

বাংলা অক্ষরবৃত্তের এই উত্থানপতনের ক্ষমতাকেই রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন
'শোষণশক্তি'। কারণ এই ছন্দ অক্ষরের সংখ্যা ঠিক রেখে নিজের মধ্যে
বহুলপরিমাণে ব্যঞ্জনবর্ণ শোষণ করে নিতে পারে। এ স্থলে তাঁর প্রদত্ত
উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।—

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।

—বলরামদাস, 'পদরত্নাবলী (রবীন্দ্রনাথ), ২৭

এ হল ধ্বনির প্রথম স্তর। তার পর—

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ', সবুজপত্র ১৩২৪ বৈশাখ

এখানে একটিমাত্র যুক্তবর্ণের ঝংকারে সমগ্র ধ্বনিটা এক স্তর উপরে উঠে গেল। তার পর—

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।

—পূর্বোক্ত

সমগ্র পংক্তিটার ধ্বনিমাত্রা বেড়ে যাওয়াতে আওয়াজ অনেক উপরে উঠে গেল।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

—পূর্বোক্ত

আর-এক স্তর উঠে গেল।

সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

—পূর্বোক্ত

এখানে সুর একেবারে পঞ্চমে উঠে গেছে।

সঙ্গীত-তরঙ্গ-রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।

—পূর্বোক্ত

ধ্বনি ষষ্ঠ স্তরে উঠে গেছে। আর-এক মাত্রা বৃদ্ধি হলে সপ্তমে উঠে যাবে বটে, কিন্তু তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

কিন্তু এ কথা বললে ভুল হবে যে, উদ্ধৃত ছয়টি পংক্তির প্রত্যেকটিতেই সমান মাত্রা। কেননা, সবগুলোতেই মাত্রা যদি সমান হত তা হলে ধ্বনির স্তরগুলো উচ্চতার হিসাবে পর পর সজ্জিত করা যেত না। অবশ্য প্রত্যেক পংক্তিতেই অক্ষরের সংখ্যা সমান, অর্থাৎ চোদ্দো। কিন্তু একটির পর একটিতে ধ্বনির পরিমাণ যেমন বেড়ে চলেছে, মাত্রার পরিমাণও তেমনি বেড়ে চলেছে। কারণ মাত্রার পরিমাণই ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং মাত্রার আধিক্যই ধ্বনির গাম্ভীর্যবৃদ্ধির হেতু। প্রথম স্তরের পংক্তিটিতে মাত্রাসংখ্যাও অক্ষরসংখ্যার মতোই চোদ্দো, কারণ এখানে একটাও গুরুস্বর নেই। সর্বশেষ পংক্তিটিতে মাত্রাসংখ্যা উনিশ, কারণ গুরুস্বর পাঁচটি, তা ছাড়া গুরুস্বরগুলোর সঙ্গগুণে লঘুস্বরগুলোও ভারী হয়ে উঠেছে। সেজন্যই ধ্বনির এত গাম্ভীর্য।

ধ্বনিকে গাম্ভীর্যের স্তরে স্তরে উন্নীত করার বিচিত্র ক্ষমতা ছাড়া ভাবকেও ক্রমে ক্রমে গুরুগম্ভীর করে তোলবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা বাংলা অক্ষরবৃত্তের আছে। এ ছন্দের এই অদ্ভুত ক্ষমতা কবি মধুসূদন যে দিন আবিষ্কার করেন, সে দিন থেকেই বাংলা ছন্দের শক্তি ও ঐশ্বর্য সহস্রগুণে বেড়ে গেছে। তার পর থেকেই বাংলায় মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গভীর ও গম্ভীর কাব্য রচনা সম্ভব হয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের আগে কবির হৃদয়ের ভাবস্রোত যতই তীব্র হক না কেন তাকে পয়ারের দুটি ছত্রের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকতে হত, আর সে স্রোত আপনার অন্তরের খরবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেবলি ফোঁপাতে থাকত—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

—রঙ্গলাল, 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য

কিন্তু পয়ারের গণ্ডি কিছুতেই ভাঙল না, দাসত্বশৃঙ্খল মোচন হল না। তার পর যখন একদিন বিদ্রোহী কবি মধুসূদন এসে 'পয়ার পায়ের বেড়ি ভাঙি কবিতার' বিদ্রোহধ্বজা উড়িয়ে দিলেন, সে দিন বাংলার সাহিত্যে কাব্যের বান ডেকে এসেছিল। বাংলা অক্ষরবৃত্তের যে বিচিত্র শক্তির ফলে এমন অঘটন ঘটা সম্ভব হয়েছিল, সে শক্তিটি হচ্ছে এই যে— ভাবস্রোতের তীব্রতা ও গভীরতার সঙ্গে তাল রেখে এ ছন্দকে যতদূর ইচ্ছা প্রসারিত করে নেওয়া যায় এবং কবি নিজের প্রয়োজনমতো এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বহু স্থানে যতিস্থাপনের দ্বারা এর গতিভঙ্গিকে বিচিত্র লীলায় লীলায়িত করে তুলতে পারেন। এখানে কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্‌ধৃত করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই বিচিত্র গতিভঙ্গির একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

দুর্ভাবনা |
দুঃস্বপ্ন-জননী, | ভেবো না আমার তরে
বোন, | সুখে আছি, | মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, | কে জেনেছে জীবনের সুখ? |
মরণের তটপ্রান্তে ব'সে | এ যেন গো
প্রাণপণে | জীবনের একান্ত সম্ভোগ।

—রবীন্দ্রনাথ, 'রাজা ও রানী', পঞ্চম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য

উদ্ধৃত ছত্রকয়টিতে যতিচিহ্নগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে কত বিচিত্র উপায়ে এ ছন্দে যতি দেওয়া যায়। যতির এই বিচিত্র সন্নিবেশের ফলে ছন্দ কেমন অদ্ভুত রকমে মোড় ফিরে ফিরে স্বীয় গতিপথকে তরঙ্গিত করে তুলেছে। কোথাও চার, কোথাও ছয়, কোথাও আট, কোথাও দশ এবং কোথাও বারো অক্ষরের পরে যতি প'ড়ে তার একটানা গতিকে বৈচিত্র্য দান করছে। বাংলা অক্ষরবৃত্ত রচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে এবং এই স্বাধীনতার ফলেই কবি এ ছন্দকে একঘেয়ে হ'তে না দিয়ে নব নব ভঙ্গিতে তরঙ্গিত করে তুলতে পারেন।

বাংলা অক্ষরবৃত্তের পরিচয় সমাপ্ত করার আগে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে এর পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত ছন্দ বিবিধ তরঙ্গভঙ্গিতে দোলায়মান, তার প্রতি পংক্তির অক্ষরগুলো লঘুগুরুভেদে এমনি বিচিত্র উপায়ে দুলে ওঠে যে, তার ধ্বনিটাও তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত হয়ে পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে দোলা দিতে থাকে। যথা ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ—

॥ ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । । ॥

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং

মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।

ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্

আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

—কালিদাস, 'রঘুবংশ', ত্রয়োদশ সর্গ, ২

এই শ্লোকটি যথারীতি উচ্চারণ করে পড়ে গেলেই তার অদ্ভুত ধ্বনিকম্পন পাঠকের মনে দোলা দিতে থাকবে। কিন্তু বাংলা অক্ষরবৃত্তের এই তরঙ্গলীলা নেই, তার সুর একঘেয়ে; কেবল মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষরের সংঘাতে তার একটানা স্রোতকে ক্ষুব্ধ করে তুলে পাঠকের শ্রুতি ও চিত্তকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সচেষ্ট সচেতন করে তোলে। যথা—

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে

× × ×

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।

—মধুসূদন, 'মেঘনাদবধ', ষষ্ঠ সর্গ, পংক্তি ৫৩০

মাত্র তিনটি গুরুস্বর এই শ্লোকটিকে একান্ত নিস্তরঙ্গতা থেকে রক্ষা করেছে।

পক্ষান্তরে সংস্কৃত ছন্দ নৃত্যপরায়ণ হলেও সে প্রতি চরণে প্রতি শ্লোকে এক তালেই নাচতে থাকে, তার গতিবৈচিত্র্য নেই। তাতে তার একতালা নৃত্যটাই ক্রমে একঘেয়ে হয়ে আসে। কিন্তু বাংলা ছন্দের স্রোত নিস্তরঙ্গ হলেও সে স্রোত একটানা না চলে বহুবিচিত্র পর্বত-উপত্যকা বন্ধুর সমতল ভূমির উপর এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে পাঠককে স্বীয় গতিপথের অপূর্ব সৌন্দর্যসুষমায় মুগ্ধ করতে থাকে। 'দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্ন-জননী', ইত্যাদি কাব্যাংশটি পড়লেই এ কথা বেশ বোঝা যাবে।

মাত্রাবৃত্ত

দ্বিতীয়তঃ, মাত্রাবৃত্তের কথা। এ সম্বন্ধে একমাত্র বক্তব্য এই যে, বাংলায় সংস্কৃতের মতো স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, বাংলায় সব স্বরেরই লঘু বা একমাত্রিক উচ্চারণ। কেবল ঐকার ও ঔকারের গুরু বা দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হয়। তা ছাড়া হসন্তবর্ণ, অনুস্বার বা বিসর্গ পরে থাকলেও পূর্ববর্তী স্বরের দুই মাত্রা গণনা করা হয়। অক্ষরবৃত্তের মতো এ ছন্দে অক্ষরসংখ্যা ঠিক রেখে যথেচ্ছ যুক্তবর্ণের প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু এ ছন্দে মাত্রার পরিমাণ ঠিক রেখে ইচ্ছামত যুক্তবর্ণ ব্যবহার করা যায় এবং তাতে অক্ষরসংখ্যা কমে যায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যথেষ্টপরিমাণ যুক্তাক্ষরের প্রয়োগে ছন্দের সৌন্দর্য বা ধ্বনির মাধুর্যবৃদ্ধি হয়। কারণ তাতে ছন্দপ্রবাহের একটানা ভাবটি দূর হয়ে নানা রকম ঢেউ খেলতে থাকে। মাত্রাবৃত্তের কয়েকটা উদাহরণ দিলেই তার স্বভাবটি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যথা—

১। লঙ্ঘি এ | সিন্ধুরে | প্রলয়ের | নৃত্যে
ওগো কার | তরী ধায় | নির্ভীক | চিত্তে,
অবহেলি | জলধির | ভৈরব | গর্জন
প্রলয়ের | ডঙ্কার | ওঙ্কার | তর্জন ?

—নজরুল, 'অগ্নিবীণা', খেয়াপারের তরণী

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চার মাত্রা আছে, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির শেষ ভাগে তিন-তিন মাত্রা। কিন্তু বিভিন্ন পংক্তিচ্ছেদে অক্ষরসংখ্যার কোনো সামঞ্জস্য নেই।

২। কি কথা উঠে | মর্মরিয়া | বকুলতরু | -পল্লবে,
ভ্রমর উঠে | গুঞ্জরিয়া | কি ভাষা।
উর্ধ্বমুখে | সূর্যমুখী | স্মরিছে কোন্ | বল্লভে,
নির্ঝরিণী | বহিছে কোন্ | পিপাসা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', মদনভস্মের পরে

শেষাংশগুলো বাদে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে পাঁচটি করে মাত্রা আছে। কিন্তু অক্ষর-সংখ্যার সামঞ্জস্য নেই। প্রথম ও তৃতীয় ছত্রের শেষাংশে চার মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের শেষাংশে তিন মাত্রা করে আছে।

৩। এ নহে মুখর | বনমর্মর | -গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর | -গরজে সাগর | ফুলিছে,
এ নহে কুঞ্জ | কুন্দকুসুম | -রঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল | কলকল্লোলে | দুলিছে।

— রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', দুঃসময়

শেষাংশগুলো বাদে প্রতি ভাগে ছয় মাত্রা। প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ ছত্রের শেষাংশে যথাক্রমে চার ও তিন মাত্রা আছে।

৪। শ্বেত ললাটে লাঞ্ছনা | রক্তচন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা | হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর | সত্য-জ্যোতিশিখা,
স্বাধীন দেশবাণী | কণ্ঠে মন বোলে,
সে ধ্বনি উঠে রণি | ত্রিংশ কোটি আজি | মানব-কল্লোলে।

—নজরুল, 'বিষের বাঁশী', বন্দীবন্দনা

এখানে প্রতি ভাগে সাতটি করে মাত্রা আছে, কিন্তু অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা নেই।

আশা করি উদ্ধৃত উদাহরণগুলি থেকেই পাঠক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ধ্বনির গাম্ভীর্য এবং বাক্যের সম্প্রসারণক্ষমতা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব; সুতরাং সে গুরুগম্ভীর ভাবের উপযুক্ত বাহন। এজন্যই বৃহৎ কাব্যে, নাটকে এবং গম্ভীরভাবপ্রকাশক কবিতাদিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার এত বেশি। কিন্তু সুরবৈচিত্র্যই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব। এজন্যই এ ছন্দ গীতিকবিতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এ ছন্দ গম্ভীর ভাবের কবিতার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য, তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অমিত্রাক্ষর কবিতা

রচনা করা অসম্ভব। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে ধ্বনিবৈষম্য অর্থকেও কেমন দুই স্বতন্ত্র উপায়ে ফুটিয়ে তোলে এবং দুই বিভিন্ন শক্তিতে শক্তিশালী করে তোলে তা নিম্নোক্ত কাব্যাংশ-দুটো পড়লেই বেশ বোঝা যাবে।—

১। অক্ষরবৃত্ত

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা।···
আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার—
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,···
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে,
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্যকারাগারে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্চয়িতা', নমস্কার

২। মাত্রাবৃত্ত

আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহা-স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যেথা বন্দী-কারাগৃহ
সেথা কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীরদলে?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা মুক্ত নভতলে।

— নজরুল, 'বিষের বাঁশী,' বন্দীবন্দনা

দুটোতেই প্রচুর শক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথমটিতে পৌরুষশক্তি যেন সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে আপনার গতিবেগে আপনি বীরদর্পে পা ফেলে ছুটে চলেছে। দ্বিতীয়টিতে নারীশক্তি যেন পদে পদে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং ওই নিয়ন্ত্রণের ফলেই তার ভিতরকার শক্তি দ্বিগুণ বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।*

* প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ

স্বরবৃত্ত

অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছাড়া বাংলা কবিতার আর-একটি নিজস্ব ছন্দ আছে যা সে সংস্কৃত বা অন্য কোনো ভাষার কাছে ধার করে পায় নি। এ ছন্দকে বাংলা ভাষা নিজের প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি করেছে। সাধু বাংলা চিরকাল পণ্ডিতসমাজে আদর পেয়ে আসছে এবং সেজন্যই সে দেবভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্ক দাবি করে স্ফীত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কথিত বাংলা চিরকাল বাঙালি নরনারীর মুখে মুখেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পণ্ডিতসমাজের চোখের আড়ালে নিজের সুরে-তালে ও নিজের ছন্দে বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার মনোরঞ্জন করে আসছে। এই কথিত বাংলার ছন্দ বহুদিন ধরে ছড়া-পাঁচালির রূপ ধরে শিশুর নিদ্রাকর্ষণ করে, মেয়েদের শাস্ত্রজ্ঞানের বাহন হয়ে, গ্রাম্য জেলে-চাষীদের বাউল প্রভৃতি গানের উৎসমূলে কথা জুগিয়েই নিজেকে ধন্য মনে করছিল। কিন্তু এমনি করে দিনে দিনে যখন তার ভাণ্ডারে নানা ভাষা নানা ভাব থেকে শক্তি ও সম্পদ্ সঞ্চিত হয়ে তাকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলল তখন পণ্ডিতগণের দৃষ্টি তার উপরে পড়ল। তখন থেকেই কথিত বা প্রাকৃত বাংলাভাষা সাহিত্যের আসরে একটুখানি স্থান পেয়েছে। এখন গদ্য-পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রাকৃত বাংলা স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়ে সাহিত্যিকগণকে বিস্মিত করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের পরিচালিত 'মাসিক পত্রিকা'-নামক মাসিক পত্রিকাতেই প্রাকৃত বাংলার সরল সহজ সৌন্দর্যের প্রতি শিক্ষিতসমাজের মনোযোগ আকর্ষণের প্রথম প্রয়াস হয়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'আলালের ঘরের দুলাল' সে প্রয়াসের অতি উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করে নি। আজকাল আবার কয়েক বৎসর ধরে এ দিকে একটা নব উদ্যম দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে প্রাকৃত বাংলার গৌরব ঘোষণা করেছে। তথাপি এখনও অধিকাংশ সাহিত্যিক এই সহজশক্তিশালী প্রাকৃত বাংলাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নেন নি। কিন্তু গদ্যলেখকসমাজে এ ভাষা স্বীয় যোগ্য আসন লাভ না করলেও বাংলার কবিসমাজ তার গলায় বিজয়মাল্য অর্পণ করেছেন এবং তার বর্ধিষ্ণু শক্তি ও শ্রী দিনে দিনেই বাংলার কাব্যরসিকগণের শ্রবণ হৃদয় ও মন মুগ্ধ করছে।

এখন এই প্রাকৃত বাংলার ছন্দের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব কোথায় তা দেখাবার চেষ্টা করব। প্রথমেই কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি।

১। বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান,
×
শিবঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন কন্যে | দান।

২। জলস্পর্শ | করব না আর, | চিতোর-রাজার | পণ
বুঁদির কেল্লা | মাটির পরে | থাকবে যত | -ক্ষণ।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কথা', নকল গড়

৩। রাত পোহাল | ফরসা হল | ফুটল কত | ফুল,
×
কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুটল অলি | -কুল।

—দীনবন্ধু, 'বিবিধ গদ্য পদ্য' (গ্রন্থাবলী), প্রভাত

উপরের নমুনা-তিনটের ধ্বনি থেকেই বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে, ওই তিনটে একই ছন্দে রচিত। কিন্তু অক্ষরের হিসাব করতে গেলে দেখা যাবে সব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। মাত্রাও সব চরণে সমানসংখ্যক নয়। অথচ প্রত্যেক চরণেই যে-কোনো হিসাব থেকে ওজন যে ঠিক আছে তাতে সন্দেহ নেই, কেননা এদের মধ্যে কোনো-রকম ঐক্যের সূত্র না থাকলে তাল ঠিক থাকত না, ছন্দপতন হয়ে যেত। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে প্রত্যেক ছেদেই স্বরবর্ণের অর্থাৎ স্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা সমান আছে, কেবল শেষ ছেদে একটি করে স্বরান্ত ব্যঞ্জন। (তা ছাড়া ×-চিহ্নিত দুটো জায়গায় ব্যতিক্রম দেখা যাবে,—এক জায়গায় একটা স্বর কম, আর-এক জায়গায় একটা স্বর বেশি। কিন্তু এ ব্যতিক্রমে সাধারণ নিয়ম দুর্বল হয় না, বরং প্রবলই হয়। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরও বলা যাবে।) এজন্যই ছন্দ তাদের উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, কোনো দিকে কাত হয়ে পড়ছে না। যেহেতু এ ছন্দ প্রতি চরণের অন্তর্গত অক্ষরসংখ্যার বা মাত্রাসংখ্যার উপরে নির্ভর না করে স্বরসংখ্যার উপরে নির্ভর করছে, সেহেতু এ ছন্দকে 'স্বরবৃত্ত' নাম দেওয়া সংগত মনে করি।

ছন্দের নামকরণের সময় সকলের আগে দেখতে হবে কোন্ মূলসূত্র বা ঐক্যভিত্তির উপরে নির্ভর করে ছন্দের সৌধটি দাঁড়িয়েছে, এবং সে দিকে লক্ষ রেখেই তার নামকরণ করতে হবে। অক্ষরবৃত্ত নির্ভর করে অক্ষরসংখ্যার উপরে, মাত্রাবৃত্ত মাত্রাসংখ্যার উপরে, এবং স্বরবৃত্ত স্বরসংখ্যার উপরে। এখানেই বাংলা ছন্দের তিন ধারার পার্থক্য।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে স্বরবৃত্তের গোলমাল হয়ে যাবার বিশেষ কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের পার্থক্য কোথায়, এ প্রশ্ন হতে পারে। ছন্দশাস্ত্রে অক্ষরের এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকেই 'অক্ষর' বলা হয় এবং এ অক্ষর আর ইংরেজি সিলেব্‌ল্ (syllable) একই জিনিস। কিন্তু যে কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ একটি স্বরবর্ণকে আশ্রয় করে থাকে সে কয়টিই একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। সুতরাং কোনো শব্দে বা ছত্রে স্বরসংখ্যা যত, অক্ষর বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যাও তত। কাজেই স্বরবৃত্তকে অক্ষরবৃত্ত থেকে পৃথক্ করার উপায় কি, এ প্রশ্ন হতে পারে। দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', বসুন্ধরা

এ ছত্রে স্বরসংখ্যা যত, অক্ষর বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যাও তত। আবার—

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

— রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', হতভাগ্যের গান

এখানেও স্বরসংখ্যা এবং অক্ষরসংখ্যা একই। সুতরাং কোন্‌টা কি ছন্দে রচিত, তা নিরূপণ করার উপায় কি? এ পার্থক্য নির্ণয় করার কয়েকটা উপায় আছে।

প্রথমতঃ, তাদের ধ্বনিই তাদের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। অক্ষরবৃত্তের ধ্বনি গম্ভীর কিন্তু একঘেয়ে; স্বরবৃত্তের ধ্বনি চপল এবং নৃত্যপরায়ণ। অক্ষরবৃত্তে যুক্তবর্ণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার গাম্ভীর্য বাড়তে থাকে, কিন্তু স্বরবৃত্তে যুক্তবর্ণ তার চাপল্য এবং নৃত্যপরায়ণতাকেই বাড়িয়ে তোলে। উদ্ধৃত ছত্র-দুটো পড়লেই ধ্বনির পার্থক্যটা ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বরবৃত্তে যত ঘন ঘন ছেদ বা যতি পড়ে, অক্ষরবৃত্তে তত ঘন ঘন পড়ে না। এই ঘন ঘন যতিই স্বরবৃত্তের নৃত্যচপলতার কারণ। উদাহরণ যথা—

আমারে ফিরায়ে লহ, | অয়ি বসুন্ধরে |

এখানে দুটোমাত্র যতি। কিন্তু

হাস্যমুখে | অদৃষ্টেরে | করব মোরা | পরিহাস |

এখানে যতি পড়েছে চার বার।

তৃতীয়তঃ, কথিত বাংলায় হলন্ত বর্ণের সংখ্যা খুব বেশি এবং এসমস্ত

হলন্ত বর্ণের ঝোঁকে কথিত বাংলায় একটা তালের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বরপ্রধান সাধু বাংলায় তাল নেই, সুরের গাম্ভীর্য আছে। এজন্যই আজ পর্যন্ত কোনো কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কথিত বাংলার ব্যবহার করতে সাহস পান নি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কথিত বাংলার হলন্ত বর্ণকে গ্রাহ্যও করতে পারে না, অগ্রাহ্যও করতে পারে না ; কাজেই পাশ কাটিয়ে যায়। করব ধরব প্রভৃতি শব্দকে অক্ষরবৃত্ত দুইও ধরতে পারে না, তিনও ধরতে পারে না ; অথচ খর্ব গর্ব প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে ব্যবহারে লাগায়। করত ধরত প্রভৃতি শব্দ অক্ষরবৃত্তের ধাতে সয় না, অথচ মর্ত্য গর্ত প্রভৃতি খুব সহ্য হয়। কাজেই যেখানে সাধু ভাষার (যথা— ধরিব করিব প্রভৃতির) প্রয়োগ দেখা যাবে, সেখানেই অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার হয়েছে বুঝতে হবে এবং যেখানে কথিত বাংলার প্রয়োগ ও কাজেই হলন্ত বর্ণের প্রাচুর্য, সেখানেই স্বরবৃত্তের তাল কানে ধরা দেবে।

কিন্তু এ তিনটে পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে একটাকে অক্ষরবৃত্ত ও অপরটাকে স্বরবৃত্ত বলার কারণ হতে পারে না। কেননা এ তিন পার্থক্য ওই দুই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে মাত্র, তাদের প্রকৃতিগত ভিন্নতা বুঝিয়ে দিচ্ছে না। এ ভিন্নতা নিরূপণ করার প্রধান উপায় এই।— বাংলা অক্ষরবৃত্তে কেবল স্বরবর্ণ বা স্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণই অক্ষরসংখ্যার নিয়ামক নয় ; কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলা অক্ষরবৃত্তে পদান্তস্থিত অ-স্বর বা হলন্ত উচ্চারিত ব্যঞ্জনও অক্ষর বলে গণ্য হয়। স্বরবৃত্তে স্বরহীন ব্যঞ্জনকে গণনা করা হয় না। যথা—

শুধ্ বৈকুণ্ঠের্ তরে | বৈষ্ণবের্ গান্ ?

—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', বৈষ্ণব কবিতা

এখানে তিনটে অক্ষরের্ হলন্ত উচ্চারণ হচ্ছে, কিন্তু তথাপি পদের[১] অন্তে আছে বলে তারা অক্ষর বলে গণ্য হয়েছে। স্বরবৃত্তে এমন হবার জো নেই। যথা—

ধ্যানে তোমার্ | রূপ্ দেখি গো | স্বপ্নে তোমার্ | চরণ্ চুমি।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

এখানে চারটে বর্ণের হলন্ত উচ্চারণ হচ্ছে, আর এদের গণনার মধ্যেও ধরা হয় নি। সুতরাং এ ছন্দ স্বরবৃত্ত। যেখানে পদান্তস্থিত স্বরহীন ব্যঞ্জনবর্ণ নেই, সেখানে ধ্বনির বৈচিত্র্য, যতি এবং ভাষার সাহায্যে ছন্দ ঠিক করতে হয়।

১ ছন্দের পদ নয়, ব্যাকরণের পদ, অর্থাৎ ক্রিয়া, বিশেষ্য প্রভৃতি বাক্যাংশ।

সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা | কাঁদিলা বিষাদে।

—মধুসূদন, 'মেঘনাদবধ', নবম সর্গ, ৪৪৩

ধ্বনি গম্ভীর, দীর্ঘ ছেদের পর যতি এবং সাধু ভাষার প্রয়োগ আছে। সুতরাং ছন্দ অক্ষরবৃত্ত।

সিন্ধু তুমি | বন্দনীয় | বিশ্ব তুমি | মাহেশ্বরী।

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর', সমুদ্রাষ্টক

ধ্বনি নৃত্যপর, যতি ঘন ঘন, সুতরাং ছন্দ স্বরবৃত্ত। স্বরবৃত্তের আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই।—

কতই কথা | লিখছে সাগর | লিখছে বারো | মাস,
উতলা ঢেউ | লিখছে সাগর | -মথন-ইতি | -হাস।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', পুরীর চিঠি

প্রথম দেখলেই মনে হবে ছন্দপতন হয়েছে, কেননা দুই ছত্রেরই প্রথম চরণে পাঁচটি করে স্বরবর্ণ দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বটে, কানে কিন্তু পাঁচটি স্বর শোনা যাচ্ছে না, কাজেই কোথাও কোনো খটকা লাগছে না। তার কারণ কি? কারণটি হচ্ছে এই।—'কতই' এবং 'ঢেউ', এ দুটো শব্দের 'অই' এবং 'এউ', এই জোড়াস্বর দুটোকে এক-একটি স্বর বলে শোনা যাচ্ছে এবং তারা এক-একটি স্বর বলেই গণ্যও হয়েছে। কেননা, এখানে ই এবং উ-র পূর্ণ উচ্চারণ হচ্ছে না, এরা অর্ধস্বর মাত্র। 'ইতিহাস'-এর ই এবং 'কতই'-এর ই উচ্চারণ করলেই টের পাওয়া যাবে 'ইতিহাস'-এর ই-র পূর্ণ উচ্চারণ হচ্ছে, আর 'কতই' শব্দের ই-র অর্ধ উচ্চারণ হচ্ছে। তেমনি 'উতলা'র উ পূর্ণ-উ, কিন্তু 'ঢেউ'-এর উ অর্ধ-উ। স্বরবৃত্ত ছন্দে হলন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মত অর্ধস্বরেরও গণনা হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত ছন্দটিতে পতন ঘটে নি। আর-একটা দৃষ্টান্ত—

এই সমুদ্র | ভীষণ মধুর | কাছে থেকেও | দূর।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', পুরীর চিঠি

এখানে 'এই' এবং 'এও', এ দুটো যুক্তস্বরকে এক-এক স্বর বলে ধরা হয়েছে।

এ স্থলে একটা খুব প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করা সংগত মনে করি। বাংলা বর্ণমালায় 'ঐ' এবং 'ঔ'-কে এক-একটি স্বরবর্ণ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বাংলায় অই এবং অউ, এ দুটো যুক্তস্বরের উচ্চারণ ঐ এবং ঔ-এর উচ্চারণ থেকে অভিন্ন। তা যদি হয়, তবে 'আই', 'এই', 'ওই', 'এও' প্রভৃতি যুক্তস্বরকেও

বাংলা বর্ণমালায় স্থান দেওয়া উচিত। এ কথার এ উত্তর দেওয়া যেতে পারে না যে, 'ঐ' এবং 'ঔ' সংস্কৃত বর্ণমালায় আছে বলেই বাংলা ধ্বনির বর্ণমালায়ও স্থান পাবে, আর 'আই', 'এই' প্রভৃতি যুক্তস্বরগুলো সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই বলে বাংলায়ও থাকবে না। সংস্কৃত ভাষায় ঐকার এবং ঔকারের উচ্চারণ আছে বলেই ও দুটো সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান পেয়েছে। বাকি যুক্তস্বরগুলোর উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষায় নেই, তাই সেগুলোকে সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান দেবার প্রয়োজনই হয় নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় এসমস্ত যুক্তস্বরের উচ্চারণ যখন আছে, তখন বাংলা বর্ণমালায় তাদের স্থান না দেবার কোনো সংগত কারণ নেই। এ দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা বর্ণমালা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বাংলা ছন্দের আলোচনায় বাংলা বর্ণমালা বা বাংলা উচ্চারণতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা শোভা পায় না। কিন্তু স্বরবৃত্তের আলোচনাকালে বাংলা স্বরতত্ত্বকে তো একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। তাই এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। বাংলার বৈয়াকরণিক বাংলা স্বরবর্ণমালার যে অসম্পূর্ণতা উপেক্ষা করেছেন, বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের কবি সে ত্রুটিকে সংশোধন করে নিয়েছেন।

'অই', 'অউ', 'এই', 'এউ', 'এও' প্রভৃতি যুক্তস্বরের অন্তস্থিত ই, উ, ও, প্রভৃতি অর্ধস্বরকে স্বরবৃত্তের হিসাবে গণনা করা হয় না বটে, কিন্তু তা বলে তাদের যে কোনো মূল্য নেই তা নয়। এই অর্ধস্বরগুলো হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মতোই পূর্ববর্তী স্বরকে গুরুত্বদান ক'রে তার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং ছন্দকে তরঙ্গিত করে তোলে। যথা—

কতই কথা | লিখ্‌ছে সাগর্ | লিখ্‌ছে বারো | মাস্।

এখানে অর্ধস্বর ই এবং হলন্ত খ, র, স, এই চারটে বর্ণ ছন্দকে আঘাত করে করে নাচিয়ে তুলছে। যদি লেখা হত

কত কথা | লিখে সাগর | লিখে বারো | মাস।

তা হলে ছন্দ কেমন তরঙ্গহীন একঘেয়ে হয়ে পড়ত।

অন্নদা তুই | অন্ন দিতে | পিছপা নহিস | বৈরীকে,
গৌরী তুমি | তৈরি তুমি | গিরিরাজের | গৈরিকে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

এখানে 'উই', 'অই' (ঐ) এবং 'অউ' (ঔ), এই তিনটে যুক্তস্বরের মূল্য কতখানি তা অনায়াসেই বোঝা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে সংস্কৃত দীর্ঘস্বরগুলোরও বাংলায়

হ্রস্ব উচ্চারণই হয়। বাংলায় দীর্ঘ-ঈকার ও দীর্ঘ-ঊকারের উচ্চারণ হ্রস্ব-ইকার ও হ্রস্ব-উকারের উচ্চারণ থেকে একটুও পৃথক্ নয়। কিন্তু দীর্ঘ উচ্চারণের অভাবে ভাষা অলস ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ আছে, ইংরেজিতেও আছে। তা ছাড়া ইংরেজিতে স্বরের উপর অ্যাক্সেণ্ট্ বা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করবার বিধি আছে। তাই সে ভাষা কখনও অলসতা প্রকাশ করে না। বাংলা ভাষার এ দৈন্য দূর করছে তার যুক্তস্বরগুলো।

পূর্বে বলা হয়েছে, বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সব স্বরেরই এক মাত্রা, কেবল 'ঐ' এবং 'ঔ' দ্বিমাত্রিক। ঠিক একই কারণে 'উই', 'এই', 'ওই' প্রভৃতি স্বরগুলোকেও মাত্রাবৃত্তে দ্বিমাত্রিক বলেই ধরা হয়।—

ঐ আসে ঐ | অতিভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে
ঘনগৌরবে | নবযৌবনা | বরষা
শ্যামগম্ভীর | সরসা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', বর্ষ মঙ্গল

এখানে যেমন 'ঐ' এবং 'ঔ'-কে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে। তেমনি—

কাছে 'যাই' যার | দেখিতে দেখিতে | চলে যায় 'সেই' | দূরে,
হাতে 'পাই' যারে | পলক ফেলিতে | তারে ছুঁয়ে 'যাই' | ঘুরে।
কো'থাও' থাকিতে | না পারি ক্ষণেক, | রাখিতে পারি নে | কিছু,
মত্ত হৃদয় | ছুটে চলে যায় | ফেনপুঞ্জের | পিছু।

— ?

এখানেও 'আই', 'এই' এবং 'আও'-কে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে।

নাই আর দেরি, | ভৈরব ভেরী | বাহিরে উঠেছে | বাজি।[১]

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', বিদায়-১

এখানে 'আই' কেমন করে ঐ-কারের সঙ্গে সমান তাল রাখছে তা লক্ষ করার বিষয়।

১ ধ্বনিগত তালসাম্য পরিস্ফুট করবার প্রয়োজনে মূলপাঠ লেখক-কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তিত। মূলে আছে 'আর নাই দেরি, ভৈরব ভেরী'।

স্বরবৃত্তের আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার।—

দুঃখে যখন | বাজিয়ে তোলে | প্রাণ,
তীব্র সুখে | গাই যে বসে | গান।

—প্যারীমোহন, 'দুঃখ ও কাব্য', প্রবাসী ১৩২৭ কার্তিক

এখানে দ্বিতীয় ছত্রের দ্বিতীয় চরণে ছন্দপতন হয় নি। কেননা 'আই'কে দেখতে দুটো দেখা গেলেও আসলে সে একটিমাত্র স্বর, সুতরাং 'গাই' এক সিলেব্‌ল্। কিন্তু প্রথম ছত্রের দ্বিতীয় চরণে ছন্দের পতন অনিবার্য বলেই মনে হয়। অথচ এখানেও কানে বেতাল ঠেকছে না। কারণ এখানে 'ই' এবং 'য়ে', এ দুটো অক্ষর বস্তুতঃ এক অক্ষরের মতোই উচ্চারিত হচ্ছে। সংস্কৃতের রীতিতে উচ্চারণ করলে যে' আর 'ইয়ে' তুল্যমূল্য। আসল 'বাজিয়ে' শব্দটি এখানে 'বাজ্‌য়ে'-র মতো উচ্চারিত হয়েছে। 'ইয়ে'কে এক অক্ষরের মতো উচ্চারণ করাতে আরও একটু লাভ এই হল যে, 'জ' বর্ণটি হসন্ত হয়ে পড়েছে এবং তাতে ছন্দ তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। যথা—

| | |
দুঃখে যখন | বাজ্‌য়ে তোলে | প্রাণ,
| | |
তীব্র সুখে | গাই যে বসে | গান।

কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দের সর্বত্র 'ইয়ে' একাক্ষরের মতো উচ্চারিত হয় না। কারণ, লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এখানে দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়েছে বলেই 'ইয়ে'র একাক্ষরের মতো উচ্চারণ হয়েছে। সুতরাং যেখানে দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন নেই সেখানে তার একাক্ষরের মতো উচ্চারণও হবে না। যদি 'ইয়ে'র অব্যবহিত পরেই যতি থাকে, তা হলে দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন হবে না; সুতরাং তখন তার দ্বিস্বর উচ্চারণই হবে। 'বাজিয়ে তোলে'-কে উল্টিয়ে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেই এইটে টের পাওয়া যাবে। 'বাজিয়ে তোলে'—এখানে চার স্বর। কিন্তু 'তোলে বাজিয়ে' বললে পাঁচ স্বর হয়ে যাবে, কাজেই ছন্দপতন হবে।

অমন আড়াল দিয়ে | লুকিয়ে গেলে | চলবে না।

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', ২৭

এখানে 'দিয়ে'র পরেই যতি আছে, সুতরাং 'ইয়ে'র দ্বিস্বর উচ্চারণ। কিন্তু লুকিয়ে'র পরে যতি নেই, কাজেই 'ইয়ে'র উচ্চারণ একস্বরের মতো। একজন্যই

কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুটল অলি | -কুল।

—দীনবন্ধু মিত্র, 'বিবিধ গদ্য পদ্য' (গ্রন্থাবলী), প্রভাত

এখানে ছন্দপতন হয় নি। 'কাঁপিয়ে পাখা' বলতে চার স্বর গণনা করা হয়েছে।

'ইয়ে'র যেমন স্থানবিশেষে একস্বরের মতো উচ্চারণ হয় তেমনি হাওয়া ছোঁওয়া প্রভৃতি শব্দের 'ওয়া'কেও একস্বব বলেই ধরা হয়। কিন্তু 'ওয়া'র উচ্চারণ সর্বত্রই একস্বর এবং সে উচ্চারণ অন্তঃস্থ ব-এর তুল্য। যথা—

১। কে বলে নেই | হাওয়ায় নিশান | পারিজাতের | সৌরভের।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র আবীব', গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

২। তোমার ছোঁওয়া | লাগলে পরে | একটুকুতেই | কাঁপন ধরে।

—ববীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', প্রকৃতি ২০৪

প্রথম দৃষ্টান্তে 'হাওয়া'র পবে যতি নেই, দ্বিতীয়টিতে 'ছোঁওয়া'র পরে আছে। কিন্তু দুটোতেই 'ওয়া'র একস্বর উচ্চারণ।

এবার স্বরবৃত্ত ছন্দেব যথার্থ ব্যতিক্রমের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

১। মেঘের উপর | মেঘ কবেছে | রঙের উপর | রং,

×

মন্দিরেতে | কাঁসর-ঘণ্টা | বাজল ঠং | ঠং।

—ববীন্দ্রনাথ, 'কড়ি ও কোমল', বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

×

২। গ্রহবিপ্র | আশীর্বাদ | করি'

×

ধানদূর্বা | দিল তাহার | মাথে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কথা', বিবাহ

× ×

৩। 'গব্ গব্ গব্' | গর্জে দেয়া | 'ঝব্ ঝব্ ঝব্' | বৃষ্টি,

চন্দ্র ভায়া | সাঁতরে চলেন | নাইক তাতে | দৃষ্টি।

—সুনির্মল বসু, 'চন্দ্র ভায়ার পদ্মাপার', প্রবাসী ১৩২৮ চৈত্র

উক্ত দৃষ্টান্ত-তিনটেতেই চিহ্নিত স্থানগুলোতে এক-একটি স্বর কম আছে। কিন্তু এ

অভাবকে ছন্দের পতন না বলে ব্যতিক্রম বলাই সংগত। কেননা, এসকল স্থলে কোনো একটা স্বরকে একটু টেনে উচ্চারণ করা হয় বলে মোটের উপর ছন্দের ওজন ঠিক থেকে যায়, সুতরাং পতন হয় না। দৃষ্টান্তের 'ঠং', 'বাদ' এবং 'ধান', এই তিনটে শব্দের স্বরগুলোকে একটু দীর্ঘ উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু 'গর্ গর্ গর্' এবং 'ঝর্ ঝর্ ঝর্', এ দু-জায়গায় প্রত্যেকটা স্বরকেই একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয় বলে ব্যতিক্রমটা কানে বড় ঠেকে না। এরকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দেও অনেক পাওয়া যায়। যথা—

× ×

১। Hark´, | hark´, | the hor´ | -rid sound´.

—John Dryden, 'Alexander's Feast', Golden Treasury

×

২। But the ten´ | -der grace´ | of a day´ | that is dead´.

—Alfred Tennyson, 'Break, break, break', Golden Treasury

এখানে চিহ্নিত পদগুলোতে এক-একটি স্বর বা সিলেব্‌ল্ কম আছে।

স্বরবৃত্তের এ ব্যতিক্রম আধুনিক কবিদের রচনায় খুব কমই দৃষ্ট হয়। কিন্তু গ্রাম্য ছড়া পাঁচালি প্রভৃতিতে এ ব্যতিক্রম বহুলপরিমাণে দেখা যায়। যথা—

বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর, | নদেয় এল | বান,

×

শিবঠাকুরের | বিয়ে হল, | তিন কন্যে | দান।

× ×

এক কন্যে | রাঁধেন বাড়েন, | এক কন্যে | খান,

× ×

এক কন্যে | না খেয়ে | বাপের বাড়ি | যান ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য', ছেলে-ভুলানো ছড়া

এ ছড়াটিতে পাঁচ জায়গায় ব্যতিক্রম আছে। আধুনিক কালে রচিত ছেলেদের ছড়াতেও এ ব্যতিক্রমের অভাব নেই। যথা—

× ×

দুধ দেবে, | ছানা দেবে, | ক্ষীর দেবে | আর ;

ময়দা দেবে, | সুজি দেবে, | সাজাইয়া | ভার।

আধা ছানার | গোল্লা দেবে, | রসগোল্লা | কত ;
× ×
সরভাজা | সীতাভোগ | কিনতে পাবে | যত।
×
আম দেবে, | কাঁঠাল দেবে, | দেবে তালের | শাঁস ;
যত্ন করে | পুষতে দেবে | পায়রা ময়ূর | হাঁস।

— ?

এখানেও পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে। প্রাচীন কালের কয়েকটা ছড়াব দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

×
১। কটা মাথা | কার ঘাড়ে।
রাজাব ঘাটে | ডঙ্কা মারে॥

—দক্ষিণাবঞ্জন, 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', শঙ্খমালা

×
২। সেই কপালে | সেই টিপ।
সাধুর ভিটায় | সোনার দীপ॥

—দক্ষিণারঞ্জন, 'ঠাকুবদাদার ঝুলি', শঙ্খমালা

×
৩। যে রন্ধন | খেয়েছি আমি | বারো বৎসর | আগে,
× ×
আজ কেন | জিভে আমার | সেই রন্ধন | লাগে॥

—দক্ষিণারঞ্জন, 'ঠাকুরদাদার ঝুলি,' শঙ্খমালা [১]

এখানেও পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে। কেবল প্রাচীন ছড়ায় কেন, প্রাচীন সব রচনাতেই এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ময়নামতীর গান থেকে নমুনা দেখাচ্ছি।—

১ এই তিনটি দৃষ্টান্তই দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ (চতুর্থ সং ১৯২১, পৃ ৭৩ এবং ৭৮) থেকে উদ্‌ধৃত।

× ×

খায় না কেনে | বনের বাঘ, | তাক নাই | ডর।

×

নিত্ কলঙ্কে | মরণ হউক্ | স্বামির পদ | -তল ॥

×

তুমি হবু | বটবৃক্ষ, | আমি তোমার | লতা।

রাঙা চরণ | বেড়িয়া লম্, | পালাইয়া যাবু | কোথা ॥

—'ময়নামতীর গান', অদুনার উক্তি[১]

এ দৃষ্টান্তে চার স্থলে এক-একটি স্বরবর্ণ কম আছে। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্‌ধৃত করছি।—

বঙ্গদেশে | প্রমাদ হইল | সকলে অ | -স্থির।

×

বঙ্গদেশ | ছাড়ি ওঝা | আইলা গঙ্গা | -তীর ॥···

রঘুবংশের | কীর্তি কেবা | বর্ণিবারে | পারে।

× ×

কৃত্তিবাস | রচে গীত | সরস্বতীর | বরে ॥

—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ[২]

এখানে তিন জায়গায় এক-একটি করে স্বরবর্ণের অভাব আছে। এরকম ব্যতিক্রমের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, উদ্‌ধৃত সমস্তগুলো দৃষ্টান্তই স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং অধিকাংশ স্থলেই প্রতি ছত্রে তেরো বা চোদ্দোটি করে স্বর বা সিলেব্‌ল্ আছে।

এই স্বরবৃত্ত ছন্দ বাংলা ভাষার সমবয়সী। যে দিন থেকে বাংলা ছড়া পাঁচালি প্রভৃতি রচনার সূত্রপাত হয়েছে সে দিন থেকে এ ছন্দও বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর বাহন

১ দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ (চতুর্থ সং ১৯২১, পৃ ৫৫) থেকে উদ্‌ধৃত। এ ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র অনুসরণ করেছেন গ্রীয়ারসনের ধৃত পাঠ। দ্রষ্টব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রন্থের (১৯২২ সং, সন্ন্যাসখণ্ড, ২৯০) পাদটীকায় উদ্‌ধৃত গ্রীয়ারসনের পাঠ।

২ দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ (চতুর্থ সং ১৯২১, পৃ ১২৩ ও ১২৮) থেকে উদ্‌ধৃত।

হয়েছে। এ ছন্দে রচিত প্রাচীন কবিতা প্রভৃতিতে এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের বহুল ব্যবহার দেখে আমার মনে হয় কালক্রমে এই ব্যতিক্রমই সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এ ব্যতিক্রম সচরাচর শব্দের অন্তেই দেখা যায়। তার বিশেষ কারণও আছে। এ ছন্দে যদি শব্দের অন্তে কোনো বর্ণের হলন্ত উচ্চারণ হয় তবে তার অব্যবহিত পূর্বের স্বরটির দীর্ঘ উচারণ করতে হয় এবং ওই দীর্ঘতাই একটি স্বরের অভাব পূরণ করে দেয়। কিন্তু শব্দের মধ্যে তা হবার স্নবিধা নেই, কেননা পরবর্তী বর্ণগুলো সে ফাঁকটা পূর্ণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শব্দের অন্তে বর্ণের হলন্ত উচ্চারণ হলে সে ফাঁক পূর্ণ করার কেউ থাকে না, কাজেই ছন্দের স্থরেই সেটা ভরাট হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস শব্দের অন্তস্থিত হলন্ত বর্ণের ফাঁকটা স্থর দিয়ে ভরতি করাই কালক্রমে সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার একটু বিশেষ স্থযোগও ছিল। তখনকার দিনে কাব্য ছড়া প্রভৃতি সব কিছুই স্থর করে পড়া ও গাওয়া হত। স্থতরাং গানের স্থরে ছন্দের সব ফাঁক ভরতি হয়ে যেত বলে এই এক-আধটা স্বরের অভাব কানে বড় টের পাওয়া যেত না। আজকাল কোনো কবিতাই স্থর করে পড়া হয় না, স্থতরাং স্বরবৃত্ত ছন্দের এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের অভ্যাসটা বদলে গেছে।

প্রাচীন বাংলা স্বরবৃত্তে যে এই একটিমাত্র পরিবর্তনই দেখা দিয়েছিল তা নয়। বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের পরে হিন্দু ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন এ দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বহুলপরিমাণে আরম্ভ হয়েছিল তখন সংস্কৃত ছন্দও ধীরে ধীরে বাংলা ছন্দের উপরে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। ফলে চোদ্দো স্বরের স্বরবৃত্তের পরিবর্তে অক্ষরবৃত্তের পয়ার বাংলা ছন্দের প্রধান আসন অধিকার করেছিল। চোদ্দো স্বরের স্বরবৃত্তে প্রতি পংক্তিতে চারটে যতি থাকে এবং প্রতি চার স্বরের পরে একটা যতি পড়ে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে অত ঘন ঘন যতির ব্যবস্থা নেই। স্থতরাং সংস্কৃত ছন্দের তালে তৈরি যাঁদের কান, সেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে পড়ে বাংলার নিজস্ব ছন্দটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। সংস্কৃতজ্ঞ কবিরা প্রথমতঃ স্বরবৃত্তের দুটো যতি তুলে দিলেন ; বাকি রইল আরও দুটো—একটা আটের পর, আর-একটা ছয়ের পর। তা ছাড়া বাংলা স্বরবৃত্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কবিরা স্বরসংখ্যা বা সিলেব্‌ল্‌-এর দিকে লক্ষ না রেখে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের অনুকরণে কেবল আট-ছয়ের ঘর ভরতি করে যেতে লাগলেন। এমনি করে চোদ্দো স্বরের স্বরবৃত্ত ছন্দের বিকৃতি থেকে চোদ্দো অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে।

পয়ার রচনায় যে সংস্কৃত ছন্দের কোনো আদর্শ ছিল না তাও নয়। সম্ভবতঃ জয়দেবের

সরসমসৃণমপি | মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব | বপুষি সশঙ্কম্॥

—জয়দেব, 'গীতগোবিন্দ', গীত ৯।২

প্রভৃতি কবিতা এইসকল পয়াব-রচয়িতাদের আদর্শ ছিল। তার পর

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

—জয়দেব, 'গীতগোবিন্দ', গীত ১১।৩

প্রভৃতি কবিতা বোধ করি বাংলা ত্রিপদী ছন্দের পথপ্রদর্শক।

এমনি কবে বাংলা স্ববৃত্ত ছন্দ অক্ষববৃত্তেব প্রভাবের নীচে একেবারে চাপা পড়ে গেল। বহু দিন বাংলা সাহিত্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের দেখা পাওয়া যায় নি। অনেক কালের পরে আজকাল আবার এ ছন্দ নবীন প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে সজীব হয়ে উঠেছে।

এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের পবিণামে স্বরবৃত্ত থেকে কি করে অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হল তা আধুনিক কালের দুই-একটি রচনা থেকেও অনুমান কবা যায়। পূর্বোক্ত 'গ্রহবিপ্র আশীর্বাদ করি' প্রভৃতি দুটো ছত্রই অনেকটা অক্ষরবৃত্তের মতো শোনায়। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

\+ \+
'জয় রানা | রাম সিঙের | জয়',
মেত্রিপতি | উর্ধ্বস্বরে | কয়।
কনের বক্ষ | কেঁপে উঠে | ডরে,
\+ \+
দুটি চক্ষু | ছল্ ছল্ | করে,
\+
বরযাত্রী | হাঁকে সম | -স্বরে,
'জয় রানা | রাম সিঙের | জয়'॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'কথা', বিবাহ

উদ্‌ধৃত কবিতাটিতে তিন স্থলে এক-একটি স্বরের অভাব আছে। 'ছল্ ছল্', এখানে দুটো স্বরের অভাব আছে। এ কয়টা ব্যতিক্রম ছাড়া এ স্থলে স্বরবৃত্তের সব লক্ষণ বিদ্যমান আছে, অথচ এর ধ্বনিটা কেমন অক্ষরবৃত্তের মতো শোনায়। এর কারণ কি? অন্ততঃ এই ব্যতিক্রমগুলো যে এর একটা প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই।

অক্ষরবৃত্ত যে স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে যথেষ্ট ব্যতিক্রম করলেই যে এ ছন্দ পাওয়া যাবে তা নয়। এ ব্যতিক্রমও একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়মটি এই যে, সাধারণতঃ শব্দের মধ্যস্থিত হলন্ত বর্ণকে গণনা না করে শব্দের অন্তস্থিত হলন্ত বর্ণের স্থানে এক স্বর গণনা করে ছন্দ রচনা করলেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ পাওয়া যায় এবং তাতে অধিকাংশ স্থলেই চার বা তার চেয়ে কম-সংখ্যক স্বরের পরে যতি পড়ে না। এ ছন্দে কচিৎ চার এবং অধিকাংশ স্থলে ছয়, আট বা দশ অক্ষরের পরে যতি স্থাপিত হয়। যথা—

মহাভারতের্ কথা | অমৃত-সমান্।
কাশীরাম্ দাস্ ভণে | শুনে পুণ্যবান্॥

এখানে যতি পড়েছে আট এবং ছয় অক্ষরের পরে, আর পাঁচটি শব্দের অন্তস্থিত হলন্ত-উচ্চারিত বর্ণকেও গণনার মধ্যে ধরা হয়েছে। এইটেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ। স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রমবিশেষ থেকে উৎপন্ন বলে অক্ষরবৃত্তকে একটি স্বতন্ত্র ছন্দ বলে গণ্য না করে এ ছন্দকে 'ভঙ্গ-স্বরবৃত্ত' বা 'ব্যতিক্রান্ত স্বরবৃত্ত' নাম দেওয়া যায়। কিন্তু স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রমবিশেষ থেকে উৎপন্ন বলে এ ছন্দকে তুচ্ছ করা যায় না। এ ছন্দেরও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। এর অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রবন্ধের আরম্ভেই অনেক কথা বলেছি। সুতরাং খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বলতে গেলে বলা উচিত, বাংলা ছন্দপ্রবাহিণীর প্রধান ধারা তিনটে নয়, দুটো— মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। কিন্তু স্বরবৃত্ত থেকে এক নূতন ধারা উদ্‌গত হয়ে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্য দান করেছে।*

স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব

সাধু বাংলা ও প্রাকৃত বাংলার মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে এই।— সাধু বাংলায় তাল নেই, নৃত্য নেই, আছে কেবল একঘেয়ে সুর; সে কখনও হেলে দুলে টলে এঁকে-বেঁকে যায়, কখনও এলিয়ে পড়ে লতিয়ে চলে; কিন্তু কখনও সে নর্তনভঙ্গিতে তালে তালে পা ফেলে চলে না। পক্ষান্তরে ওই নৃত্যরঙ্গই প্রাকৃত ভাষার বিশেষত্ব। উঠিবে পড়িবে টলিবে চলিবে ধরিতেছে করিতেছে প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে উঠ্‌বে পড়্‌বে টল্‌বে চল্‌বে ধর্‌ছে কর্‌ছে প্রভৃতি শব্দের তুলনা করলেই এ পার্থক্যটা ধরা পড়বে। সাধু শব্দগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে; কিন্তু অসাধু শব্দগুলো সৈন্যদলের মতো তালে তালে পা ফেলে মার্চ করে চলেছে। এর কারণ হচ্ছে সাধু ভাষায় স্বরের বাহুল্য এবং প্রাকৃত ভাষায় হসন্ত বর্ণের বাহুল্য। সাধু বাংলায় সংস্কৃতের কাছে ধার-করা যুক্তবর্ণ ছাড়া হসন্ত বর্ণ নেই বললেই হয়। শব্দের মাঝখানে তো একেবারেই নেই। কিন্তু কথিত বাংলায় হসন্ত বর্ণের ছড়াছড়ি এবং এগুলো শব্দের মাঝখানে থেকে পরস্পরের গায়ে ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি করে এক অদ্ভুত তালের সৃষ্টি করে। এজন্যে সাধু বাংলা যুক্তবর্ণের বহুল প্রয়োগ দ্বারা অক্ষরবৃত্তে গম্ভীর হয়ে উঠতে পারে। যথা—

চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে | সংগীত-ঝংকারে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রা', বিজয়িনী

এবং মাত্রাবৃত্তে গানের সুরে ঝংকার তুলতে পারে। যথা—

ও কি শিঞ্জিত | ধ্বনিছে কনক | -মঞ্জীরে?

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', অসময়

অথবা যুক্তবর্ণ একেবারে বর্জন করে একঘেয়ে সুরের ধারায় বয়ে যেতে পারে। যথা—

পাখি উড়ে যাবে | সাগরের পার,
সুখময় নীড় | পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে | ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে | সবে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', বিদায়-১

কিন্তু এ ভাষা কিছুতেই প্রাকৃত বাংলার মতো ঘন দ্রুততালে নৃত্যচপল হয়ে উঠতে পারে না। যথা—

। । । ।
মেঘ্‌লা | থম্‌থম্‌, | সূর্য | ইন্দু
ডুব্‌ল | বাদ্‌লায়, | দুল্‌ল | সিন্ধু।
হেম্‌ক | -দম্বে | তৃণ | -স্তম্বে
ফুট্‌ল | হর্ষের্‌ | অশ্রু | -বিন্দু॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষের গান', ছন্দহিন্দোল

প্রাকৃত বাংলায় সাধু বাংলার তুলনায় স্বরসংখ্যা অনেক কম এবং হসন্ত বর্ণের সংখ্যা অনেক বেশি। এজন্যই স্বরবৃত্ত ছন্দে এমন অদ্ভুত নৃত্যতালের তরঙ্গসঞ্চার করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে কেবল যে প্রাকৃত বাংলারই ব্যবহার হয় তা নয়, বরং এ ছন্দে সংস্কৃত যুক্তবর্ণের সদ্‌ব্যবহার করলে ছন্দের দ্বিগুণ শোভাবৃদ্ধি হয়। উদ্‌ধৃত ছত্র-চারটিতে আটটি যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে ছন্দের তরঙ্গভঙ্গ কেমন মুখর হয়ে উঠেছে তা অনায়াসেই বোঝা যায়। কিন্তু স্বরবৃত্তে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সে ভাষায় ইয়াছে ইয়াছিল ইতেছে ইতেছিল প্রভৃতি ঢিলে-ঢালা রকমের স্বরবহুল প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার অসম্ভব। এই স্বরবর্ণের অল্প প্রয়োগই স্বরবৃত্ত ছন্দে ব্যবহৃত ভাষার বিশেষত্ব।

এ দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে প্রাকৃত বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার বেশ সাদৃশ্য আছে এবং ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা স্বরবৃত্তের তুলনা করা যায়। যে-কোনো একখানা ইংরেজি বই খুলে পড়লেই দেখা যাবে, এ ভাষায় স্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও হলন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা প্রায় সমান। প্রায় প্রত্যেক শব্দেরই মাঝখানে দু-একটি করে হলন্ত বর্ণ থাকে এবং এ বর্ণটি তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণের মাঝখানে একটা ঢেউ তোলে। তা ছাড়া ইংরেজিতে একস্বর (monosyllabic) শব্দ অসংখ্য এবং তাদের অন্তে প্রায়ই এক-একটি হলন্ত বর্ণ থাকে। সুতরাং দুটো একস্বর শব্দকে পাশাপাশি বসালেই তাদের মাঝখানে একটা হলন্ত বর্ণ পাওয়া যায় এবং এইটেই দুটো শব্দের মধ্যে একটা তরঙ্গভঙ্গি সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজি ছন্দের তরঙ্গলীলার প্রধান হেতু হচ্ছে এ ভাষার অ্যাক্‌সেন্ট্‌ (accent) অর্থাৎ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করার ব্যবস্থা। ওই ঝোঁকের ব্যবস্থা থাকাতেই এ ভাষায় স্বর গুরুত্ব লাভ করে। যথা— lo´-ver (লা´-ভার্), daugh´-ter

(ডʹ-টার), deʹ-mon (ডিʹ-মন্)। এখানে মধ্যস্থলে হলন্ত বর্ণ না থাকা সত্ত্বেও আ, অ এবং ই র উপরে ঝোঁক থাকাতে এদের গুরু উচ্চারণ হচ্ছে। এ বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে যদি ইংরেজি শব্দগুলোকে পর-পর এমনভাবে সাজানো যায় যে প্রতি দুই স্বরের মধ্যে একটি করে গুরুস্বর অর্থাৎ অ্যাক্সেন্ট থাকে, তা হলেই একটা ধারাবাহিক তরঙ্গলীলার উৎপত্তি হয় এবং ইংরেজি ছন্দোলক্ষ্মী ওই লহরীমালায় দুলতে থাকেন। যথা—

১। And) outʹ a | -gainʹ I | curveʹ and | flowʹ
To) joinʹ the | brimʹ-ming | riʹ-ver,
For) menʹ may | comeʹ and | menʹ may | goʹ,
But) Iʹ go | onʹ for | eʹ-ver.

—Alfred Tennyson, 'The Brook', Golden Treasury

২। Lifeʹ is | reʹ-al | lifeʹ is | earnʹ-est,
Andʹ the | graveʹ is | notʹ its | goalʹ,
"Dustʹ thou | artʹ, to | dustʹ re | -turnʹ-est"
Wasʹ not | spoʹ-ken | ofʹ the | soulʹ.

—H W Longfellow, A Psalm of Life, Voices of the Night

ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রকারেরা এ ছন্দকে দু ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। যে ছন্দে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে দুটো স্বরের মধ্যে প্রথমটা লঘু দ্বিতীয়টা গুরু তার নাম Iambus, যে ছন্দে প্রথমটা গুরু দ্বিতীয়টা লঘু তার নাম Trochee। কিন্তু আসলে এ দুটো ছন্দই এক। Iambus-এর প্রথম স্বরটাকে একটু আলগা উচ্চারণ করলেই এ ছন্দ Trochee থেকে অভিন্ন হয়ে যায়। উক্ত দৃষ্টান্ত দুটো থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। প্রথম দৃষ্টান্তটি Iambus এর, দ্বিতীয়টি Trochee-র।

দুই স্বরের ছন্দ ছাড়া ইংরেজিতে তিন স্বরের ছন্দও আছে। এ ছন্দে প্রতি পাদে একটি গুরু ও দুটো লঘু স্বর থাকে। কিন্তু এ তিন স্বরের সাজানোর প্রকারভেদে এ ছন্দের তিনটে আকারভেদ হয়। প্রথমটা গুরু ও বাকি দুটো লঘু হলে তার নাম Dactyl, মধ্যস্বর গুরু এবং বাকি দুটো লঘু হলে Amphibrach; শেষের স্বর গুরু হলে তার নাম Anapaest। যথা—

১। আদিগুরু (Dactyl)—

Touch´ her not | scorn´-ful-ly ;
Think´ of her | mourn´-ful-ly,
Gent´-ly and | hu´-man-ly.

—T. Hood., 'The Bridge of Sighs', Golden Treasury

২। মধ্যগুরু (Amphibrach)—

Most friend´-ship | is feign´-ing,
Most lo´-ving | mere fol´-ly.

—W. Shakespeare , 'Blow, blow···', Golden Treasury

৩। অন্তগুরু (Anapaest)—

Like the dawn´ | of the morn´.
Or the dews´ | of the spring´.

—Henry Francis Lyte, 'Agness', Golden Treasury

কিন্তু ইংরেজিতে মোটের উপর গুরুস্বরের সংখ্যা খুব বেশি এবং লঘুস্বরের সংখ্যা খুব কম হওয়াতে এ ভাষায় দুই স্বরের ছন্দই সর্বদা ব্যবহৃত হয়, তিন স্বরের ছন্দের প্রয়োগ খুব বিরল। পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইংরেজি ভাষা ও প্রাকৃত বাংলা এবং ইংরেজি ছন্দ ও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কেবল হসন্তবর্ণের প্রাচুর্য ও স্বরবর্ণের অল্পতাই যে এই সাদৃশ্যের একমাত্র হেতু তা নয়। ইংরেজি ছন্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করেছি, বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দেও সে নিয়মগুলি অবিকল খাটে। কেবল প্রভেদ এই যে, ইংরেজিতে ঝোঁকের ব্যবস্থা বাঁধা-ধরা এবং ছন্দে এ ব্যবস্থার প্রবলতা খুব বেশি; কিন্তু বাংলায় ঝোঁকের ব্যবস্থাও শিথিল এবং তার শক্তিও অতি মৃদু। আর-একটি প্রভেদ এই যে, ইংরেজিতে শব্দের আদি মধ্য অন্ত সর্বত্রই ঝোঁক থাকতে পারে, কিন্তু বাংলায় এ ঝোঁক সর্বদাই শব্দের আদিতে থাকে। বাংলায় যুক্ত বর্ণ বা হসন্ত বর্ণের সাহায্যে এই ঝোঁকের অভাব পূরণ করে নিতে হয়।

পূর্বোক্ত নিয়মগুলো মেনে স্বরবর্ণ বা সিলেব্‌ল্‌গুলোকে লঘুগুরুক্রমে সাজিয়ে

গেলেই যেমন ইংরেজি ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি কথিত বাংলাতেও ওই নিয়মগুলোর সাহায্যেই অতি অদ্ভুত উপায়ে নব নব ছন্দের সৃষ্টি করা হয়েছে। দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বিশদ করছি।—

Tell´ me | not´ in | mourn´-ful | num´-bers,
Life´ is | but´ an | emp´-ty | dream´.

—H W. Longfellow, 'A Psalm of Life', Voices of the Night

এ দুটো ইংরেজি ছত্রের সঙ্গে

মৌ´ন | নৃ´ত্যে | ম´গ্ন | খ´ঞ্জন,
মে´ঘ্‌স | -মু´দ্রে | চ´লছে | ম´ন্থন।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষের গান', ছন্দহিন্দোল

এ দুটো বাংলা ছত্র মিলিয়ে পডলেই দুই ভাষা এবং দুই ছন্দেব প্রকৃতিগত সাদৃশ্য স্পষ্ট হযে উঠবে। গুরুলঘু স্ববেব এই পর্যাযক্রমিক সমাবেশে যে চলনভঙ্গিব উৎপত্তি হযেছে সে যেন সৈন্যদলেব যুদ্ধযাত্রা। পর্যাযক্রমে গতি এবং যতি, পদোত্তোলন এবং পদক্ষেপেব ফলে এ ছন্দে গমনেব বেগ এবং নর্তনেব স্পন্দ দু-ই বযেছে। যত দিন প্রাকৃত বাংলাব অন্তর্নিহিত এই শক্তিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয নি, তত দিন বাংলা ছন্দকে এভাবে তালে তালে মার্চ কবিয়ে নেওযা সম্ভব ছিল না। আবাব

Pic´-ture it, | think´ of it, |
Dis´-so-lute | Man´!

—T Hood, 'The Bridge of Sighs', Golden Treasury

এ শ্লোকাংশেব সঙ্গে

সি´ন্ধুব্ টিপ্ | সিং´হল্ দ্বীপ্ |
কা´ঞ্চন্‌ময়্ | দে´শ্!

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', সিংহল

এ দুটো ছত্র মিলিয়ে পডলেই ইংবেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা স্ববৃত্তেব নিগূঢ় ঐক্যটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রাকৃত বাংলাতেই ছন্দের এ স্পন্দন সম্ভবপর, সাধু বাংলায় ছন্দের এমন ধ্বনিকম্পন সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব।

প্রাকৃত বা কথিত বাংলায় সাধু বাংলার চাইতে স্বরসংখ্যা অনেক কম এবং হসন্ত বর্ণের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই হসন্ত বর্ণের প্রাচুর্যহেতু গুরুস্বরের ঐশ্বর্যবিষয়ে কথিত বাংলা সাধু বাংলার চাইতে অধিকতর সম্পন্ন। কিন্তু তা হলেও গুরুস্বরের প্রাচুর্যবিষয়ে কথিত বাংলা ইংরেজি ভাষার তুলনায় দীন। ইংরেজিতে গড়ে প্রতি দুই স্বরে একটি করে গুরুস্বর পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ প্রতি চার স্বরে একটি যথার্থ গুরুস্বর মেলে। কাজেই ইংরেজিতে যেমন দুই স্বরের ছন্দ বেশি প্রচলিত, তেমনি বাংলা স্বরবৃত্তে চার স্বরের ছন্দের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক। যথা—

। । । ।
বিশ্ব-বাংলা | উঠছে গড়ে | জাগছে প্রাণের | তীর্থ গো,
। । । ।
জাতির শক্তি | -পীঠ জগতে | গড়ছে মোদের | চিত্ত গো ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

এই চতুঃস্বরের ছন্দই প্রাকৃত বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর প্রধান বাহন। দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পংক্তিচ্ছেদের প্রথম বর্ণটি গুরু, আর এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ হসন্ত বর্ণ, যুক্তব্যঞ্জন বা যুক্ত-স্বরের সাহায্যে প্রথম স্বরটির গুরুত্ব টের পাওয়া না গেলেও এ ছন্দের গতির ঝোঁকেই সেটি গুরু হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম স্বর 'আ'কারটির গুরু হবার কোনো প্রত্যক্ষ কারণ বিদ্যমান না থাকলেও এখানে তার গুরু উচ্চারণই হচ্ছে। পড়ার সময় স্বভাবতঃই এর উপরে একটা ঝোঁক পড়ে। এইটেই এ ছন্দের বিশেষত্ব। 'জাতির' কথাটির 'জা' স্বভাবতঃ লঘু এবং 'শক্তি'র 'শ' স্বভাবতঃ গুরু। কিন্তু যেমনি ওরা ছন্দের তালের মধ্যে পড়ে গেল অমনি 'শক্তি'র 'শ'র চাইতে 'জাতি'র 'জা'র শক্তি অনেক বেড়ে গেল। 'বিশ্ব'র 'বি' এবং 'বাংলা'র 'বা' উভয়ই স্বভাবতঃ গুরু; কিন্তু ছন্দে বিশেষ সন্নিবেশ হেতু 'বা'র চাইতে 'বি' অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, যেখানে স্বরের স্বাভাবিক গুরুত্ব আর ছন্দের ঝোঁক একত্র মিলিত হয় সেখানে ছন্দশ্রী দ্বিগুণ শোভা লাভ করে। যেখানে ছন্দের ঝোঁক স্বরের স্বাভাবিক গুরুত্বের সহায়তা লাভ করে না সেখানে ছন্দ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যথা—

।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
আজকে তোমায় | দেখতে এলাম | জগৎ-আলো | নূরজাহান।
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
সন্ধ্যারাতের | অন্ধকার আজ | জোনাক-পোকায় | স্পন্দমান ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', কবর-ই-নূরজাহান

এখানে ছন্দ কেমন আপন শক্তিতেই স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, কেবল দু-জায়গায় ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু

।
কিশোর যারা | প্রাণের টানে | চাইবে তারা | কিশোরী।
।
হায় কি পাপে | রয়েছে দেশ | বিধির বিধান | বিসরি ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', মৃত্যু-স্বয়ম্বর

এখানে ছন্দের নৃত্যভঙ্গি অনেকটা মৃদু হয়ে এসেছে; কেবল দু জায়গায় পদক্ষেপ সজোরে পড়েছে।

বাংলায় গুরুস্বরের অপেক্ষাকৃত অভাবহেতু যদিও চতুঃস্বরের ছন্দই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, তথাপি গুরুস্বরবহুল শব্দগুলোকে বেছে বেছে প্রয়োগ করলে বাংলায় দ্বিস্বর এবং ত্রিস্বরের ছন্দেও বেশ সুন্দর কবিতা রচনা করা যায়। তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ইংরেজির মতো অত অনায়াসে বাংলায় দ্বিস্বর্ বা ত্রিস্বরের ছন্দ ব্যবহার করা যায় না। ইংরেজিতে প্রতি শব্দের নিজস্ব এক্সেণ্ট্ বা ঝোঁকগুলোর যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করলে ইংরেজি ছন্দে প্রতি পাদের আদি মধ্য বা অন্তে গুরুত্ব স্থাপন করা যায়। বাংলাতেও তেমনি হলন্ত বা যুক্তবর্ণের সাহায্যে প্রতি পাদের সকল স্থানেই গুরুত্ব স্থাপন করা যায়। যথা Amphibrach—

Dear Harp´ of | my Coun´-try ! | in dark´-ness | I found´ thee ;
The cold´ chain | of si´-lence | had hung´ o'er | thee long´.

—Thomas Moore, 'Dear Harp of my Country', Irish Melodies

।　　।　　।　　।
বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | -প্রায়
।　　।　　।　　।
জীবন সে | দিনান্তে | ঝরেই কি | যায়?

—লেখক

এখানে উভয় স্থলেই প্রতি পাদের মধ্যস্বরে গুরুত্ব রয়েছে। আরও কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বাংলা ছন্দের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। Iambus—

| | | |
মহৎ | ভয়ের | মূরৎ | সাগর, |
বরন | তোমার | তমঃ | -শ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয় -পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', সিন্ধুতাণ্ডব

২। Trochee—

| |
পাখনায় | নাই ফাঁস,
মন তার | নয় দাস,
নীড় তার | মোর বুক,—
এই মোর | এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস,
প্রেম তার বিত্ত,
প্রেম তার নিশ্বাস,
প্রেম তার নিত্য ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', পিয়ানোর গান

৩। Dactyl—

| | | |
ওই সিন্ধুর্ টিপ্ | সিংহল দ্বীপ্ | কাঞ্চন্‌ময়্ | দেশ্
ওই চন্দন্ যার্ | অঙ্গের্ বাস্, | তাম্বুল্‌বন্ | কেশ্,
যার্ উত্তাল্ তাল্ -কুঞ্জের বায়্ মন্থর্ নি-শ্বাস্,
আর উজ্জ্বল্ যার্ অম্বর্, আর্ উচ্ছল্ যার্ হাস্ ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', সিংহল

যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পাদের সবগুলো স্বরই গুরু, তথাপি ছন্দের ঝোঁক স্বভাবতঃ প্রথম স্বরের উপরেই পড়েছে বলে এ দুটোকেও আদিগুরু (অর্থাৎ Trochee ও Dactyl) বলেই ধরা গেল।

বাংলায় নিজস্ব চতুঃস্বরের ছন্দ ছাড়া ইংরেজি দ্বিস্বর এবং ত্রিস্বর ছন্দ

রচনাও কেবল যে চলে তা নয়। বাংলায় দুই স্বর ও তিন স্বরের মিশ্রণে এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে এই যৌগিক পঞ্চস্বরের ছন্দ রচনা করা চলে না। এ হিসাবে বাংলা স্বরবৃত্ত ইংরেজি ছন্দকেও জিতেছে। দুই স্বর ও তিন স্বরের মিশ্র ছন্দের উদাহরণ।—

কার ইঙ্-গিত্-বলে সিন্ধুর ঢেউ চলে,
বজ্রের বেগ বাঁধা কার নিয়মে?
খুনলুণ্-ঠন্-রত ক্রূর্ নিষ্-ঠুর যত
কার দুই পায় নত হয় চরমে?

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'জয়ধ্বনি', ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ

তিন স্বর ও দুই স্বরের মিশ্রছন্দের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সংসারে একদিন | থাকবে না কেউ ভাই,
আর তবে মৃত্যুর | ভয় কি রে, ভয় নাই।
নিঃশেষে দুঃখীর | অশ্রুটি শেষ কর্,
সত্যেরে বক্ষের | খুন দিয়ে বেশ কর্॥

—লেখক

যদিও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ স্বীয় শক্তিতে সমস্ত ইংরেজি ছন্দের ধ্বনি প্রায় অবিকল প্রকাশ করতে পারে এবং যদিও কোনো কোনো বিষয়ে বাংলা স্বরবৃত্ত ইংরেজি ছন্দের চাইতেও অধিকতর ক্ষমতা দেখিয়েছে, তথাপি একটি অতি গুরুতর বিষয়ে বাংলা ছন্দ এখনও ইংরেজি ছন্দের অনেক পিছনে পড়ে আছে। ছন্দের যে শক্তিতে ইংরেজি ভাষায় *Paradise Lost*, *Childe Harold* প্রভৃতি অতি গুরুগম্ভীর বৃহৎ কাব্য রচিত হতে পেরেছে, বাংলা স্বরবৃত্তের সে ক্ষমতা আছে কি না, তা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। বাংলা স্বরবৃত্তে 'পলাতকা'র মতো অতি উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ এবং 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' প্রভৃতি অপূর্ব কবিতা রচনা করা যায় তা দেখা গেছে। কিন্তু এ ছন্দে 'মেঘনাদবধ'এর মতো কাব্য বা 'বসুন্ধরা'র মতো কবিতা রচিত হতে পারে কিনা, এখনও তা জানা যায় নি। অর্থাৎ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ ছড়া-পাঁচালি ছেড়ে মহাকাব্যের বাহন হতে পারে কি না, এইটে হচ্ছে প্রশ্ন। আমার বিশ্বাস ইংরেজি ছন্দে যখন গম্ভীর ও গভীর কাব্য রচনা করা সম্ভব হয়েছে তখন বাংলা স্বরবৃত্তেও তা পারার সম্ভাবনা রয়েছে। দেখা গেছে

যেখানে হলন্ত বর্ণের সংখ্যাটা কিছু বেশি, সেখানে নাচুনি তালটাই ওঠে সহজে, গম্ভীর স্বর প্রকাশ করা শক্ত। ইংরেজিতেও হলন্ত বর্ণের অভাব নেই এবং ও ভাষার Trochee প্রভৃতি ছন্দে নৃত্যেরও অভাব নেই, অথচ ওই ভাষায় যখন *Paradise Lost* লেখা গেল তখন বাংলা স্বরবৃত্তেও গম্ভীর কাব্য রচনা করার সম্পূর্ণ আশা আছে বলে মনে করি। আশা করি বাংলার কবিবৃন্দ এ দিকে দৃষ্টিপাত করে মাতৃভাষার রত্নভাণ্ডারের আর-একটি কক্ষ উন্মুক্ত করবেন। বাংলার অমর কবি মধুসূদন পয়ারের বেড়িপরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শৃঙ্খল উন্মোচন করে বাংলা ভাষায় গুরুগম্ভীর মেঘমন্দ্র ধ্বনিত করেছেন। বাংলার কোন্ ভবিষ্য কবি স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দেও মহাকাব্যের দুন্দুভিধ্বনি নিনাদিত করবেন তা জানি নে। আজ পর্যন্ত কোনো কবিই যে স্বরবৃত্ত ছন্দে গম্ভীর কবিতা রচনার প্রয়াস করেন নি তা নয়। বাংলার মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু বিষয়ে বাংলা সাহিত্যিকগণের পথপ্রদর্শক, বাংলার কাব্যোত্থানে বসন্তসমাগমের তিনিই একমাত্র অগ্রদূত বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের পুরোবর্তী এই বিশাল ক্ষেত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি যে আকৃষ্ট হয় নি তা মনে হয় না। অন্ততঃ একটি কবিতায় এক বার তিনি স্বরবৃত্তের গণ্ডি ভেঙে দিয়ে তাকে ছত্রের পর ছত্রে যথেচ্ছ প্রসারিত করে নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। ছন্দপারদর্শী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি কবিতাতেও এ প্রয়াসের নিদর্শন দেখা যায়। এ স্থলে রবিবাবুর 'পরমায়ু'-নামক কবিতা থেকে প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্‌ধৃত করছি। পাঠক তার গতি এবং যতির বিচিত্র ভঙ্গির দিকে একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, এ ছন্দ অক্ষরবৃত্তের চাইতে ঢের বেশি স্বাভাবিক অথচ অক্ষরবৃত্তের মতো গাম্ভীর্য প্রকাশের সব শক্তিই এ ছন্দের রয়েছে।—

> যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
> আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা-কালো
> যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা,
> তাদের প্রাণের ঝরনাস্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
> চলছে বয়ে চতুর্দিকে। কালের যোগে নয় ত মোদের আয়ু,
> নয় সে কেবল দিবসরাতির সাতনলি হার, নয় সে নিশাসবায়ু।

—রবীন্দ্রনাথ, সবুজপত্র ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ

কিন্তু এখানেই বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের অদ্ভুত ক্ষমতা শেষ হল না। বাংলা শব্দের প্রত্যেকটি স্বরকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে লঘুগুরুভেদে তাদের এমনভাবেও সাজানো যায় যে, তাতে বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দে শুধুই ইংরেজি কেন, সংস্কৃত আরবি ফারসি প্রভৃতি ভাষারও বহু ছন্দের তালকে ধরে রাখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল, | কই গো কই মেঘ, | উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার | মূরতি ধরি' আজ | মন্দ্রমন্থর | বচন কও।
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও, অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', যক্ষের নিবেদন

সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এ কয়টা ছত্র পড়ামাত্রই তাদের কানে 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দের মন্দ্র ধরা দেবে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এখানে প্রথম পংক্তিচ্ছেদে চারটি গুরুস্বর, দ্বিতীয় পংক্তিচ্ছেদে পাঁচটি লঘু ও একটি গুরু স্বর এবং তৃতীয় পংক্তিচ্ছেদে যথাক্রমে একটি গুরু একটি লঘু ও দুটি গুরু স্বর এবং চতুর্থ ছেদে একটি লঘু ও দুটি গুরু স্বর আছে। প্রত্যেক চরণেই এ স্বরগুলো অবিকল এক প্রণালীতেই সজ্জিত হয়েছে। সুতরাং এখানে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দেব পর্যায়ক্রম সম্পূর্ণ অব্যাহত রয়েছে। মন্দাক্রান্তার সূত্র হচ্ছে এই।—

। । । । - - - - - । । - । । - । ।
মন্দাক্রান্তা | -ম্বুধিরসনগৈ | -র্মোভনৌ তৌ গযুগ্মম্।

—গঙ্গাদাস, 'ছন্দোমঞ্জরী' ২। ১৩৪

এমনি করে যদি বাংলা শব্দের লঘু ও গুরু স্বরগুলোকে নিপুণভাবে কাজে লাগানো যায়, তা হলে স্বরবৃত্তের সাহায্যে বহু সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রবর্তিত করা যায়। যথাস্থানে আমরা বাংলায় রচিত বহু সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দেব।

কেবল সংস্কৃত কেন, এ প্রণালী অবলম্বন করে আরবি ফারসি প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার বহু ছন্দকেও যে বাংলায় চালানো যায় তার অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আরবি হজয্ ছন্দের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

হে মোর ভৈবব | ভীষণ সুন্দর,
তোমার কম্বুর | নিনাদ গম্ভীর
ডুবাক বিশ্বের | হৃদয়-কন্দর,
কাঁপাক অন্তর | নিদয় দম্ভীর।

—লেখক

শুধু তাই নয়, লঘু ও গুরু স্বরগুলোর নব নব সমাবেশের দ্বারা বাংলায় অসংখ্য নূতন ছন্দের আবিষ্কারের সম্ভাবনাও রয়েছে। কেবল কানের উপর নির্ভর করে স্বরগুলোকে লঘুগুরুভেদে এমন নূতন পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করা সম্ভবপর, যা অন্য কোনো ভাষায় নেই। সুতরাং এ দিক্ থেকে বাংলায় নব নব ছন্দ রচনার যে বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত রয়েছে, আশা করা যায় বাংলার ভবিষ্যৎ কবিরা তার সদ্ব্যবহার করে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অপূর্ব শ্রী ও সম্পদে মণ্ডিত করবেন।

(বাংলা ছন্দের জাদুকর সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার এই অতি নিগূঢ় শক্তি আবিষ্কার করে সাহিত্যিকগণকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। তিনিই বাংলার গুপ্ত ছন্দভাণ্ডারের এই চাবিটি বাংলার কবিবৃন্দের হস্তে তুলে দিয়েছেন। এজন্য বাংলার কবিরা চিরকাল তাঁকে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্মরণ করবেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই স্বরবৃত্ত ধারার বহু ছন্দে বহু কবিতা রচনা করে স্বরবৃত্তের অদ্ভুত শক্তি ও সম্পদের পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরা সকলেই তাঁর এ কৃতিত্ব স্বীকার করেন। তার পরে বাংলার তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ছন্দ নিয়ে যে অদ্ভুত ভেলকিবাজি দেখিয়েছেন তাতে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মূলের ভাব এবং ছন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে হাফেজের কতকগুলি ফারসি গজলের বাংলা অনুবাদ করেছেন। এইটেও তাঁর অপূর্ব প্রতিভারই পরিচায়ক। যা হক, আমরা যখন যথাস্থানে বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের বিস্তৃত শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হব তখন পাঠক অবশ্যই বাংলা ছন্দের বিপুল সম্পদের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হবেন)।

বাংলা ছন্দের এই যে অপূর্ব ঐশ্বর্যশালিতা, বাংলা ভাষার স্বরব্যঞ্জনের অপূর্ব সামঞ্জস্যই তার মূলকারণ। প্রাকৃত বাংলায় হসন্ত বর্ণের (সুতরাং গুরুস্বরেরও) সংখ্যা সাধু বাংলার চাইতে অনেক বেশি, কিন্তু ইংরেজি ভাষার

থেকে কম। এইজন্যই বাংলা স্বরবৃত্তে চতুঃস্বরের ছন্দই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। অথচ বেছে বেছে গুরুস্বরবহুল শব্দগুলোকে প্রয়োগ করলে বাংলায় অনায়াসে দ্বিস্বরের, ত্রিস্বরের এবং তাদের মিশ্রণে পঞ্চস্বরের ছন্দ রচনা করা যায়। কিন্তু ইংরেজিতে হসন্ত বর্ণ এবং কাজেই গুরুস্বরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়াতে সে ভাষায় চতুঃস্বরের বা পঞ্চস্বরের ছন্দ মোটেই রচনা করা যায় না। আবার স্বরবহুল সাধু বাংলা শব্দ এবং হসন্তবহুল প্রাকৃত বাংলা কিংবা যুক্ত-বর্ণবহুল সংস্কৃত শব্দের যথাযোগ্য মিশ্রণ করে সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষার ছন্দ বাংলায় ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একান্ত হসন্তবহুল ইংরেজিতে সেসব ছন্দ মোটেই আনা যায় না। পূর্বোক্ত মন্দাক্রান্তা ছন্দের দৃষ্টান্তটাই ধরা যাক। এ ছন্দের অন্যান্য পর্যায়ক্রম ইংরেজিতে আনা যদি বা সম্ভব হয়, তথাপি দ্বিতীয় পংক্তিচ্ছেদের 'ব্যথিত নভতল' প্রভৃতি শব্দের পাঁচটি লঘুস্বর ইংরেজিতে একত্র পাওয়া তো একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া ইংরেজি উচ্চারণে যে ঝোঁকের ব্যবস্থা থাকাতে তার ছন্দের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে সেই ঝোঁকের ব্যবস্থাই ইংরেজিতে অন্য ছন্দ প্রবর্তনের একান্ত অন্তরায়। অপর দিকে সাধু বাংলায় হসন্তের এত অভাব যে, এ ভাষায় গুরুস্বর পাওয়াই দুষ্কর। সুতরাং গুরুস্বরের অভাবহেতু সাধু বাংলায় ছন্দের স্পন্দন তোলার আশাই করা যায় না। হসন্তবহুল কথিত বাংলা, স্বরবহুল সাধু বাংলা এবং যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে যে অপূর্ব ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার সাহায্যেই ছন্দোজগতে এই দিগ্‌বিজয় করা সম্ভব হয়েছে।

আশা করি এখন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত, বাংলা ছন্দপ্রবাহিণীর এই ত্রিধারার বিশিষ্ট স্বরূপ ও শক্তির পরিচয় পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়েছে। পরবর্তী প্রবন্ধে দৃষ্টান্তসহ এই তিন ধারার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ও তাদের নামকরণে প্রবৃত্ত হবার আশা রইল।

* প্রবাসী ১৩২৯ ফাল্গুন

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক শ্লোকের চারটে করে ভাগ থাকে এবং অধিকাংশ স্থলেই এ চার ভাগের গঠনপ্রণালী অবিকল একরকম। সুতরাং এক ভাগের গঠনভঙ্গি নির্দেশ করে দিলেই সবটা শ্লোকের নির্মাণকৌশল আয়ত্ত হয়ে যায়। এ চার ভাগের প্রত্যেক ভাগকে এক-একটি 'চরণ' বা 'পদ' বলা হয়। আবার অনেক স্থলেই প্রত্যেক চরণে এক বা ততোধিক জায়গায় যতি বা বিরামের ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত ভাষায় এক যতি থেকে আর-এক যতি পর্যন্ত শ্লোকাংশের কোনো নাম নেই, নামের দরকারও হয় না। কিন্তু বাংলায় এক যতি থেকে আর এক যতি পর্যন্ত যে পদ্যাংশ, তার উপরেই প্রধানতঃ ছন্দের গঠনকৌশল নির্ভর করে। সুতরাং এরকম এক-একটি অংশকেই বাংলা পদ্যের 'পদ' বলা সংগত। ইংরেজিতেও দুই যতির মধ্যবর্তী অংশের উপরেই সমস্ত ছন্দ নির্ভর করে এবং এ অংশকে ইংরেজিতেও foot বা পদ বলা হয়।

কিন্তু প্রত্যেক পদের নির্মাণপ্রণালীর উপরে ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি নির্ভর করলেও কয়েকটি পদের বিভিন্ন সমাবেশের দ্বারাই তার বাহ্যপ্রকৃতি নিয়মিত হয়। কোনো কবিতাব ছন্দের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে তার ভিতরের গঠন ও বাইরের গঠন, এ দু-ই জানা চাই; অর্থাৎ জানতে হবে এ কবিতায় প্রতি ছত্রে কয়টি করে পদ আছে এবং প্রত্যেক পদ গঠিত হয়েছে কোন্ প্রণালীতে।

সুতরাং কোনো পদ্যের প্রত্যেক পদের নির্মাণপ্রণালী এবং তার প্রত্যেক ছত্রের অন্তর্গত পদসংখ্যার উপরে লক্ষ রেখেই বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নামকরণ করতে হলে প্রত্যেকটি নাম অর্থদ্যোতক হওয়া চাই। অর্থাৎ ছন্দের নাম থেকেই ছন্দের অন্তর্গঠন ও বহির্গঠন অনায়াসে বোঝা যাবে এবং নামগুলোর সঙ্গে এক বার পরিচয় হয়ে গেলে কোনো এক ছন্দের একটি কবিতা পড়লেই তার নাম মনে জেগে উঠবে। এখন আমরা শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ কার্যে প্রবৃত্ত হই। পাঠক

নামের অর্থ ও তৎসঙ্গে প্রদত্ত উদাহরণ থেকেই এরকম নামকরণের সার্থকতা উপলব্ধি করবেন। সুতরাং এ নামকরণের পক্ষে আমার কোনো রকম ওকালতি করা নিষ্প্রয়োজন।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

প্রথমে স্বরবৃত্ত ছন্দটাই ধরা যাক। প্রতি পাদে স্বরের সংখ্যা, স্বরগুলোর গুরুলঘুভেদে বিভিন্ন সন্নিবেশ এবং প্রতি ছত্রের পাদসংখ্যা— এই তিনটি বিষয়ের বিচিত্র সমাবেশের ফলে স্বরবৃত্ত ধারায় বহু শাখাপ্রশাখার উৎপত্তি হয়েছে। এই শাখাপ্রশাখাব মধ্যে অনেকগুলো ইংবেজি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার অনেক ছন্দের অবিকল অনুরূপ। যথাস্থানে সে কথা উল্লেখ করা যাবে।

প্রথমতঃ, দেখা যায় স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি পাদে দুই স্বর, তিন স্বর, চার স্বর, এমন কি দুই-তিন বা তিন-দুয়ের মিশ্রণে পাঁচ স্বর এবং তিন চার বা চার-তিনের মিশ্রণে সাত স্বর পর্যন্ত থাকতে পারে। সুতরাং স্ববৃত্ত ছন্দকে প্রথমতঃ দ্বিস্বরপাদ, ত্রিস্বরপাদ, চতুঃস্বরপাদ, পঞ্চস্বরপাদ এবং সপ্তস্বরপাদ, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক পাদের আদি, মধ্য কিংবা অন্ত-স্থিত স্বর লঘু বা গুরু হতে পারে। সুতরাং এ দিক্ থেকে এ ছন্দকে আদিগুরু বা আদিলঘু, মধ্যগুরু বা মধ্যলঘু প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা যায়। তৃতীয়তঃ, এ ছন্দের কোনো কবিতায় যদি প্রতি ছত্রে দুটো, তিনটে, চারটে বা পাঁচটা করে পদ থাকে তবে সে ছন্দকে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী, পঞ্চপদী প্রভৃতি নাম দেব। কিন্তু অনেক সময় কোনো ছত্রে কয়েকটি পূর্ণ পদ এবং শেষে একটা অপূর্ণ পদ থাকে, যেমন তিনটে পূর্ণ পদ ও একটা অপূর্ণ পদ, সে স্থলে ছন্দকে অপূর্ণ চৌপদী প্রভৃতি নাম দেওয়া যায়। এ অপূর্ণতা আবার অনেক রকম হতে পারে। কোথাও একটি স্বরের অভাবে অপূর্ণ, কোথাও দুটো স্বরের অভাবে অপূর্ণ ইত্যাদি।

এখন আমরা এই বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্ত দিতে প্রবৃত্ত হব। প্রত্যেক দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ণপরিচয়সূচক নাম দেওয়া যাবে এবং বিভিন্ন ভাষার কোনো ছন্দের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য থাকলে যথাস্থানে সে কথারও নির্দেশ করা যাবে। বলা বাহুল্য, এইসকল বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাবেশের ফলে যে বহুসংখ্যক ছন্দের

উৎপত্তি হতে পারে সেসমস্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া অসম্ভব, নিষ্প্রয়োজনও বটে। আমরা প্রধানতঃ ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচায়ক দৃষ্টান্ত-সমূহই উদ্ধৃত করব।—

১ দ্বিস্বরপাদ

১। আদিগুরু : ইং—Trochee, সং—তূণক

অপূর্ণ আটপদী

হায় রে | বন্ধু, | দুঃখ | মোর সে |
বল্‌তে | চক্ষে | ঝর্‌ছে | জল ;
বেদ্‌না -সিন্ধু উথ্‌লে উঠ্‌ছে
মোর এ বক্ষে, নাইক তল ॥

—লেখক

২। অন্তগুরু : ইং—Iambus, সং—পঞ্চচামর বা প্রমাণিকা

পূর্ণ আটপদী

মহৎ | ভয়ের | মূরৎ | সাগর, |
বরণ | তোমার | তমঃ | -শ্যামল ,
মহে -শ্বরের প্রলয় -পিনাক
শোনাও আমায়, শোনাও কেবল ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', সিন্ধুতাণ্ডব

৩। উভয়গুরু : সংস্কৃত—বিদ্যুন্মালা

পূর্ণ চৌপদী

ভোম্‌রায় | গান গায় | চরকায় | শোন্ ভাই,
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই।
ঘর-বার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর,
ঘর ঘর ক্ষীরসর, আপনায় নির্ভর ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বিদায়-আরতি', চরকার গান

৪। মিশ্র—

পূর্ণ চৌপদী

সান্দ্র | -বর্ষণ | হর্ষ | -হিল্লোল,
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু-হিল্লোল,
মূর্ছে বীণ আর মূর্ছে বীণকার—
মূর্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষের গান', ছন্দহিন্দোল

২ ত্রিস্বরপাদ

১। আদিগুরু : ইং—Dactyl, সং—মোটক

অপূর্ণ চৌপদী

ত্রিশ কোটি | দেশবাসী | ডুব্‌ছে রে | বন্যায় ;
তোম্‌রা কি মেষ সবে, সইছ যে অন্যায় ?
ওঠ্‌ তোরা, জাগ্‌ তোরা, আয় ছুটে, আয় না—
লাখ তাজা প্রাণ দিয়ে দেশ রাখা যায় না ?

—লেখক

২। আদিলঘু : আরবি—মোতাকাবেব, সংস্কৃত—ভুজঙ্গপ্রয়াত

পূর্ণ চৌপদী

সমুদ্রের | তরঙ্গের | গভীর তান | ভয়ঙ্কর
বাজায় কোন্ অনন্তের বেদনগীত, এ সুন্দর !
বসন্তের আনন্দের কুসুম কার পরান ছায়,
বিহঙ্গের কূজনতান জাগায় তার কি বাঞ্ছায় !
অরুণ, কার মুখের 'পর করিস তুই কিরণদান,
আগুন, তার বুকের ওই পরানটার দে সন্ধান ॥

—লেখক

৩। মধ্যগুরু : ইংরেজি—Amphibrach

অপূর্ণ ত্রিপদী

ওরে জীবন কি | শুধুই রে | দুখ,
তার দেখিস না আনন্দ-টুক ?
না না, জীবন সে ব্যথার তো নয়,
সে যে অনন্ত আনন্দময়।

ওরে মরণকে কি ভয় রে আর,
সে প্রাণের যে তোরণ দুয়ার।
তাই ফেলিস নে চোখের ও-জল,
বল্ আনন্দ আনন্দ বল্॥

—লেখক

৪। মধ্যলঘু আরবি—মোতদারিক

চাইছে বুক | দিব্যসুখ,
সুখ অভয়, | দ্বন্দ্ব-ক্ষয়,
মৃত্যুজিৎ ছন্দগীত,
তার নাগাল পায় না মৃৎ।
নিত্যরূপ, কল্পভূপ,
এক অনুপ পূর্ণ সেই,
সেই ভূমায় অর্ঘ্য দেই॥

—করুণানিধান, 'ধানদূর্বা', স্বর্ণমৃগ

৫। অন্তগুরু ইং—Anapæst, সং—তোটক (অপূর্ণ)

অপূর্ণ চৌপদী

ওরে ওঠ্ | তোরা সব | ছেড়ে সং | -শয়,
মুছে ফেল্ হৃদয়ের ব্যথা সঞ্চয়;
নব শক্তিতে বুক করি' বন্ধন
যত দুঃখেরে আজ কর লঙ্ঘন,
মিছা মৃত্যুরে আর বৃথা কোন্ ভয়?
বিনা দুঃখেতে ভাই কোনো সুখ নয়।
তাই ছুটে চল্ ছুটে চল্ ছুটে চল্ সব,
যদি মৃত্যুতে চাস্ চির-গৌরব,
বুকে জ্বাল্ জ্যোতি আজ শত সূর্যের—
ওই বাজে সংগ্রামে শোন্ ধ্বনি তূর্যের॥

—লেখক

৩। অন্তলঘু : সংস্কৃত—সারঙ্গ

অপূর্ণ চৌপদী

ঐ শঙ্খ | শোন্ বাজ্‌ল | ভীম শব্দে | গম্ভীর,
গায় মুক্তি-বন্দন রে নির্ভীক সে কোন্ বীর !
হয় রাজ্য, নয় ভিক্ষা, নয় মৃত্যু-বন্ধন,
চাই বীর্য, নয় তুচ্ছ স্বর্গেরও নন্দন।
বন্ধন সে মুক্তের তো অঙ্গের অ-লঙ্কার ,—
ওই ঝন্‌ঝন্ কি শুন্‌ছিস্ না ঝঙ্কার সে ডঙ্কার ?

—লেখক

৭। ত্রিগুরু : ইংরেজি—Dactyl

অপূর্ণ চৌপদী

হাসে স্বন্দর মুখ, | খঞ্জন-চোখ, |
জাফ্‌রান্-রঙ্ | অঞ্চল।
নাহি নৃত্যেব শেষ, সংগীত-রেশ
ফুলবাণ সব চঞ্চল !
ওই আন্‌মন্ চম্পায
মান- স্বপ্নের আব্‌ছায়
কার যৌবন লোল হাস্যের রোল,
রূপদর্পণ ঝল্‌মল্ ॥

—কৰুণানিধান, 'ধানদূর্বা', বসন্তবিলাস

৩ চতুঃস্বরপাদ

১। আদিগুরু :

অপূর্ণ চৌপদী

হায় সে কত | কাল গেল রে, | গাইল বৃথা | বুলবুলি,
হয় নি তবু প্রস্ফুটিত কাব্যবনে ফুলগুলি ;
আজকে হেসে ছন্দোময়ী যেমনি এল ফাল্গুনে,
অমনি যত বাংলা কবি তান ধরেছে ফুলবনে ॥

—লেখক

২। আদিলঘু : আরবি—হজয্

দ্বিপদী

আপন বক্ষের | কাঁপন দেখলেই
যে জন চম্‌কায়, | মরণ তার সে-ই ;
কি লাভ তার ওই জীবন থাকলেই,
মরণ-ত্রাস যার বুকের পার্শ্বে ই ?
পরের বেদনায় অধীর মন যার,
কি তার শঙ্কাই মরণ-ঝঞ্ঝার ?
অমর বীরদল তারাই বিশ্বের,
যাদের প্রাণমন সেবায় নিঃস্বের ॥

—লেখক

৩। অন্তগুরু : সংস্কৃত—গজগতি

পূর্ণ দ্বিপদী ও চৌপদী

হর-মুকুট ! | হর-মুকুট !
ভূ-স্বরগের | সুমেরু-কূট !
গগনে প্রায় | ভিড়ায়ে কায় | করিতে চায় | তারকা লুট ।
বিজুলি থির হয়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির !
হীরা ফটিক উজলি দিক্ ঘিরেছে কাব জটারি নীড় ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীব', হরমুকুট গিরি

৪। অন্তলঘু :

পূর্ণ দ্বিপদী

নয় নয় হিংসা, | রক্তের বন্যা,—
প্রাণহীন বিশ্বে | করতেই ধন্যা,
বন্দীর হস্ত-শৃঙ্খল খুলতে,
দেশ-দেশ মুক্তি-মন্দির তুলতে,
প্রাণ-দান করবে এই সব বীর রে,
আর্তের মুছবে চক্ষের নীর রে !

—লেখক

৫। দ্বিতীয়লঘু: আরবি—রমল্

পূর্ণ দ্বিপদী

হায় কি শঙ্কায় | চিত্ত উন্মন,
কাঁপছে অন্তর, | কাঁপছে প্রাণমন,—
এই যে দুস্তর সিন্ধু দুঃখের
গর্জে ভীমনাদ বজ্র-লক্ষের,
তার কি নিষ্ঠুর গর্তে কুক্ষির
ডুববে সব সুখ লক্ষ দুঃখীর ?

—লেখক

বলা বাহুল্য, প্রতি পাদের অন্তর্গত স্বরগুলোর লঘুগুরুভেদে বিভিন্ন সমাবেশের ফলে চতুঃস্বরপাদের আরও অনেক রকম উপবিভাগ হতে পারে। প্রত্যেক উপবিভাগের এক-একটা ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে, সবগুলোর ধ্বনিও একরকম শোনায় না। কিন্তু বাহুল্যভয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত দিলাম না। এ স্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে, এরকম বাঁধাবাঁধি নিয়মের ছন্দ সর্বদা ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়, কেননা তাতে কবির চিন্তাধারা পদে পদে বাধা পেতে থাকে। সেজন্যেই চতুঃস্বরপাদের যে শাখাটা সবচেয়ে মুক্ত, অর্থাৎ যে শাখায় নিয়মের বাড়াবাড়ি সবচেয়ে কম, সেইটেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এখন এই অনিয়মিত ধারার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব। এ পর্যন্ত কোনো ধারারই দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি উপশ্রেণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় নি। কিন্তু এই অনিয়মিত ধারায় এই-সমস্ত উপশ্রেণীর দৃষ্টান্ত দেখানো আবশ্যক।

৬। অনিয়মিত—

ক. ত্রিপদী

দুই স্বরের অভাবে অপূর্ণ

রক্ত আলোর | মদে মাতাল | ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা', ১

খ. চৌপদী

দুই স্বরের অভাবে অপূর্ণ

সামনেকে তুই | ভয় করেছিস, | পেছন তোরে | ঘিরবে—
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা', ৩০

এক স্বরের অভাবে অপূর্ণ

সুরু হল | নূতন নাট্য | সূত্রধারের | নূতন নাট,
সাগরপারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী-পাঠ।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', ইজ্জতের জন্য

পূর্ণ

ধ্যানে তোমার | রূপ দেখি গো, | স্বপ্নে তোমার | চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি !
দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী, মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে, বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

গ. পঞ্চপদী

অপূর্ণ

সবল কর | পঙ্গু ইচ্ছা, | পরশ বুলাও | মনের পক্ষ | -ঘাতে,
হাত ধরে নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বিদায়-আরতি', বড়দিনে

৪। পঞ্চস্বরপাদ (মিশ্র)

দুই-তিন এবং তিন-দুয়ের মিশ্র পঞ্চস্বরপাদের দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে (পৃ ৩৬-৭)। আর নূতন দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

৫। সপ্তস্বরপাদ (মিশ্র)

পঞ্চস্বরপাদের ন্যায় তিন-চার এবং চার-তিনের মিশ্র সপ্তস্বরের ছন্দও ব্যবহার করা যায়। যথা—

(ক) তিন-চারের মিশ্র

মরি কার পরশমণি
গগনে ফলায সোনা !
হৃদয়ে নূপুরধ্বনি
অজানার আনাগোনা ॥
সোনালি জপা-চেলি
দিযে কে শূন্যে মেলি
নিথরেব পদ্দা ঠেলি
উদাসেব আঁচল হেলায।
সাঁঝে আজ কিসের আলো
ভুলালো মন ভুলালো,
ফাগুযাব ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষেব গান', সাঁঝাই

(খ) চাব-তিনের মিশ্র

তোমবা কি গো, হায নাবী, | থাকবে চির-বন্ধনে ?
থাকবে ক্ষণেব সঙ্গিনী, থাকবে শুধুই বন্ধনে ?
তোমরা তো নও লক্ষ্যহীন, তোমবা তো নও তুচ্ছ গো,
ভগ্নী মাতা কন্যাগণ, তোমবা সবাই আজ জাগো।

—লেখক

৬। বিবিধ মিশ্র

উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহে প্রতি পংক্তিব অন্তর্গত প্রত্যেক পাদের গঠনপ্রণালী একই রকম। কিন্তু প্রতি পাদের নির্মাণকৌশল একই বকমেব না করে যদি বিভিন্ন পাদ বিভিন্ন প্রণালীতে রচনা করা যায তবে ছন্দের ধ্বনিবৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায। ছন্দের এ বৈচিত্র্য বাংলায় এখনও বহুলপবিমাণে দেখা যায না। এ স্থলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তার সবগুলিই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। দৃষ্টান্তগুলির কয়েকটি বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ, বাকিগুলি অনেকটা স্বতন্ত্র। এই উপায় অবলম্বন করে বাংলার বহু নূতন ছন্দ প্রবর্তিত করা যায়, এ কথা পূর্বেই বলেছি।

১। অনুষ্টুপ্—

আর্ত সংসার | ব্যথায় কাঁদছে,
ওরে শোন্ তুই | যে নস্ বধির।
ধ্বস্ত ধায় ধূম্ | -কেতুর দম্ভে,
বাড়ে কল্লোল | রুধির-নদীর ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'ছন্দসরস্বতী', ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ

২। মালিনী—

সূত্র—ন ন ম য য যু তেয়ং | মালিনী ভোগি লোকৈঃ।

—গঙ্গাদাস, 'ছন্দোমঞ্জরী' ২।১৩৪

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্, | শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, | যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর, উৎসবের কুঞ্জ নির্জন;
ভেঙে দেবে বুঝি অন্তর মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', রিক্ত।

৩। মন্দাক্রান্তা—

সূত্র—মন্দাক্রান্তা | -ম্বুধি র স ন গৈ | র্মো ভ নৌ তৌ গ যু গ্মম্।

—গঙ্গাদাস, 'ছন্দোমঞ্জরী' ২।১৬৪

ভরপুর অশ্রুর | বেদনা-ভারাতুর | মৌন কোন্ সুর বাজায় মন।
বক্ষের পঞ্জর | কাঁপিছে কলেবর, | চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', যক্ষের নিবেদন

৪। চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত—

সূত্র—যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্তরেফাস্তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতো ভবেদ্দণ্ডকঃ।

—গঙ্গাদাস, 'ছন্দোমঞ্জরী' ২।২২৬

গগনে গগনে নীল নিবিড় ভিড় মেঘের ভিড় গো ভিড়,
শোন্ তাদের শব্দ ভীম ডম্বরুর দুন্দুভির।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'মণিমঞ্জুষা', বর্ষামেঘ

৫। স্বতন্ত্র—

(ক) তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়।
কচি কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায়॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষের গান', প্রণাম

(খ) নিশাসে কি সৌরভ, কাল চুলে মেঘ সব,
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর্‌ গো।
কালো চোখে বিদ্যুৎ, কোনোখানে নেই খুঁৎ,
অদ্ভুত অদ্ভুত তুই স্বর্গ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বিদায়-আরতি', হিন্দোল বিলাস

আরবি ছন্দের অনেকগুলো এই বিবিধ মিশ্র বিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাব দৃষ্টান্ত এ স্থলে উদ্ধৃত করলাম না।

চতুঃস্ববপাদ স্বরবৃত্তেব দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারেব পংক্তির বিভিন্ন সমাবেশেব দ্বারা বাংলা কবিতায় বহু ছন্দোবন্ধের উৎপত্তি হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত এ স্থলে দেখানো নিষ্প্রয়োজন। স্বরবৃত্ত ছন্দে অতি উৎকৃষ্ট মুক্তবন্ধ কবিতাও রচনা করা যায়। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'ই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অতঃপর আমরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শ্রেণীবিভাগকার্যে প্রবৃত্ত হব।*

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ করে থাকবেন যে, স্বরবৃত্ত ছন্দের যেসমস্ত ধারায় প্রতি পাদের অন্তর্গত স্বরগুলোর লঘুত্ব-গুরুত্বের হিসাব রাখা হয় সেসমস্ত স্থলে প্রতি পাদে মাত্রাপরিমাণও ঠিক থাকে। যেমন আদিগুরু, মধ্যগুরু কিংবা অন্তগুরু ত্রিস্বর ছন্দের প্রতি পাদেই চার মাত্রা থাকে। আবার ত্রিস্বরপাদ ছন্দের যেসমস্ত শাখায় দুটো গুরু স্বর থাকে কিংবা চতুঃস্বরপাদ ছন্দের

* প্রবাসী ১৩২৯ চৈত্র

যেসমস্ত শাখায় একটি গুরু স্বর থাকে সেসমস্ত স্থলে প্রতি পাদে পাঁচটি করে মাত্রা পাওয়া যাবে। তেমনি সর্বগুরু ত্রিস্বরপাদ কিংবা দ্বিগুরু চতুঃস্বরপাদ কিংবা একগুরু পঞ্চস্বরপাদের প্রতি পাদে মাত্রাপরিমাণ ছয়। কিন্তু এসব ছন্দে মাত্রাপরিমাণ স্থির থাকলেও এসব ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা সংগত নয়। কেননা, প্রতি পাদের স্বরসংখ্যা এবং তাদের লঘুগুরুক্রমের প্রতি লক্ষ রেখেই এসব ছন্দ রচিত হয়, মাত্রাপরিমাণের প্রতি লক্ষ রেখে নয়। মুখ্যতঃ স্বরসংখ্যা এবং তাদের লঘুগুরুক্রমের উপরে দৃষ্টি রাখলেই গৌণতঃ মাত্রাপরিমাণও নিয়মিত হয়ে যায়। তাই এসব ছন্দকে 'মাত্রাবৃত্ত' নাম দেওয়া সংগত মনে করি না। সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধেও এ কথা অবিকল খাটে। সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তেও প্রত্যেক স্বরের লঘুত্ব গুরুত্বের হিসাব রাখা হয় বলে প্রতি চরণের মাত্রা সমান থাকে, কিন্তু তাই বলে এ ছন্দকে 'জাতি' বা 'মাত্রাছন্দ' বলা হয় না।

যা হক, বাংলায় অধিকাংশ সময়েই স্বরসংখ্যা ঠিক রেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতি স্বরের ওজন হিসাব করে ছন্দ রচনা করা সম্ভবপর হয় না। তাই কবিরা অনেক সময় কেবল স্বরসংখ্যা ঠিক বেখেই ছন্দ রচনা করেন। এইটেই খাঁটি স্বরবৃত্ত ছন্দ; এ ছন্দে মাত্রাপরিমাণ স্থির থাকে না। আবার অনেক সময় তাঁরা কেবল মাত্রাসংখ্যা ঠিক রেখেই কবিতা রচনা করেন। এইটেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ; এ ছন্দে স্বরসংখ্যা স্থির থাকে না। যথা—

রুদ্র মোদের | হাঁক দিয়েছে | বাজিয়ে আপন | তূর্য।
মাথার 'পরে | ডাক দিয়েছে | মধ্যদিনের | সূর্য ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা'.

এখানে প্রতি পাদের স্বরসংখ্যা চার, কেবল শেষ দুই পাদে দুই। কিন্তু মাত্রাসংখ্যার স্থিরতা নেই। কাজেই এ ছন্দ স্বরবৃত্ত। আবার

ফাল্গুন | চঞ্চল | ফোটা ফুল | রয় না।
অবহেলে | দেয় ফেলে | পুষ্পের | গয়না ॥

—সতীশচন্দ্র রায়, 'চঞ্চল', প্রবাসী ১৩২৫ চৈত্র

এখানে প্রতি পাদের স্বরসংখ্যার কোনো মিল পাওয়া যায় না। অথচ প্রতি পাদে মাত্রাসংখ্যা চার, কেবল প্রতি ছত্রের শেষ পাদে তিন-তিন মাত্রা। কাজেই ছন্দ মাত্রাবৃত্ত।

এক্ষণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতি পাদের মাত্রাসংখ্যা এবং প্রতি ছত্রের অন্তর্গত পাদসংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করতে হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতি পাদে চার মাত্রা, পাঁচ মাত্রা, ছয় মাত্রা এবং তিন-চার কিংবা চার তিনের মিশ্রণে সাত মাত্রা করে থাকতে পারে। সুতরাং এ দিক্ থেকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে চতুর্মাত্রপাদ, পঞ্চমাত্রপাদ, ষণ্মাত্রপাদ এবং সপ্তমাত্রপাদ, এই চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রতি পাদের অন্তর্গত এই মাত্রাসংখ্যার দ্বারাই এ ছন্দের ভিতরের গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার প্রতি ছত্রের অন্তর্গত পাদসংখ্যার দিক্ থেকে এ ছন্দকে দ্বিপদী ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি নাম দেওয়া যেতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগ ছন্দের বহির্গঠনকে নিয়মিত করে। অনেক সময় এ ছন্দের শেষ একটি পাদ এক, দুই, তিন, চার, এমন কি পাঁচ মাত্রার অভাবে অপূর্ণ থাকতে পারে। সে স্থলে এ ছন্দকে অপূর্ণ দ্বিপদী, অপূর্ণ ত্রিপদী প্রভৃতি নাম দেওয়া যাবে।

১। চতুর্মাত্রক বা চতুর্মাত্রপাদ—

অপূর্ণ চৌপদী (বাংলা পজ্ঝটিকা)

খুলে যায় | মুহু আজ | অন্তর | -দৃষ্টি।
অবচন একি শ্লোক। অপরূপ সৃষ্টি।
সাম্যের একি সাম। পূত হল চিত্ত।
নিত্যের ইঙ্গিত এ মিলন-তীর্থ।
টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা,
জয়তু যমুনা জয়। জয় জয় গঙ্গা।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষের গান', যুক্তবেণী

২। পঞ্চমাত্রক বা পঞ্চমাত্রপাদ—

নন্দপুর | -চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার।
বহে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার ॥
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কল-কণ্ঠসুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

—কালিদাস রায়, 'পর্ণপুট', বৃন্দাবন অন্ধকার

৩। ষণ্মাত্রক বা ষণ্মাত্রপাদ—

মেঘদুর্দিন | দুর্যোগে আজি | গর্জিছে বারি | -ধার।
সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ, শঙ্কিল চারি ধার॥
যে থাকে যেথায়, আজিকে সেথায় মিলিতে সবাই হবে।
বিশ্বনাথের ডঙ্কা বেজেছে মেঘভৈরব রবে॥

—যতীন্দ্রমোহন, 'নাগকেশর', রথযাত্রা

৪। সপ্তমাত্রক বা সপ্তমাত্রপাদ—

(ক) তিন-চারের মিশ্র

আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ | শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কারা যেন চাহিয়া অনিমিখে।
ওই ধূ ধূ ধূ হোমশিখা জ্বলিল ভারতে রে,—
ললাটে জয়টীকা প্রসূন-হার গলে, চলে রে বীর চলে।
সে কারা নহে কারা, যেখানে ভৈরব রুদ্র-শিখা জ্বলে॥

—নজরুল, 'বিষের বাঁশী', বন্দীবন্দনা

(খ) চার-তিনের মিশ্র

সংগ্রামে আজি যে | দুন্দুভি বাজিছে,
প্রাণদান করিতে সত্যই রাজি কে?
নির্ভীক হৃদয়ে দুঃখে না ডরিয়া
গৌরব নিবি কে মৃত্যুরে বরিয়া?
কে জ্বালিবি তিমিরে মুক্তার দীপ্তি
ভেদ করি যত না মিথ্যার শুক্তি?
কে ধরিবি বুকেতে দীন-অসহায়রে?
আয় ছুটে আজিকে, আয় ছুটে আয় রে॥

—লেখক

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পংক্তির সমাবেশে বাংলা কবিতায় সর্বদাই বহু ছন্দোবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অনাবশ্যক। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতা

দেখা যায় না। তথাপি এই ছন্দেও যে মুক্তবন্ধ কবিতা রচনা করা যায় তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বাংলার উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী'-নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

এ স্থলে আর-একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদিও বাংলার স্বরবর্ণগুলো বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারিত হয় না, তথাপি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মাঝে মাঝে (প্রায়ই সংগীতে) সংস্কৃত উচ্চারণরীতি অবলম্বন করেও কবিতা রচনা করা হয়। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১। ষণ্মাত্রপাদ—

দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্দ্রিত তব | ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই।
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সবজন-পশ্চাতে,—
লউক বিশ্ব-কর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', স্বদেশ ১৬

২। সপ্তমাত্রপাদ—

এস মঙ্গল, | এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য-সৌরভ,
এস তেজঃ-সূর্য-উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে।
বীর-ধর্মে পুণ্য কর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ, বাজ হে।
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বী-রাজ হে॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', স্বদেশ ১৭

৩। অষ্টমাত্রপাদ—

(ক) পতিতোদ্ধারিণি | গঙ্গে !
শ্যাম-বিটপি ঘন | তটবিপ্লাবিনি, | ধূসর-তরঙ্গ-ভঙ্গে !
কত নগনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননি এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে ॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল, ভীষ্ম', চতুর্থ অঙ্ক, 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে'

(খ) 'রে সতি, রে সতি !' | কাঁদিল পশুপতি | পাগল শিব প্রম | -থেশ।
যোগমগন হর তাপস যত দিন, তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥
শবহৃদি আসন, শ্মশান-বিচরণ, জগত নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক, বিষধর, তিরপিত অন্তর, আশ্রম রতি নিরবাণে ॥

—হেমচন্দ্র, 'দশমহাবিদ্যা', মহাদেবের বিলাপ

অনেক সময় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংস্কৃত উচ্চারণ ও বাংলা উচ্চারণ যথেচ্ছভাবে মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু এরকম যথেচ্ছ উচ্চারণ সংগীতে দোষাবহ না হলেও সাধারণ কবিতায় দোষাবহ বটে।—

জ্যোৎস্নাহসিত | নী-ল আকাশে | যখন বিহগ গা-হে,
স্নিগ্ধ সমীরে | শিহরে ধরণী | মুগ্ধ নয়নে | চা-হে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল 'চন্দ্রগুপ্ত', তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, 'যখন সঘন গগন গরজে'

এখানে হাইফেন-চিহ্নিত স্থান-তিনটিতে সংস্কৃত নিয়মে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত কবিতায় অতি বিরল।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ সহজ নয়। কেননা, বাংলার কবিগণ শত শত বৎসর ধরে এ ছন্দে কবিতা লিখে আসছেন এবং তার ফলে এ ছন্দে অসংখ্য ও অদ্ভুত অদ্ভুত রূপবৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। কবিরা নিজের ইচ্ছামতোই কোথাও এক অক্ষর বেশি বা কোথাও এক অক্ষর কম ব্যবহার করেই মনে করেছেন এই একটি নূতন ছন্দ হয়ে গেল এবং নিজ কল্পনা

থেকে এর একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়ে ফেলেছেন। এমনি করে এ ছন্দের অসংখ্য প্রকারভেদ ও অসংখ্য নামের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ নিছক খামখেয়ালি বই আর কিছুই নয়। তা ছাড়া, অক্ষরবৃত্তের নামে অনেক কবিতা চলে আসছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো অক্ষরবৃত্তের এলাকায় পড়ে না। আসলে সেগুলোর ধ্বনি ও গতিভঙ্গি মাত্রাবৃত্তের ন্যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এ ছন্দে নানারকম অদ্ভুত প্রকারভেদ দেখা দিচ্ছিল। বোধ করি অবশেষে রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে এ ছন্দ তার স্বরূপ প্রকাশ করতে পেরেছে। তিনি এর কতকগুলোকে অক্ষরবৃত্তের এলাকাতেই রেখেছেন, আর কতকগুলোকে মাত্রাবৃত্তের অধিকারের মধ্যে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদ্‌ভাবক।

পূর্ব কবিদের খামখেয়ালির একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে।
তার তেজে বালি তাতে পদে নাহি সয় হে ॥[১]

—লালমোহন, 'কাব্যনির্ণয়', নবম সং-১৩৪২, পৃ ১১৪

এখানে যদি প্রতি ছত্রের শেষ অক্ষরটা না থাকত, তা হলেই এ ছন্দটা হত 'পয়ার'। কিন্তু যেহেতু শেষে একটি 'হে' যোগ করে দেওয়া হয়েছে, সেজন্যে এইটে আর পয়ার রইল না, সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে তার নাম হল 'মালতী' ছন্দ। কিন্তু এই মালতীর আগে যদি আর দুটো অক্ষর বসানো যায়, তা হলেই এ ছন্দ হয়ে যাবে 'মালতীলতা'! যথা—

তুমি আপনার দোষ কভু! দেখিতে না পাও হে।
দেখি, পাইলে পরের দোষ শত মুখে গাও হে ॥

—লেখক (সম্ভবতঃ)

যা হক, এসমস্ত খামখেয়ালির বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই। সুতরাং প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ ও 'কুসুমমালিকা', 'চম্পক', 'মালঝাঁপ'

১ 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থের পাঠের সঙ্গে এই পাঠের কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সম্ভবতঃ লেখককৃত। প্রবন্ধ রচনাকালে লেখকের হাতের কাছে ছিল এই গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ (১৩১৮ শ্রাবণ)।

প্রভৃতি কাল্পনিক নাম ছেড়ে দিয়ে সাধারণভাবে আধুনিক ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করব।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পাদবিন্যাস সাধারণতঃ স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের মতো একভাবেই চলে না। এর পাদবিন্যাসের অনেক বৈচিত্র্য আছে। সুতরাং আমাদের পূর্বপ্রণালী অনুসারে এ ছন্দকে চতুরক্ষর পাদ, অষ্টাক্ষরপাদ প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত না করে একেবারেই দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা সমীচীন মনে করি। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পাদের অক্ষরসংখ্যা দিয়ে গেলেই প্রত্যেক ধারার বিশিষ্ট স্বরূপটি চোখে পড়বে।—

১। দ্বিপদী (৬+৫)

ষড়ক্ষরপাদ, অপূর্ণ দ্বিপদী · প্রাচীন নাম 'একাবলি'

ভো নভোমণ্ডল, | বল স্বরূপ,
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ।
এ ভব-ভবনে যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই॥

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, 'সদ্ভাবশতক', আকাশ

২। দ্বিপদী (৬+৬)

ষড়ক্ষরপাদ, পূর্ণ দ্বিপদী . প্রাচীন নাম 'দীর্ঘ একাবলি'

আজি শচীমাতা, | কেন চমকিলে—
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে ?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু নিমু' বলে
দ্বার খুলি মাতা, কেন বাহিরিলে ?

—শিবনাথ শাস্ত্রী, 'পুষ্পমালা', চৈতন্যের সন্ন্যাস

৩। দ্বিপদী (৮+৬)

অষ্টাক্ষরপাদ, অপূর্ণ দ্বিপদী, প্রাচীন নাম 'পয়ার'

সাত কোটি সন্তানেরে, | হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি।

—রবীন্দ্রনাথ, 'চৈতালি', বঙ্গমাতা

৪। দ্বিপদী (৮+৮)

অষ্টাক্ষরপাদ, পূর্ণ দ্বিপদী

যেই দিন ও চরণে | ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি-অশ্রু সেই দিন কবিযাছি বিসর্জন।…
হাসিবাব কাঁদিবাব অবসর নাহি আব,
দুখিনী জনমভূমি, মা আমাব, মা আমার॥

—কামিনী বায, 'আলো-ছাযা', মা আমার

৫। দ্বিপদী (৮+১০)

হে নিস্তব্ধ গিবিবাজ, | অভ্রভেদী তোমাব সংগীত
তবঙ্গিয়া চলিযাছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্ববিত
প্রভাতেব দ্বাব হতে সন্ধ্যাব পশ্চিম নীড় পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীব সন্ধানে।

—ববীন্দ্রনাথ 'উৎসর্গ', ২৪

৬। দ্বিপদী (১০+১০)

দশাক্ষবপাদ, পূর্ণ দ্বিপদী

অনাথ ছেলেবে কোলে নিবি, | জননীরা আয তোবা সব;
মাতৃহাবা মা যদি না পায তবে আজ কিসেব উৎসব?
দ্বাবে যদি থাকে দাঁড়াইযা, ম্লানমুখে বিষাদে বিবস,—
তবে মিছে সহকাব শাখা, তবে মিছে মঙ্গলকলস॥

—রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল', কাঙালিনী

৭। ত্রিপদী (৪+৪+৬)

দেখ দ্বিজ | মনসিজ | জিনিযা মূবতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পবশযে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল-আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিযাছে শোভা॥[১]

—কাশীরাম দাস, 'মহাভাবত', আদি পর্ব

১ এই পাঠ বহুলাংশে জযগোপাল তর্কালঙ্কার-কর্তৃক পবিমার্জিত। দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ১৩ (১৩৪৯ পৌষ), পৃ ৫ এবং ১৭।

এর প্রাচীন নাম 'তরল পয়ার'। আসলে এ ছন্দ পয়ারই, তফাত এই যে, একেবারে আট অক্ষরের পরে যতি না পড়ে এখানে প্রতি ছত্রেই প্রথম চার অক্ষরের পর আর-একটা অতিরিক্ত যতি পড়েছে। অর্থাৎ পয়ারের প্রথম পদটাকে ভেঙে দুটো করা হয়েছে।

৮। ত্রিপদী (৬+৬+৮)

কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্বকিন্নর যক্ষবিদ্যাধর অপ্সরাগণের বাস ॥

—ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', কৈলাসবর্ণন

প্রাচীন নাম 'লঘু ত্রিপদী'। এরকম ত্রিপদী অক্ষরবৃত্তের চাইতে মাত্রাবৃত্তেই সুন্দর হয়।

৯। ত্রিপদী (৮+৬+৬)

একদা তুলসীদাস | জাহ্নবীর তীরে | নির্জন শ্মশানে।
সন্ধ্যায় আপন মনে একা একা ফিরে মাতি নিজ গানে ॥

—রবীন্দ্রনাথ 'কথা', স্বামীলাভ

লঘু ত্রিপদীর পদগুলোকে উল্‌টিয়ে নিলে অথবা পয়ারের সঙ্গে ছয় অক্ষর যোগ করে দিলেই এ ছন্দ পাওয়া যায়।

১০। ত্রিপদী (৮+৮+৬)

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'কথা', স্পর্শমণি

১১। ত্রিপদী (৮+৮+১০)

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজী হেরিলা এক দিন।
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'কথা' প্রতিনিধি

১২। ত্রিপদী (৮+১০+৬)

চাব না পশ্চাতে মোরা, | মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, |
হেরিব না দিক্।
গনিব না দিন ক্ষণ, কবিব না বিতর্ক বিচাব,
উদ্দাম পথিক ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', বর্ষশেষ

১৩। ত্রিপদী (৮+১০+১০)

মোরে কব সভাকবি | ধ্যানমৌন তোমার সভায়, |
হে শর্ববী, হে অবগুন্ঠিতা।
তোমাব আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহাবা
বিবচিব তাহাদেব গীতা ॥

—রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা', বাত্রি

১৪। চৌপদী (৬+৬+৬+৫)

ষডক্ষবপাদ, অপূর্ণ চৌপদী

চিরসুখী জন | ভ্রমে কি কখন |
ব্যথিতবেদন | বুঝিতে পাবে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যাবে ॥

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদাব 'সদ্‌ভাবশতক, সুখী দুঃখীব দুঃখ বুঝে না

১৫। চৌপদী (৮+৮+৮+৬)

অষ্টাক্ষবপাদ, অপূর্ণ চৌপদী

অর্ধেক জীবন খুঁজি | কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি |
স্পর্শ লভেছিল যাব | এক পল ভর,
বাকি অর্ধ-ভগ্ন প্রাণ আবাব কবিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', পরশপাথর

১৬। চৌপদী (১২+১২+১২+৩)

"প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি",—
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ
-নিন'দে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কথা', শ্রেষ্ঠভিক্ষা

এ ছন্দকেই 'দীর্ঘ চৌপদী' বলা উচিত। কেননা এর প্রথম তিন পদেব মধ্যস্থলে একটি করে যতি আছে। আসলে তিনটি দ্বিপদী ছত্র ও একটি অপূর্ণ পদ নিয়ে এ ছন্দ রচিত হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটা প্রকারভেদই দেখানো গেল। এ ছন্দের আরও অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। বাহুল্যভয়ে আর দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না। এ ছন্দের উদ্ধৃত নমুনাগুলো থেকেই পাঠক অনায়াসে বাকি প্রকারভেদগুলোর শ্রেণীবিভাগ ও নাম অনুমান করে নিতে পারবেন। যা হক, উক্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পাদে চার, ছয়, আট এবং দশটি করে অক্ষর থাকতে পারে। অন্য কোনো-সংখ্যক অক্ষর নিয়ে এ ছন্দে পদ রচনা করতে গেলে পদগুলো খোঁড়া হয়ে যাবে। জীবমাত্রেরই দুই, চার, ছয়, আট প্রভৃতি জোড়-সংখ্যক পা আছে বলেই তারা চলতে পারে, বিজোড়-সংখ্যক পা নিয়ে খোঁড়াতে হয়। এ ছন্দেরও তাই। তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি-সংখ্যক অক্ষরে এ ছন্দ চলতেই পারে না।

এই বিশেষ প্রকৃতিটি বজায় রেখে অক্ষরবৃত্তে দুটি উপায়ে অতি স্বাধীনভাবে কবিতা রচনা করা যায়— একটি 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ, আর-একটি 'মুক্তবন্ধ' ছন্দ। সকলেই জানে চোদ্দোর পরে মিল না দেওয়াটাই অমিত্রাক্ষরের বিশেষত্ব নয়। "মহাভারতের কথা সমান অমৃত" লিখলেই মহাভারত অমিত্রাক্ষর হয়ে যেত না। আসলে প্রতি ছত্রের পরে মিল থাক বা না থাক, যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য। নানা ভঙ্গিতে চার, ছয়, আট, দশ অক্ষরের পরে যতিস্থাপনেই অর্থাৎ এ ছন্দের পাদগুলোকে বহু বিভিন্ন পরিমাণের করাতেই এর গাম্ভীর্যগরিমা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রতি ছত্রে চোদ্দো অক্ষর রাখা কিংবা চোদ্দোর পরে মিল না দেওয়াটা অবান্তর মাত্র।

সুতবাং এ দুটো অনাবশ্যক বাঁধাবাঁধিকে না মেনে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে কবিতা রচনা কবা যায তাকেই 'মুক্তবন্ধ' ছন্দ বলা যায়। মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতি ছত্রে দুই থেকে দশ পর্যন্ত যে কোনো জোড সংখ্যক অক্ষববিশিষ্ট একটি বা দুটি পাদ থাকে, এই তাব বিশেষত্ব। ছত্রেব শেষেব দিকের মিলগুলো কবিব ইচ্ছামতো নিযন্ত্রিত হয। ববীন্দ্রনাথেব 'বলাকা'র কতকগুলো কবিতাই মুক্তবন্ধ অক্ষববৃত্তেব সর্বপ্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

যে ঐশ্বর্যশালী অহোরাত্র ঐশ্বর্যেব হাওযাতে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হযে ওঠে, সে তাব সহজলব্ধ সম্পদেব প্রাচুর্য সহজে উপলব্ধি কবতে পারে না। বাংলাব মতো নদীমাতৃক দেশে যাদেব জীবন পবিপুষ্ট তাবা বাংলাব নদীগুলির প্রকৃত মাধুর্য সজাগভাবে অনুভব কবে না, কিন্তু অলক্ষে তাদেব মধুধাবাতেই বাঙালিব জীবন মধুময হযে ওঠে। তেমনি বাংলা কাব্যেব ক্ষেত্রেও ছন্দেব গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন ধাবা কেমন কবে বাঙালিব জীবনকে সবস ও সতেজ কবে তুলছে, বসমুগ্ধ বাঙালি সহজে তা অনুভব কবতে পারে না। কিন্তু যখন চোখ খুলে বিভিন্ন দেশেব ছন্দেব ক্ষীণ ধারাগুলোব দিকে দৃষ্টিপাত করা যায, তখন নিজেব মাতৃভাষাব এই অপূর্ব সম্পদ্ দেখে হৃদয় গৌববে পূর্ণ হযে ওঠে। কোন্ ভাবায ছন্দেব এমন তিনটি বিশাল ধাবা আছে, আব কোন্ ভাষায এক ধাবা থেকে বহু ধারা নির্গত হযে সমগ্র কাব্যক্ষেত্রকে এমন শ্যামল ও সুশীতল কবে তুলেছে, তা তো জানি নে। জানি এই যে, বাংলা ভাষার ছন্দেব ভাণ্ডাব বিক্ত নয, তাতে অপবিমেয ধনবত্নবাশি স্তবে স্তবে সজ্জিত হযে আছে এবং নিঃস্ব যে বাঙালি, সে-ই আজ তাব অধিকাবী। এইটেই আমাদেব গৌবব।*

* প্রবাসী ১৩৩০ বৈশাখ

বাংলা ছন্দ ও সংগীত

(গানের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সাদৃশ্য কোথায় ও পার্থক্য কোথায় সে বিষয়ে একটু আলোচনা করব। সকলেই জানেন যে, (যদিও কাব্য ও সংগীতের মধ্যে ভাবগত পার্থক্য অপরিসীম, তথাপি তাদের মধ্যে কোথাও একটু যোগ যেন রয়ে গেছে। কাব্যজগতের দিক্‌চক্রবাল যেখানটিতে নিজেকে নিজে অতিক্রম করে গিয়ে অনন্তকে স্পর্শ করেছে ঠিক সেখানটিতেই সংগীত-লোক শুরু হয়ে অনন্ত ভাবজগতে প্রসারিত হয়ে গেছে। কাব্যের শক্তির যেখানটিতে শেষ সীমা, সেখানটিতেই সে সংগীতরাজ্যের পরিধিতে সংলগ্ন হয়ে আছে; কিন্তু কিছুতেই সে ওই পরিধির ভিতরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না।) কাব্যশক্তির লক্ষণই হচ্ছে এই যে, কাব্য প্রধানতঃ বাক্ ও অর্থের সাহায্যে প্রথমে মানসলোকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরে ওই মনোজগতের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিজাত অনন্ত রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে রূপের অতীত অসীম সৌন্দর্যলোকের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে। সেখানটিতেই আমাদের মন কাব্যের বচনকে অতিক্রম করে গিয়ে কাব্যের অনির্বচনীয়তাকে স্পর্শ ক'রে অগাধ আনন্দের মধ্যে মগ্ন হয়ে সার্থকতা লাভ করে, আর সেখানটিতেই কাব্যের ধ্বনি এবং ছন্দও হিসাবের রাজ্যকে অতিক্রম ক'রে কেবলি সংগীতের সুর ও লয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার তীব্র আগ্রহে ও আকুলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সংগীতশক্তির আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া এর প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। সংগীত প্রথমেই কথাকে অতিক্রম করে গিয়ে মনকে অনির্বচনীয়তার নিবিড় আনন্দস্পর্শে সাফল্য দান করে; পরে কথার ও ভাবের রাজ্যসীমায় এসে পৌঁছে কথা ও ভাবকে অনির্বচনীয়তা ও অনন্তের মহিমায় স্পন্দিত করে তোলে এবং কথাকে চিরন্তনতা ও অসীমের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অমরতা দান করে। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—কাব্যের গতি কথা, ভাব এবং রূপের থেকে অনন্ত, অরূপ ও অনির্বচনীয়তার আনন্দজগতের দিকে; কাব্যের গতি সীমা ও বহুত্বের জগৎ থেকে অনন্ত অনির্বচনীয়তার দিকে আরোহণ। কিন্তু সংগীত অনন্ত

অনির্বচনীয়তার আনন্দজগৎ থেকে সীমা ও রূপের জগৎকে ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করতে থাকে; সংগীতের গতি কথা ও রূপের জগৎকে অরূপ ও অনির্বচনীয়তার দিকে উৎকর্ষণ। কাব্য চায় সংগীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে সার্থকতা লাভ করতে, আর সংগীত চায় কাব্যকে আপন অন্তরের অনির্বচনীয় আনন্দে মণ্ডিত করে সার্থকতা দান করতে। এই নিগূঢ় সত্যটিকে আপনার কবিচিত্তে উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
> ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
>
> —রবীন্দ্রনাথ, 'উৎসর্গ', ১৭

সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক্ থেকে কাব্য ও সংগীতের অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্যের আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। আমাদের উদ্দেশ্য বাহ্য গঠনের দিক্ থেকে কাব্য ও সংগীতের রচনাপ্রণালীর সাদৃশ্য ও পার্থক্যের আলোচনা করা। কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোন্ ঐক্যভূমিতে পরস্পরের সাযুজ্য লাভ করেছে, আমরা সেইটেই দেখাতে চেষ্টা করব। প্রথমেই মনে রাখতে হবে গানেই হক বা কাব্যেই হক, ছন্দ কোনোটারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। গান এবং কাব্য, উভয়ত্রই ছন্দ গৌণ; মুখ্য-উদ্দেশ্যরূপ সৌন্দর্যসৃষ্টির সে সহায়ক বা বাহন মাত্র। কিন্তু যেহেতু কোনো একটি সীমারেখায় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থেকেও কাব্য ও সংগীত স্বরূপতঃ সৌন্দর্যলোকের দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে যায়, সেজন্যে তাদের বাহন ছন্দগুলোও কোনো একটি সামান্যক্ষেত্রে পরস্পর মিলিত হয়েও দুটি বিভিন্ন পথেই আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

কাব্যে ছন্দের উদ্দেশ্য কাব্যের কথা ও ভাবকে সৌন্দর্যসুষমায় মণ্ডিত করে কথা ও রূপকে অনির্বচনীয়তা ও অরূপের মধ্যে মুক্তি দেওয়া। গানে ছন্দের উদ্দেশ্য গানের অরূপ নিবিড় আনন্দরসকে কথার মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে মনের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কাব্যের ছন্দের কারবার প্রধানতঃ কথাকে নিয়ে, কিন্তু কথার অতীত অরূপ অসীমের দিকে তার ব্যঞ্জনা। গানের ছন্দের উদ্দেশ্য কথার অতীতকে আভাসে ইঙ্গিতে মনের গোচরে ফুটিয়ে তোলা; কথার অতীতকে কথার মধ্যেই মূর্তি দান করা তার সাধনা। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, যেহেতু কথার অতীত সুরকে

ফুটিয়ে তোলাই গানের ছন্দের প্রতিজ্ঞা, সেজন্যেই গানের ছন্দের সাধনা কাব্যের ছন্দের চাইতে অনেকাংশে বৃহত্তর ও মহত্তর। কথাকে একটা বিশেষ ভাবে দুলিয়ে দিয়ে তার ভিতরকার ভাবকে ঝংকৃত করে অনির্বচনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে দেওয়াই কাব্যছন্দের কাজ। কিন্তু গানের ছন্দকে সুরের সূক্ষ্মতম ধ্বনিস্পন্দনকেও যথাযথরূপে মুক্তি দিয়ে অথচ আকৃষ্ট করে মনের পরিধির মধ্যে এনে পৌঁছিয়ে দিতে হয়। সুতরাং গানের ছন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। সংগীতের সুরের যথার্থ স্বরূপটিকে বিশ্লেষণের বা হিসাবের সীমার মধ্যে আনা অসম্ভব বললেও হয়। কিন্তু কাব্যের ছন্দে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। যদিও কাব্যে ছন্দ ধ্বনিকে নব নব বিচিত্র উপায়ে তরঙ্গিত ক'রে এবং ভাবকে ওই ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে লীলায়িত ক'রে মনের স্তরে স্তরে স্পন্দিত করে তোলে, তথাপি ভাব বা বাগর্থই মুখ্য, ছন্দ বা বাগর্থের বাহন ধ্বনির নিয়ন্ত্রণরীতি গৌণ। কথাকে নাড়া দিয়ে তার ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই কাব্যছন্দের উদ্দেশ্য এবং এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তার সার্থকতার অবসান। কাজেই কাব্যে ধ্বনির নিয়ামক ছন্দশাস্ত্রের পরিধি সংকীর্ণ। ধ্বনিলীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্ত প্রক্রিয়াকে কান তথা মনের গোচর করা কাব্যছন্দের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ছন্দের পরিধি আর ধ্বনিলীলার পরিধি সমায়তন। ধ্বনিলীলার সূক্ষ্মতম থেকে সর্বপ্রকার প্রকাশকে ফুটিয়ে তোলাতেই গানের ছন্দের সার্থকতা। সুতরাং গানের ক্ষেত্রে ছন্দশাস্ত্র ও ধ্বনিশাস্ত্র সমপরিসর এবং সেজন্যেই গীতছন্দের বিকাশভঙ্গি এত বিচিত্র ও অফুরন্ত।

গীতছন্দের এই অফুরন্ত বিকাশভঙ্গির আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সূক্ষ্মতার দিক্ দিয়ে গানের ছন্দ কাব্যছন্দকে প্রথম সোপানেই ছাড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু এই প্রথম সোপানটিতেই একটি অতি ক্ষুদ্রপরিসর সামান্য-ভূমিতে এই দুই ছন্দ পরস্পরের সাযুজ্য লাভ করে। অথচ ঐ ক্ষুদ্র ভূমিটুকুর মধ্যেও ওই দুই ছন্দের গতিলীলা কত বিভিন্ন দিকে, তাই দেখাতে চেষ্টা করব। গানের ছন্দ সুরের ক্ষীণতম ও সূক্ষ্মতম আবেগকেও ফুটিয়ে তুলতে চায়, সেইজন্য গীতছন্দের বিভাগ-উপবিভাগ অনেক এবং তার পারিভাষিক সংজ্ঞাও অল্প নয়। কাব্যছন্দের উদ্দেশ্য অত ব্যাপক ও গভীর নয় বলে তার বিভাগ ও পারিভাষিক শব্দ গীতছন্দের তুলনায় অনেক কম। তথাপি

পরস্পরের আংশিক সাদৃশ্যহেতু উভয় শাস্ত্রেই কতকগুলো সামান্য পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়। আমরা এ শব্দগুলির সংজ্ঞানির্দেশ এবং উক্ত দুই শাস্ত্রে এদের অর্থগত তারতম্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেই কাব্যছন্দ ও গীতছন্দের আলোচনায় নিবৃত্ত হব।

কাব্য ও সংগীত উভয় ক্ষেত্রেই মাত্রা, লয়, যতি ও তাল, এ কয়টা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়। আমরা একে একে এ কয়টা পরিভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

মাত্রা ও লয়

১

প্রথমেই মাত্রার কথা বলা প্রয়োজন। কবিতার ক্ষেত্রে মাত্রা শব্দটি খুবই সাধারণ বা স্থূল ভাবে ব্যবহৃত হয়। কবিতায় মাত্রার খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে মাত্রার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিলার্ধ-ব্যতিক্রমেও গানের সুরের ধারা বাধা পায়, কাজেই রসভঙ্গ হয়। কবিতার ছন্দেও ধ্বনির কালপরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে মাত্রার হিসাব রাখতে হয়। কিন্তু তদুপরি কবিতায় স্থায়িত্বভেদে মাত্রার কোনো প্রকারভেদ নেই। কবিতার সব মাত্রাই একজাতীয় ও সমান স্থায়ী। কিন্তু গানে সব মাত্রা সমানভাবে চলে না, তার গতির বিচিত্র ভঙ্গি ও লীলা আছে। সুতরাং কবিতার মাত্রা একঘেয়ে ও একরঙা। গানের মাত্রার স্বরূপ বিচিত্র। সেইজন্যেই কবিতা গানের তুলনায় অনেকটা একঘেয়ে শুনতে হয়। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরও দুএকটি কথা আলোচনা করব। এখন গানের মাত্রা ও কবিতার মাত্রার পার্থক্যটি বিশদ করতে চেষ্টা করব।

কবিতার মাত্রা থেকে গানের মাত্রা দুটো বিশিষ্ট উপায়ে পার্থক্য লাভ ক'রে আভিজাত্য- ও শ্রী -সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

প্রথমতঃ, কবিতায় অক্ষরগুলোর মাত্রার তারতম্য বিশেষ নেই, সবগুলো অক্ষরই প্রায় সমমাত্রায় একভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলে। আমরা আগেই দেখেছি কবিতার অক্ষরগুলো হয় একমাত্রক, নয় দ্বিমাত্রক হবে। অন্যথা হবার জো নেই।

॥ ॥
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,—
॥
তুমি বিচিত্র-রূপিণী।

— রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রা', চিত্রা

এখানে কেবল চিহ্নিত অক্ষরগুলো দ্বিমাত্রক, বাকি সবগুলো একমাত্রক। সর্বত্রই এই রকম। কবিতায় কোনো বর্ণেব দুইএর অধিক বা একের কম মাত্রা থাকে না। কিন্তু গানে এক-একটি বর্ণ ত্রিমাত্রক, চতুর্মাত্রক প্রভৃতি বহুমাত্রক তো হতে পারেই, আবার অন্য দিকে এক-একটি বর্ণ অর্ধমাত্রক, সিকিমাত্রক প্রভৃতি অনেক প্রকার ভগ্নমাত্রকও হতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই মাত্রাবৈচিত্র্যেব ফলে ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত) তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। মধ্যে মধ্যে দ্বিমাত্রক বর্ণের অস্তিত্বহেতুই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও-রকম গতিভঙ্গিতে দুলে উঠতে পারে, নতুবা এ ছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পডত। উপরের পদ্যাংশটি পডলেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে, শুধু তিনটি গুরু স্বরের প্রভাবেই এ ছন্দের সুরটা কেমন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। ঠিক এই কারণেই গানেব সুরপ্রবাহ এমন বিচিত্র উপায়ে নৃত্যপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কবিতায় কোন্ বর্ণ গুরু এবং কোন্ বর্ণ লঘু হবে তা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট থাকে বলে ছন্দরচয়িতার স্বাধীনতা কম, কেবল লঘুগুরু বর্ণের সন্নিবেশকৌশলেব উপরেই তাঁর কৃতিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু গানে মাত্রাপরিমাণ নির্দেশ করা সম্বন্ধে সুররচয়িতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তা ছাড়া, তাঁর স্বাধীনতার ক্ষেত্রের পরিসরও খুব বেশি; তিনি সিকিমাত্রা বা তার নীচু থেকে চার মাত্রা বা তার ঊর্ধ্বেও বিচরণ করতে পারেন। কিন্তু কাব্যছন্দ-রচয়িতার শুধু একমাত্রক এবং দ্বিমাত্রক বর্ণ নিয়েই কারবার, সুতরাং তাঁর বিচরণভূমি অতি সংকীর্ণ। কবিতায় একটি বর্ণ এক মাত্রার কম বা দুই মাত্রার বেশি হতে পারে না। কিন্তু গানে একটি বর্ণ সিকিমাত্রক থেকে বহুমাত্রক হতে পারে। সেইজন্যই গানের গতিবৈচিত্র্য কবিতার চাইতে ঢের বেশি। যেখানে কয়েকটি সিকিমাত্রক বর্ণ একত্র হয় সেখানে গানের ধ্বনিপ্রবাহ অত্যন্ত খরগতি; যেখানে এক-একটি বর্ণের পরিমাণ অর্ধমাত্রা সেখানকার গতি অনেকটা মন্থর; আবার যেখানে এক-একটি বর্ণই বহুমাত্রাব্যাপী সেখানে

স্বরের গতি খুব ধীর এবং গম্ভীর। এইরূপে মাত্রাবৈচিত্র্যে স্বরের গতিবেগ অতি অদ্ভুত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যে-কোনো একটি গানের গতির প্রতি লক্ষ রাখলেই গানের মাত্রাবৈচিত্র্যের এই অসীম শক্তি ধরা পড়বে। গানে মাত্রাবৈচিত্র্যের আর-একটি গৌণ ফল প্রতি পাদের অন্তর্গত অক্ষরসংখ্যার অসমতা। আমরা পূর্বেই দেখেছি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পাদের অক্ষরসংখ্যা খুবই অনিয়মিত; গুরুস্বরের আধিক্য বা অল্পতা হেতু অক্ষরসংখ্যা কমে কিংবা বাড়ে। যেমন—

॥ ॥
স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', বর্ষামঙ্গল

এখানে প্রথম ছত্রে দুটো গুরুস্বর অক্ষরসংখ্যা কমিয়ে তেরো করেছে; দ্বিতীয় ছত্রে ও-রকম গুরুস্বর নেই বলে অক্ষরসংখ্যা পনেরো। কিন্তু উভয় ছত্রেই মাত্রাসংখ্যা সমান অর্থাৎ পনেরো। গানের এক পাদের সঙ্গে আর-এক পাদের অক্ষরসংখ্যার পার্থক্য আরও অনেক বেশি হতে পারে। যেখানে ভগ্নমাত্রক বা অল্পমাত্রক বর্ণ বেশি সেখানে অক্ষরসংখ্যাও বেশি। পক্ষান্তরে বহুমাত্রক বর্ণের আধিক্যে অক্ষরসংখ্যা অনেক কমে যায়।

এই তো গেল গানে মাত্রার গুণনবিষয়ক বা ভগ্নাংশবিষয়ক প্রকারভেদ। দ্বিতীয় প্রকারভেদ হচ্ছে মাত্রার স্থায়িত্ব নিয়ে। প্রথমেই মাত্রার সংজ্ঞানির্দেশ করার সময়ে বলা হয়েছে যে, কালের দিক্ দিয়ে ধ্বনিপরিমাণের একক বা unitকে 'মাত্রা' বলা হয়। একটি লঘুস্বর বা লঘুস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ (যথা অ, ই, ক, খ) উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে, সে সময়পরিমাণকে একমাত্রা বলে অভিহিত করেছি। মাত্রার এ সংজ্ঞা কাব্য ও সংগীত উভয়ত্রই সমভাবে খাটে। এই একমাত্রা-কালের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণকে দুই মাত্রা বা তিন মাত্রা এবং তার অর্ধেক বা সিকি-পরিমাণ কালকে অর্ধমাত্রা বা সিকি মাত্রা বলব। গানে দেড় মাত্রা প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে। কিন্তু গানে মাত্রাপরিমাণের আরও সূক্ষ্ম বিচার করা প্রয়োজন।

একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে এক মাত্রা বা মাত্রার একক বলে অভিহিত করেছি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই মনে সংশয়

জাগবে, এ সংজ্ঞা ঠিক হল কি না। কেননা, একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে কত সময় লাগবে তার তো কোনো স্থিরতা নেই। বস্তুতঃ ওই সংজ্ঞাটি আপেক্ষিক। কারণ, ওটা বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির অথবা একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমি হয়তো এখন রেগে বা অন্য কোনো ব্যস্ততায় খুব দ্রুতগতিতে কথা বলছি, আবার হয়তো অন্য সময়ে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে খুব ধীরে ধীরে কথা বলব। সুতরাং আমার কথার এক মাত্রার সময়পরিমাণের কোনো স্থিরতা নেই। ব্যস্ততার সময়ে এক মাত্রার উচ্চারণে যে সময় লাগে, ধীরতার সময়ে তার পরিমাণ দেড়গুণ কি দ্বিগুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং মাত্রার কোনো নিরপেক্ষ সংজ্ঞা হল না। যদি বলা যায়, বিশেষ ব্যস্ততা বা ধীরতা বাদ দিয়ে স্বভাবতঃ অনুত্তেজিত বা অনবসন্ন অবস্থায় আমার এক বর্ণের উচ্চারণে যে সময় লাগে সেইটেই মাত্রার যথার্থ নিরপেক্ষ পরিমাণ, তথাপি ঠিক হবে না। কারণ, সকল লোকে সমান গতিতে উচ্চারণ করে না; এক বর্ণের উচ্চারণে আমার যে সময় লাগে অন্যের ঠিক সে সময় লাগে না— কারও বেশি লাগে, কারও কম লাগে।

সুতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মাত্রাপরিমাণ নির্ণয়ের উপায় কি? প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে ওটাকে আরও একটু বিশদ করে বুঝিয়ে বলা দরকার, কেননা এর উপরেই কবিতার সঙ্গে সংগীতের একটা প্রধান পার্থক্য নির্ভর করে। মনে কর কেউ একটা গান করছে। এখন গানটির প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন মাত্রাপরিমাণ নির্দেশ করা আছে, কোনোটার সিকি মাত্রা, কোনোটার দেড় দুই তিন বা চার ইত্যাদি। এ স্থলে গায়কের দুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।—

প্রথমতঃ, দেখতে হবে যেন গানের আদ্যন্ত সর্বত্র মাত্রার সমতা রক্ষা হয়; অর্থাৎ গানের প্রথমেই এক মাত্রা যতটুকু কাল স্থায়ী হয়, গানের শেষ পর্যন্ত যেন মাত্রার ওই স্থায়িত্বকালের স্থিরতা বা সমতা (uniformity) রক্ষা হয় এবং ভগ্নমাত্রা ও গুণমাত্রাগুলোর স্থায়িত্বেও যেন এককের স্থায়িত্বের সমানুপাতিক হয়। মাত্রার এই সমতার উপরেই সমগ্র গানটির ধ্বনিপ্রবাহের গতিসাম্য নির্ভর করে। ধ্বনিপ্রবাহের এই গতিসাম্যকেই সংগীতশাস্ত্রে 'লয়' নামে অভিহিত করা হয়। ।ানের গতি যদি সর্বত্র সমান না হয়ে কোথাও দ্রুত সংগীতের সমস্ত মাধুর্যই নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বনির

এই গতিসাম্য বা লয়ই সংগীতের মাধুর্যের মূলকারণ। সুতরাং দেখা গেল যে, প্রতি মাত্রার স্থায়িত্বকাল যথানুপাতে সুনির্দিষ্ট হলেই সমগ্র সংগীতটির লয়ও স্থির হয়ে যায়। এখন আমরা লয়ের এ সংজ্ঞা দিতে পারি যে, সংগীতের আদ্যন্ত সর্বত্র মাত্রার কালপরিমাণের সমতা বা সমানুপাত রক্ষা করাকেই 'লয়' বলে।

দ্বিতীয়তঃ, মাত্রার সমতা রক্ষা হলে লয় ঠিক থাকে বটে, কিন্তু একটি মাত্রা কত ক্ষণ স্থায়ী হবে সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। সংগীত সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন যে, শুধু লয় ঠিক থাকলেই গানের মাধুর্য সম্পূর্ণ রক্ষা হয় না, লয়ের গতিবেগের ক্রমও (rate) নির্দিষ্ট হওয়া দরকার; কোনো গান দ্রুত লয়ে এবং কোনো গান বিলম্বিত লয়ে গীত হলেই ভালো শোনায়। সুতরাং যে গান দ্রুত লয়ে গীত হবে সে গানের মাত্রাও অল্পক্ষণস্থায়ী হবে, আবার বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হলেই মাত্রার স্থায়িত্বকালেরও বৃদ্ধি হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সংগীতে মাত্রার কোনো বাঁধাবাঁধি স্থায়িত্বকাল নির্দিষ্ট নেই, গানভেদে মাত্রাপরিমাণও বিভিন্ন হয়। সংগীতে ধ্বনিপ্রবাহের এই গতিক্রম বা লয় অনেক প্রকার হতে পারে। কোনো গান দ্রুত লয়ে, কোনো গান অতিদ্রুত, বিলম্বিত, অতিবিলম্বিত, ঈষৎ-বিলম্বিত বা মধ্য লয়ে গাওয়া হয়। কিন্তু এ বিশেষণগুলো সবই আপেক্ষিক শব্দ, এগুলো গায়ক বা শ্রোতার শ্রুতিশক্তির উপর নির্ভর করে। আমি যে লয়টিকে দ্রুত মনে করছি, তুমি হয়তো তাকেই মধ্য বা বিলম্বিত মনে করতে পার। সুতরাং গানের লয় বা গতিক্রম বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রুতিরুচির উপরে নির্ভর করে বলে এ লয় ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। যাতে এ ভিন্নতা না হয়ে সর্বত্র লয়ের সমতা রক্ষা হয়, সেজন্যে অনেক সময় 'মাত্রামান' (metronome) -নামক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়। ওই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মাত্রার স্থায়িত্বকাল সুনির্দিষ্ট করা যায়, সুতরাং গানের সর্বত্র গতিসাম্য বা লয় এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে গতিক্রম বা লয়ের প্রকারভেদও স্থির থাকে। এ বিষয়ে আমাদের অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এখন আমরা কবিতায় এই মাত্রা ও লয়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাই দেখতে চেষ্টা করব।*

২

আমরা দেখেছি গানে মাত্রার সমতা (অর্থাৎ ধ্বনির গতিসাম্য) এবং ধ্বনির গতিক্রম গানের লয় ও লয়ের প্রকারভেদকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ওই গতিক্রম বা লয়ের দ্রুততা- ও ধীরতা -ভেদে মাত্রারও স্থায়িত্বকাল পরিবর্তিত হয়। কবিতায় এসমস্ত সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন হয় না। কবিতায় গানের মতো মাত্রার কালপরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া অনাবশ্যক। সংগীতশাস্ত্রে মোটামুটিভাবে এক মাত্রার কালপরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ গানে এক মাত্রা কত ক্ষণ স্থায়ী হবে তার নির্দেশ থাকে। লয় দ্রুত হলে মাত্রা অল্পস্থায়ী হয়, লয় মন্থর হলে মাত্রার স্থিতিকাল বেড়ে যায়। একটি লঘু স্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাই এক মাত্রার পরিমাণ, এটি সাধারণ সংজ্ঞা এবং এ সংজ্ঞা সংগীতে ও কাব্যে সমভাবে খাটে। কিন্তু গানে লয়ভেদে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকাল বাড়তেও পারে, কমতেও পারে; এবং সংগীতশাস্ত্রে মাত্রাপরিমাণের বাড়তি-কমতির সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয়। কিন্তু কাব্যছন্দে তা নয়। কবিতায় ধ্বনির গতিসমতা (অর্থাৎ লয়) এবং গতিক্রমের (অর্থাৎ লয়ভেদের) গণনা করা হয় না; সুতরাং লয়ভেদে কবিতাবিশেষে মাত্রাপরিমাণেরও বাড়তি-কমতি গণ্য হয় না। অর্থাৎ কবিতায় সকল প্রকার ছন্দেই মাত্রাপরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়; সুতরাং এক মাত্রা বলতে যে কতটা কাল বোঝায় তার হিসাব রাখা হয় না। কাজেই কবিতায় মাত্রার সংজ্ঞাটা অনেকটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টই থেকে যায়। একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকালই এক মাত্রা, সে কালটুকুতে কত অনুপল বা পল বোঝায় তার হিসাব রাখা কাব্যের ছন্দে নিষ্প্রয়োজন বলে গণ্য হয়।

কিন্তু তা হলেও গীতছন্দের মাত্রা- ও লয় -সম্পৃক্ত বিশেষত্বগুলোর সহিত কাব্যছন্দের যে কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই তা নয়। কারণ উভয় ছন্দই ধ্বনি এবং ধ্বনিশাস্ত্রকে অবলম্বন করে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করছে। কাজেই এ দুএর মধ্যে খানিকটা সামান্যধর্ম আছে। কাব্যছন্দেও যে সংগীতধর্ম অন্ততঃ অতি অল্পপরিমাণে বিদ্যমান আছে, যে-কোনো একটি কবিতার যথারীতি আবৃত্তি করলেই এ তথ্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু কবিতায় সংগীতের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হলে খুব তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। একটু নিগূঢ়ভাবে দেখলেই কবিতাতেও সংগীতের মাত্রা- ও লয় -সম্পর্কীয় লক্ষণগুলো লক্ষ করা যায়। কিন্তু

কবিতায় এ লক্ষণগুলো স্পষ্ট ব্যক্ত নয়। কারণ পূর্বেই বলেছি গানে ধ্বনির যত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হয়, কবিতায় তত প্রয়োজন হয় না।

প্রথমতঃ, লয়ের কথা। আপাততঃ কবিতায় লয়ের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না এবং কাব্যছন্দ-শাস্ত্রে লয়ের কথা আলোচিতও হয় না বটে, কিন্তু তথাপি যথাযথরূপে কবিতা আবৃত্তি করতে হলে লয় রক্ষা করা আবশ্যক, অর্থাৎ সমগ্র কবিতাটা সমান গতিতে আবৃত্তি করা প্রয়োজন। গানে লয় সম্বন্ধে যতটা সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হয়, কবিতা আবৃত্তি করার সময় ততটা প্রয়াস আবশ্যক হয় না। তবু আবৃত্তি করার সময় যদি প্রতি মাত্রার স্থিতি-াম্য অর্থাৎ লয় ঠিক না থাকে তবে আবৃত্তি সুন্দর হয় না, প্রতি পদেই শ্রুতিকটুতাদোষ ঘটে। সেজন্যে কবিতার ক্ষেত্রে লয় শব্দের ব্যবহার না হলেও আবৃত্তিকারের স্বাভাবিক শ্রুতিরুচির প্রখরতাভেদে লয়ের পার্থক্যহেতু ব্যক্তিভেদে কবিতার আবৃত্তি মধুর বা কটু হয়। শ্রুতিরুচির পুনঃপুনঃ চর্চাদ্বারা লয় রক্ষা করার ক্ষমতা আয়ত্ত হয়ে গেলেই আবৃত্তি মার্জিত ও সুন্দর হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ধ্বনির গতিক্রম বা লয়ভেদের কথা। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সব কবিতাই সমান লয়ে আবৃত্তি করলে ভালো শোনায় না। কোনো কবিতা একটু দ্রুত লয়ে এবং কোনো কবিতা একটু ধীর লয়ে আবৃত্তি করলেই শ্রুতিমধুর হয়। কাজেই দেখা যায় কবিতাতেও ধ্বনির গতিক্রমভেদে লয়ভেদ হয়। যদিও ছন্দশাস্ত্রে এসমস্ত সূক্ষ্ম ভেদের প্রতি কোনো লক্ষ রাখা হয় না এবং ধ্বনির গতিক্রমের কোনো হিসাব রাখা হয় না, তথাপি কবিতাতেও ধ্বনির যে অল্পবিস্তর লীলাবৈচিত্র্য আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ কানই আপন রুচির উপরে নির্ভর ক'রে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে।

তৃতীয়তঃ, মাত্রার কথা। দেখা গেল্ যে, কবিতাভেদে লয়েরও দ্রুততা মন্থরতা প্রভৃতি ভেদ হয়ে থাকে। তাই যদি হয় তবে কবিতাভেদে মাত্রারও স্থিতিকাল পরিবর্তিত হয়। কারণ মাত্রার স্থিতিকালের উপরেই লয়ের গতিক্রম নির্ভর করে। সুতরাং খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে কাব্যছন্দ-শাস্ত্রেও মাত্রার একটা অপরিবর্তনীয় স্থিতিপরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। কবিতাভেদে ও আবৃত্তিকারভেদে মাত্রাপরিমাণ একটু এদিক্-ওদিক্ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। দ্রুত-আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা যত ক্ষণ স্থায়ী হবে, ধীর- আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা তার চেয়ে বেশি স্থায়ী

হবে, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তা হলেও ছন্দশাস্ত্রে মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা গণ্য নয়, গণনা করা অনাবশ্যক। কেননা, কবিতায় লয়ভেদ ও তজ্জনিত মাত্রার পরিবর্তন অতি সামান্য এবং শ্রুতির উপরে তার ক্রিয়াফলও বেশি নয়। তা হলেও শ্রোতা ও পাঠকের অলক্ষে এই মাত্রা ও লয়ের প্রকারভেদ আবৃত্তিকালে কবিতাবিশেষকে মধুর বা কর্কশ করে তোলে। কিন্তু গানে লয়ের গতিবেগ ও মাত্রার এ পরিবর্তনের উপরে গানের প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রুতিমধুরতা খুব বেশি নির্ভর করে এবং এজন্যেই গানে এগুলোর খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়।

এক্ষণে আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টাকে আর-একটু বিশদ করতে চেষ্টা করব। আশা করি দৃষ্টান্তগুলো থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, যদিও কাব্যছন্দের ক্ষেত্রেও ধ্বনির মাধুর্য ও সার্থকতা আসলে স্বরের লয় ও মাত্রার স্থিতিপরিমাণের উপরে অনেকটা নির্ভর করে তথাপি তাদের ক্রিয়াফল কার্যতঃ এতটা অকিঞ্চিৎকর যে ছন্দশাস্ত্রে তাদের হিসাব রাখা অনাবশ্যক।

প্রথমে মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তই দেখা যাক।—

যুগে যুগে | অভিসার |
  করি লঘু | পক্ষে ;
নাই লীলা-দেবতার
  অনিমেষ চক্ষে।
আকাশের দুই তীর
হতে নাহি দিই থির,
টিঁকি নাকো পৃথিবীর
  সীমাঘেরা বক্ষে ॥

আকাশের ফুল মোরা,
  দ্যুতি মোরা দ্যুলোকে ;
স্বপনের ভুল মোরা
  ভুলভরা ভুলোকে।

চরণে হাজার হিয়া
কেঁদে মরে গুমরিয়া,
ধূলি হতে ফুল নিয়া
পরি মোরা অলকে ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'তুলির লিখন', বিদ্যুৎপর্ণা

এটা চতুর্মাত্রক ছন্দের দৃষ্টান্ত। এ ছন্দে ঘন ঘন যতি পড়ে। আর উপরের লাইনগুলি পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দের স্বাভাবিক লয় দ্রুত।

পঞ্চমাত্রক ছন্দের লয়ও দ্রুত বটে, কিন্তু চতুর্মাত্রক ছন্দের চাইতে কিছু মন্থর। যথা—

জ্ঞানের মণি | -প্রদীপ নিয়ে | ফিরিছ কে গো | দুর্গমে,
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য-নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্যপথ-যাত্রী ওগো, তোমায় করি নমস্কার ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', মনীষী-মঙ্গল

ষণ্মাত্রক ছন্দের গতি আরও মন্থর। যথা—

সে দিন নদীর | নিকষে অরুণ |
আঁকিল প্রথম | সোনার লেখা ;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।...
মনে হল মোর নবজনমের
উদয়শৈল উজল করি'
শিশিরধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি' ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'কাহিনী', পতিতা

কেবল যে ছন্দভেদেই লয় দ্রুত বা মন্থর হয় তা নয়, রচনাভেদে একই ছন্দের লয়ে অনেক পার্থক্য হতে পারে। ষণ্মাত্রকেরই আর-একটা নমুনা দিচ্ছি। পাঠক দেখতে পাবেন রচনাভেদে এটার লয় পূর্বোদ্ধৃত পংক্তি-কয়টির চাইতে কত বেশি ধীর। যথা—

জগতের মাঝে | কত বিচিত্র | তুমি হে,—
তুমি বিচিত্র | -রূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল-গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রা', চিত্রা

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের সাহায্যে ধ্বনিপ্রবাহ যেমন বৈচিত্র্য লাভ করে, স্বরবর্ণের বাহুল্যে তেমনি মন্থর ও একঘেয়ে হয়ে ওঠে।

এবার স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দেব। এ ছন্দ সাধারণতঃ নৃত্যপরায়ণ ও দ্রুতগতি। যথা—

পিছল পথে | নাইক বাধা, | পিছনে টান | নাইক মোটে,
পাগলা ঝোরার পাগল নাটে নিত্যনূতন সঙ্গী জোটে!
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হতে,
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে,—

গুহার তলে গুমরে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে',
ঐরাবতের বৈরী হয়ে কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে',
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে,—

পরান ভরে নৃত্য করে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি মরে মনের দুখে;
যাচ্ছি মরে মনের দুখে পূর্ব সুখে স্মরণ করে;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝরে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', পাগলা ঝোরা

এখানে ছন্দ যেন পাগলা ঝোরার মতোই উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছে। কিন্তু এই চতুঃস্বরের ছন্দেই কেমন ধীর গতির গম্ভীর কবিতাও রচনা করা যায় তা নিম্নের ছত্র-ক'টি পড়লেই বোঝা যাবে।—

ভাবসাধনার | এই ভুবনে | এস তোমার | নূতন বাণী | লয়ে,
বিরাজ কর ভারত-হিয়ার ভক্তমালে নূতন মণি হয়ে ;
ব্যথাভরা চিত্ত মোদের— খানিক ব্যথা ভুলব তোমায় হেরি ;
সত্যসাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্‌বোধনের ভেরী।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বিদায়-আরতি', বড়দিনে

কিন্তু দুই স্বরের ও তিন স্বরের ছন্দ অত্যন্ত খরগতি। সে ছন্দকে গাম্ভীর্য ও মন্থরতা দান করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়।

এ দিক্ থেকে দেখতে গেলে অক্ষরবৃত্তই গম্ভীর ভাবের সবচেয়ে উপযুক্ত বাহন। এ কথা পূর্বেই বিশদরূপে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এ স্থলে অক্ষরবৃত্তের আরও দুএকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পাঠক পূর্বের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন, এ ছন্দের লয় কত ধীর গতিতে চলে। যথা—

১। হে আদি-জননী সিন্ধু, | বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন্ কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', সমুদ্রের প্রতি

২। বৃন্তহীন পুষ্পসম | আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে ;

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রা', উর্বশী

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-দুটোতে সমুদ্রের গভীর এবং গম্ভীর গর্জনধ্বনি যেমনভাবে প্রতিধ্বনিত করা হয়েছে, অক্ষরবৃত্ত ছাড়া অন্য ছন্দে তা সম্ভব হত না।

যা হক, এখন আবার আমাদের আসল কথার অবতারণা করা যাক। পূর্বোদ্ধৃত সবগুলো দৃষ্টান্ত একে একে পড়ে গেলে আপনা থেকেই এ সত্যটা মনে জেগে উঠবে যে, সব কবিতা সমান গতিতে বা সমান লয়ে পড়া যায় না বা পড়লে ভাল শোনায় না। এক-এক ছন্দের কবিতা এক-একটা বিশেষ লয়ে পড়লেই যেন তাদের ভিতরকার সমস্ত ভাবসৌন্দর্য ভাষার ও ছন্দের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। কবিতাভেদেও লয়ের পার্থক্য হয়। কোনো কোনো কবিতায় যতি ও তাল যেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও দ্রুত, তার লয়ও যেন গতির আবেগে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে থাকে। আবার অন্য কবিতায় যতি ও তাল যেন এক-একটা বিশাল তরঙ্গের মতো অনেক ক্ষণ পরে উত্থিত হয়ে মনকে স্তম্ভিত করে দিতে থাকে, তার লয়ও যেন আপন গুরুগম্ভীর ও মন্থর গতিতে মনকে কোন্ অকূল সমুদ্রের অতল গভীরতার মধ্যে তলিয়ে দিতে থাকে।

লয়ের এই গতিবেগের পার্থক্যে মাত্রার স্থিতিকালেরও পার্থক্য হয়, এ কথা আগেই বোঝানো হয়েছে। মাত্রাবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির তুলনা করলেই টের পাওয়া যাবে যে, একটার এক-একটি বর্ণ যত ক্ষণ স্থায়ী হয় আর-একটার এক-একটি বর্ণ তার চেয়ে বেশি স্থায়ী হয়। আর, এ কথাও টের পাওয়া যাবে যে,—এ পার্থক্য এত সূক্ষ্ম ও এত পরিবর্তনশীল যে তাকে হিসাবের মধ্যে কিছুতেই আনা যায় না। এজন্যেই কাব্যছন্দে মাত্রার স্থায়িত্বভেদের কোনো গণনা করা হয় না এবং সুবিধার জন্যে সব কবিতারই মাত্রাকে সমকালস্থায়ী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু গানভেদে মাত্রার স্থায়িত্বভেদ খুবই প্রচুর এবং মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা নিয়ম মেনে চলে। সেজন্যে সংগীতশাস্ত্রে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়।

আশা করি এতক্ষণে আমরা কবিতায় ও গানে লয় ও মাত্রার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য পাঠকের নিকট অনেকটা স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছি। এক্ষণে কাব্যে ও গানে যতি ও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। কিন্তু সে আলোচনা করার পূর্বে কবিতার মাত্রা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

পূর্বে মাত্রা সম্বন্ধে যা বলেছি তা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে খাটে। সুতরাং মাত্রাবৃত্তের মাত্রা বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রানির্ণয় ও মাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা সংগত। কেবল কাব্যছন্দের দিকেই যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, তা হলে অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মাত্রানির্ণয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কেননা, ওই দুটি ছন্দ মাত্রাপরিমাণের উপরে নির্ভর করে রচিত হয় না; মাত্রাই ও দুটি ছন্দের নিয়ামক নয়। মাত্রাবৃত্তে কিন্তু মাত্রাপরিমাণের উপরেই ছন্দের স্বরূপ ও সার্থকতা নির্ভর করে এবং এজন্যেই এ ছন্দকে 'মাত্রাবৃত্ত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এসমস্ত কথা ছন্দের নামকরণের সময়ে আলোচিত হয়েছে।

কেবল কাব্যছন্দের দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি গানের ছন্দটাও আমাদের চোখের সামনে রাখি, তা হলে অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দেও মাত্রানির্ণয় করা আবশ্যক হয়ে ওঠে। কেননা, ওই ছন্দে রচিত গান যখন সুরে লয়ে গাওয়া হয় তখন এদেরও মাত্রার হিসাব রাখা প্রয়োজন। গান যে শুধু মাত্রাবৃত্তেই রচিত হয় তা নয়, বরং অধিকাংশ গানই সচরাচর স্বরবৃত্তে বা অক্ষরবৃত্তে রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু গাইতে হলেই যখন মাত্রা ও লয়ের হিসাব রাখতে হয় তখন গানের তরফ থেকে এ দুটি ছন্দেও কি করে মাত্রানির্ণয় করা সংগত তাই দেখাতে চেষ্টা করব। কিন্তু এ কথা এ স্থলে বলে রাখা উচিত যে, এ দুটি ছন্দের যেসব কবিতা সুরে লয়ে গাওয়া যায় কেবল সেসব কবিতারই শুধু গানের পরিমাপে মাত্রা নির্ণয় করা যায় তা নয়; যেসব কবিতা গাওয়া হয় না সেগুলোরও মাত্রার হিসাব গানের পরিমাপে করা যায়। দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথা পরিষ্কার হবে।—

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।

—রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা', ৩৭

এটা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা। এ পংক্তিটিতে আঠারোটি অক্ষর আছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুসারে এখানে বিশটি মাত্রা পাওয়া যাবে। কেননা, চিহ্নিত স্বর-দুটোকে মাত্রাবৃত্তে দ্বিমাত্রক বলে ধরতে হবে। কিন্তু গানের রীতি অনুসারে এখানে মাত্রাও বিশটি বলেই গণ্য করতে হবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এক মাত্রা এমন একটি আদর্শ কালপরিমাণ যা সকল কবিতাতেই সমভাবে খাটে। মোটামুটিভাবে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকালই এ ছন্দের সেই আদর্শকাল এবং এ আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সংগীতে এ আদর্শকালটি গানভেদে পরিবর্তিত হয় এবং কোথাও দীর্ঘক্ষণস্থায়ী, কোথাও অল্পক্ষণস্থায়ী হয়। সুতরাং মোট কালপরিমাণ বেড়ে গেলেও মাত্রাসংখ্যা স্থিরই থেকে যায়। কবিতাতেও এ হিসাব অনেকটা চালানো যায়। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই।—

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রা', উর্বশী

এখানে অক্ষরসংখ্যা চোদ্দো। কিন্তু মাত্রাসংখ্যা কত, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। প্রথমেই দেখা যায় এখানে গুরুস্বর ছয়টি এবং লঘুস্বর আটটি। সুতরাং চোদ্দোটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে উক্ত পংক্তিটি যথাযথরূপে উচ্চারণ করতে তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে, তা সহজেই বোঝা যায়। একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে সাধারণতঃ যে সময় লাগে সেই অপরিবর্তনীয় আদর্শকালটিকে একক ধরে হিসাব করলে উক্ত পংক্তিতে মাত্রাসংখ্যা চোদ্দো তো নয়ই, বরং বিশ। কেননা, এখানে ছয়টি গুরু বা দ্বিমাত্রক এবং আটটি লঘু বা একমাত্রক স্বর আছে। এটি হল কাব্যছন্দের হিসাব। কিন্তু গানের হিসাবের দিকে লক্ষ রাখলে বলতে হবে এখানে মাত্রাসংখ্যা বিশটিই। কিন্তু ছন্দ এখানে ধীর লয়ে চলছে বলে এখানে মাত্রাপরিমাণও সাধারণ একক মাত্রার চাইতে কিছু বেশি। আরও একটু বিশদ করছি। একটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

হাজার হাজার | বছর কেটেছে, | কেহ ত কহে নি | কথা ;
ভ্রমর ফিরেছে | মাধবীকুঞ্জে, | তরুরে ঘিরেছে | লতা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', প্রকাশ

এ দৃষ্টান্তটির সঙ্গে ঠিক এক লয়ে অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তের ধরনে নিম্নের পংক্তিটি পড়ুন।—

কুন্দশুভ্র | নগ্নকান্তি | সুরেন্দ্রবন্ | -দিতা।

পড়লেই বুঝতে পারবেন, এর প্রথম তিন পাদে ছয়টি করে মাত্রা আছে এবং শেষ পাদে দুই মাত্রা। সবসুদ্ধ বিশটি মাত্রা। পড়ার ধরন থেকেই বোঝা যাবে, উপরের তিনটি পংক্তিতেই বিশ মাত্রা করে আছে। সুতরাং তৃতীয় ছত্রটিতে কেমন করে বিশ মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় তা সহজেই দেখা গেল। কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে মাত্রার একক পরিমাণ অপরিবর্তনীয় আদর্শস্থানীয়, অর্থাৎ এক লঘুস্বরের উচ্চারণের সমস্থায়ী।

এখন আবার সেই ছত্রটিই অক্ষরবৃত্তের তালে আবৃত্তি করুন।—

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি | সুরেন্দ্রবন্দিতা।

পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দ কেমন ধীরগম্ভীর লয়ে চলেছে। অর্থাৎ এর লয় মন্থর। এখন সমগ্র পংক্তিটা পড়তে মোট যে পরিমাণ সময় লেগেছে তাকে চোদ্দোটি অক্ষরের মধ্যে সমভাগে পরিবেষণ করে দিন। তা হলে প্রত্যেক অক্ষরের ভাগে যে সময়টুকু পড়েছে তাকেও এক হিসাবে অর্থাৎ গীতছন্দের হিসাবে একমাত্রা বলা যায়। এ হিসাবে এখানে চোদ্দোটি মাত্রা আছে, কিন্তু এর প্রত্যেকটি মাত্রা অপরিবর্তনীয় আদর্শকাল অর্থাৎ একটি লঘুস্বরের স্বাভাবিক উচ্চারণসময়ের চাইতে একটু বেশি হবে। অতএব দেখা গেল এক হিসাবে উক্ত ছত্রটিতে বিশ মাত্রা এবং আর-এক হিসাবে চোদ্দো মাত্রা আছে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় প্রকারের মাত্রা প্রথম প্রকারের মাত্রার চাইতে ওজনে কিছু বেশি হবে। যদি লেখা হত—

কুসুম-ধবল-রূপ | সুরেশ-পূজিতা।

তা হলে এখানে অক্ষরসংখ্যা তো চোদ্দো হতই, মাত্রাসংখ্যাও চোদ্দোই হত এবং গীতছন্দ ও কাব্যছন্দের হিসাবে এ স্থলে মাত্রাপরিমাণের কোনো পার্থক্য থাকত না। আশা করি এতক্ষণে কাব্যরীতি ও সংগীতরীতিতে মাত্রার আদর্শ ও পরিমাণ স্পষ্ট হয়েছে।

এবার একটা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দিই।—

আমরা সুখের | স্ফীত বুকের | ছায়ার তলে | নাহি চরি।
আমরা দুখের | বক্র মুখের | চক্র দেখে | ভয় না করি॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', হতভাগ্যের গান

কাব্যছন্দের রীতিতে হিসাব করলে এখানে প্রথম পংক্তিতে বিশ ও দ্বিতীয় পংক্তিতে বাইশ মাত্রা পাওয়া যাবে। অথচ গানের রীতিতে হিসাব করলে উভয় পংক্তিতেই ষোলোটি করে মাত্রা গুনতে হবে। প্রত্যেকটি হলন্ত বর্ণ পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের উপরে নির্ভর ক'রে তাকে ওজনে একটু ভারী করে তুলছে এবং তাতে প্রতি মাত্রার পরিমাণ একটু বেড়ে যাচ্ছে মাত্র। সুতরাং গানের হিসাবে এখানে মাত্রা- ও স্বর-সংখ্যা সমানই ধরতে হবে। এ বিষয়ে যথাস্থানে অনেক কথা বলা হয়েছে, আর বাক্যব্যয় করার দরকার নেই।

কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমরা গানের রীতিতে কোনো ছত্রের যে মাত্রার হিসাব করেছি সেটাকে যেন কেউ প্রকৃত গানেব মাত্রা বলে মনে না করেন। তা মনে করলে ভুল হবে। কেননা, গানে স্বররচয়িতার ইচ্ছা অনুসারে এক একটি বর্ণ তিন চার প্রভৃতি বহুমাত্রাব্যাপী হয়ে স্বর অনেক প্রসারিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রত্যেক বর্ণের মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে এবং কোনো বর্ণেই দুই মাত্রার বেশি থাকতে পারে না। সুতরাং কবিতার মাত্রা গানের মাত্রার চাইতে স্বভাবতঃই অনেক কম হয়ে থাকে। সুতরাং এ বিস্তৃত আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, কাব্য ছন্দের রীতিতে হিসাব করলে মাত্রার একক বা আদর্শকালপরিমাণ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সর্বত্র সমান এবং বর্ণের গুরুত্বের উপরেই তার সংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু গানের ছন্দের রীতিতে হিসাব করলে মাত্রার একক-পরিমাণ কবিতাভেদে বাড়ে বা কমে; অক্ষরবৃত্তে অক্ষরসংখ্যার এবং স্বরবৃত্তে স্বরসংখ্যার পরিমাণ সমানই থাকে।*

যতি ও তাল

এক্ষণে আমরা যতি ও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। কবিতায় বা গানে স্বরেরক্ষণিক নিস্তব্ধতাকেই যতি বা বিরাম বলে। অর্থাৎ জিহ্বা যেখানে স্বভাবতঃই একটু বিশ্রাম করে তাকে 'যতি' বলে।

যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানম্।

—গঙ্গাদাস, 'ছন্দোমঞ্জরী' ১।১৮

* প্রবাসী ১৩৩০ ফাল্গুন

প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ধ্বনির বা স্বরের বিরাম হলেও কালের বিরাম হয় না, কাল চলতেই থাকে। সুতরাং বর্ণকে আশ্রয় করে যে ধ্বনি প্রবাহিত হতে থাকে শুধু তারই যে মাত্রা বা কালপরিমাণ আছে তা নয়, যতিরও মাত্রা বা কালপরিমাণ আছে। কিন্তু কাব্যছন্দের এই যতি বা বিরামকালের হিসাব রাখা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই কাব্যে যতির মাত্রাপরিমাণ গণ্য করা হয় না। কিন্তু যাঁরা নূতন নূতন ছন্দ রচনা করেন তাঁদের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের এসব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাতে নব নব ছন্দ উদ্‌ভাবনার সহায়তা হয়। সাধারণভাবে ছন্দের আলোচনার ক্ষেত্রে এসব সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয় না; নূতন নূতন সৃষ্টি করতে গেলেই এসব সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংবাদ রাখা প্রয়োজন হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই।—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা;
দিনের কল্লোল'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', অশেষ

উদ্ধৃত শ্লোকটি পড়লেই বোঝা যায় যে, একটি পাদের আবৃত্তি শেষ করে আর-একটি পাদ শুরু করা পর্যন্ত খানিকক্ষণ থেমে থাকতে হয়। এই সময়টুকুই ধ্বনিবিরতি বা যতির মাত্রাপরিমাণ। কিন্তু কবিতায় এই সময়টুকুর হিসাব রাখার বিশেষ প্রয়োজন নেই, যদিও গানে তার সার্থকতা আছে। অবশ্য কবিতাতেও এই যতিটুকু ধ্বনির চাইতে এতটুকু কম প্রয়োজনীয় নয়। এই যতি ও গতিকে নিয়েই সমগ্র কবিতার সার্থকতা। কারও প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তবে কবিতায় যতিকালটুকুর হিসাব না রাখলেও চলে, ধ্বনির গতির হিসাব রাখলেই বিরতি আপনি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। কিন্তু গানের স্বরের গতির ন্যায় তার বিরামের দিকেও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উপরের কবিতাটি থেকেই বোঝা যাবে যে, কবিতাতেও যতি সর্বত্র সমান নয়; তার স্থিতিকাল কোথাও কিছু বেশি, কোথাও কিছু কম। উপরের কবিতাটিতেই প্রত্যেক পংক্তিতে প্রথম দুটো যতিতে যতক্ষণ থামতে হয়, তৃতীয় যতিতে তার চেয়ে বেশি থামতে হয়। এরূপ সর্বত্রই দেখা যাবে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই।—

সংসারে সবাই যবে | সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা | পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে | একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ | মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? | কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎজনে ? | কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল ? | কোন্ অন্ধকারমাঝে | জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায় ? | স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে | রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া।

—রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রা', এবার ফিরাও মোরে

এ পংক্তিগুলি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এখানে কোথাও চার, কোথাও ছয়, কোথাও আট এবং কোথাও দশ অক্ষরের পরে যতি পড়েছে। এরকম যুগ্মসংখ্যক বর্ণের পরে যতি পড়াই এ ছন্দের প্রকৃতি। আরও দেখা যায় প্রত্যেক পংক্তির অন্তেই যতি বা বিরাম আছে। শুধু অক্ষরবৃত্ত কেন, প্রত্যেক ছন্দেই পংক্তিশেষে যতিপড়া অনিবার্য, নতুবা ছন্দরচনাই হয় না। পংক্তিশেষের যতি কোনো চিহ্নে চিহ্নিত হয় নি, শুধু পংক্তিমধ্যস্থ যতি এক-একটি দণ্ডচিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে।

এ যতিগুলোকে দু ভাগে বিভক্ত করা যায়— কতকগুলো ভাবগত যতি আর কতকগুলো ছন্দোগত যতি। যেখানে কবিতার অর্থের মধ্যেই একটি ছেদ রয়েছে, স্বভাবতঃই সেখানে একটি যতি পড়েছে; আবার যেখানে অর্থের বা কবিতার ভাবের বিরতি নেই, এমন অনেক স্থলেও যতি পড়েছে ছন্দের দাবিতে। প্রথম প্রকারের যতিকে 'ভাবগত যতি' এবং দ্বিতীয় প্রকারের যতিকে 'ছন্দোগত যতি' বলেছি।

আর-এক দিক্ থেকেও যতিকে দু ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেখানে ভাবগত যতির সম্ভাবনা আছে সেখানে ছন্দোগত যতিও অবশ্যই থাকা চাই। সেজন্যে যেখানে ভাবগত যতি থাকে সেখানে ধ্বনির পূর্ণ বিরতি হয়। এরকম যতিকে বলব 'পূর্ণযতি'। আর যেখানে শুধু ছন্দোগত ধ্বনিবিরতিমাত্রই আছে,

ভাবের বিরতি নেই, সেখানে বিরামকাল বেশি স্থায়ী নয়। এপ্রকার যতিকে বলব 'অর্ধযতি'। তা ছাড়াও আর-এক প্রকার যতি আছে, তাকে 'ঈষদ্‌যতি' নামে অভিহিত করা যায়। এ যতির কথা পরে যথাস্থলে বলব।

গানেই হক বা কবিতাতেই হক, এই যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই তালের সৃষ্টি করে। পূর্বেই বলেছি ধ্বনির গতি এবং বিরতিই ছন্দকে সার্থক করে। গতি এবং যতি যত নব নব উপায়ে পরস্পরকে অভিব্যক্ত করে তোলে ততই নূতন নূতন ছন্দ উদ্‌ভাবিত হয়। গতি ও যতির বিভিন্ন সন্নিবেশের ফলেই, ধ্বনির তরঙ্গলীলার উদ্ভব হয়। গানে বা কবিতায় ধ্বনির এই তরঙ্গলীলাকেই 'তাল' বলা যায়। কাব্যে এবং সংগীতে, উভয়ত্রই এই তালের নানারকম হিসাব রাখতে হয় এবং এই হিসাবের উপরেই উভয় ছন্দশাস্ত্র বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাল জিনিসটা কিন্তু আসলে স্বর বা ধ্বনি মোটেই নয়। স্বর বা ধ্বনির গতিভঙ্গিকেই 'তাল' বলা হয়। কত বিচিত্র উপায়ে ধ্বনির উত্থানপতন বা গতিবিরতি সাধিত হয় তা নির্ণয় ক'রে তাকে হিসাবের মধ্যে ধরে রাখাই তালের কাজ। ধ্বনির এক বার উত্থান বা গতি থেকে পরবর্তী পতন বা বিরতি পর্যন্ত যে মাত্রাপরিমাণ বা কাল, তাকেই গানে এক-একটি 'তাল-বিভাগ' বলা যায়। গানে যা তালবিভাগ, কবিতায় তাকেই 'পদ' বা 'পাদ' বলেছি।

যদিও একই প্রকার হিসাব থেকে গানের তালবিভাগ ও কবিতার পাদের উৎপত্তি, তথাপি এ দুটো জিনিস কখনই এক নয়। এ দুএর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের হেতু হচ্ছে গানে ও কবিতায় মাত্রা-আদর্শের অনৈক্য। এ অনৈক্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বিশদ করছি।—

আমার নিশীথ রাতের | বাদলধারা, |
এস হে গোপনে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', প্রেম ৬৮

এটা স্বরবৃত্ত ছন্দ। এক যতি থেকে আর-এক যতি পর্যন্ত যে অংশ, তাকে পাদ বলা হয় এবং এখানে প্রতি পাদে চারটি স্বর আছে। সবসুদ্ধ এখানে চোদ্দোটি স্বর আছে। সুতরাং এক হিসাবে চোদ্দো মাত্রা আছে বলতে পারি। প্রতি পাদে চার মাত্রা। কিন্তু গানের সুরের ধারায় যখন এ কথাগুলো বয়ে

চলবে তখন তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে; অনেক জায়গায় মাত্রা বেড়ে যাবে, সুতরাং পাদগুলোও নূতন আকার ধারণ করবে। যথা—

আমার্ | নি ০ শী থ | রা ০ তে র | বা ০ দ ল | ধা ০ রা ০ |
০ ০ এ স | হে ০ ০ ০ | ০ ০ গো প | নে ০ ০ ০ | ০ ০

এখানে বিন্দুচিহ্নগুলো অতিরিক্ত মাত্রা-জ্ঞাপক। দেখা যাচ্ছে কবিতার একমাত্রক বর্ণ গানে দ্বিমাত্রক, চতুর্মাত্রক, এমন কি ষন্মাত্রকও হয়েছে। আর, পাদসংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। কবিতায় ছিল চোদ্দো মাত্রা, গানে হয়েছে চৌত্রিশ মাত্রা। কবিতায় ছিল চার পাদ, গানে আট পাদেরও বেশি। কবিতায় ও গানে, উভয়ত্রই প্রতি পাদে চার মাত্রা আছে। কিন্তু উপরের বিভাগগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই টের পাওয়া যাবে এর প্রতি পাদের বর্ণ-বিন্যাসে কি বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে। কোথাও কোথাও এর চাইতে আরও অনেক বেশি বিপর্যয় উপস্থিত হয়ে থাকে। সব জায়গাতেই এমনটি হয়ে থাকে তা নয়। কোনো কোনো জায়গায় কবিতার ও গানের পাদসংখ্যা ও মাত্রাসংখ্যা ঠিক সমানই থেকে যায়। যথা—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীল বাসে নিল কায়া,
বাদল-নিশীথেরি ঝরঝর
তোমারি আঁখি'পরে ভরভর॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতিবিতান', প্রকৃতি ৩৫

এখানে প্রতি ছত্রে তিনটি করে পাদ আছে। প্রথম পাদে তিন মাত্রা এবং বাকি দুই পাদে চার মাত্রা করে আছে। গানেও তাই। এ স্থলে গানে ও কবিতায় তফাত নেই।

যা হক, আমাদের কথা হচ্ছিল এই।— ধ্বনির এক যতি থেকে আর-এক যতি পর্যন্ত যে অংশ, তাকে কবিতায় বলা হয় পাদ এবং তার গঠনের উপরেই কবিতার গঠন নির্ভর করে; তেমনি সুরের এক ভঙ্গি থেকে আর-এক ভঙ্গি পর্যন্ত যে অংশ তাকে বলা হয় তালবিভাগ এবং এই তালবিভাগের উপরেই গানের গঠনপ্রণালী নির্ভর করে।

একটি পাদ বা তালবিভাগের মধ্যে কয়টি মাত্রা থাকে তার হিসাব থেকেই গানের বা কবিতার তালের বহু প্রকারভেদ হয়ে থাকে। প্রথমে গানের কথাই ধরা যাক। গানে প্রধানতঃ তালের তিনপ্রকার রূপ দেখা যায়। কোনো গানে চার মাত্রার পরেই তাল দিতে হয়; এরকম তালকে চতুর্মাত্রক বা 'সমপদী' তাল বলা যায়। আবার কোনো গানে তিন মাত্রার পরেই তাল দিতে হয়; এ তালকে ত্রিমাত্রক তাল বা 'অসমপদী' তাল নামে অভিহিত করা যায়। আবার কোনো কোনো গানে তালবিভাগের মাত্রাসংখ্যার সমতা নেই; একবার তিন মাত্রার পরে আর-এক বার দু মাত্রার পরে তাল দিতে হয় অথবা একবার তিন মাত্রার আবার চার মাত্রার পরে তাল দিতে হয়। এরকম তালকে 'বিষমপদী' তাল বলা যায়। পূর্বোদ্ধৃত সংগীতের দৃষ্টান্ত-দুটোর মধ্যে প্রথমটি চতুর্মাত্রক বা সমপদী এবং দ্বিতীয়টি বিষমমাত্রক বা বিষমপদী তালের দৃষ্টান্ত। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। জা ০ গ র | ণে ০ যা ০য় | বি ০ ভা ব | রী ০ ০ ০ |

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', প্রেম ২৯১

এটা চতুর্মাত্রক তাল।

২। দে ০ শ | দে ০ শ | ন ০ন্ দি | ত ক রি | ম ০ন্ দ্রি | ত ত ব |
ভে ০ ০ | রী ০ ০।

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', স্বদেশ ১৬

এটা অসমপদী বা ত্রিমাত্রক তাল।

৩। মা ০ তৃ | ম ০ন্ | দি র | পু ০ণ্ ণ্য | অ ০ঙ্ | গ ন |
ক র ম | হো ০জ্ | জ্ব ল | আ ০ জ | হে ০।

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', স্বদেশ ১৭

এখানে যথাক্রমে তিন-দুই-দুই -এর পরে তাল হবে। সুতরাং তাল বিষমপদী। গানের এ তিনপ্রকার তালের আবার বহুপ্রকার উপবিভাগ ও বহু নাম আছে। আমাদের পক্ষে ওসমস্ত কথা আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

কবিতার তালের সঙ্গে উক্ত তিনপ্রকার তালের কি সাদৃশ্য আছে, এখন তাই আলোচনা করব। কাব্যছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের উপরে তালের এই প্রকারভেদের খুব বেশি প্রভাব আছে। তালের দিকেই সম্পূর্ণ লক্ষ রাখলে ছন্দের সম্পূর্ণ নূতন আর-এক রকম শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করতে হয়। এই নূতন শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ কেমন হবে, এখন তাই দেখাতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, গানের রীতির প্রতি লক্ষ রেখে মাত্রার যে আদর্শ পূর্বে নির্ণয় করেছি তাকেই কাব্যেও মাত্রার একমাত্র আদর্শ বলে ধরলে ছন্দের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি প্রধান ধারাই থাকে না। আর সংগীত-আদর্শের এই মাত্রার উপরে নির্ভর করেই যদি কবিতার পাদের প্রকারভেদ নির্ণয় করা যায় তবে সম্পূর্ণ নূতন ধরনে ছন্দের তিনটি প্রধান শ্রেণী পাওয়া যাবে— সমপদী, অসমপদী এবং বিষমপদী।

দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা বোঝা সহজ হবে।—

১। হা রে নিরানন্দ দেশ, | পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', মায়াবাদ

আমাদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে একে অক্ষরবৃত্ত 'দ্বিপদী' ছন্দ বলব। কারণ সাধারণ শ্রুতিতে এখানে প্রতি পংক্তিতেই আট অক্ষরের পরে একটি ও ছয় অক্ষরের পরে একটি যতি পড়েছে।

কিন্তু পূর্বোক্ত তালের হিসাবে এটার অন্য নাম হবে। প্রথমতঃ, সংগীত-আদর্শের দিকে লক্ষ রাখলে এখানে প্রতি ছত্রে চোদ্দো অক্ষর না বলে চোদ্দো মাত্রা বলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, খুব প্রখর তালশ্রুতির উপরে নির্ভর করলে এখানে প্রত্যেক চার মাত্রার পরেই একটি ছেদরেখা টানতে হবে। ফলে এটার আকৃতি অন্যরকম হয়ে যাবে। এটা দাঁড়াবে এরকম।—

হা রে নিরা | -নন্দ দেশ, | পরি জীর্ণ | জরা,
বহি বিজ্ঞ | -তার বোঝা, | ভাবিতেছ | মনে
ঈশ্বরের | প্রবঞ্চনা | পড়িয়াছে | ধরা
সুচতুর | সূক্ষ্মদৃষ্টি | তোমার ন | -য়নে।

সুতরাং এ ছন্দটা হল সমমাত্রক অপূর্ণ 'চৌপদী' ছন্দ। এ ছন্দের এরকম বিশ্লেষণের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এর দ্বারাই এ ছন্দের (যাকে সাধারণতঃ 'পয়ার' বলেই অভিহিত করা হয়) উৎপত্তির ইতিহাসের দিকে একটা গভীর ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। পূর্বেই বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকেই অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হয়েছে এবং চোদ্দো অক্ষরের পয়ার চোদ্দো স্বরের স্বরবৃত্তের

বিকারমাত্র। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চার স্বরের পরেই একটি করে যতি থাকে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ও গানের সুরের প্রভাবে ওই যতির সংখ্যা কমে গিয়ে অর্থাৎ স্বরবৃত্তের পাদগুলো আরও ঠেসে গিয়ে এই পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণেই ওই চতুঃস্বরপাদ স্বরবৃত্তের ও গানের প্রভাবের ইঙ্গিতটা টের পাওয়া যায়। 'পয়ার' শব্দটি 'পদচার' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এ কথাটি সত্য হলে পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার যুক্তিগুলো আরও দৃঢ়তা লাভ করে। যা হক, অক্ষরবৃত্তের প্রায় সর্বত্রই গোড়ায় এই চতুর্মাত্রক তালের সন্ধান পাওয়া যাবে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

২। আজিকে হ | -য়েছে শান্তি,
জীবনের | ভুলভ্রান্তি
সব গেছে | চুকে।
রাত্রিদিন | ধুক্‌ধুক্
তরঙ্গিত | সুখদুখ
থামিয়াছে | বুকে॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রা', মৃত্যুর পরে

এখানেও ওই চতুর্মাত্রক তাল অনায়াসেই ধরা পড়ে।

এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে এই চতুর্মাত্রক তালের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৩। লুকিয়ে ছিল | যে মর্যাদা | নারীর হৃদয় | -তলে,
উঠল জাগি | দিগ্‌বিজয়ী | বীরের অটুট | বলে।
যুক্তকরে অশ্রুমাখা দিব্যহাসি হেসে,
করল বরণ অগ্নিদেবে নববধূর বেশে॥

—করুণানিধান, 'ধানদূর্বা', স্নেহলতা

এ ছন্দের কবিতায় চতুর্মাত্রক তালের স্বচ্ছন্দ গতি। পূর্বে পয়ারের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যায় সেটা কতখানি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য অক্ষরবৃত্তের যে আভিজাত্য আছে সে সম্বন্ধে আগেই অনেক কথা বলেছি।

এখন মাত্রাবৃত্তের একটা চতুর্মাত্রক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৪। এস তৃষ্ | -ণার দেশে | এস কল | -হাস্যে,
গিরিদরী | -বিহারিণী | হরিণীর | লাস্যে।

ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও পরশে কর গো শ্রী-মন্ত।
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্‌না,
ঝর্‌না!

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বিদায়-আরতি', ঝরনা

চতুর্মাত্রক তালের যে কয়টা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তার থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গানের রীতিতে কাব্যছন্দের এরকম শ্রেণীবিভাগ করলেও আমাদের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ অব্যাহতই থেকে যায়। কারণ সমপদী, অসমপদী বা বিষমপদী, যেরকম তালই হক না কেন, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি প্রকারভেদ থাকবেই। উদ্ধৃত প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ, এই দৃষ্টান্ত-তিনটি পরীক্ষা করলেই এর যথার্থ্য উপলব্ধি হবে। সুতরাং কাব্যছন্দের শ্রেণীবিভাগ করবার সময়ে কাব্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও তালের প্রকারভেদ, এ দুটো বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখা দরকার। আমরা শ্রেণীবিভাগ করবার সময়ে তাই করেছি, কিন্তু কাব্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্যকেই প্রাধান্য দিয়েছি। কারণ গানে শুধু তালের উপরে লক্ষ রেখেই শ্রেণীবিভাগ করা হয়, ভাষার রচনাপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি থাকে না বললেই হয়। কিন্তু কাব্যের রচনাবৈচিত্র্যই সর্বাগ্রে মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। এজন্যে ভাষার রচনাবিধিকেই প্রাধান্য দিয়ে ছন্দকে প্রধানতঃ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছি; তালকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্বপ্রথমেই ছন্দকে সম, অসম ও বিষম এই তিন ভাগে বিভক্ত করি নি। রচনাবৈশিষ্ট্যের পরেই তাল বা তালবিভাগের প্রাধান্য। গানের ক্ষেত্রে যা তালবিভাগ, কাব্যছন্দের ক্ষেত্রে তাই পাদবিভাগ। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীর পরেই পাদরচনার বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য স্বীকার করে চতুরক্ষরপাদ, অষ্টাক্ষরপাদ, চতুর্মাত্রপাদ, পঞ্চমাত্রপাদ, চতুঃস্বরপদে প্রভৃতি উপবিভাগ করেছি। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করবার সময়েই এ কথা বলেছি। সুতরাং এখানে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন অসমমাত্রক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আজি কি তোমার | মধুর মূরতি |
হেরিনু শারদ | প্রভাতে।

হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'কল্পনা', শরৎ

এটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অমনি পড়ে গেলে প্রত্যেক ছয় মাত্রার পরে একটা করে যতি পাওয়া যায়। কিন্তু আরও একটু লক্ষ করলে এই ছয় মাত্রার প্রত্যেকটি পাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা করে সূক্ষ্ম ছেদ আবিষ্কার করা যায়। প্রত্যেক তিন মাত্রার পরেই একটা ঈষদ্‌যতি বা একটুখানি স্বরের বিরতি যেন শ্রুতিশক্তির কাছে ধরা দেয়। বস্তুতঃ খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে, তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির সাহায্যেই এ ছন্দ রচিত হয়। এরকম দুটো মাপকাঠিতেই এর এক পাদ হয়। সেজন্যেই এই ষন্মাত্রক ছন্দের কবিতায় প্রতি পাদে তিন মাত্রার পরেই একটা ঈষদ্‌-যতির অস্তিত্ব অনুভূত হয় এবং এটাই এ ছন্দের স্বরূপ। তবে কোথাও কোথাও কোনো পাদের মধ্যবর্তী এই ঈষদ্‌যতিটি প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। পূর্বের দৃষ্টান্তটিতেই এর নমুনা আছে।—

মাঠে মা ঃ ঠে ধান | ধরে না : কো আর

এবং

মাঝখা ঃ নে-তুমি | দাঁড়ায়ে জননী।

এখানে কোলনচিহ্নিত তিনটি জায়গায় পাদমধ্যবর্তী ছেদ বা ঈষদ্‌যতিটি কানে ধরা দেয় না, ওই যতিটি লুপ্ত হয়ে দুটো ক্ষুদ্র ভাগ একত্র জোড়া লেগে গেছে। কিন্তু ওই ঈষদ্‌যতি থাকাটাই এর যথার্থ প্রকৃতি এবং তিন মাত্রার মাপকাঠিটাই এর ভিতরের গঠনের আসল আদর্শ। এই ঈষদ্‌যতির সাহায্যেই এ ছন্দের তালরক্ষা হয়ে থাকে। এজন্যেই এ ছন্দকে ত্রিমাত্রক বা অসমপদী তালের ছন্দ বলেছি। উক্ত দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসমপদী তালের নমুনা।

এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে অসমপদী তালের একটা উদাহরণ দেব।—

ওই সিংহলদ্বীপ | সুন্দর শ্যাম, | নির্মল তার | রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ্ নির্বাণ ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', সিংহল

গানের রীতিতে এখানে প্রতি পদে তিনটি করে মাত্রা পাওয়া যাবে, যদিও বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের ভাষায় একে মাত্রাবৃত্ত না বলে স্বরবৃত্ত বলেছি। তিন মাত্রার মাপকাঠিতে রচিত হয়েছে বলেই একে ত্রিমাত্রক বা অসমপদী তালের ছন্দ বলব।

অক্ষরবৃত্তে এ তালের দৃষ্টান্ত এই।—

একবার তোরা | মা বলিয়া ডাক,
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গলে যাক,
মুখ তুলে আজি চাহ্ রে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতবিতান', জাতীয় সংগীত ১১

এ ছন্দে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেক কবিতা লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে অক্ষরবৃত্তে এই অসমপদী তালের অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে এ তাল ভাল শোনায় না। যেখানে যুক্তবর্ণ উপস্থিত হয় সেখানেই পদে পদে তালভঙ্গ হয়, শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে। এই তথ্যটি লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় মাত্রাবৃত্তের প্রবর্তন করেছেন। 'মানসী'তে তিনি সর্বপ্রথম যুক্তবর্ণের পূর্বস্বরকে দ্বিমাত্রক বলে ধরে এই নূতন ছন্দ ব্যবহার করতে শুরু করেন। এখন অসম তালের ছন্দ সর্বদাই মাত্রাবৃত্তে রচিত হয়ে থাকে। অক্ষরবৃত্তে অসম তাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয়ে গেছে। আর-একটা উদাহরণ দিচ্ছি রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসংগীত' থেকে। পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন এ রচনাটা মার্জিত শ্রুতিরুচির উপরে কতখানি অত্যাচার করে।—

বায়ুর হিল্লোলে | ধরিবে পল্লব | মর মর মৃদু | তান,
চারি দিক্ হতে কিসের উল্লাসে পাখিতে গাহিবে গান ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'প্রভাতসংগীত', আহ্বানসংগীত

এখানে যুক্তবর্ণগুলো যেন গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের মতো স্বরপ্রবাহের গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ছন্দচেতনাও যেন সে গুরুভারে নিপীড়িত হচ্ছে। সুতরাং এ ভারটাকে যদি একটু লঘু করে দেওয়া যায় তবেই ছন্দের স্রোত আবার অবাধ গতিতে বয়ে চলবে।—

বায়ুহিল্লোলে | ধরে পল্লব | মর মর মৃদু | তান,
চারি দিক্ হতে কি যে উল্লাসে পাখিরা গাহিছে গান ॥

কাব্যে বিষম তালটাও মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই শোভা লাভ করে। সেজন্যে অক্ষরবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে এ তালের ছন্দ সচরাচর রচিত হয় না। বিষম তাল অনেকরকম হতে পারে। যেমন—

১। বিপদে মোরে | রক্ষা কর, | এ নহে মোর | প্রার্থনা,
বিপদে আমি | না যেন করি | ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', ৪

এখানে প্রতি পাঁচ মাত্রার পরেই যতি আছে। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম শ্রুতির নিকট প্রতি পদে তিন মাত্রার পরে একটা যতির আভাস ধরা পড়বেই। সুতরাং আসলে এখানে তিন মাত্রার অসমপদের সঙ্গে দুই মাত্রার একটা সমপদের যোগেই পাঁচ মাত্রার এক-একটি পদ রচিত হয়েছে। এই অসম ও সম তালের মিশ্র তালকেই 'বিষম তাল' বলা হয়েছে।

২। জড়ায়ে আছে বাধা, | ছাড়ায়ে যেতে চাই, |
ছাড়াতে গেলে ব্যথা | বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গেলে মরি লাজে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', ১৪৪

এটা সপ্তমাত্রক অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ। কারণ প্রথম তিন পদে সাতটি করে মাত্রা

ও শেষ পদে দুটোমাত্র মাত্রা আছে। কিন্তু এর তাল বিষম, কারণ প্রতি পদেই তিন মাত্রার পরে একটা ঈষদ্‌যতি আছে। এ যতি প্রত্যেক পদকে একটি তিন মাত্রার অসমভাগ এবং আর-একটি চার মাত্রার সমভাগে বিভক্ত করেছে। সেজন্যেই তাল বিষমপদী।

৩। জীবনে যত পূজা | হল না সারা,
জানি হে জানি তাও | হয় নি হারা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', ১৪৬

এটা সপ্তমাত্রক অপূর্ণ দ্বিপদী ছন্দ। কারণ প্রথম পদে সাত ও দ্বিতীয় পদে পাঁচ মাত্রা আছে। কিন্তু প্রতি পদেই তিন মাত্রার পরে একটি করে ঈষদ্‌যতি দুটো অসমান ভাগ সৃষ্টি করেছে। অতএব বিষম তাল।

৪। গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখি।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', গানভঙ্গ

এ ছন্দের তাল অতি বিচিত্র। প্রত্যেক পংক্তিতে যথাক্রমে তিন-চার-পাঁচ, ও তিন-চার-দুই মাত্রা রয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এ ছন্দটা এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দৃষ্টান্তটির সম্প্রসারণমাত্র। তৃতীয় দৃষ্টান্তের সাত-পাঁচের অপূর্ণ দ্বিপদীর সঙ্গে সাত-দুইএর আর-একটা দ্বিপদ যোগ করলেই এ ছন্দ পাওয়া যায়। সুতরাং এ ছন্দের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে এ-রকম।—

গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুবা, |
ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সুর, |
সাতটি যেন পোষা | পাখি।

এর স্বরূপটি একটি অতিরিক্ত মিলের সাহায্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে নীচের দৃষ্টান্তটিতে।—

কোশল-নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশোগাথা ;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কথা', মস্তকবিক্রয়

বলা বাহুল্য এখানেও বিষম তাল।

বিষম তালের আর-এক রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৫। ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত ;
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।
কখনো ফুল দু'টো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'মানসী', বিরহানন্দ

এটা বিপর্যস্ত সপ্তমাত্রক দ্বিপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই একটিমাত্র দৃষ্টান্ত ছাড়া এ ছন্দ আর কোথাও দেখি নি। প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার দুটো পদ আছে। প্রত্যেক পদ আবার ঈষদ্‌যতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এ বিভাগের মধ্যে সন্নিবেশবিপর্যয়ের দ্বারা বেশ একটু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। প্রত্যেক পংক্তিতেই প্রথম পদ তিন-চার ও দ্বিতীয় পদ চার-তিন মাত্রায় ছিন্ন হয়েছে।

এতক্ষণে আমরা তালের দিক্ থেকে ছন্দের প্রধান তিন ভাগ— সম, অসম এবং বিষম ছন্দের আলোচনা করেছি। গানে তালবিভাগের অন্তর্গত মাত্রার সমাবেশপ্রণালীভেদে তালের অনেক প্রকারভেদ আছে। তার আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। কবিতাতেও পদের অন্তর্গত স্বরবর্ণগুলোর লঘুত্ব-গুরুত্বভেদে তালের নানারকম উপবিভাগ হয়ে থাকে। তাতে ছন্দের তাল আদিগুরু, মধ্যগুরু, অন্তগুরু প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করার সময়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং এ স্থলে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তালের এরকম উপবিভাগ স্বরবৃত্ত ছন্দেই হতে পারে। অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম বৈচিত্র্যের অবসর নেই। স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরের লঘুত্বগুরুত্বভেদে তালের যে বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকেই কাব্যের ভাষায় 'ছন্দস্পন্দন' নামে অভিহিত করেছি।

কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের স্পন্দন বা নৃত্যলীলার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। সবাই জানেন যে, বিশ্বজগতের ভিতরকার মূলপ্রণালী নির্ণয় করতে গিয়ে

জড়বিজ্ঞান সর্বত্র কতকগুলো বিচিত্র আণবিক স্পন্দন বা চঞ্চল নৃত্যপরায়ণতাই আবিষ্কার করেছে। ধ্বনিতত্ত্বে এ কথা যেমন খাটে, মানুষের মানস ক্ষেত্রেও এ কথা তেমনি খাটে বলতে পারি। তাই কবিতার ভিতরকার যা মূলসত্য অর্থাৎ রস, কবিতার ছন্দ সেই রসকে ধ্বনির স্পন্দনের ভিতর দিয়েই আমাদের চিত্তস্পন্দনের সঙ্গে সমান তালে ফুটিয়ে তুলতে চায় এবং এই চিত্তস্পন্দনের ভিতর দিয়েই আমাদের মর্মকে স্পর্শ ক'রে রসকে আমাদের মানসলোকে সার্থক করে তুলতে চায়। কিন্তু ধ্বনিস্পন্দনের এই বিচিত্র সূক্ষ্ম লীলা ব্যাকরণের অর্থাৎ বিশ্লেষণের সূত্রে বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং সে প্রয়াস আমরা করব না। তবে বাংলা কবিতায় ছন্দস্পন্দনের রীতিবৈশিষ্ট্য এবং কোন্ কোন্ বিশেষ উপায়ে তা আমাদের চিত্তকে দোলা দেয় সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায় এবং বলা দরকারও বটে। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

সুর

ছন্দ ও সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমরা মাত্রা, লয়, যতি ও তাল, উভয় শাস্ত্রের এ কয়টা সামান্য পরিভাষা এবং উক্ত দুই শাস্ত্রে এদের সার্থকতা ও পার্থক্য কি, তাই বিশদ করতে চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, উভয় শাস্ত্রেই এমন কতকগুলো বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্ম আছে যা এক পক্ষে খাটে, অন্য পক্ষে খাটে না। কাব্যছন্দের আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এ ক্ষেত্রের বিশেষ ধর্মগুলোর আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু সংগীতশাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যছন্দের খানিকটা সাদৃশ্য আছে বলে উভয়ের মধ্যে একটু তুলনা করার উদ্দেশ্যেই সংগীতের অবতারণা করা হয়েছে। সংগীতের আলোচনা গৌণ এবং কাব্যছন্দের আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্যই কাব্যছন্দের কথা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে সংগীতের কথা সংক্ষেপে সমাপ্ত করেছি।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, লয় ও তাল সংগীতের ক্ষেত্রে যতই প্রয়োজনীয় হক না কেন এগুলোই সংগীতের মূলতত্ত্ব নয়: সংগীতের অন্তরতম মূলতত্ত্ব হচ্ছে সুর। মাত্রা লয় প্রভৃতি সুরের বাহনমাত্র, সুরের গতিপ্রকৃতিকে

ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা। সংগীতের সুরই অনির্বচনীয় আনন্দরসকে মানুষের মনের স্পর্শসীমার মধ্যে এনে পৌঁছিয়ে দেয়। সংগীতে যেমন সুর, কাব্যে তেমনি ভাব। ভাব বলতে শুধু শব্দের অর্থকেই বুঝি নে। ভাব বলতে বুঝি এমন একটা ইঙ্গিত, এমন একটা সৌরভ, এমন একটা সুষমা যা চকিতের মধ্যেই আমাদের মানসলোকে অদ্ভুত সৌন্দর্য-সৃষ্টির মায়াজাল বিস্তার করে। কাব্যেও তাল লয় মাত্রা প্রভৃতি গৌণ, এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা। যা হক, কাব্য এবং সংগীত, উভয়েরই চরম লক্ষ্য এবং পরম সার্থকতা হচ্ছে সৌন্দর্য বা আনন্দরসের সৃষ্টি। সংগীতে এই সৌন্দর্য প্রকাশ লাভ করে সুরের উপরে নির্ভর ক'রে এবং সুর প্রবাহিত হয় লয় তাল প্রভৃতির আশ্রয়ে। কাব্যেও তেমনি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে ভাবের ভিতর দিয়ে এবং ভাব বিকশিত হয় ছন্দের সাহায্যে। কিন্তু তা বলে যে এ দুএর মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো যোগ নেই তা নয়। সংগীতে সুর যদিও প্রধানতঃ ধ্বনিকে অবলম্বন করেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তবু সুরের মধ্যেও কাব্যের ভাবব্যঞ্জনার আভাস রয়ে যায়। আবার, কাব্যের ভাবও সম্পূর্ণ সুরনিরপেক্ষ নয়। কেননা, কাব্যছন্দেরও ধ্বনিনিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু গানের সুর ও কাব্যের সুরের মধ্যে গুরুতর প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়ে গেছে। সংগীতে ভাব সুরের অনুবর্তন করে; কিন্তু কাব্যে সুরই ভাবের অনুসরণ করে। সেজন্যেই কাব্য আবৃত্তি করার সময়ে আমাদের রসনা বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণ ক'রে ও কথার অর্থকে অব্যাহত রেখে কোথাও চলে, কোথাও থামে। কবিতায় ছন্দধ্বনি সুরকেই প্রাধান্য দিয়ে কথার অর্থকে সহজে গৌণ আসন দেয় না। কাব্যে অর্থের অনুযায়ী হয়েই সুর কখনো তীব্র, কখনো মৃদু, কখনো গম্ভীর, কখনো তরল, কখনো মন্থর, কখনো দ্রুত হয়ে থাকে। সকলেই লক্ষ করে থাকবেন, কবিতা আবৃত্তি করার সময়ে আমরা শুধু যে ছন্দ বা তাল বাঁচিয়েই কথাগুলোকে আওড়ে যাই তা নয়। যদি শুধু তাই হত তবে কবিতার প্রাণটাই জড় শব্দপুঞ্জের নীচে চাপা পড়ে মারা যেত। আর, ছন্দও কবিতার ভাবকে গতিদান না করে বরং পাষাণপ্রাচীরের মতো তার গতিরোধ করেই দাঁড়াত। কিন্তু প্রকৃত তথ্য তো তা নয়, ছন্দ কাব্যের বাধা না হয়ে তার সহায় হয়েছে। তার কারণ কাব্যের ভাবকে

বহন করে বলেই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা। ভাবের উপরে প্রভুত্ব করা ছন্দের কাজ নয়, বরং ছন্দের উপরেও ভাবের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেজন্যেই শুধু যতি তাল লয় মাত্রা রক্ষা করে যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করে গেলেই কবিতার যথার্থ আবৃত্তি হয় না। তাতে কবিতার যথার্থ ভাবটি ছাড়া পায় না; ছন্দের খাঁচাটাই তখন কাব্যের মুক্তির প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যেই কবিতা আবৃত্তি করার সময়ে ছন্দের তাল-লয়কে অতিক্রম করে গিয়ে কবিতার ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এখানটাতেই ছন্দ হাজার চেষ্টা করেও কাব্যের যথার্থ স্বরূপটির নাগাল পায় না, তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং নিজেকে নিজে অতিক্রম করে যাওয়ার মধ্যেই ছন্দের সার্থকতা। আর, এ অতিক্রমই হচ্ছে ছন্দের রাজ্য ছাড়িয়ে ভাবের ও সুরেব রাজ্যে প্রবেশের উপক্রম। কাজেই আবৃত্তি করার সময়ে শুধু ছন্দ বাঁচালেই চলে না; তার সঙ্গে একটু ভাবের আভাস, একটু সুরের স্পর্শও যোগ করে দিতে হয়। এজন্যেই দেখা যায় আবৃত্তি করার সময়ে আমাদের কণ্ঠ জড়যন্ত্রের মতো শব্দগুলোকে শুধু উচ্চারণ করে যায় না; ভাবের গভীরতা, তীব্রতা ও ওজস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কণ্ঠস্বরও কোথাও তীব্র, কোথাও গম্ভীর, কোথাও দৃপ্ত হয়ে ওঠে। এখানেই আমাদের চিত্ত কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে' আমাদের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্যেই তো কবিতার আবৃত্তি সজীব সচেতন ও প্রাণের স্পন্দনে এমন স্পন্দিত হয়ে ওঠে। আর, এখানেই কাব্যের ভাব বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে সংগীতের সুরের স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানেই শেব। সংগীতসুরের আভাসলাভ ও তার মধ্যে আত্মপ্রসারের এই ব্যাকুলতার মধ্যেই কাব্যছন্দের চরম তৃপ্তি।

গানের সুরের প্রক্রিয়া অন্যরকম, তার অভিব্যক্তির পন্থা স্বতন্ত্র। গানের সুর ধ্বনিকে আশ্রয় করেই আনন্দকে রূপদান করে, কথার ভাবকে আশ্রয় করে নয়। সেজন্যেই গানের সুর স্বচ্ছন্দগতিতে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়ে চলে, গানের কথাকে সে গ্রাহ্যও করে না। গানের সুরের কাছে কথা ও তার অর্থের কোনো মর্যাদা নেই বললেই হয়। কথার অর্থ যেখানে থেমেছে, সুর হয়তো সেখানেও চলেছে, কথার অর্থে যেখানে গতি রয়েছে, সুর হয়তো সেখানেই মোড় ফিরে

গানের কথাগুলো নিজ নিজ স্বতন্ত্র রূপকে পর্যন্ত বজায় রাখতে পারে না, সুরের বেগে শব্দগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; কোনো শব্দের বর্ণগুলো পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকতে না পেরে বিশ্লিষ্ট হয়ে এ-শব্দের বর্ণ ও-শব্দের গায়ে গিয়ে পড়ে। শব্দগুলো নিজেই যখন এমন ছাড়া-ছাড়া বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন তারা অর্থের সমতা রক্ষা করবে কেমন করে? তাই বলছিলাম গানের সুর বাক্‌ ও অর্থকে অগ্রাহ্য ক'রে ধ্বনির সাহায্যেই সৌন্দর্য ও আনন্দকে সৃজন করতে চায়। তাই গানে ধ্বনিকে এত বিশ্লেষণ করা হয়; তাই গানে ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি সুরের সাতটি গ্রাম, উঁচু নীচু মাঝারি প্রভৃতি সপ্তকের বিভাগ, কড়ি কোমল প্রভৃতি সুরের সূক্ষ্ম ভেদ, এসমস্ত বৈচিত্র্য দেখতে পাই।

গানের সুরের এসমস্ত ভেদকে মাত্রা লয় প্রভৃতি থেকে পৃথক করে দেখা দরকার। কালের দিক্‌ থেকে ধ্বনির আদর্শ মাপকাঠিকে মাত্রা বলা হয়; কাল ব্যেপে সুরের স্থিতিপরিমাণই হচ্ছে মাত্রাপরিমাণ। এ দিক্‌ থেকে এক-একটি বর্ণ সিকিমাত্রা থেকে শুরু করে চার পাঁচ প্রভৃতি বহুমাত্রাব্যাপী স্থায়ী হতে পারে, সুতরাং কালের স্থিতির দিক্‌ থেকে বহুমাত্রাপরিমাণ হতে পারে। ঠিক তেমনি ধ্বনির তীব্রতা বা মৃদুতার দিক্‌ থেকেও বহু বিভাগ। ধ্বনির এই উচ্চতানীচতাভেদ অসংখ্যরকম হতে পারে। ষড়জ ঋষভ প্রভৃতি এরই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু এসমস্ত প্রকারভেদ সম্পূর্ণরূপে মাত্রানিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন্‌ মাত্রার বর্ণ তীব্রতার কোন্‌ গ্রামে থাকবে বা কোন্‌ গ্রামে মাত্রাপরিমাণ কত তার কোনো স্থিরতা নেই। ধ্বনির স্থিতি যেমন মাত্রাভেদ নিয়মিত করে, তার তীব্রতাও তেমনি সুরের ভেদ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ধ্বনির গতির সমতাকেই লয় বলে এবং এই গতির ক্রমভেদে লয়ভেদ হয়। আর ধ্বনির গতিভঙ্গিতেই তালের সৃষ্টি।

মাত্রা লয় যতি তাল ও সুর গানের ক্ষেত্রে যে অপরূপ অরূপসৌন্দর্যের তাজমহল গড়ে তোলে, কাব্যের ক্ষেত্রে তা গড়ে ওঠে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির মানসী মূর্তির মাধুরীতে। কিন্তু কাব্যেও মাত্রা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে; এরা সেই সৌন্দর্য-ইমারতের স্থূল উপাদান জোগায়। সেজন্যেই এগুলোকে হিসাবের বিচারে অল্পবিস্তর পরিমাপ করা যায়। কিন্তু কাব্যে সুরের যে আভাস পাই তার কোনো বিশ্লেষণ নেই, ভাবের আবেগে চিত্তে যে গতির সঞ্চার হয় তার থেকেই কাব্যে ওই সুরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু

সে সুর গানের সুরের মতো আপন গতিতেই আপনি বয়ে চলে না, ভাবের আবেগের অনুসরণ করেই কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সংগীত ও ছন্দ সম্বন্ধে আমরা যে বিষয়গুলোর আলোচনা করলাম, আশা করি তার থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে, কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোনো কোনো বিষয়ে সদৃশধর্মা বটে, কিন্তু সমানধর্মা নয়। যে ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেখানেও তাদের গতি এক দিকে নয়, এ সাদৃশ্যটাও বিভিন্নমুখ। এ দুএরই যা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বা স্বতন্ত্র সার্থকতা, তা সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে এদের ভিতরকার স্বরূপ বা সৌন্দর্যমূর্তিকে আকৃতি দান করে। অতএব কাব্য ও সংগীতের ছন্দের যথার্থ পরিচয় লাভ করতে হলে এই দুই শাস্ত্রের স্বতন্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক।*

* প্রবাসী ১৩৩০ চৈত্র

নিশীথে

ঐ সুদূরে গভীর তিমির নিবিড় করি গগন-তলা জুড়ে
স্তব্ধ যেন হরের তপোবনে ;
দখিন হতে মলয়-বাতাস নীরব পদে যাচ্ছে বয়ে দূরে
বক্ষ ছুঁয়ে স্নিগ্ধ পরশনে ।

জগৎ-জোড়া প্রাণের তলে শূন্যতাময় রিক্ত হৃদিখানি
হাহাকারে পূর্ণ হয়ে আছে ;
কিসের যেন কঠিন অভাব ঘুরছে বুকে মর্মব্যথা হানি—
বক্ষমণি নেইক যেন কাছে ।

ঐ যে দূরে— অনেক দূরে যাচ্ছে শোনা স্বচ্ছ তিমির ভেদি
অশ্রুকরুণ কণ্ঠভরা গীতি ;
নিরাশ্রয়া নিঃসহায়া কাহার যেন পড়ছে ভেঙে হৃদি,
আত্মহারা উপেক্ষিতা প্রীতি ।

দুঃখ-ব্যথার স্বপ্ন মাঝে ক্ষীণস্বরে বাজছে যেন কানে
স্তব্ধ ব্যাকুল বাক্যহারা ব্যথা ;
একলা সে কোন্ গহন বনে অন্তবিহীন দুঃখভরা প্রাণে
কাঁদছে যেন নির্বাসিতা সীতা ।

হায় রে, যেন শ্মশান'পরে মাতৃপরান বিলুণ্ঠিত বেশে
পুত্রহারা ভাবছে অভাগিনী ;
জগৎ-জোড়া আঁধার মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে বাঁধনছাড়া কেশে
চক্ষু মুছে একলা নিশীথিনী ।

গগনতলে দুপুর হল চলছে ছুটে দণ্ডগুলি বাকি,
আদেশ কাহার যাচ্ছে পাছে পাছে ;
আড়ালে তার রুদ্ধশ্বাসে চক্ষু-দুটি হস্ত দিয়ে ঢাকি
দুর্ভাবনা স্তব্ধ হয়ে আছে ।

ছিন্নবেশা কোন্ ভিখারী পথের পাশে বৃক্ষগুলি ঘেরি
যাচ্ছে চলে মর্মরিয়া পাতা ;
বুকের তলে হৃদয় মাঝে শঙ্কা যেন বক্ষ দিয়ে ঘেরি
রাখছে ঢেকে কোন্ অজানা ব্যথা ।

কিসের যেন তৃষ্ণা গভীর, কাহার যেন স্পর্শলাভের আশা
জগৎভরে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ;
কাহার যেন মুখের বাণী প্রাণের মাঝে করছে যাওয়া-আসা,
পড়ছে ভেঙে বুকের তীরে তীরে ।

কোথায় যেন যক্ষ এবে ডাকছে মেঘে লক্ষ অনুনয়ে
কোন্ অলকায় বার্তাখানি নিতে ;
হায় রে, বছর কাটবে কবে কখন তারে চিত্ত ভরে পেয়ে
সর্বজীবন উঠবে জেগে মেতে ।

এমনি কালে একলা আমার
চক্ষু-দুটি মুগ্ধ কত স্বপ্নভাবাবেশে ;
হায় রে, এখন বন্ধু আমার,
মোদের মাঝে কোন্ পারাবার,
কোথায় তুমি কোন্ অচেনা দেশে ?
চিত্ত আমার নিদ্রাহারা জাগছে আজি,
জাগছে ওগো তোমার তরেই, জাগছে অনিমেষে ॥

মোসলেম ভারত ১৩২৮ অগ্রহায়ণ

যৌবন-বোধন

পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ

প্রাণে মনে মহা মুক্তিপণ জাগুক আজ,
বুকে বুকে অগ্নিশিখার কেতন উড়ুক হায় ;
অপমানে নত শীর্ষ'পর পড়ুক বাজ,
ললাটেতে মৃত্যুতিলক জ্বলুক আগুন-প্রায়।

আঘাতে আহত বক্ষ'পর শোণিত লাল
দিকে দিকে শঙ্কা জাগাক মরণসমুদ্রের ;
মরণে মরণে ত্রস্ত হোক মহান্ কাল,
লোকে লোকে দুঃখ-ব্যথার রোদন উঠুক ঢের।

মুখরিত করি' বিশ্বলোক প্রলয়গান
পলে পলে ছিন্ন করুক জগৎ-বীণার তার ;
তারকা-তপনে বিদ্রোহের বিষম বান
অবিরত ধ্বংস আনুক ভীষণ চমৎকার !

সহে না সহে না আর যে ভাই, চোখের জল,
অপমানে খিন্নমলিন জীবন-ফাগুন-কাল ;
আজিকে পুড়িয়া হোক না ছাই সুখের ছল,
চারিদিকে হিংস্রভীষণ লাগুক আগুন লাল।

বৃথা এ গুমরি' কান্না তোর, বৃথাই হায়,
কে শুনিবে আর্তনাদের হৃদয়-বিদার রব ?
শিখাতে শিখাতে বহ্নি ঘোর গগন ছায়,
শোন না কি অত্যাচারের নিদয় জয়োৎসব ?

রেখে দে আজিকে অশ্রুপাত, হৃদয় বাঁধ,
জীবনেরে দৃপ্ত তেজের কঠিন আধার কর্ ;
জাগা রে বুকেতে যৌবনের প্রলয়-সাধ,
শতকোটি ঝঞ্ঝা তুফান নাচুক বুকের 'পর।

কাঁপায়ে ধরণী তাণ্ডবের চলুক নাচ,
দে উড়ায়ে দীর্ণ অযুত ভুবনকমল-দল ;
কোটি রাঙা শিখা খাণ্ডবের জ্বলুক আজ,
শিরে নে রে ধ্বংসবিনাশ, তরুণ পাগল-দল !

ঝলকে ঝলকে রক্ত-স্রোত মরণজয়
পথে পথে মৃত্যুরাজের বিষাণ বাজাক, হায় ;
পলকে পলকে খড়্গাঘাত কিরণময়
দিকে দিকে মুক্তিরথের কেতন উড়াক বায় !

আজিকে আসনে যৌবনের বসুক দুখ,
তারি তরে শঙ্খনিনাদ জাগাক মরণ-গান ;
ছিঁড়িয়া আনিয়া হৃৎকমল দে সুখটুক,
তারি পায়ে অঞ্জলি হায় তরুণ-জীবন-দান ॥

প্রবাসী ১৩৩০ ভাদ্র

স্মৃতিযজ্ঞ

শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

কাঁদছিস একলা কিসের ব্যথায় আজি হেথায়

অশ্রুর ধারায় সিক্ত চোখ ?

তোর ওই কণ্ঠে রোদন অপার সহে না আর,

দুঃখের আগার রিক্ত হোক।

দাস্যের লজ্জা, কলঙ্ক আর বেদনাভার

বক্ষের পাঁজর করছে চুর ?

সন্তান তোর সে দাসত্বলীন মমতাহীন,

অক্ষম এ লাজ করতে দূর ?

একদিন বুদ্ধ-অশোকরাজের ত্রিশরণের

ধর্মের ছায়ায় বিশ্বজন,

আর তোর অশ্বঘোষের ভাসের কালিদাসের

কাব্যের সুধায় মুগ্ধমন।

তিব্বত চীন তো তোমার ক্ষেমের মহা প্রেমের

ধর্মের জোরেই সভ্য হয় ;

তোর বুক-স্তন্য পিয়াই জগৎ এত মহৎ,

নয় এর কিছুই মিথ্যা নয় ॥

গৌরব তোর যে বিলায়বিহীন হলো কি ক্ষীণ ?

মন্দারকুসুম শুষ্ক, হায় ?

উজ্জ্বল মুক্তা গরব-মালায় ঝরে কি যায়

সন্ধ্যার মলিন পুষ্প-প্রায় ?

একদিন হায় মা, ধ্যানের জ্ঞানের তরবারের

বিদ্যুৎ-বিভায় ছাইলে লোক ;

আজ তার পূর্ব-স্মৃতির যাগের অবশেষের

ভস্মের ধুলায় ছায় ত্রিলোক ॥

উদয়ন ১৩৪১ শ্রাবণ

চঞ্চল

সতীশচন্দ্র রায়

ফাল্গুন চঞ্চল, ফোটা ফুল রয় না,
সুখ-স্মৃতি শোকভার চিরদিন বয় না।
বৈশাখে হয় তার
মরণের অভিসার,
অবহেলে ফেলে দেয় পুষ্পের গয়না ;
সুখ-স্মৃতি শোকভার কখনো সে বয় না।

আমি কেন নিশ্চল, যেতে নই উৎসুক,
বাঁধা রই, শিরে বই ক্ষণিকের দুখ-সুখ ?
পদে পদে গুরুভার
বইতে না পারি আর,
জড়তায় বারেবার ভেঙে ভেঙে পড়ে বুক,
নিশিদিন শিরে বই নিমেষের দুখ-সুখ ?

গেলে সুখ উন্মুখ স্মৃতি করে ক্রন্দন,
ভালোবাসা বসে রয় দুরাশায় উন্মন।
যাহা লই যাহা পাই
এই আছে এই নাই,
ফাঁকি মোরে দেয় তাই, বিচ্ছেদে ভরে মন
গেলে সুখ উন্মুখ স্মৃতি করে ক্রন্দন !

চঞ্চল, আমি ভাই লই তোর সঙ্গ,
ঝঞ্ঝায় বয়ে যাই জলধি-তরঙ্গ।
তরবারি খরশান
হোক আজি মোর প্রাণ,
জড়তার কারাগার করি' দ্বার ভঙ্গ
যাহা কিছু অস্থির তারি লই সঙ্গ ॥

প্রবাসী ১৩২৫ চৈত্র

দ্বিতীয় পর্ব

১৩৩৮-১৩৩৯

শ্রীবিকাশচন্দ্র নন্দী

শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

অনুজপ্রতিমেষু

বাংলা ছন্দের বিবর্তন

বাংলা ভাষার উচ্চারণপদ্ধতি ও বাংলা স্বরবর্ণের প্রকৃতির দ্বারাই বাংলা ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বাংলা ভাষার উচ্চারণের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, প্রত্যেক শব্দ বা শব্দসমষ্টির আদিস্বরের উপরে ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট্ পড়ে। ইংরেজি ভাষার অ্যাক্‌সেণ্ট্ শব্দগত; প্রত্যেক শব্দের কোনো বিশেষ স্বর বা সিলেব্‌ল্-এর ওই অ্যাক্‌সেণ্ট্ অপরিবর্তনীয়রূপে নির্দিষ্ট আছে। বাংলার অ্যাক্‌সেণ্ট্-পদ্ধতি উচ্চারণগত, শব্দগত নয়; এবং ওই অ্যাক্‌সেণ্ট্ বা ঝোঁক সর্বদাই শব্দ বা শব্দসমষ্টির প্রথম স্বরটিকে আশ্রয় ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। তাই সকলপ্রকার বাংলা ছন্দে উচ্চারণের ঝোঁক পর্বের আদিস্বরের উপরেই স্থাপিত হয়। ইংরেজির মতো মধ্যগুরু বা অন্ত্যগুরু পর্ব বাংলায় হয় না। ওই উচ্চারণের ঝোঁক থেকে ধ্বনির গতি শুরু হয় এবং যেখানে এই গতির অবসান হয় সেখানে যতি বা ধ্বনিবিরতি। এই ঝোঁক ও যতির মধ্যবর্তী যে অংশ তাকেই 'ছন্দপর্ব' বলেছি। এই ছন্দপর্বের গঠনপ্রণালীর উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। বাংলায় এই ছন্দপর্ব তিনটি বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয় বলে বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা— অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত।

স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেকটি পর্ব ধ্বনি বা স্বরের অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। ইংরেজি ছন্দও পর্বের অন্তর্গত ধ্বনি বা স্বরের সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্ব ধ্বনির মাত্রাসাম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় দীর্ঘস্বর নেই বটে, কিন্তু বহু যুগ্মস্বর আছে। দুটি ভিন্নজাতীয় স্বরবর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়ে যে মিশ্রস্বরের সৃষ্টি হয় তাকেই 'যুগ্মস্বর' বলে অভিহিত করেছি। এই যুগ্মস্বরের সাহায্যে বাংলা ছন্দে এমন ধ্বনিবৈচিত্র্য ও স্বরতরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অযুগ্মস্বর লঘু বা একমাত্রক এবং যুগ্মস্বর গুরু বা দ্বিমাত্রক বলে গণিত হয়।

বাংলার বহুপ্রচলিত মামুলি ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি—যেহেতু ওই ছন্দ দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যার উপরে নির্ভর করে। কিন্তু শুধু অক্ষরগণনার উপরে ভিত্তি করে কোনো ছন্দ রচিত হতে পারে না; কারণ ছন্দের মূলতত্ত্ব অক্ষর নয়, ধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার লিপিপদ্ধতিতে যদি যুক্তবর্ণের ব্যবস্থা না থাকত

তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হতে পারত না। পক্ষান্তরে যুগ্মস্বরগুলিকেও একাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থা যদি বাংলায় থাকত তা হলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেত।

কিন্তু অক্ষরগণনার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলে একটি ধ্বনিতত্ত্ব আছে; নতুবা এরকম ছন্দরচনা সম্ভব হত না। সেই তত্ত্বটি এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ শেষাংশে মাত্রাবৃত্তধর্মী ও অন্যাংশে স্বরবৃত্তধর্মী। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণজাত একটি যৌগিক ছন্দ। এ ছন্দের গতি অত্যন্ত মন্থর ও নিস্তরঙ্গ, এর ধ্বনি একঘেয়ে, যতি অনিয়মিত এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট। এরূপ হবার কারণ এই যে, বহু শতাব্দী যাবৎ কবিদের অজ্ঞাতসারে খাঁটি প্রাকৃত বাংলার স্বরবৃত্ত ধ্বনি, সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ এবং সংগীতের সুরের মিশ্রণে এই ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। বহু দিনের বহু অভ্যাসের স্তর উদ্‌ঘাটিত না করলে এই ছন্দের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপা পড়ে গেছে। এই ছন্দে ধ্বনিবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়, কারণ এ ছন্দ অত্যন্ত একঘেয়ে। অক্ষরবৃত্তের এই ত্রুটি সংশোধন করার জন্য বহুকাল যাবৎ, বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের সময় থেকে বিশেষ চেষ্টা চলছে। তখনকার সকল কবিই সংস্কৃত ছন্দের আশ্রয় নিয়ে বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে তাঁদের সব চেষ্টা বিফল হয়েছে। অবশেষে যখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করলেন তখন থেকে বাংলা ছন্দে বহু বৈচিত্র্য ঘটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা' কবিতাটি বাংলার সর্বপ্রথম মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা। আর তাঁর 'ছবি ও গান' কাব্যে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস দেখা যায়; কিন্তু 'ক্ষণিকা'র সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃত শক্তি ও সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।*

সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৮ ভাদ্র

* ১৩৩৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট ১৯৩১) প্রদত্ত ভাষণের সারমর্ম— বক্তাকর্তৃক লিখিত।

বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ

বাংলা ছন্দের মূল প্রবাহ হচ্ছে তিনটি—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। তার মধ্যে অক্ষরবৃত্তে অনেকটা আড়ষ্টতা আছে; এর গতি স্বচ্ছন্দ নয়। এ ছন্দকে কেটে ছেঁটে, এর সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগ করে এর বাইরের রূপে অনেকটা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু এব ভিতরের গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্যসাধন করা যায় না।

মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা বাহ্য আকৃতিতে যেমন অনেক পরিবর্তন সাধন করা যায় তেমনি একটু চেষ্টা করলেই এদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও অনেক বৈচিত্র্য ঘটানো যায়। এদের গতিতে স্বচ্ছন্দতা ও প্রকৃতিতে লীলাবৈচিত্র্য আছে। এ স্থলে সে সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের যুগ থেকেই বাংলার কবিরা অনুভব করে আসছেন যে বাংলা ছন্দ জিনিসটা বড়ই একঘেয়ে, ওকে কেটে ছেঁটে বাড়িয়ে কমিয়ে, ঘন ঘন মিল দিয়ে কিংবা খুব ঘটা কবে অনুপ্রাসের অলংকার দিয়ে যে ভাবেই রচনা করা যাক না কেন কিছুতেই ওর একঘেয়ে ধ্বনিতে বৈচিত্র্য দেখা দেয় না। দিগক্ষরা, পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী সকলেরই মূল ধ্বনিটা এক, বৈচিত্র্যহীন। বাংলা ছন্দের এই মৌলিক ত্রুটির অবসান ঘটাবার অভিপ্রায়েই প্রায় দুশো বছর যাবৎ বাংলায় সংস্কৃতের ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) প্রবর্তনের অবিরাম চেষ্টা চলে আসছে। পরম ছন্দোবিৎ ভারতচন্দ্রই এ প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু বহুকাল যাবৎ বাঙালি কবিদের এই চেষ্টা সফল হয় নি। তার কাবণ তাঁর ব্যবহৃত ছন্দটা ছিল অক্ষরবৃত্ত, ছন্দরচনার পদ্ধতিটা ছিল অক্ষরগোণা, আর ভাষাটা ছিল সাধুভাষা। আর সাধুভাষায় যে বাংলার যথার্থ প্রকৃতি, অর্থাৎ খাঁটি বাংলার শক্তি, লীলা ও মাধুর্য নেই তা আজকাল কারও অজানা নয়। কাজেই ওই সব কবিদের সব চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ অর্থাৎ সংস্কৃত ধ্বনিতরঙ্গ প্রবর্তনের ইতিহাস খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু এ স্থলে আমরা সে আলোচনা করব না; কারণ বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন বাংলা ছন্দের আলোচনা

করাও আমাদের অভিপ্রেত নয়। এ স্থলে আমরা শুধু আধুনিক অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক যুগের ছন্দের বিষয়েই আলোচনা করব; বিশেষভাবে "মানসী"র (১২৯৪-৯৭) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে ছন্দ প্রচলিত আছে শুধু তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যা হক, যে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করলেন সে সময় থেকেই বাংলা ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ উৎপাদনের অনেক চেষ্টা করেছেন। যথা—

(১)

অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা
সঙ্গী পরানের
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

—দুরন্ত আশা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(২)

তখন তারা দৃপ্তবেগের বিজয়-রথে
ছুটেছিল বীর মত্ত অধীর, রক্তধুলির পথবিপথে।
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে চলার পথিক-মতো
মন্দ-গমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে;
বিহঙ্গগান শান্ত তখন অন্ধরাতের পক্ষছায়ে।

—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটিতেই ধ্বনিতরঙ্গের লীলা খুব সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বাঙালি কবিরা শত শত বৎসর চেষ্টা করেও যা করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই তা পারলেন। কারণ আজ পর্যন্ত এ দেশে যত কবি আবির্ভূত হয়েছেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন একমাত্র ছন্দদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শে বাংলার ছন্দ-সরস্বতীর বীণার তারে যে কত বিচিত্র সুরতালের

ধ্বনিতরঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে তার সংখ্যা নেই। লক্ষ করার বিষয়, উপরে যে ধ্বনিতরঙ্গের নিদর্শন দেওয়া হল তার কোনোটিই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নয়; প্রথমটি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত, দ্বিতীয়টি চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখলেন যে সংখ্যা-গোণা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং সাধুভাষার মধ্যে ছন্দের বিদ্যুৎ-চমক সৃষ্টি করার ক্ষমতাটি মারা পড়েছে। তাই তিনি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং খাঁটি বা চলতি বাংলা ভাষার যোগে ঐ বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করেই সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-জিজ্ঞাসার পথে আরও কতকটা অগ্রসর হয়েছেন। তিনিই অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের মূল কথাটি আবিষ্কাব করেছেন, যার ফলে এখন বাংলায় নব নব ও বিচিত্র উপায়ে স্ববতরঙ্গের সৃষ্টি করা সম্ভবপব হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, সত্যেন্দ্রনাথ আসলে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত ছন্দতত্ত্বের উপরই কারুকার্য করেছেন মাত্র, রাবীন্দ্রিক ছন্দের এলাকা তিনি সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। তথাপি তিনি বাংলার কাব্যসরস্বতীর বীণায় যে তারটি যোজনা করে গেছেন তার মূল্য কম নয়; তাঁর এ দান আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে চিবকাল অক্ষয় হযে বিরাজ করবে।

বাংলা ছন্দে কি রূপে স্ববতরঙ্গের সৃষ্টি করা যায় এখন আমরা তাই আলোচনা কবব। বাংলায় দীর্ঘস্বর কার্যতঃ না থাকলেও বাংলার সমস্ত মূল ধ্বনিগুলিকে ছন্দের তরফ থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) লঘুস্বর এবং লঘুস্বরান্ত ব্যঞ্জন, যথা—অ, আ, ই, ঈ, ক, কা, কি, কী, ইত্যাদি। এগুলি সবই অযুগ্ম ব'লে, এদের অযুগ্ম স্বর ও বলা যায়। (২) যুগ্মস্বর বা যুগ্মস্বরান্ত ব্যঞ্জন, যথা—অই্ (ঐ), অউ্ (ঔ), আই্, উই্, এউ্, খৈ, যৌ, ভাই্ দুই্, ঢেউ্ ইত্যাদি। এ যুগ্মস্বরগুলি সবই স্বরান্তিক। (৩) ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনি, যথা—অন্, ইন্, অর্, উর্, উখ্, মন্, দিন্, ঘর্, দূর্, সুখ্ ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর অযুগ্ম ধ্বনিগুলি লঘু অর্থাৎ একমাত্রিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যুগ্মধ্বনিগুলি গুরু অতএব দ্বিমাত্রিক।

বাংলায় দীর্ঘস্বর না থাকলেও এই একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক ধ্বনিগুলির পর্যায়বিন্যাসের দ্বারা বাংলা ভাষায় যে বহু রকমের স্বরতরঙ্গ উৎপন্ন করা সম্ভবপর তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলায় স্বরতরঙ্গ সৃষ্টির মোটামুটি তিনটি উপায় আছে বলা যেতে পারে। প্রথম উপায় হচ্ছে প্রচলিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে স্বরের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া; তাতেই নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির রাখার জন্যে যুগ্ম বা

দ্বিমাত্রিক ধ্বনির প্রয়োগ বেশি হয়, ফলে ছন্দ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। উপরের প্রথম দৃষ্টান্তটিতেই এই উপায় প্রযুক্ত হয়েছে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) কলস-ঘায়ে ঊর্মি টুটে
রশ্মিরাশি চুর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু।
—অপেক্ষা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এটা পঞ্চমাত্রিক ছন্দ। কিন্তু এর কোনো পর্বেই পাঁচটি স্বর নেই; চার কিংবা তিন স্বরের সাহায্যেই পাঁচ মাত্রার পরিমাণ রক্ষা করতে হয়েছে। তাই যুগ্ম ধ্বনির ঘায়ে ছন্দের স্থির জলে ঊর্মি জেগে উঠেছে। আরেকটা দৃষ্টান্ত—

(২) এ নহে মুখর বন মর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম-রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
—দুঃসময়, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এটা ষণ্মাত্রিক ছন্দ, অথচ কোনো পর্বেই ছয়টি লঘুমাত্রা নেই। তাই যুগ্মধ্বনির সংখ্যাও বেড়ে, ছন্দও হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে। যুগ্মধ্বনির সংখ্যাবৃদ্ধি না হলে অনুপ্রাসের প্রাচুর্যেও এ ছন্দে কিছুতেই তরঙ্গ দেখা দিত না।

ছন্দতরঙ্গ উৎপাদনের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা-পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। তাতেও যুগ্মধ্বনির সংখ্যা বেশি হয় এবং ছন্দ লাস্যলীলায় দুলতে শুরু করে। পূরবীর "বিজয়ী" কবিতাটি ছন্দতরঙ্গের এই প্রণালীর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখানে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(৩) বেণুশাখার অন্তরালের অস্তপারের রবি
আঁক্‌বে মেঘে মুছ্‌বে আবার শেষ বিদায়ের ছবি।

* * *

ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
—আনমনা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুঃস্বর ছন্দ। অথচ প্রতিপর্বেই চারের বেশি মাত্রা আছে; এ ভাবে

যুগ্মধ্বনির পরিমাণ বেশি হওয়াতে ছন্দকে বাধ্য হয়ে তরঙ্গায়িত হতে হয়েছে।

এ দুটি পন্থাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত। এই দুটি উপায়েই তিনি ছন্দে অসংখ্য রকমের তরঙ্গভঙ্গি দেখিয়েছেন। তৃতীয় উপায়টি সত্যেন্দ্রনাথের অবলম্বিত। এ উপায়টি হচ্ছে লঘু এবং গুরু, যুগ্ম এবং অযুগ্মধ্বনিকে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে ছন্দের সর্বত্র বিন্যস্ত করা। কোনো সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে ধ্বনিমাত্রার এরূপ পর্যায়বিন্যাস করতে হলে বাংলা ছন্দের অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই।

বাংলা ছন্দের অন্তরের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে এ স্থলে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন; নতুবা কি রূপে বাংলা ছন্দের ধ্বনিতে উত্থানপতনের তরঙ্গলীলা দেখা দেয় তা বোঝা যাবে না। এ তরঙ্গলীলা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি তত্ত্বের উপর—(১) বাংলা ছন্দপর্বের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ তার ধ্বনিসংখ্যা ও মাত্রাপরিমাণ; (২) বাংলা ছন্দের উচ্চারণপদ্ধতি, ধ্বনির গতিক্রম ও বিরতি, ছন্দের ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট এবং যতি; (৩) লঘু ও গুরুমাত্রিক ধ্বনির পর্যায়-সন্নিবেশ। এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে প্রথম দুটি পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; প্রকৃতপক্ষে এরা দুটি পৃথক্ তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দুটি দিক্ মাত্র।

বাংলার উচ্চারণপদ্ধতির প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, আমরা এক ঝোঁকেই অনেকগুলি কথা উচ্চারণ করে ফেলি; তারপর ওই ঝোঁকের মুখে ধ্বনির যে গতি শুরু হয় সে গতির অবসান হলেই আরেক ঝোঁকে আরেকটা গতির সৃষ্টি হয়। এভাবে একেকটি ঝোঁকের দ্বারাই আমাদের উচ্চারণপদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনির গতি ও বিরতি নিয়ন্ত্রিত হয়। গতির যেখানে আরম্ভ সেইখানে পড়ে ঝোঁক, আর যেখানে সেই গতির অবসান ঘটে সেখানটাকেই বলি যতি। আবার ধ্বনির এই গতি ও বিরতি অর্থাৎ ছন্দের এই ঝোঁক ও যতির দ্বারাই ছন্দ-পর্বের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট হয়। প্রতিপর্বের স্বরসংখ্যা বা ধ্বনিমাত্রার ওজনের দ্বারাই ওই পর্বের দৈর্ঘ্য পরিমিত হয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

সখি ´প্রতিদিন হায় | ´এসে ফিরে যায় | ´কে!

তারে ´আমার মাথার | ´একটি কুসুম | ´দে।

যদি ´শুধায় কে দিল | ´কোন ফুল-কান | -´নে
তোর ´শপথ, আমার | ´নামটি বলিস্ | ´নে।

—সকরুণা, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিগুলি পড়লেই বোঝা যাবে যে প্রতি পংক্তিতে তিনটি করে ঝোঁক আছে। ঝোঁকগুলিকে রেফ-চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। একেক ঝোঁকেই কয়েকটি কথা একসঙ্গে সমান গতিতে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। তারপর যেখানে ওই গতি শেষ হয়েছে সেখানেই যতি; ছেদ-চিহ্ন দ্বারা যতি-নির্দেশ করা হল। ঝোঁক ও যতির মধ্যবর্তী যে অংশ তাকেই বলছি **ছন্দ-পর্ব**। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রত্যেক পংক্তিতে তিনটি করে পর্ব আছে, তাই এ ছন্দকে বলব ত্রিপর্বিক। কিন্তু এ হল এ ছন্দের বাহ্য আকৃতির কথা। এর অন্তঃপ্রকৃতি নির্ভর করছে একেকটি পর্বের গঠনপ্রণালীর উপর। দেখতে পাচ্ছি এই দৃষ্টান্তের পর্বগুলিতে ধ্বনিসংখ্যার স্থিরতা নেই; কোথাও চার কোথাও পাঁচ। আসলে এ ছন্দ ধ্বনি বা স্বরের সংখ্যার ভিত্তির উপর রচিত নয়; তাই এ ছন্দের তত্ত্ব হচ্ছে ধ্বনিমাত্রার সাম্য। এখানে প্রতিপর্বে ছ'টি করে ধ্বনিমাত্রা আছে; তাই এ ছন্দকে বলব ষণ্মাত্রিক ছন্দ; এইটেই হল এ ছন্দের অন্তর-প্রকৃতির পরিচয়। এখানে প্রথম দুপর্বে ছ'টি করেই মাত্রা আছে বটে, তৃতীয় পর্বে মাত্রা শুধু একটি। কিন্তু একটি মাত্রা হলেও যেহেতু এর উপর ঝোঁক রয়েছে সেজন্য একেও একটি স্বতন্ত্র পর্ব বলে গণ্য করব। অবশ্য এ পর্বে ছ'টির স্থানে একটি মাত্রা হওয়াতে একে অপূর্ণ পর্ব বলা প্রয়োজন। প্রয়োজনমতে এ পর্বেও মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে একে পূর্ণপর্বে পরিণত করা যায়। যা হক, বর্তমান ছন্দটিকে ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্বিক বললেই এর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়।

লক্ষ করার বিষয়, এখানে প্রত্যেক পংক্তিতেই প্রথম পর্বের পূর্বে দুটি করে মাত্রা স্থাপিত হয়েছে। এ দুটি মাত্রার উপর কোনো ঝোঁক বা অ্যাক্সেন্ট নেই; অতি মৃদু ভাবে এদের উচ্চারণ করতে হয়। যে মাত্রাসমষ্টি একটি ঝোঁকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই পর্ব বলেছি। অথচ এ দুটি মাত্রা কোনো ঝোঁকের এলাকায় আসছে না; আর ও দুটি মাত্রাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পড়লেও এ ছন্দের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তাই এ দুটি মাত্রাকে বলব **অতি-পর্বিক মাত্রা**। কিন্তু এই অতি-পর্বিক মাত্রাকে মূল ছন্দের সম্পূর্ণ বহির্ভূত মনে করলে ভুল করা হবে;

কারণ এ দুটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ছন্দপাঠে কোনো বিঘ্ন না হলেও আসল কবিতার অর্থসংগতি রক্ষিত হবে না। আসলে অতি-পর্বিক মাত্রা মূল ছন্দের অঙ্গীভূত না হলেও তার অঙ্গশোভন অলংকার তো বটে। মাত্রাবৃত্তের ন্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দেও অতি-পর্বিক শব্দ যোজনার ব্যবস্থা করা যায়। স্বরবৃত্ত ছন্দের অতি-পর্বিক শব্দকে মাত্রা না বলে অতি-পর্বিক স্বর বলাই সংগত, কেননা ওই ছন্দে স্বরসংখ্যাই রচনার ভিত্তি, ধ্বনিমাত্রা নয়। অতি-পর্বিক মাত্রা কিংবা স্বর কোনো ছন্দেই দুটির বেশি ব্যবহার না করাই রীতি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অতি-পর্বিক শব্দ যোজনার ব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথই অতি-পর্বিক মাত্রা ও স্বর ব্যবহারের প্রবর্তন করেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দূরে অশথ-তলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো?
সামনে আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচো।

—বাউল, শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্রনাথ

এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের পূর্বে দুটি করে অতি-পর্বিক স্বর যোজনা করা হয়েছে। প্রথম পদের পূর্বেও ওরকম দুটি স্বর অনায়াসেই বসানো যেতে পারত। এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অতি-পর্বিক মাত্রার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

অত চুপি চুপি কেন | কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর | মরণ!
অতি ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি | ধরণ?

—মরণ, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

এটি ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপর্বিক ছন্দ। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্বে চার মাত্রা; দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির শেষ পর্বে তিন মাত্রা। প্রতি পংক্তির পূর্বেই দুটি করে অতি-পর্বিক মাত্রা স্থাপিত হয়েছে।

ঝোঁক ও যতি স্থাপনে বৈচিত্র্য

আমরা দেখেছি পর্বসংখ্যার দ্বারা ছন্দের বাইরের আকৃতি মাত্র নিয়মিত হয়। কিন্তু ছন্দের অন্তরের গঠন নির্ভর করে ওই পর্বের নির্মাণপ্রণালীর উপর।— (১) ঝোঁক এবং যতি,—এই দু'জিনিসের দ্বারা প্রত্যেক পর্বের অন্তর্গত ধ্বনির আয়তন নিযন্ত্রিত হয়। যদি ঝোঁক ও যতি ঘন ঘন স্থাপিত হয় তবে পর্বের আয়তন হ্রস্ব ও ধ্বনির গতি দ্রুত হয়; আর ঝোঁক ও যতি যদি ঘন ঘন স্থাপিত না হয় তবে পর্বের আয়তন দীর্ঘ এবং ধ্বনির গতি বিলম্বিত হয়। এই ঝোঁক ও যতি স্থাপনকেই অন্য কথায় তাল বলা হয় এবং ধ্বনির গতিক্রমকেই লয় বলা হয়। ঘন ঘন তালে লয় দ্রুত এবং বিরল তালে লয় বিলম্বিত হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, পর্বের নির্মাণপ্রণালী ধ্বনিবিন্যাসের প্রকারভেদের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি শুধু ধ্বনি বা স্বরের সংখ্যার উপর নির্ভর করে ছন্দ রচিত হয় তবে সে ছন্দকে বলব স্বরবৃত্ত; যদি শুধু ধ্বনির মাত্রাপরিমাণের উপর ছন্দকে দাঁড় করানো যায় তবে সে ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। যদি একাধারে ধ্বনিসংখ্যা ও ধ্বনিমাত্রা স্থির রাখা হয় তবে তার নাম দেওয়া যায় **স্বর-মাত্রিক ছন্দ**। আর যদি বিশেষ উপায়ে স্বরসংখ্যা ও ধ্বনি-মাত্রার মিশ্রণ করে তথাকথিত 'অক্ষর' সংখ্যা ঠিক রেখে ছন্দ রচিত হয় তবে তাকে অক্ষরবৃত্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এ স্থলে ঝোঁক ও যতি -স্থাপনের বৈচিত্র্যের দ্বারা ছন্দের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাই দেখাব।

অত ´চুপি চুপি কেন | ´কথা কও
অতি ´ধীরে এসে কেন | ´চেয়ে রও

এখানে উভয় পংক্তিতেই দুটি অতি-পর্বিক মাত্রা আছে। তার পরেই উচ্চারণের ঝোঁক পড়েছে 'চুপি' এবং 'ধীরে', এ দুটি শব্দের উপর। এখানেই ধ্বনির যাত্রা শুরু হল এবং ছয়টি মাত্রা অতিক্রম করে উভয়ত্রই 'কেন' শব্দের পরে সে গতি থেমেছে; এইখানেই যতি। তার পরেই আবার ঝোঁক এবং গতি; চারমাত্রার পরই গতির অবসান অর্থাৎ ধ্বনি-বিরতি বা বিশ্রাম। সুতরাং এটা ছয় এবং চার মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্বিক ছন্দ। ঝোঁক এবং যতির পরিবর্তনের দ্বারা এ দুটি পংক্তিতে কত পরিবর্তন আনা যায় এবার তাই দেখা যাক।—

অত চু́পি চুপি কেন | ক́থা কও

এটা ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপর্বিক ছন্দ।

অত চু́পি চুপি | কে́ন কথা | ক́ও

এবার তিনটি ঝোঁক ও তিনটি যতি ; চার মাত্রার পরেই ধ্বনিগতির অবসান। এ ছন্দ আর ষণ্মাত্রিক রইল না। এটা হল চতুর্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্বিক ছন্দ।

অ́ত চুপি চুপি | কে́ন কথা কও

আবার ছন্দ বদ্‌লে গেল। এটা ষণ্মাত্রিক পূর্ণ দ্বিপর্বিক ছন্দ।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

এটা কি ছন্দ? শুধু দেখে বলার জো নেই। যে ভাবে উচ্চারণ করা হবে অর্থাৎ যেভাবে ঝোঁক ও যতি স্থাপন করা হবে তার উপরই ছন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

ঐ́ আসে ঐ | অ́তি ভৈরব | হ́রষে

যদি এ ভাবে পড়া হয় তবে এ ছন্দ হবে ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্বিক। কিন্তু যদি ঝোঁক ও যতি আরও ঘন ঘন স্থাপন করা যায়—

ঐ́ আসে | ঐ́ অতি | ভৈ́রব | হ́রষে

যদি এ ভাবে ঝোঁক ও যতি দিয়ে উচ্চারণ করা যায় তবে শুনতে আরেক রকম লাগে। ছন্দের প্রকৃতি বদ্‌লে গেল; ষণ্মাত্রিকের বদলে এ ছন্দ এখন হল চতুর্মাত্রিক অপূর্ণ চৌপর্বিক। একটা পর্বই বেড়ে গেছে এখানে।

ভু́বন মিলায় | মো́র অঞ্চল | থা́নিতে,
বিশ্ব নীরব | মোর কণ্ঠের | বাণীতে।

—প্রণয়-প্রশ্ন, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এভাবে পড়লে একে ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্বিক ছন্দ বলব। কিন্তু একে চতুর্মাত্রিক ছন্দের ভঙ্গিতেও পড়া যায়। যথা—

ভু́বন মি- | লা́য় মোর | অ́ঞ্চল | থা́নিতে
বিশ্ব নী- | রব মোর | কণ্ঠের | বাণীতে।

এটা চতুর্মাত্রিক ছন্দ এবং এখানে তিন পর্বের স্থানে চার পর্ব রয়েছে।

অনেক সময় একেকটা সমগ্র কবিতাকেও দু'রকম ছন্দে পড়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ"-এর "মনের মানুষ" কবিতাটি এর একটি সুন্দর নিদর্শন। একটু নমুনা দেখাচ্ছি।—

আজ এক | হয়ে তারা
মোরে করে | মাতোয়ারা,
এক বীণা- | রূপ ধরি'
এক গানে | ফেলে ছায়া।

এ ভঙ্গিতে পড়লে এ হল চতুর্মাত্রিক ছন্দ; দ্বিপর্বিক পূর্ণ চৌপদী। প্রতি পদে দুটি করে পুরো পর্ব আছে। আবার একে ষণ্মাত্রিক ছন্দেও পড়া যায়।—

আজ এক হয়ে | তারা
মোরে করে মাতো- | য়ারা,
এক বীণা-রূপ | ধরি'
এক গানে ফেলে | ছায়া।

এভাবে পড়লে এর ধ্বনি সম্পূর্ণ বদলে যায়, এখানে প্রতি পদে দুটি করে পর্ব আছে; কিন্তু একটি পর্ব পূর্ণ (ছ' মাত্রা) আরেকটি অপূর্ণ (দু'মাত্রা)। সুতরাং একে ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বি-পর্বিক চৌপদী ছন্দ বলা যায়।

গীতাঞ্জলির "জীবনে যা চিরদিন" প্রভৃতি রচনাটিও আগাগোড়া দুই ছন্দে পড়া যায়। একটু নমুনা দিচ্ছি।—

জীবনের শেষ | দানে
জীবনের শেষ | গানে,
হে দেবতা, তাই | আজি
দিব তব সকা- | শে,
প্রভাতের আলো- | কে যা
ফোটে নাই প্রকা | শে।

এ হচ্ছে ছ'মাত্রার ভঙ্গি। চার মাত্রার ভঙ্গিতে পড়তে গেলেই এর ঝোঁক ও যতি স্থাপনের কায়দা বদলে যাবে। যথা—

জীবনের | শেষ দানে
জীবনের | শেষ গানে

হে দেবতা, | তাই আজি
দিব তব | সকাশে,
প্রভাতের | আলোকে যা
ফোটে নাই | প্রকাশে।

আশা করি এখন এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে ঝোঁক এবং যতির দ্বারা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ স্থলে এটি লক্ষ করার বিষয় যে ঝোঁক এবং যতির দ্বারাও ছন্দে এক প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গকে বলতে পারি **পর্বিক তরঙ্গ,** কারণ সমগ্র পর্বটিকে আশ্রয় করেই এ তরঙ্গের উদ্ভব হয়। ঝোঁক ও যতি যত ঘনসন্নিবিষ্ট হবে ছন্দের পর্ব-তরঙ্গও ততই লীলায়িত হয়ে উঠবে; আর ঝোঁক ও যতির সন্নিবেশ যত দূরবর্তী হবে পর্বতরঙ্গ ততই দীর্ঘায়ত ও তার লীলা মৃদুতর হবে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে একথাটা স্পষ্টতর হবে। যথা—

মৌন | নৃত্যে | মগ্ন | খঞ্জন,
মেঘ্‌স- | মুদ্রে | চল্‌ছে | মন্থন!
দগ্ধ | দৃষ্টি | বিশ্ব- | সৃষ্টির
মুগ্ধ | নেত্রে | স্নিগ্ধ | অঞ্জন।

—ছন্দ-হিল্লোল, বেলাশেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে ঝোঁক ও যতি খুব অল্প-ব্যবহিত এবং পর্বগুলি খুব ছোট ছোট। কাজেই ছন্দের তরঙ্গলীলা খুব দ্রুত ও স্পষ্ট। এবার একটা দীর্ঘপর্বিক ছন্দতরঙ্গের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দেখো নাকি, হায়, | বেলা চলে যায়, | সারা হয়ে এল | দিন।
বাজে পূরবীর | ছন্দে রবির | শেষ রাগিণীর | বীণ্‌।

—লীলাসঙ্গিনী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা হল ষণ্মাত্রিক পর্বের ছন্দ, অর্থাৎ সুদীর্ঘ ছয়মাত্রার পর একবার করে ঝোঁক আসছে। একেকটা পর্ব অত্যন্ত দীর্ঘ বলে তার তরঙ্গও খুব আয়ত। তাই তরঙ্গের লীলাও খুব মন্থর, এমন কি সতর্ক না থাকলে এর অস্তিত্বই ধরা পড়ে না। কিন্তু স্বরসংখ্যা সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক যুগ্মধ্বনির সংখ্যা বর্ধিত করে কেমন করে ষণ্মাত্রিক পর্বেও ঢেউ তোলা যায় তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। উদ্ধৃত

দৃষ্টান্তটির সঙ্গে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির তুলনা করলেই এ কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে।—

ˊপৌষ প্রখর | ˊশীতে জর্জর, | ˊঝিল্লী-মুখর | ˊরাতি ;
নিদ্রিত পুরী, | নির্জন ঘর, | নির্বাণ দীপ- | বাতি।

—সিন্ধুপারে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

চতুর্মাত্রিক ছন্দের পর্বগুলি ছোট ছোট বলে তার তরঙ্গলীলাও ঘনবিন্যস্ত। যথা—

ˊএস তৃষ্- | ˊণার দেশে | ˊএস কল | ˊহাস্যে—
গিরি-দরী- | বিহারিণী | হরিণীর | লাস্যে,
ধূসরের | উষরের | কর তুমি | অন্ত,
শ্যামলিয়া | ও-পরশে | করগো শ্রী- | মন্ত।

—ঝর্ণা, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

চার তিন এবং দুই স্বরের স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বগুলিও ছোট বলে স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বতরঙ্গও খুব খরগতি। যথা—

(১) ˊদুঃখ সহার | ˊতপস্যাতেই | ˊহোক্ বাঙালীর | ˊজয়,
ভয়কে যারা | মানে তারাই | জাগিয়ে রাখে | ভয়।
মৃত্যুকে যে | এড়িয়ে চলে | মৃত্যু তারেই | টানে,
মৃত্যু যারা | বুক পেতে লয় | বাঁচতে তারাই | জানে!

—চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুঃস্বরপর্বিক ছন্দ। এবার ত্রিস্বরপর্বিকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(২) ˊওর তরে | ˊমন্থরে | ˊনদ হেথা | ˊচল্‌ছে,
জলপিপি | ওর মৃদু | বোল্ বুঝি | বোল্‌ছে।
দুই তীরে | গ্রামগুলি | ওর জয়ই | গাইছে,
গঞ্জে যে | নৌকো সে | ওর মুখই | চাইছে।

—দূরের পাল্লা, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পর্বে তিনটি করে স্বর। তাই এর পর্বতরঙ্গ চতুঃস্বরের পর্বতরঙ্গের চেয়ে বেশি লীলায়িত। দুই স্বরের পর্বতরঙ্গ আরও বেগবান্। যথা—

(৩) চুপ্‌ চুপ্‌ | —ওই ডুব | দ্যায় পান্‌- | কৌটি,
দ্যায় ডুব | টুপ্‌ টুপ্‌ | ঘোমটার বউটি।
ঝক্‌ঝক্‌ | কল্‌সীর | বক্‌ বক্‌ | শোন্‌ গো,
ঘোমটায় | ফাঁক বয় | মন উন্‌- | মন গো।

—দূরের পাল্লা, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্বতরঙ্গ অত্যন্ত ঢিমে তেতালা গোছের, প্রায় নেই বললেই হয়। কারণ এর পদগুলি অত্যন্ত আড়ষ্ট; পর্ববিভাগগুলি অস্পষ্ট; যতিও খুব নিয়মিত নয়; এর ঝোঁকগুলিও তীব্র নয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ছন্দ প্রায়ই যুগ্মপর্বের তালে চলে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দেবতার স্তবগীতে | দেবেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' | মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

—ভাষা ও ছন্দ, কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

এটা আট ও দশ অক্ষরের দ্বিপদী ছন্দ। এখানে এক ঝোঁকে আট ও দশ অক্ষরের একেকটা বড় বড় পদ অতিক্রম করতে হয় বলে এ ছন্দের পর্বিক তরঙ্গ এমন নিস্তেজ।

আমরা দেখলুম যে অক্ষরবৃত্তে পর্বতরঙ্গ প্রায় নেই; কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে পর্বতরঙ্গ আছে এবং তার বৈচিত্র্যও আছে। মাত্রাবৃত্তে পর্বতরঙ্গ হতে পারে তিন রকম—চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক এবং ষণ্মাত্রিক। স্বরবৃত্তের পর্বতরঙ্গও তিন রকম—দ্বিস্বরপর্বিক, ত্রিস্বরপর্বিক ও চতুঃস্বরপর্বিক। কিন্তু এক বিষয়ে এই সব রকম তরঙ্গই সমধর্মী; কারণ এই সব তরঙ্গেই উচ্চারণের ঝোঁকটা থাকে গোড়ার দিকে। এইটে বাংলা ভাষারই একটা বিশেষ লক্ষণ। বাংলায় যখন আমরা কথা বলি তখনও আমরা প্রথমেই একটা ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট দিয়ে কথা আরম্ভ করি এবং এক ঝোঁকেই এক সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে ফেলি; তারপর আরেক ঝোঁকে আরও কতকগুলি কথা বলি; এইটেই বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি। আমাদের কথিত এবং পঠিত বাংলার উচ্চারণের প্রতি লক্ষ করলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হবে। কথা বলার সময় আমরা যে ঝোঁক দেই সেটা অবশ্য অনিয়মিত অর্থাৎ কয়টা শব্দের পর আবার ঝোঁক হবে তার কিছু নিয়ম নেই; ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারেই ঘন বা বিরল ভাবে

ঝোঁক পড়ে। কিন্তু আমাদের নিত্যকথিত বাংলার উচ্চারণের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সচরাচর দুটি ঝোঁকের মধ্যে চার পাঁচটির বেশি স্বরধ্বনি অথবা ছ'-সাতটির বেশি ধ্বনিমাত্রা থাকে না। একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি।—

"কো́ল্‌রিজ ব́'লে গেচেন,—স́মুদ্রে জ́ল সর্বত্রই, কি́ন্তু এ́ক ফোঁ́টা জল নেই যে পা́ন করি। স́ময়ের স́মুদ্রে আছি, কি́ন্তু এ́ক মু́হূর্ত স́ময় নেই।"

—যাত্রী (পৃ ৩১১), রবীন্দ্রনাথ

এখানে রেফ-চিহ্নিত শব্দগুলির আদিতে ঝোঁক পড়েছে। আমাদের লক্ষ করার বিষয় এই যে এক ঝোঁকে চার-পাঁচটার বেশি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না, কোনো কোনো জায়গায় এক ঝোঁকে তিনটি এবং এক জায়গায় দুটি স্বরধনি উচ্চারিত হচ্ছে। মাত্রা হিসেবে দুটি ঝোঁকের মধ্যে কোথাও চারটি কোথাও পাঁচটি এবং কোথাও ছয়টি মাত্রা; কেবল এক জায়গায় আটটি মাত্রা আছে, তাও সন্দেহের বিষয়। যা হক, বাংলা গদ্যের এই ঝোঁকের তত্ত্বই বাংলা পদ্যের গোড়ার কথা। ঝোঁক যখন অর্থের বাহন হিসেবে অনিয়মিত ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা হয় গদ্য, আর ঝোঁক যখন নিয়মিত ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা পদ্য হয়ে ওঠে। ঝোঁককে নিয়মিত করার মানে হচ্ছে দুটি ঝোঁকের মধ্যবর্তী ধ্বনিসংখ্যা বা মাত্রাপরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া। ঝোঁক যদি চার স্বরের পর পর আসতে থাকে তবেই সে ছন্দ হয় চতুঃস্বরপর্বিক, আর যদি ছ'মাত্রার পর পর আসতে থাকে তবে সে ছন্দ হবে ষণ্মাত্রিক। বেছে বেছে শব্দ প্রয়োগ করে এ ভাবেই দ্বিস্বর, ত্রিস্বর এবং চতুর্মাত্রিক ও পঞ্চমাত্রিক ছন্দ রচিত হয়ে থাকে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলেও এ কথাই রয়েছে তা যথাস্থানে দেখাতে চেষ্টা করব।

এ স্থলে বাংলা ছন্দের সঙ্গে ইংরেজি ছন্দের তুলনা করা প্রয়োজন; কারণ ইংরেজি ছন্দের মূলেও এই ঝোঁকের তত্ত্বই রয়েছে। ওই ঝোঁক এবং যতির যোগেই ইংরেজি ছন্দে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই বেশি এবং ওই পার্থক্য কোথায় তা বুঝলেই বাংলা ছন্দের স্বরূপ পরিস্ফুট হবে।

প্রথমেই দেখতে পাই যে অধিকাংশ ইংরেজি শব্দেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে, আর ওই ঝোঁক কোনো শব্দের আদিতে, কোনো শব্দের মধ্যে এবং কোনো শব্দের অন্তে থাকে। তা ছাড়া ইংরেজিতে অনেকগুলি একস্বর শব্দ আছে

যার কোনো নিজস্ব ঝোঁক নেই। একাধিক স্বর (অর্থাৎ সিলেবল্)-বিশিষ্ট সব শব্দেরই আদি, মধ্য, অন্ত কোথাও না কোথাও ঝোঁক থাকবেই। শব্দের এই স্বভাবগত ঝোঁককে পর্যায়ক্রমে সাজিয়েই ইংরেজি ছন্দের সৃষ্টি। ঝোঁকহীন একস্বর শব্দ এবং ঝোঁকওয়ালা বহুস্বর শব্দের সাহায্যে নির্দিষ্ট পর্যায় রচনা করা ইংরেজিতে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। ইংরেজির আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, ও ভাষার স্বরান্তবর্ণ খুবই কম, হসন্তবর্ণ খুব বেশি। ইংরেজিতে হসন্তবর্ণের সংখ্যা চল্‌তি বাংলার হসন্তবর্ণের দ্বিগুণ কিংবা আরও কিছু বেশি, এ বিষয়ে ইংরেজির সঙ্গে সাধু বাংলার তুলনাই করা যায় না। যা হক, শব্দের এই স্বাভাবিক ঝোঁক এবং হসন্তবাহুল্যের সাহায্যে ইংরেজিতে পাঁচ রকম ছন্দ রচিত হয়ে থাকে—দুরকম দ্বিস্বরপর্বিক ছন্দ এবং তিন রকম ত্রিস্বরপর্বিক ছন্দ। দ্বিস্বরপর্বিক ছন্দে উচ্চারণের ঝোঁকটা প্রথম স্বরের উপরেও থাকতে পারে (trochee), দ্বিতীয় স্বরের উপরেও থাকতে পারে (iambus)। ত্রিস্বরপর্বিক ছন্দেও তেমনি ঝোঁকটা প্রতি পর্বের আদিতে (dactyl), মধ্যে (amphibrach) এবং অন্তে (anapaest) স্থাপিত হতে পারে।

বাংলায় কিন্তু কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত ঝোঁকপ্রবণতা নেই। সব শব্দই স্বভাবতঃ সমান নিস্তরঙ্গ। বাংলায় যে ঝোঁকের কথা পূর্বে বলেছি সে কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত নয়, সে ঝোঁক আমাদের উচ্চারণগত। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্যই আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ঝোঁক দিয়ে কথা বলি; এক সময় যে কথার উপর ঝোঁক দিলুম আরেক সময় সে-কথার উপর ঝোঁক না-ও দিতে পারি। ইংরেজিতে কিন্তু এরূপ হবার জো নেই; সে ভাষায় যে শব্দের যে স্বরের উপর ঝোঁক নির্দিষ্ট আছে সব সময় ওই স্বরের উপরই ঝোঁক থাকবে, এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। এর ফলে ইংরেজি গদ্যে এবং পদ্যে এমন একটা বন্ধুরতা ও তীক্ষ্ণতা আছে যা বক্তা ও শ্রোতার চিত্ত ও শ্রুতিকে কখনও অলস হবার প্রশ্রয় দেয় না। একঘেয়ে হওয়া ইংরেজি ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাংলার উচ্চারণ-ঝোঁকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ওই ঝোঁক সর্বদাই শব্দের আদিতে স্থাপিত হয়, কখনও অন্যত্র স্থাপিত হয় না। তার ফল এই হয় যে বাংলা পদ্যে ওই ঝোঁকটাই একঘেয়ে হয়ে পড়ে; কারণ পদ্যছন্দে সেটা নিয়মিত ব্যবধানের পর সব সময়ই শব্দের আদিস্বরে স্থাপিত হয়। বাংলা গদ্যে কিন্তু ওই ঝোঁকের দ্বারা একঘেয়েমির সৃষ্টি হয় না; কারণ গদ্যে

ঝোঁকের ব্যবধান নিয়মিত নয়; তা ছাড়া ওই ঝোঁক অর্থকেই অনুসরণ করে ব'লে এবং শ্রোতার নিকট অর্থ-ই একমাত্র লক্ষ্য ব'লে অনেক সময় ওই ঝোঁকের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। ইংরেজির ওই শাব্দিক ঝোঁক (অনেক সময় শব্দার্থের অনুসরণ করলেও) বাক্যের অর্থের উপর মোটেই নির্ভর করে না। বাক্যার্থের প্রতি শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সময় সময় যে ঝোঁকের ব্যবহার হয় তা এই শাব্দিক ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস (emphasis); এর সঙ্গে ছন্দের কোনো সম্বন্ধ নেই।

স্বরসংখ্যা হিসেবে ইংরেজি ছন্দ দুরকম—দ্বিস্বরেব ছন্দ ও ত্রিস্বরের ছন্দ। তার মধ্যেও দ্বিস্বর ছন্দের ব্যবহারই বেশি; ত্রিস্বর ছন্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। বাংলায় কিন্তু চতুঃস্বর ছন্দের প্রয়োগই সব চেয়ে বেশি; তবে খুব নিপুণ ভাবে শব্দ প্রয়োগ করে দ্বিস্বর ও ত্রিস্বরের ছন্দও বাংলায় বেশ রচনা করা যায় এবং তার ছন্দ-সৌন্দর্যও কম হয় না। পূর্বেই বলেছি হসন্তবর্ণ এবং যুগ্মস্বরের সংখ্যা ইংরেজিতে বাংলার দ্বিগুণ; কাজেই ইংরেজির সর্বদা প্রচলিত ছন্দ দ্বিস্বরপর্বিক এবং বাংলার বহুপ্রযুক্ত ছন্দটি চতুঃস্বরপর্বিক, এ রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এ স্থলে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সমস্ত ইংরেজি ছন্দই আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বধর্মী। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের অনুরূপ কোনো ছন্দ ইংরেজিতে নেই।

যা হক, ইংরেজিতে সচরাচর দ্বিস্বরপর্বিক ছন্দই ব্যবহৃত হয় আর বাংলায় নিত্যপ্রচলিত ছন্দ চতুঃস্বরপর্বিক, এইটাই ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের প্রধান পার্থক্য নয়। ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ছন্দের প্রধান পার্থক্য এই যে, ইংরেজিতে শাব্দিক ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট পর্বের আদি, মধ্য বা অন্ত যে কোনো জায়গায় স্থাপিত হতে পারে এবং ওই ঝোঁকগুলি শব্দেরই প্রকৃতিগত। কিন্তু বাংলায় স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত সমস্ত ছন্দেই উচ্চারণঝোঁকটি প্রতি পর্বের আদি স্বরের উপর স্থাপিত এবং ওই ঝোঁক শব্দের প্রকৃতিগত নয়, বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি-জাত। ইংরেজি ছন্দে পর্ববিভাগের পরিবর্তন করে ওই শাব্দিক ঝোঁককে পর্বের আদি, মধ্য ও অন্তে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু এ পরিবর্তনের দ্বারা শাব্দিক ঝোঁকের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না; সে ঝোঁক পূর্বে যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই থাকবে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

So faith-ful | in love, and | so daunt-less | in war,

There ne-ver | was knight like | the young Lo | -chin-var.

—Lochinvar, Marmion, W. Scott.

এটা হচ্ছে ত্রিস্বর অপূর্ণ চৌপর্বিক ছন্দ। শব্দের ঝোঁক সর্বত্রই পর্বের মধ্যে রয়েছে। এর ইংরেজি নাম হচ্ছে Amphibrachic tetrametre catalectic অর্থাৎ মধ্যগুরু অপূর্ণ চৌপর্বিক। কিন্তু পংক্তিগুলির পর্ববিভাগ অন্য ভাবেও করা যেতে পারে। যথা—

So faith | -ful in love, | and so daunt | -less in war,

There ne | -ver was knight | like the young | Lo-chin-var.

এবার কিন্তু শব্দের ঝোঁক প্রতি পর্বেই অন্ত্যস্বরের উপর পড়ছে। প্রথম ছুটি অন্ত্যগুরু দ্বিস্বর পর্ব অর্থাৎ Iambus; বাকি সবগুলিই অন্ত্যগুরু ত্রিস্বর পর্ব অর্থাৎ Anapaest। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে যে-ভাবেই পর্ববিভাগ করা হক না কেন, শব্দের উপরকার ঝোঁক পূর্বে যেখানে ছিল পরেও সেখানেই আছে।

বাংলায় কিন্তু পর্ববিভাগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের উপরকার ঝোঁকও সরে যায়; কারণ ওই ঝোঁক উচ্চারণের উপরই নির্ভর করে, শব্দের উপরে নয়। যথা—

এত বলি | গৃহকোণে
বসিলাম | দৃঢ় মনে
লেখকের | যোগাসনে
পাশে লয়ে | মসীপাত্র।

—শীতে ও বসন্তে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এটা হল চারমাত্রার দ্বিপর্বিক চৌপদী ছন্দ; প্রতি পদে ছুটি করে পর্ব এবং প্রতি পর্বের আদিস্বরের উপর ঝোঁক। পর্ববিভাগের পরিবর্তন করে দেখা যাক কি হয়।—

এত বলি গৃহ- | কোণে
বসিলাম দৃঢ় | মনে

লেখকের যোগা- | সনে,
পাশে লয়ে মসী | পাত্র।

এটা ছ'মাত্রার ছন্দ ; প্রতি পদে একটি পূর্ণ পর্ব (ছ'মাত্রা) এবং একটি অপূর্ণ পর্ব (দুমাত্রা) রয়েছে। কাজেই এটা হল ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্বিক চৌপদী ছন্দ। যা হক, এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক পদেই প্রথম পর্বের আদি স্বরের ঝোঁকটি ঠিক থাকলেও দ্বিতীয় পর্বের ঝোঁকগুলি দুমাত্রা সরে গেছে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

যবে ফিরে আসে গোঠে | গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে | ভ্রমিয়া

—মরণ, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

এটা ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্বিক ছন্দ। প্রত্যেক পংক্তির আগে দুটি করে অতি-পর্বিক মাত্রা আছে। পর্ববিভাগ পরিবর্তন করা যাক।—

যবে ফিরে আসে | গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান | মাঠে ভ্রমিয়া—

এখানে অতি-পর্বিক মাত্রা দুটিকেও পর্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পর্বের ঝোঁকগুলি কিরূপে দুমাত্রা করে বাঁ দিকে সরে গেছে তা-ই লক্ষ করার বিষয়। কিন্তু পর্ববিভাগ যতই পরিবর্তন করা যাক না কেন, বাংলায় প্রতি পর্বের আদিস্বরের উপর ঝোঁক থাকবেই ; কিন্তু ইংরেজিতে তা হবার জো নেই।*

* বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রূপকার। রূপদৃষ্টির যে প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছেন তার নবনবোন্মেষশালিতার পর্যাপ্ত পরিচয় বহু ক্ষেত্রে বহু রূপে সঞ্চিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পুরোহিত। তাঁর কবিপ্রাণে "সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে" যে বাঁশি চিরকাল মন্দ্রিত হয়েছে তাতে শুধু তাঁর জন্মভূমি নয়, সমস্ত পৃথিবীই মুখরিত হয়েছে। যে সুন্দরের আরাধনায় তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন, তার সন্ধানে তাঁকে নিত্যই কত নব নব ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়েছে তা কারও অজানা নয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও নিত্যনবীনতার কারণ এই যে, তাঁর জীবনদেবতাই তাঁকে বহু বিচিত্র ও নিত্যনূতন রূপে দেখা দিয়েছেন। তাই কবি নিজেই বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে তাঁকে সম্ভাষণ করেছেন—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী!"
"এ কি কৌতুক নিত্যনূতন,
ওগো কৌতুকময়ী!"

রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ে প্রত্যহ যে অগণিত ভাব সেই বহুবিচিত্রের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে, তাঁর শিল্পপ্রতিভাও তেমনি প্রতিদিনই তাকে অজস্ররূপে অভিব্যক্তি দান করেছে। তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার আলোতে ভাব ও রূপ যে কত ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, কবির নিজের কথাতেই তার প্রমাণ পাই।—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

—১৭, উৎসর্গ

বর্তমান প্রসঙ্গে ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। এ স্থলে আমরা শুধু তাঁর রূপদক্ষতার বিষয়ই আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের চিত্তপ্রকৃতি, আপন সার্থকতা লাভের উপায়স্বরূপ প্রথম থেকেই সৌন্দর্যের

ধ্বনিরূপকেই আশ্রয় করেছে। তাঁর সহজাত রূপনৈপুণ্যের স্পর্শ পেয়ে সৌন্দর্যের ধ্বনিস্বরূপ যে বিচিত্র ও অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। ধ্বনিশিল্পীরূপে তিনি বাংলা ভাষায় যে মায়ার সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। তিনি যে "সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে মৃত্তিকার কোলে" নেমে এসেছেন তাতে কে মুগ্ধ হয় নি?

(রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও সংগীত, ধ্বনির এই উভয় প্রকাশকেই অবলীলাক্রমে যুগপৎ রূপসৃষ্টির কার্যে নিয়োগ করেছেন। ছন্দ ও সংগীত ধ্বনিশিল্পের দুটি প্রধান অঙ্গ। ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পপ্রতিভা যে কত অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ স্থলে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।) কিন্তু একটিমাত্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যথাযোগ্য আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মূলতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটিমাত্র কথার উত্থাপন করব।

। শুধু রূপদৃষ্টি নিয়েই কবি কাব্য রচনা করতে পারেন না; রচনাকার্যে নিরত হয়ে তাঁকে প্রতি পদেই রূপতত্ত্বদৃষ্টির পরিচয়ও দিতে হয়। রূপতত্ত্বদ্রষ্টা-রূপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কত অসাধারণ, তাঁর ছন্দোবৈভবের আলোচনায় সে কথাটিই সকলের আগে মনকে আকৃষ্ট করে। কিশোরবয়স থেকেই তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিরূপের অসাধারণ তত্ত্বদৃষ্টি নিয়ে রচনাকার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারই ফলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ছন্দভাণ্ডারে তাঁর দান এত অপরিমেয়। বাংলা কাব্যজগতে তিনি যে কত নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যবহুলতাই তাঁর ছন্দের আসল কথা নয়। আসল কথা এই যে, তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সর্বপ্রথম ও যথার্থ আবিষ্কারক। তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষার মর্মগত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা ছন্দের মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর এ আবিষ্কার পৃথিবীর ভাষাগত অন্য কোনো আবিষ্কারের চেয়ে কম নয়। বাংলা ভাষার আপাতদৃশ্যমান স্থূল আবরণের অন্তরালে অবস্থিত যে ছন্দরাজ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা আটলান্টিকের পরপারস্থ তরঙ্গপ্রচ্ছন্ন নূতন মহাদেশ-আবিষ্কারের চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়কর নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দজগতের সর্বব্যাপী মূল মাধ্যাকর্ষণনীতিটি আবিষ্কার করেই নিরস্ত হন নি পরন্তু ওই নীতিটিকে কাব্যসাহিত্যের বহু ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র উপায়ে প্রয়োগ করে বাংলা ছন্দে যে হিল্লোল, যে ঝংকার, যে নৃত্যলীলা ও

সুরমাধুর্য তিনি সঞ্চারিত করেছেন তা যথার্থই অপরিমেয়। ছন্দের দিক্ থেকে একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই একাধারে নৃত্য ও সংগীতের যুগপৎ অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। কোন জাদুমন্ত্রের প্রভাবে বাংলা ছন্দকে এমন অদ্ভুতরূপে তরঙ্গিত ও মুখরিত করে তোলা সম্ভবপর হল তার আলোচনা করার সার্থকতা আছে।

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।

—ভাষা ও ছন্দ, কাহিনী

এই উক্তি আদিকবি বাল্মীকির কাব্য সম্বন্ধে যতখানি সত্য, রবীন্দ্রনাথের নিজের কাব্য সম্বন্ধেও তার চেয়ে কম সত্য নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার জীর্ণ বাক্যে তাঁর ছন্দ যে নব সুর দিয়েছে তার যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই দেখা দরকার, তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত যে ছন্দশক্তিকে আবিষ্কার করেছেন তার মৌলিক নীতিসূত্রগুলি কি। ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহির্গঠন, কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির আসল স্বরূপটি কি, সে তত্ত্বের উপরেই বাংলা ছন্দের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। তিনি যেদিন ওই তত্ত্বটি আবিষ্কৃত করলেন সেদিন থেকেই বাংলা ছন্দ সার্থকতা ও ঐশ্বর্য-লাভের পথের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বাঙালি কবিরা বহুশত বৎসর যাবৎ নানা প্রয়াস ও সাধনার ভিতর দিয়ে অতি মন্থর গতিতে বাংলা ছন্দের স্বরূপ-সন্ধানের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু সে তত্ত্বের আবরণ কেউ উন্মোচন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টির রশ্মিতে যেদিন সে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হল সেদিন দেখা গেল বাংলা ছন্দের শক্তিও ক্ষীণ নয় এবং তার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর নয়। সেদিন থেকে বাংলা ছন্দ তাঁর শঙ্খধ্বনির অনুসরণ করে ত্রিপথগা ভাগীরথীর মতো তিনটি স্বতন্ত্র ও প্রবল ধারায় বয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যসাহিত্যের আসরে প্রথম প্রবেশ করেন তখন বাংলায় যে কটি ছন্দ প্রচলিত ছিল সে সমস্তই অক্ষরবৃত্তের অন্তর্গত। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দগুলিও তখন পর্যন্ত সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় নি। ছন্দ নিয়ে তখন বহু পরীক্ষা চলেছে, অক্ষরবৃত্তের মূলতত্ত্বটি তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল। পরবর্তী কালে

রবীন্দ্রনাথের হাতেই এ ছন্দগুলি সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে) সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করব। কিন্তু এ স্থলে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কৃত্রিমতা ও অপূর্ণতা প্রথম থেকেই তাঁর স্বাভাবিক প্রখর ছন্দবোধকে পীড়া দিচ্ছিল। তাই তাঁর বাল্যরচনাগুলিতে একটা অতৃপ্তি ও প্রচলিত ছন্দকে ভেঙে-চুরে নূতন ছন্দ-সৃষ্টির একটা অশ্রান্ত প্রয়াস দেখতে পাই। ("শৈশবসংগীত" বা "কৈশোরক"-এর সময় থেকে "ছবি ও গান"-এর সময় পর্যন্ত এই অতৃপ্তি ও প্রয়াসের যুগ। "কড়ি ও কোমল"-এ ছন্দ অনেকখানি শান্ত ও সংযত হয়েছে। কিন্তু তখনও ছন্দের আসল রূপটি আবিষ্কারের প্রয়াসে কিছুমাত্র বিরাম নেই। "মানসী"র যুগে যখন ছন্দের ধ্বনিপরিমাপের নূতন নীতি আবিষ্কৃত হল তখন থেকেই এই অবিশ্রান্ত সন্ধানের কতকটা তৃপ্তি ঘটল। তার পর হতেই রবীন্দ্রকাব্যনিকুঞ্জ বহু বিচিত্র ছন্দের স্তবকে স্তবকে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।)

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের রচনায় যুক্তবর্ণের বিরলতা একটি বিশেষ লক্ষ করার বিষয়। যুক্তবর্ণের এই বিরলতা আকস্মিক নয়। অযুক্ত ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির মধ্যে যে একটি অবাধ প্রবাহ ও সংগীতমাধুর্য আছে, তা তাঁর সংগীতনিপুণ কিশোরহৃদয়ে সহজেই অনুভূত হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, যেখানেই যুক্তবর্ণের ব্যবহার হয় সেখানেই ছন্দের সহজ ধ্বনিপ্রবাহে বাধা ঘটে। এ-ই হচ্ছে তাঁর তরুণবয়সের রচনায় যুক্তবর্ণের বিরলতার প্রধান কারণ। কিন্তু যুক্তবর্ণকে যদি ছন্দ থেকে একেবারে বর্জন করা যায় তাহলে ছন্দের ধ্বনি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে এবং অত্যন্ত তরল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে, এ কথাটিও তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যুক্তবর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রবল দ্বন্দ্ব কবির মনে দেখা দিয়েছিল। ("কড়ি ও কোমল"-এর সময় পর্যন্ত বহু রচনাতেই এই দ্বন্দ্বের প্রচুর আভাস রয়েছে। কিন্তু "মানসী"-র যুগে তিনি যখন ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়েও যুক্তবর্ণ-ব্যবহারের জাদুমন্ত্রটি আবিষ্কার করলেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তবর্ণের পর্যাপ্ত ব্যবহারে তিনি যে ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই।)

তখনকার দিনের কবিরা শুধু অক্ষর গুনেই ছন্দ রচনা করতেন। তাঁরা একথা বুঝতে পারেন নি যে, লিপিবদ্ধ বা পঠিত অক্ষরের সঙ্গে ছন্দের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। ছন্দ একটি ধ্বনিশিল্প, 'সুতরাং ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে

ধ্বনির তত্ত্ব। লিখিত অক্ষরের সংখ্যার উপরে ছন্দ মোটেই নির্ভর করে না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম "মানসী" রচনার সময়ে এ কথাটি অনুভব করেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে, অক্ষরগোনার অন্ধপদ্ধতি বর্জন করে ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ বা quantity-র উপরেই ছন্দকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, সংস্কৃত ছন্দের রীতিতে বাংলায় ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ বা quantity নির্ণয় করা চলবে না। কারণ বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি সংস্কৃতের পদ্ধতি থেকে অনেক পৃথক্। স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু বাংলার পক্ষে নয়। বাংলায় কার্যতঃ দীর্ঘস্বরের ব্যবহার নেই বললেই হয়। অথচ শুধু হ্রস্বস্বরের ব্যবহারে ছন্দ বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে হয়ে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন যে, বাংলায় দীর্ঘ ধ্বনি নেই বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি আছে এবং এই যুগ্মধ্বনি স্বভাবতঃই গুরুমাত্রিক ও তরঙ্গায়িত। তা ছাড়া যুক্তবর্ণ আসলে যুগ্মধ্বনিকে লিখিত আকারে প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালী ভিন্ন আর কিছু নয়। সুতরাং যখন থেকে তিনি অযুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা (metrical moment বা instant) এবং যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা ধরে ছন্দ রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন থেকে যুক্তবর্ণ ব্যবহারের কল্পিত বাধাটি অন্তর্হিত হয়ে গেল। বরং যুক্তবর্ণ ছন্দের ধ্বনিকে বিচিত্র ও তরঙ্গিত করে তোলার পক্ষে বিশেষ অনুকূলই হল। এভাবে "মানসী"র যুগ থেকেই তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রিক পর্ব বা quantitative measures-এর প্রবর্তন করেন। এই মাত্রিক পর্বের বহু বিচিত্র সমাবেশের ফলে বাংলায় ছন্দের এক নূতন ধারার উৎপত্তি হয়েছে। ছন্দের এই ধারার সাধারণ নাম দিয়েছি মাত্রাবৃত্ত। ইংরেজিতে একে বলা চলে quantitative metre। ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে রচিত "ভুলভাঙা" নামক কবিতাটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কবিতা। এই "ভুলভাঙা" কবিতাটিতেই সর্বপ্রথমে শুধু অক্ষর গুনে ছন্দ রচনার ভুল ভেঙেছে। অক্ষরবৃত্তের শিকলভাঙা সর্বপ্রথম বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দটির একটি নমুনা দিচ্ছি।—

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।...

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো ;
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
জীবনহত।

—ভুল-ভাঙা, মানসী

ওই "বন্ধন" কথাটিই সর্বপ্রথমে বাংলা ছন্দে অক্ষরগুনতির বন্ধনপাশ ছিন্ন করেছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন সেটি হচ্ছে ধ্বনি-পরিমাণের তত্ত্ব। এ ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্বরপ্রাধান্য ; তাই এ ছন্দ বাংলা গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা-সমূহের অধিকাংশই এ ছন্দে রচিত। এই স্বরপ্রবণতার একটা অসুবিধা এই যে, এর ধ্বনি অনেক সময়ই নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কবিকে খুব সতর্ক ভাবে স্থানে স্থানে যুগ্মধ্বনির প্রয়োগ করে ধ্বনিকে বিচিত্র ও তরঙ্গিত করে তুলতে হয়। সেজন্যেই দেখতে পাই, যে রবীন্দ্রনাথ তরুণবয়সে যুক্তবর্ণের ব্যবহারে অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করতেন সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর পরিণত-বয়সের রচনায় প্রয়োজনমতো যুক্তবর্ণের (অর্থাৎ যুগ্মধ্বনির) বজ্রকরতালি বাজিয়ে ছন্দকে উদ্‌বেল করে তুলেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর,
ঝংকৃত তার ঝিল্লীর মঞ্জীর।
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির,
হে গম্ভীর ॥

—বর্ষামঙ্গল, বনবাণী

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গীতিকবিতার উপযোগী সুরমাধুর্য আছে কিন্তু ওই স্বরপ্রবণতার মধ্যে বাংলা উচ্চারণরীতির আসল তত্ত্বটিই ধরা পড়ে না। উচ্চারিত ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা ও স্বরঝংকারের দ্বারা মাত্রাবৃত্তের মাধুর্য সৃষ্টি

হয়। কিন্তু আমাদের নিত্যউচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে সুর নেই, আছে accent বা ঝোঁক। আর মাত্রানির্ণয়ই ধ্বনির সবটুকু তত্ত্ব নয়। উচ্চারণের সময় শব্দের উপরে আমরা যে ঝোঁক দিয়ে কথা বলি, ওই ঝোঁকটির মধ্যেই ধ্বনির আসল শক্তিটি নিহিত থাকে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ওই ঝোঁকটিই সুরের আড়ালে গৌণ হয়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই বাংলা ছন্দে ওই ঝোঁকটুকু সহ আমাদের সমগ্র উচ্চারণপদ্ধতিটাকেই অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণরূপে সমাবিষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছেন। "ছবি ও গান"-এই তিনি সর্বপ্রথমে আমাদের এই উচ্চারণতত্ত্বটিকে প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ঘুমের মত মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলে' দুলে'
গায় শুধু নূপুর রণরণি'
আধেক মুদি' আঁখির পাতা
কার সাথে যে কচ্ছে কথা
শুনছে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি॥

—মাতাল, ছবি ও গান

"কড়ি ও কোমল"-এও এ রকম ছন্দের প্রয়োগ আছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মাকে,
সকাল বেলা "জাগো জাগো" পারুল দিদি ডাকে॥

—সাত ভাই চম্পা, কড়ি ও কোমল

কিন্তু এ দুই গ্রন্থে এ ছন্দ রচনার মধ্যে অনেক স্থানেই সন্দেহ ও শৈথিল্য রয়েছে। ছড়াজাতীয় কবিতা ছাড়া উচ্চ ভাবের রচনায় এ ছন্দ চলবে কি না এ বিষয়ে কবির মনে কতকটা সন্দেহ রয়ে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু "ক্ষণিকা"-র যুগ থেকে তিনি নিঃসন্দেহে ও দৃঢ়হস্তে এ ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।—

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী।

বলছে—কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে ;
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলা দেশে
উচ্চ কথা।
তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী,
হে প্রেয়সী ॥

—ক্ষতিপূরণ, ক্ষণিকা

কিংবা

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।

—সেকাল, ক্ষণিকা)

এ সমস্ত কবিতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি কেমন নিঃসংশয়চিত্তে এ ছন্দ রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। ("ক্ষণিকা"-র পর "উৎসর্গে" তিনি এ ছন্দে খুব উচ্চ ভাবের কবিতা রচনা করেছেন এবং তার পর থেকে এ ছন্দে কত বিচিত্র ভঙ্গির অজস্র রচনা প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা করা যায় না। এভাবে রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনা ও অসংখ্য রচনার ফলে এ ছন্দটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে।)

দেখা যাক, এ ছন্দের ভিতরকার তত্ত্বটি কি। লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার মধ্যে এর প্রাণতত্ত্বের সন্ধান মিলবে না। ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ অর্থাৎ quantity-র মধ্যেও এ ছন্দকে ধরা যায় না। এ ছন্দের ভিতরকার তত্ত্ব হচ্ছে, প্রাকৃত বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি ও ঝোঁক (accent) স্থাপনের রীতি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ ছন্দে প্রতি পর্বের অন্তরে রয়েছে আমাদের উচ্চারণরীতির অখণ্ড রূপটি। মাত্রাপরিমাণ নির্ণয়ের কোনো চেষ্টা এ ছন্দের মধ্যে নেই, আছে শুধু অখণ্ড ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যার হিসাব। প্রতি

পর্বের ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যার হিসাব স্থির থাকলেই এ ছন্দের গঠন অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রত্যেকটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর ভিতরকার কথা হচ্ছে, একটি যুগ্ম বা অযুগ্ম স্বরের অস্তিত্ব। তাই এই ছন্দের এক-একটি পর্বের নাম দেওয়া যায় স্বরপর্ব বা syllabic measure। স্বরপর্বের বিভিন্ন সমাবেশের ফলে এ ছন্দ রচিত হয় বলেই এ ছন্দের নাম দিয়েছি **স্বরবৃত্ত**। ইংরেজিতে একে বলা যায় syllabic metre।

(মাত্রাবৃত্তের ন্যায় স্বরবৃত্তও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই দান। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ ছন্দ বাংলায় ছিল না, এ কথা সত্য নয়। এ ছন্দ আমাদের পল্লীসংগীতে, ছেলেভুলানো ছড়ায়, কবির গানে, বাউলের গানে, এক কথায় আমাদের লোকসাহিত্যে বহুকাল যাবৎই প্রচলিত ছিল। রামপ্রসাদের গানে এ ছন্দের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ঘটেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কয়েকটি কবিতাতেও এ ছন্দের সাক্ষাৎ পাই মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের নিকটও এ ছন্দ অজ্ঞাত ছিল না। যথা—

বাহিরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম-ধোয়া।
পুণ্যখাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম ফললো ধর্ম,
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥

—বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মধুসূদন

হায় কি হলো— বঙ্গদর্শন বঙ্কিম দেছে ছেড়ে,
হায় কি হলো— দেশটা গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে।

—হায় কি হলো, কবিতাবলী, হেমচন্দ্র

লক্ষ করার বিষয়, প্রথম দৃষ্টান্তটিতে দুটি পর্বে (বাহিরে ছিল, বুড় সালিকের) ছন্দের ত্রুটি ঘটেছে এবং দুটি দৃষ্টান্তই লৌকিক কায়দায় সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত বলে উভয়ত্রই স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"-এও এক স্থানে স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত

আছে। এ স্থলেও লৌকিক বিষয়বস্তুই এ ছন্দে রচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তটি হচ্ছে এই।—

উমার কেশ চামরছটা,
তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী,
দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া,
বুড়ার দাড়ি শণের নুড়া,
ছারকপালে ছাইকপালে,
দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার,
বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ও মা উমা
করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া,
ভাঙড় পাগল ওই লো বুড়া,
ভারত কহে—পাগল নহে,
ওই ভুবনেশ্বর লো॥

—কন্দল ও শিবনিন্দা. অন্নদামঙ্গল

এখানেও কয়েকটি পর্বে ত্রুটি ঘটেছে। ভারতচন্দ্রের পূর্বকালবর্তী গোবিন্দদাসের রচনাতেও স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যথা—

চিকন কালা গলায় মালা বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে তেরছ নয়ানে চায়॥

রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি করেন নি। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথমে প্রাকৃত বাংলার এই খাঁটি ছন্দটিকে লোকসাহিত্যের আসন থেকে উন্নীত করে সর্বপ্রকার রসসাহিত্যের উপযুক্ত বাহনরূপে অসংকোচে নিযুক্ত করেছেন এবং এ ছন্দটিকে যথোচিতরূপে মার্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করে বহু শাখাপ্রশাখায় লীলায়িত করে বাংলার ছন্দভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। বাংলার এই খাঁটি ছন্দের শক্তি, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের আবিষ্কারের দ্বারা তিনি

আমাদের কাব্যসাহিত্যের যে সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন তার পরিমাপ নেই।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভিতরকার গঠনকৌশলও তাঁরই হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি বাংলা ভাষার আদিম ছন্দ না হলেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সময়ে এই অক্ষরবৃত্তকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্তকে তার বর্তমান সৌষ্ঠব ও সুসংগতি দান করতে বাংলার প্রাচীন কবিদের বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। বহুকাল যাবৎ বহু কবির অক্লান্ত পরিশ্রম, পরীক্ষা ও প্রয়াসের ফলে অক্ষরবৃত্ত তার বর্তমান রূপে উপনীত হয়েছে। এ ছন্দটি মূলে মাত্রিক না ধ্বনিসংখ্যক, এর পর্বগঠন কিরূপ হবে, প্রতি পংক্তিতে কয়টি 'অক্ষর' থাকবে, যতিস্থাপনের বিধি কিরূপ, এর প্রকারভেদ কি উপায়ে উৎপন্ন করা যায়, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই প্রাচীন কবিদের মনে সর্বদাই সংশয় থেকে যেত। তাই প্রাচীন কাব্যগুলিতে দেখতে পাই, এ ছন্দ কোথাও মাত্রিক, কোথাও স্বরসংখ্যক, এর পর্বগঠন ও যতিস্থাপন অনিয়মিত, প্রতি পংক্তির অক্ষরসংখ্যাও অনির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে একদিকে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব ও অক্ষরগোনার প্রয়াস, অন্যদিকে মাত্রা বা স্বরসংখ্যা নির্দিষ্ট করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার উপরে সমস্ত ছন্দ সুর করে গানের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করার প্রথা, এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে এ ছন্দটি একটি সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করতে পারে নি। শক্তিমান কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যেও এ ছন্দকে একটা অনিয়মিত অবস্থার মধ্যে দেখতে পাই। ভারতচন্দ্রের ছন্দবোধ অসাধারণ ছিল সন্দেহ নেই এবং তাঁর হাতেই এ ছন্দ সর্বপ্রথমে কতকটা নির্দিষ্ট আকার লাভ করে। কিন্তু ভারতচন্দ্রও এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই দেখতে পাই অন্নদামঙ্গল কাব্যে পয়ারের পংক্তিতে যদিও অক্ষরসংখ্যা সর্বত্রই চোদ্দ ঠিক আছে এবং মিলের রীতিও সুনির্দিষ্ট হয়ে এসেছে, তথাপি বহু স্থলেই যতিস্থাপন বিষয়ে শৈথিল্য দেখা যায়। অথচ যতিস্থাপনবিধি এবং পর্বগঠন প্রণালীই ছন্দের মূল কথা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে পয়ারের যতিস্থাপনবিধির অনিশ্চয়তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখে বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥

—কন্দল ও শিবনিন্দা, অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র

এ দৃষ্টান্তটির উভয় পংক্তিতেই সাত অক্ষরের পরে যতি পড়েছে। কিন্তু

অক্ষরবৃত্তের একটি নিয়ম এই যে, এ ছন্দ প্রতি পংক্তির আদি, মধ্য, অন্ত কোথাও অসমসংখ্যক অক্ষরকে স্বীকার করে না। কাজেই সাত অক্ষরের পরে যতিস্থাপন এ ছন্দের স্বভাববিরুদ্ধ।

আধুনিক কালে মধুসূদন দত্ত অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে বাংলা কাব্যের জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নবশক্তির সঞ্চার হল। তিনি যেদিন থেকে পয়ারের সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দিলেন সেদিন থেকেই ওই ছন্দে যথার্থ মহাকাব্য রচনা করা সম্ভবপর হল। কিন্তু তাঁর অসামান্য শক্তির কাছেও এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে নি। "মেঘনাদবধ কাব্যে" অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সদ্যমুক্ত প্রবল শক্তির প্রচুর পরিচয় যেমন আছে তেমনি ও ছন্দ ব্যবহারের বহু ত্রুটিবিচ্যুতির নিদর্শনও রয়েছে। যথা—

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।

"মেঘনাদবধ কাব্যে"র এই প্রথম পংক্তি-কয়টিতেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শক্তি এবং যতিস্থাপনের ত্রুটির প্রমাণ রয়েছে। মধুসূদন পংক্তির যে-কোনো স্থানে যতিস্থাপন কবতে দ্বিধা করতেন না। অথচ অসমসংখ্যক অক্ষরের পর যতিস্থাপন এ ছন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর "আত্মবিলাপ" থেকে আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে!...
মাৎসর্য-বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?

এই পংক্তি-কয়টিতে দুই জায়গায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংগতি নষ্ট হয়েছে। 'বাড়ায় মাত্র আঁধার' এবং 'মাৎসর্য-বিষদশন', এ দুটি পদে এ ছন্দের একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এ ছন্দে কখনও তিন-দুই-তিন কিংবা দুই-তিন-তিন এই পর্যায়ে অক্ষর বিন্যাস করা সংগত নয়, তাতে শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে। চার-চার কিংবা তিন-তিন-দুই, এই হচ্ছে এ ছন্দের অক্ষরসমাবেশের বিধি।

'বাড়ায় শুধু আঁধার' কিংবা 'শুধু বাড়ায় আঁধার', কোনোটাই ভালো শোনায় না। কিন্তু 'বাড়ায় আঁধার শুধু' কিংবা 'আঁধার বাড়ায় শুধু' বললে বেশ ভালো শোনায়। তেমনি 'মাৎসর্য-বিষদশন' না বলে 'মাৎসর্যের বিষদন্ত' বললেই ঠিক শোনাত।

(রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। তাঁর স্বাভাবিক ছন্দবোধশক্তিই তাঁকে এ ছন্দের যথার্থ পথে চালিত করেছে। তাই তাঁর রচিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পূর্বোক্ত দোষগুলো সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছে। আর, তাঁরই রচনা থেকে এ কথা সর্বপ্রথমে বোঝা গেল যে, অক্ষরবৃত্ত আসলে একটি মিশ্রপ্রকৃতির ছন্দ। গোড়ায়, লিখিত হরফ বা অক্ষবের সংখ্যা গুনে রচনা করার প্রথা থেকেই এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং বর্তমানেও প্রধানতঃ অক্ষরসংখ্যা গুনেই এ ছন্দ রচিত হয়। তাই এ ছন্দেব নাম দেওয়া হয়েছে অক্ষরবৃত্ত।)

কিন্তু আসলে অক্ষরসংখ্যা এ ছন্দের মূলগত তত্ত্ব নয়। ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হতে পারে না। গোড়া থেকেই অক্ষরসংখ্যা দেখে রচনা করার অভ্যাস থাকার ফলে এ ছন্দের স্বরূপ আবিষ্কৃত হতে এত বিলম্ব ঘটেছে। এ ছন্দের স্বরূপ এই যে, এর প্রত্যেক শব্দের শেষ অংশের (সিলেব্‌ল্‌-এর) প্রকৃতি মাত্রিক (quantitative) এবং বাকি অংশের প্রকৃতি স্বরসংখ্যক (syllabic)। একস্বর শব্দের ধ্বনিটিকে প্রান্তিক বলেই গ্রহণ করতে হয়; সুতরাং এ-প্রকার শব্দের ধ্বনিটিও মাত্রিক প্রকৃতির। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

| ॥ | ॥ | | | |
প্রান্তর্‌-সীমায়্‌ ছায়াবটে
| | | | ॥ | | ॥
মৌনব্রত বউ্‌-কথা-কও্‌।

—হেমন্ত, নটরাজ

এখানে প্রত্যেক শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি (যুগ্মদণ্ড চিহ্নযোগে নির্দিষ্ট) দ্বিমাত্রিক রূপে উচ্চারিত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আদি বা মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক বলেই গণ্য হয়েছে। বিশেষ লক্ষ করার বিষয়—এখানে 'বউ' কথাটিতে দুই ধরা হয়েছে, 'বউ' না লিখে যদি 'বৌ' লেখা হত, তাহলে

অক্ষরসংখ্যা কমে গেলেও ছন্দ ঠিকই থাকত এবং 'বৌ' কথাটিকেও দ্বিমাত্রিক বলেই গণ্য করতে হত। অউ্-কার অর্থাৎ ঔ-কারের মতো যদি অও্-কারের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংকেতলিপি থাকত, তাহলে 'কও' কথাটির দ্বিমাত্রিকতা অব্যাহতই থাকত। 'বউ-কথা-কও' কথাটিকে ছ'টি অক্ষরের সাহায্যেই লেখা হক, কিংবা চার অক্ষরের সাহায্যেই লেখা হক, এ কথাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সর্বদাই 'ছয়' বলেই গৃহীত হবে। কারণ এখানে অউ্ এবং অও্ শব্দের প্রান্তে আছে। পক্ষান্তরে 'মৌন' কথাটিকে যদি 'মউ্ন'-রূপে লেখা হয় তা হলেও এ শব্দটি দুই অক্ষরের শব্দ বলেই গণ্য হবে। কারণ এখানে অউ্-কার শব্দের প্রান্তে অবস্থিত নয়। এটিই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূল তত্ত্ব। এ তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেরূপ অব্যাহত আছে, তাঁর পূর্ববর্তী অন্য কোনো কবির রচনাতেই তেমন অব্যাহত নেই। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও এ নিয়মের দু-একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু তাঁর রচিত বিপুল কাব্যসাহিত্যে সে দু-একটি ব্যতিক্রম অতি নগণ্য। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

> কুরূচি, তোমার লাগি' পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
> যে-ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
>
> —কুরূচি, বনবাণী

> জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
> হেথা আল্পনা আঁকে,
> এ নিকুঞ্জ জানো আপনার।
>
> —চামেলি-বিতান, বনবাণী

অক্ষরবৃত্তের নিয়ম অনুসারে 'কুরূচি' ও 'জ্যোৎস্না' শব্দে দুই এবং 'আল্পনা' শব্দে তিন অক্ষর ধরা উচিত। এ স্থলে তা হয় নি বলে এ তিনটি শব্দকেই একটু টেনে বিলম্বিত উচ্চারণ করতে হচ্ছে। যদি লেখা হত—

> শুভ্র জ্যোৎস্না শাখা-ফাঁকে
> হেথায় আল্পনা আঁকে

তাহলে খারাপ শোনাত না এবং ধ্বনিটি একটু দৃঢ় হত। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

> উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে
>
> —পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী

এখানে 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দে তিন 'অক্ষর' ধরা হয়েছে। কিন্তু 'দিক্‌' কথাটি অন্য কথার সঙ্গে সমাসবদ্ধ হলেও একটি স্বতন্ত্র শব্দ এবং এর অন্তবে একটি যুগ্মধ্বনি রয়েছে। সুতরাং অক্ষরবৃত্তের নিয়ম অনুসারে এই একস্বর শব্দটিকে দ্বিমাত্রিক বলেও ধরা যায় এবং তাহলে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে তিন না ধবে চাব ধরতে হবে। সুতরাং

উদয়ের দিক্‌প্রান্ত-তল্পে নেমে এসে

এরূপ লিখলেও অক্ষববৃত্তের নিয়ম অব্যাহত থাকত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে তিন না ধরে চার ধরেছেন। যথা—

চলেছে উজান ঠেলি' তবণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।

—নববধূ, মহুযা

দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীববে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

—প্রত্যাগত, মহুযা

অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও যে মাত্রিক গণনাবীতিব স্থান আছে তাব প্রমাণ এই যে উদ্‌ধৃত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যদি 'ওই' না লিখে 'ঐ' লেখা হত তাহলে 'অক্ষব'-সংখ্যা কমে যেত বটে, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অব্যাহতই থাকত। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

—পঁচিশে বৈশাখ, পুববী

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

—বুদ্ধদেবেব প্রতি, প্রবাসী ১৩৩৮ অগ্রহাযণ

উদ্‌ধৃত পংক্তি-দুটিতে 'অক্ষর'সংখ্যা কম আছে কিন্তু 'ঐ' শব্দে দুমাত্রা রয়েছে বলে ছন্দ অক্ষুণ্ণই আছে।

অক্ষরবৃত্তের মাত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি (বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ)। সুতরাং এ স্থলে এ বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত, ছন্দের এ দুটি ধারাই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান

এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দও তাঁরই হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। বাংলা ভাষার ধ্বনি, উচ্চারণরীতি ও ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টি নিয়ে রচনাকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রিক (quantitative), স্বরসংখ্যক (syllabic) ও মিশ্র (অক্ষরবৃত্ত)—এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।

ধ্বনির একক বা unit নির্ণয়েব তিনটি স্বতন্ত্র প্রণালী থেকেই ছন্দের এই তিনটি ধারার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি unit-এর বিভিন্ন সমাবেশের ফলে যে ছন্দপর্ব গঠিত হয় তার উপরেই ছন্দের ভিতরকার গঠনকৌশল নির্ভর করে। ছন্দপর্ব নির্মাণব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও কৌশল অপরিসীম। ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহের দুটি যতির মধ্যবর্তী যে অংশ তাবই নাম পর্ব (measure)। ছন্দে যতিস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন প্রকারের পর্বের উৎপত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র উপাযে ছন্দে যতিস্থাপন ও পর্বগঠন করেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি যে শুধু নব নব বিচিত্র পর্বগঠন-পদ্ধতির উদ্ভাবন কবেছেন তা নয়। তিনি বহু প্রচলিত ছন্দপর্বকে পরিবর্তিত ও সুসংগত করেছেন, স্থলবিশেষে পরিত্যাগও কবেছেন। এ বিষয়ে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথমেই মাত্রাবৃত্তের কথা। প্রতি পর্বে চার, পাঁচ, ছয় কিংবা সাত মাত্রা করে থাকতে পাবে। এই হিসাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

চতুর্মাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে এ স্থানে আলোচনা করব না।

পঞ্চমাত্রিক ছন্দ গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পঞ্চমাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হয় না। জয়দেবের "অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণিভূষণং" কিংবা "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী" ইত্যাদি ছন্দের অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় পঞ্চমাত্রিক ছন্দের প্রবর্তন করেন। এখন পঞ্চমাত্রিক ছন্দ আমাদের কবিদের একটি অতি প্রিয় ছন্দ হযে দাঁড়িয়েছে। এটি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পরে' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ষণ্মাত্রিক ছন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যে এ ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ আছে বলে মনে হয় না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ষণ্মাত্রিকের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

ঈষৎহসিত বয়ান-চন্দ
তরুণী-নয়ন নয়ন-ফন্দ।
বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী,
ত্রিভুবনমনোমোহিনী।

—গোবিন্দদাস

কিন্তু প্রাচীন কবিরা কেউ এ ছন্দের যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং এ ছন্দের প্রকৃত বাংলা আকৃতি কি হবে তা নিঃসংশয়ে স্থির করতে পারেন নি। অনেক স্থলেই তারা যুক্তবর্ণের বাহুল্য এবং সংস্কৃত রীতিতে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণপদ্ধতি অবলম্বন করেই এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ ছন্দের স্বরূপ ও মর্যাদা উপলব্ধি করে একে বাংলার উচ্চারণরীতিতে রূপান্তরিত করে বাংলা ছন্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। ষণ্মাত্রিক ছন্দ যে বাংলা সাহিত্যের কত বড় সম্পদ্ তা সাহিত্যানুরাগীমাত্রই জানেন। রবীন্দ্রনাথ যদি এ ছন্দের প্রবর্তন না করতেন তবে বাংলা কাব্যজগতের একটি বৃহৎ মহাদেশই অনাবিষ্কৃত রয়ে যেত। বর্তমানে বাংলা গীতিকবিতা, গাথা প্রভৃতি বহু ধরনের অসংখ্য কবিতারই বাহন এই ষণ্মাত্রিক ছন্দ। দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পূর্বোক্ত "মানসী"র 'ভুল-ভাঙা' কবিতাটিই বাংলার প্রথম খাঁটি ষণ্মাত্রিক ছন্দের কবিতা।

সপ্তমাত্রিক ছন্দও ষণ্মাত্রিকেরই মতো সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তিত। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নন্দনন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধনিন্দিত-অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥…
কঞ্জলোচন কলুষমোচন শ্রবণরোচন-ভাষ।
অমলকোমল-চরণকিশলয়-নিলয়-গোবিন্দদাস॥

—গোবিন্দদাস

কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥

—অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র

প্রথম দৃষ্টান্তটি সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলার উচ্চারণরীতি এখানে পীড়িত হয়েছে এবং এক স্থলে ('গোবিন্দদাস') ছন্দে ত্রুটি ঘটেছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে বাংলার উচ্চারণরীতি বজায় আছে। কিন্তু ছন্দ নিখুঁত নয় এবং বিশেষভাবে একটি শব্দের ('বসন্ত') দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এ ছন্দটি অক্ষর গুনেই রচিত হয়েছে, ধ্বনির মাত্রাবিচার স্বীকৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ ছন্দকে নিখুঁত এবং খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে সাহিত্যে প্রবর্তন করেছেন।—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।

—প্রভাত-উৎসব, প্রভাত-সংগীত

"প্রভাত-সংগীত"-এর উদ্ধৃত পংক্তি-দুটি এ ছন্দের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করেন নি। তাই তিনি ধ্বনিসংগতি রক্ষার জন্যে এই কবিতাটিতে সযত্নে যুক্তাক্ষরকে বর্জন করে চলেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এ ছন্দে যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের দ্বারা অতি চমৎকার কবিতা রচিত হয়েছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিভিন্ন প্রকারের পর্ব গঠন করেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হন নি। নানা প্রকারের পর্বের একত্র সমাবেশের দ্বারাও তিনি ছন্দে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি।—

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।

—বিরহানন্দ, মানসী

এ স্থলে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, অগ্রজ কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরে কতখানি পড়েছে তার পরিচয় তিনি "জীবনস্মৃতি"তেই বিশেষভাবে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচনায় "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের ছন্দের আলোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। এ স্থলে সে কার্যে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি শুধু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিকে মিলিয়ে দেখলেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।—

দু'-সখী, এইরূপে, চুপে চুপে কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত॥

কথনো চড়ে গিবি, ধীরি ধীরি ; কথনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে ॥

—স্বপ্নপ্রয়াণ, দ্বিতীয় সর্গ, ১১৩

রবীন্দ্রনাথের পর্বসমাবেশের আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বানতে সভাগৃহ ঢাকি'
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্বর সাতটি যেন পোষা পাখী।

—গানভঙ্গ, সোনার তবী

"কথা"র 'মস্তকবিক্রয়' কবিতাটিও এই ছন্দেই রচিত। শুধু একটি অতিরিক্ত মিলের জন্যই অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়েছে।

স্ববৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ চতুঃস্বর পর্বকেই অবলম্বন করেছেন। দ্বিস্বর বা ত্রিস্বরের পর্ব তিনি রচনা করেন নি। কিন্তু ত্রিস্বর ও চতুঃস্বরের যোগে তিনি পর্বগঠনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যথা—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।

—১৮, গীতালি

অক্ষরবৃত্তের পর্বগঠন সম্বন্ধে এ তত্ত্বটি তাঁরই রচনায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে যে, ও-ছন্দ কোথাও অসমসংখ্যক অক্ষরকে স্বীকার করে না। সুতরাং প্রাচীন কবিরা যে-সব ছন্দোবন্ধে তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি অসমসংখ্যক অক্ষরের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি সে-সব ছন্দোবন্ধকে অক্ষরবৃত্ত থেকে মাত্রাবৃত্তের এবং স্থলবিশেষে স্বরবৃত্তের এলাকায় স্থানান্তরিত করেছেন। তাঁরই রচনা থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দগঠনের মূল উপাদান চার অক্ষরের পর্ব। অক্ষরবৃত্ত আসলে চতুরক্ষর পর্বেরই ছন্দ। কিন্তু বহু স্থলে দুটি পর্বের সংযোগে আট অক্ষরের এক-একটি যুক্তপর্ব এ ছন্দকে একটি বিশেষ গাম্ভীর্য দান করে। আবার চার অক্ষরের একটি পূর্ণপর্ব এবং দুই অক্ষরের একটি অর্ধপর্বের সংযোগেও অনেক সময় এক-একটি যুক্তপর্বের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এ ধরনের খণ্ডিত যুক্তপর্ব সচরাচর পংক্তির শেষ প্রান্ত ব্যতীত অন্যত্র স্থাপিত হয় না। চার অক্ষরের পূর্ণপর্ব, আট অক্ষরের যুক্তপর্ব এবং ছয় অক্ষরের সার্ধপর্ব, এ তিনটি উপাদানেই সমস্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচিত হয়েছে।

কতকটা অস্পষ্টভাবে হলেও মধুসূদনই এ তত্ত্বটি প্রথম অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি পর্বগঠন ও যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যের দ্বারা বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এ তত্ত্বটি তিনি কখনও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই "মেঘনাদবধ" কাব্যে ছন্দের এমন প্রবল গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও বহু স্থানেই ছন্দপতন ঘটা সম্ভবপর হয়েছে এবং সেজন্যই তাঁর রচনায় "বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে" ইত্যাদি রকমের ছন্দবিকৃতির সাক্ষাৎ পাই। যা হক, এ কথা মনে রাখা উচিত যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দেও অমিত্রাক্ষরতাই আসল কথা নয়। বাংলা পয়ার ছন্দে মিলের অভাব ঘটানোই মধুসূদনের কৃতিত্ব নয়। পয়ারের সংকীর্ণতা অর্থাৎ ও-ছন্দে পর্বগঠন ও যতিস্থাপনে যে একটা একঘেয়ে ভাব ছিল, সেটাকে ঘুচিয়ে দিয়ে পর্বগঠন ও যতিস্থাপনে বৈচিত্র্য ঘটিয়ে কবির ভাবকে দুটি মাত্র পংক্তির গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে বহু পংক্তির মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়াতেই মধুসূদনের কৃতিত্ব। পয়ার ছন্দের দুর্বলতাই এই যে, ও-ছন্দে প্রতি পংক্তির অন্তে পূর্ণযতি স্থাপন করতেই হবে এবং দুটি মাত্র পংক্তির মধ্যেই একটি ভাবকে সমাপ্ত করা চাই। তাই মধুসূদনের বিদ্রোহী মন পয়ারের এই সংকীর্ণ গণ্ডির বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে কবির ভাবকে পংক্তির পর পংক্তিতে ছড়িয়ে দিল। তাঁর প্রবর্তিত ছন্দে পংক্তি যেখানে শেষ হয়, ভাব ও ছন্দের প্রবাহ সেখানেই বিরত হয় না। ভাব ও ছন্দের এই **প্রবহমানতা** (enjambement)-ই মধুসূদনের বিশেষ দান। "মেঘনাদবধ"-এর বিশেষত্বই হচ্ছে ওই enjambement বা প্রবহমানতা; অমিত্রাক্ষরতা ওই ছন্দের অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। সুতরাং "মেঘনাদবধ"-এর ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বললে সব কথা, এমন কি আসল কথাটিই বলা হয় না। Blank verse-এর বাংলা নাম 'অমিত্রাক্ষর' হতে পারে; কিন্তু অমিত্রাক্ষরতা blank verse-এরও মূল কথা নয়। সুতরাং মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দের যদি কোনো যথার্থ নাম দিতে হয় তবে তাকে বলা উচিত 'প্রবহমান পয়ার' ছন্দ। এ ছন্দ অ-মিলও হতে পারে, স-মিলও হতে পারে। মিলের অভাবে কিংবা সদ্‌ভাবে এর আসল প্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য ঘটে না।

মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দ সম্বন্ধে এতটা বিস্তৃত আলোচনা করার উদ্দেশ্য আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ও-ছন্দও রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেই পূর্ণতা লাভ করেছে। কি ভাবে করেছে সে কথা আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। মধুসূদনের ছন্দের পূর্ণ পরিচয়জ্ঞাপক নাম হচ্ছে—অমিল প্রবহমান পয়ার। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যে, মিলের অভাবটাই ছন্দের আসল তত্ত্ব নয় ; বরং অন্যান্য সকল ছন্দেরই মতো ও-ছন্দেও মিল থাকার একটা সার্থকতা আছে। মিল ছন্দের অপরিহার্য অঙ্গ না হলেও ছন্দের একটি অতি প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ "চিত্রাঙ্গদা", "বিসর্জন", "রাজা ও রানী" প্রভৃতি নাট্যকাব্যে অমিল প্রবহমান পয়াব ছন্দই ব্যবহার করেছেন, কারণ নাট্যকাব্যে মিল না থাকার সার্থকতা আছে। কিন্তু অন্য সর্বত্রই তিনি ওই ছন্দে সর্বদাই মিল বক্ষা করেন। তাঁব স-মিল প্রবহমান পয়াবের চমৎকার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'মেঘদূত', 'যেতে নাহি দিব', 'মানসসুন্দরী', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে।)

প্রবহমান পয়ার সম্বন্ধে এ স্থলে আর-একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে বহুকাল যাবৎ চোদ্দ অক্ষরের পয়ারই চলে আসছে। কিন্তু পয়ারকে শুধু চোদ্দ অক্ষবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কবে রাখতে হবে, এমন অপরিহার্য কোনো বিধান নেই। তাই ষোল অক্ষরেব পয়ার রচনাব প্রয়াস অনেকেই করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে ষোল অক্ষরের পয়াব রচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আর-একটি স্বভাব হচ্ছে এই যে, এই ছন্দ সর্বদাই প্রতি পংক্তির শেষ প্রান্তে একটি করে ছয় অক্ষরের সার্ধপর্বের অপেক্ষা রাখে, তাই চোদ্দর স্থানে ষোল অক্ষবের পয়ার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সুবিধাজনক হল না। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে ষোল অক্ষরের পয়ার রচনা করেন নি এবং আজকালকার কবিরাও তা করেন না। কিন্তু পয়ার ছন্দে যদি দ্বিতীয় পর্বেব পবেই চার অক্ষরের আর-একটি পর্ব যোগ করে দেওয়া যায় তবে আঠারো অক্ষরের একটি চমৎকার নতুন ধরনের পয়ারের উৎপত্তি হয়। এ ছন্দের নাম দেওয়া যায় 'বর্ধিত পয়ার'। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে এই বর্ধিত পয়ার ছন্দের প্রথম দৃষ্টান্ত পাই। তার পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে এ ছন্দ যে কি শক্তি ও সৌষ্ঠব অর্জন করেছে তা অজানা নেই। এখন এ ছন্দটি বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর অতি প্রিয় বাহন-রূপেই গৃহীত হয়েছে। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দটিকেও শুধু দুই পংক্তিব মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন নি ; বহু পংক্তিব মধ্যে একে মুক্ত ও প্রবহমান কবেছেন। এ ছন্দের পরিসব বেশি, তাই এ ছন্দের প্রবাহধাবা মধুসূদনের পয়ারের চেয়ে বিপুলতর ও প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। এ ছন্দের কোনো অ-মিল দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের স-মিল প্রবহমান বর্ধিত পয়ারের দৃষ্টান্তরূপে

তাঁর 'সমুদ্রের প্রতি', 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে।)

কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কৃত্রিম বন্ধন থেকে এতখানি মুক্তি দিয়েও রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হতে পারেন নি। সমস্ত ছন্দেই বন্ধনের একটা সার্থকতা আছে, কিন্তু মুক্তিরও একটা সার্থকতা আছে। তাই তিনি ছন্দকে অধিকতর মুক্তির পথে চালিয়ে নিতে প্রয়াসী হলেন। সাধারণ পয়ার বা বর্ধিত পয়ারের প্রতি পংক্তিতে অক্ষরসংখ্যার যে বন্ধনটি রয়েছে তার সার্থকতা কোথায়? ছন্দ যখন প্রতিপংক্তির অন্তস্থিত যতিটিকে স্বীকার করে চলে তখন ওই অক্ষরসংখ্যার সীমাবন্ধনটির প্রয়োজনীয়তা থাকে। কিন্তু ছন্দের ধারা যখন অক্ষরসংখ্যা ও পংক্তির অন্তস্থিত বিরামের তীরকে অতিক্রম করে পংক্তির পর পংক্তিকে প্লাবিত করে প্রবাহিত হতে থাকে, তখনও প্রতিছত্রকে একটি নির্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। এ তত্ত্বটি অনুভব করেই রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান ছন্দে পংক্তি-নির্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডি দৃঢ়হস্তে ভেঙে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই চরম মুক্তি ঘটেছিল "সবুজপত্র" বা "বলাকা"র যুগে। বলাকায় যে মুক্ত ছন্দের সন্ধান পাই তাতে কৃত্রিম বন্ধনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। সুতরাং এ ছন্দের নাম দেওয়া যেতে পারে মুক্তক ছন্দ। যে-ছন্দকে আমরা vers libre বা free verse নামে জানি তাকেই 'মুক্তক' নামে অভিহিত করলাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোনো ছন্দের পক্ষেই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ বন্ধনই ছন্দের প্রাণ। সকল বন্ধনকে অতিক্রম করলে ছন্দ আর ছন্দই থাকবে না—সে হবে তার পক্ষে আত্মঘাত। কিন্তু ছন্দের পক্ষে সকল বন্ধনেরই মর্যাদা সমান নয়। যে বন্ধন ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য সে বন্ধনই হচ্ছে ছন্দের প্রাণ বা মূল তত্ত্ব। পর্বগঠন-পদ্ধতি ও যতিস্থাপন-রীতি এ বন্ধনের অন্তর্গত। আর যে বন্ধন ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য নয় সে বন্ধন স্থলবিশেষে ধ্বনিপ্রবাহের বাধা হলেও অধিকাংশ স্থলেই তা ছন্দের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। পংক্তি- ও শ্লোক-নির্মাণপদ্ধতি ও মিলস্থাপনের রীতি এ শ্রেণীর বন্ধনের অন্তর্গত। যা হক, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মুক্তক ছন্দে দ্বিতীয় প্রকার বন্ধন থেকেই মুক্তিলাভ ঘটে, প্রথম প্রকারের বন্ধন থেকে নয়। মুক্তক ছন্দকেও পর্বগঠন ও যতিস্থাপন সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়; কিন্তু পংক্তি- ও শ্লোক-নির্মাণ এবং মিলস্থাপন বিষয়ে এ ছন্দের প্রচুর স্বাধীনতা রয়েছে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দগঠনের মূল তত্ত্বগুলিকে এ ছন্দে রক্ষা করতে হয়, অন্য বিষয়ে এর গতিপ্রকৃতি বিধিবদ্ধ নয়। মুক্তক ছন্দ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে এ স্থলে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়।

গিবিশচন্দ্র তাঁর নাটকগুলিতে বহু স্থলে একপ্রকার মুক্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, গিরিশচন্দ্রের ছন্দ রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দের সঙ্গে সমজাতীয় নয়। গিরিশচন্দ্র অভিনয়সৌকর্যের জন্য সাধারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই ভেঙে অসমপংক্তিতে বিন্যস্ত করেছেন মাত্র। তাতে চোদ্দর নিয়মকে অতিক্রম করা হয়েছে বটে, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যে মূলগত রীতি তাকেও অনেক সময় লঙ্ঘন করা হয়েছে। যা হক, এ উভয় ছন্দের মধ্যে তুলনা ঘটাবার উপযুক্ত স্থান এটা নয়।

অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তক' ছন্দটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করেছেন। এ কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু তাতে তাঁর ছন্দপ্রতিভার কিছুমাত্র লাঘব ঘটে না। কারণ বিদেশী free verse এবং আমাদের 'মুক্তক' ছন্দ বাইরের আকৃতিতে সদৃশ হলেও, ও-দুই ছন্দের মৌলিক প্রকৃতি কখনও এক নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণপদ্ধতি অব্যাহত রেখে ছন্দকে মুক্তিদান করার যে কৃতিত্ব, ইউরোপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সে কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকবে। বিলিতি blank verse-এর অনুসরণ করে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করায় মধুসূদনের কবিপ্রতিভা ম্লান হয়েছে, না উজ্জ্বলতর হয়েছে?

কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, "বলাকা"র যুগের বহু পূর্ব থেকেই মুক্ত ছন্দ রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে দেখা দিয়েছিল। তাঁর কবিজীবনের সূচনাতেই দেখতে পাই ছন্দের বাধাগুলোকে অতিক্রম করার একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। "সন্ধ্যাসংগীত" "প্রভাতসংগীত" এবং "ছবি ও গান"-এ তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ নব নব ছন্দ রচনা করা ও যুগপৎ ছন্দের বাধাকে লঙ্ঘন করে যাবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আজও রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সমানভাবে জাগরূক ও সক্রিয় আছে। যা হক, এ কথা বলা প্রয়োজন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় মুক্তক ছন্দও প্রবহমান, মুক্তক ছন্দেও ধ্বনির প্রবাহ পংক্তির পর পংক্তিতে বয়ে চলে। প্রবহমান পয়ারে যেমন মিল না-দেওয়াটাই

অপরিহার্য নয়, প্রবহমান মুক্তকেও তেমনি মিল দেওয়াটাই অত্যাজ্য নয়। অ-মিল মুক্তক রচনা করাও সম্ভব, যদিও তাতে মিলের মাধুর্যের অভাবটা শ্রুতিকে কতকটা পীড়া দেয়। Collins-এর Ode to Evening[১] নামক কবিতাটি অ-মিল মুক্তক ছন্দে রচিত। আর "মানসী"র যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্ফল কামনা' নামক চমৎকার কবিতাটিও বাংলায় অ-মিল মুক্তক ছন্দের একটি সুন্দর নিদর্শন। এ কবিতাটিকে "বলাকা"র যুগের স-মিল মুক্তক ছন্দের অগ্রদূত মনে করা যেতে পারে।)

অক্ষরবৃত্তে যত রকম ছন্দোবন্ধ রচনা করা যায়, স্বরবৃত্তেও সে-সমস্তকেই স্বচ্ছন্দেই চালানো যায়—এ সত্যটিও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই প্রতিপন্ন হয়েছে। অক্ষরবৃত্তের সাধারণ পয়ার, বর্ধিত পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বহু ছন্দোবন্ধকেই তিনি চমৎকাররূপে স্বরবৃত্তে রূপান্তরিত করেছেন। সুতরাং আশা করা যায়, 'বসুন্ধরা', 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ অঙ্গের প্রবহমান কবিতাও স্বরবৃত্ত ছন্দে রচনা করা সম্ভব। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রবহমান কবিতা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। Paradise Lost প্রভৃতির ন্যায় মহাকাব্য যখন ইংরেজি ছন্দে রচনা করা সম্ভব হয়েছে তখন বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দকেও ও-রকম মহাকাব্যজাতীয় কবিতার বাহন করা অসম্ভব নয়। কারণ ইংরেজি ছন্দ ও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, এ তথ্যটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের জানিয়েছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দে ওই ধরনের কাব্য রচনার বাধা কবে দূর হবে অর্থাৎ স্বরবৃত্তকে কবে "মেঘনাদবধ"-এর মতো কাব্যের বাহন করা সম্ভব হবে জানিনে। কিন্তু তার সূত্রপাতও রবীন্দ্রনাথই করেছেন। তাঁর রচনায় স্বরবৃত্ত প্রবহমান পয়ারের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পেয়েছি। "পূরবী" গ্রন্থের 'পূরবী'-নামক প্রথম কবিতাটি ও-রকম প্রবহমান স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কিন্তু তার পরে তিনি প্রবহমান স্বরবৃত্তে আর কোনো কবিতা রচনা করেছেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রবহমান কবিতার দৃষ্টান্ত খুব বিরল হলেও, ও-ছন্দে যে খুব চমৎকার মুক্তক ছন্দ রচনা করা যায় তাও রবীন্দ্রনাথই

১ এই কবিতাটির ছন্দ অ-মিল, কিন্তু তাকে মুক্তক বলা যায় না। পক্ষান্তরে Wordsworth-এর Ode on Immortality-র ছন্দ মুক্তক, কিন্তু স-মিল।

দেখিয়েছেন। "সবুজপত্রের" যুগেই তিনি এ তত্ত্বটিকে উদ্‌ঘাটিত করেন। "পলাতকা"র কবিতাগুলিতেই এ ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তির চরম প্রকাশ হয়েছে। এ ছন্দেব গঠনপ্রণালী মুক্তক অক্ষববৃত্তেব মতোই; শুধু স্বববৃত্তের বিশেষ রীতিগুলিকে মেনে চলতে হয়। সুতরাং এ বিষযে অধিকতব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মাত্রাবৃত্তকেও অক্ষববৃত্ত এবং স্বরবৃত্তেব মতো মুক্তকে পরিণত কবা যায় কি না, এ বিষযে সংশয রয়েছে। কাবণ মাত্রাবৃত্তের সুবপ্রবণতাই ও-ছন্দের দৃঢ গতিভঙ্গিব একটি প্রবল অন্তবায়। কিন্তু পঞ্চমাত্রিক ছন্দে সুরের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত কম এবং এ ছন্দটিই চতুঃস্বরপর্বিক ছন্দেব নিকটতম মাত্রিক প্রতিরূপ। তাই পঞ্চমাত্রিক ছন্দে মুক্তক বচনা কবা একেবাবে অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতাটি ("মহুযা") কতকটা মুক্তক ছন্দেই রচিত হয়েছে। এ কবিতাটিতে পংক্তির দৈর্ঘ্য বিষয়ে কোনো স্থিরতা নেই, এ বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতাই রয়েছে। কিন্তু লক্ষ করাব বিষয়—এই কবিতাটির ভাব অধিকাংশ স্থলেই দুটি পংক্তির মধ্যেই আবদ্ধ আছে, বহু পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে যায় নি। সুতবাং এ ছন্দটিকেও পূর্ণ বা প্রবহমান মুক্তক বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটিমাত্র তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবা গেল। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁর ছন্দোবন্ধের অজস্র বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আরও বহু বক্তব্য রয়ে গেছে। বাংলা ছন্দে তিনি যে কত অসংখ্য ভঙ্গিতে পর্ববন্ধ (বা পংক্তিগঠন) ও শ্লোকবন্ধ (বা stanza) রচনাব রীতি প্রবর্তন কবেছেন, বাংলা ভাষার নিস্তরঙ্গ ছন্দে অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) ও সুরমাধুর্য (melody) জাগিয়ে তুলেছেন, সে-সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা না করলে বাংলা ছন্দে তাঁর দানের পরিমাণ যে কত বিচিত্র ও অফুরন্ত তার ধারণা করা যাবে না। এমন কি, ছন্দপংক্তির অন্তিম প্রান্তে মিল দেবার মামুলি একঘেয়ে পদ্ধতিতেও তিনি যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং তার স্থলে বাংলা ছন্দে যে মূর্ছনা বা cadence উৎপাদনেব ও মিল (rhyme) ঘটাবার দ্বিদল (dissyllabic), ত্রিদল (trisyllabic) প্রভৃতি পদ্ধতি দেখিযেছেন তাব মূল্যও কিছুমাত্র কম নয। তা ছাড়া ববীন্দ্রনাথের ছন্দ প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দ এবং উচ্চাবণপদ্ধতি সম্বন্ধে আপেক্ষিক আলোচনা, বিশেষতঃ তাঁর ছন্দের সঙ্গে সংগীত ও সুরতালের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে আলোচনা

করার বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সমস্ত প্রসঙ্গের উত্থাপন করাও সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার প্রতি যুগপৎ দৃষ্টি স্থাপন করলে এ কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়, কত বিচিত্র ও অবিশ্রান্ত তাঁর ভাব ও রূপসৃষ্টির প্রবাহ এবং কবিজীবনের সেই প্রথম অভ্যুদয় থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র জীবনব্যাপী নব নব ছন্দ, সংগীত, ভাব ও রূপ রচনার সাধনা তাঁর কত বিপুল, কত অজস্র ও অবিরাম! তাঁর এই সমগ্র জীবনব্যাপী অফুরন্ত রূপসৃজনের মহোৎসবের আনন্দে যোগ দেবার জন্যে আজ আমরা তাঁরই ছন্দে ও ভাষায় (নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৮ আশ্বিন) সকলকে সাদর আমন্ত্রণ করছি।—

উদয়রবি যে রাঙা রঙে রাঙায়ে
পূর্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চির-প্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল,
অরুণবীণা যে সুর দিল রণিয়া
সন্ধ্যাকালে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে,
বাঁধন-হারা রঙের ধারা ঐ-যে ব'হে যায় রে ॥*

* পুষ্পিকা ১৩৩৮ পৌষ

বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ

বাংলা ছন্দকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আমি ঐ তিনটি ধারার যথাক্রমে নাম দিয়েছি—মাত্রাবৃত্ত, স্ববৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত।* বাংলা ছন্দে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে ধ্বনির মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং ধ্বনিব পরিমাণ-নির্ণয়ের এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি থেকেই বাংলা ছন্দের তিনটি মূল প্রবাহের উৎপত্তি হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত, ছন্দের এই তিন ধারাতেই অযুগ্মধ্বনির (অ আ ই ঈ ক কা কি ইত্যাদি) একই মর্যাদা, সংস্কৃত ভাষার স্বভাবদীর্ঘ স্বরগুলিও হ্রস্ব স্বরের সমান মর্যাদাই পেয়ে থাকে অর্থাৎ একমাত্রিক বলে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ তিন ছন্দে যুগ্মধ্বনির পরিমাণ-নির্ণয় হয় তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে। মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনি, তা সে স্বরান্তিকই হক আর ব্যঞ্জনান্তিকই হক, সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য হয়; অন্য কথায় এই বলা যায় যে মাত্রাবৃত্তে সর্বদাই যুগ্ম ধ্বনিরশেষাংশটিকে অর্থাৎ আশ্রিত বর্ণটিকে গণনার মধ্যে ধরা হয়।

```
   ।                  +         ।
যে বাণী আমার | কথনো কারেও্ | হয়্ নি বলা
+                    ।         ।
তাই্ দিয়ে গানে | রচিব নূতন্ | নৃত্যকলা।
```

—নিবেদন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দণ্ডচিহ্নিত তিনটি ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক বলে গণনা করা হয়েছে; যোগচিহ্নিত দুটি স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনিকেও দ্বিমাত্রিক বলেই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ র্ য়্ ত্ এই তিন আশ্রিত ব্যঞ্জন এবং ও্ আর ই্ এই দুটি আশ্রিত স্বর†, এরা সকলেই গণনার আমলে এসেছে। সুতরাং ছন্দ মাত্রাবৃত্ত।

স্বরবৃত্তের ব্যবস্থা তার ঠিক উল্টো অর্থাৎ এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক

* প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ—চৈত্র, ১৩৩০ বৈশাখ, মাঘ—চৈত্র।

† আশ্রিত স্বরবর্ণকেও আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় হসন্তচিহ্নযোগে নির্দেশ করা গেল। ছন্দপ্রসঙ্গে হসন্তচিহ্নকে আশ্রয়চিহ্ন নামে অভিহিত করাই সংগত মনে করি।

বলে গণ্য করা হয় না, আশ্রিত বর্ণগুলি হিসাবের আমলে আসে না। মোট ধ্বনিসংখ্যা গুনে গেলেই এ ছন্দের প্রকৃতি ধরা পড়ে। দৃষ্টান্ত—

| | | | .
সে দিন্ যেন | কৃপা আমায়্ | করেন্ ভগ- | বান্,

| | | | + + | + |
মেশীন্-গান্-এর্ | সম্মুখে গাই্ | জুঁই ফুলের্ এই্ | গান্।

—চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে স্বর বা ধ্বনি আছে, কেবল শেষ ছেদে একটি করে; দণ্ডচিহ্নিত ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনি এবং যোগচিহ্নিত স্বরান্তিক যুগ্ম ধ্বনি, কাউকেই হিসাবে ডবল বলে ধরা হয় নি অর্থাৎ দশটি আশ্রিত ব্যঞ্জন এবং তিনটি আশ্রিত স্বর কেউ গণনার আমলে আসে নি। সুতরাং ছন্দ স্বরবৃত্ত।

অক্ষরবৃত্তের ব্যবস্থা এ দুয়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে কোথাও ডবল বলে গণনা করা হয়, কোথাও হয় না। অবশ্য এ গণনার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেটি হচ্ছে এই—শব্দের মধ্যবর্তী* যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয় এক, কিন্তু শব্দের অন্তস্থিত* যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয় দুই। দৃষ্টান্ত—

+ | + | |
উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

+ |
মোর চিত্ত মাঝে

+
চির-নূতনেরে দিল ডাক

|+
পঁচিশে বৈশাখ।

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক বলে গণ্য করা হয়েছে, কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত; আর যোগচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত। শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলি যে আসলে দ্বিমাত্রিক তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে এই ধ্বনিগুলিকে শব্দমধ্যবর্তী ধ্বনিগুলির চেয়ে দীর্ঘতর করে অর্থাৎ টেনে উচ্চারণ করতে হচ্ছে;

* এ প্রবন্ধে শব্দের অ-প্রান্তবর্তী স্বরমাত্রাকেই মধ্যবর্তী বলে ধরা হয়েছে এবং একস্বর শব্দের স্বরধ্বনিটিকে প্রান্তবর্তী বলে গণ্য করা হয়েছে।

তার আরেক প্রমাণ এই যে 'বৈশাখের' ঐ-কারকে এক বলে ধরা হলেও প্রথম পংক্তিস্থিত 'ঐ'কে প্রত্যক্ষতঃই দুই বলে গণনা করা হয়েছে।

কবিরা কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনার সময় শব্দের এই অন্তিম দ্বিমাত্রিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রাখেন না; তাঁরা শুধু ধ্বনির চাক্ষুষ প্রতিরূপ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যা গুনেই এ ছন্দ রচনা করেন। বলা বাহুল্য এই কৃত্রিম ও স্থূল বিচারের ফলে এ ছন্দে সময় সময় ত্রুটি ঘটে থাকে; কি করে তা হয় তাই দেখাচ্ছি। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ না রেখে রচনা করা সত্ত্বেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে এত কম ত্রুটি ঘটে সেইটেই আশ্চর্যের বিষয়; কিন্তু তার কারণ আছে। দৈবক্রমে ভারতবর্ষে ব্যঞ্জনসংহতিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করার পদ্ধতি হয়েছিল; বাংলা ভাষায়ও (বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দের বেলায়) এই রীতি অনেকটা প্রচলিত আছে; তাই বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি হতে পেরেছে; নতুবা অর্থাৎ বাংলায় যদি ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার মতো হসন্ত বর্ণকে স্বতন্ত্ররূপে লেখার রীতি থাকত, তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব হতে পারত না। এই উক্তিটি আপাততঃ বিস্ময়কর মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্—

ঝঞ্‌ঝার্ মঞ্‌জীর্ বাঁধি উন্‌মাদিনী কাল্‌বই্‌শাখীর্
নৃত্‌য্ হোক্ তবে।

—বর্ষশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শুধু যুগ্মধ্বনিগুলিকে আলাদা করে দেখিয়েছি; স্বরবর্ণগুলিকে প্রচলিত আ-কার ই-কার রূপেই রেখেছি। ইংরেজির মতো স্বতন্ত্র করে দেখালে এই কথাগুলি আরও দীর্ঘ হয়ে যেত। কিন্তু এখানে উদ্‌ধৃত কথাগুলিকে ইংরেজির তুলনায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা গেল; এ রকম লিপিপদ্ধতিও যদি প্রচলিত থাকত তবু কি শুধু অক্ষর গুনে ছন্দরচনার অন্ধ অভ্যাস এ দেশে হতে পারত? এর একমাত্র উত্তর, পারত না। আর ইংরেজির মতো স্বরবর্ণগুলিও যদি স্বতন্ত্ররূপে লেখা হত তবে তো আর কথাই ছিল না। কিন্তু বাংলায় যুগ্ম-ধ্বনিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা হয় বলেই যুক্তাক্ষরকে এক গণনা করে এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করা হচ্ছে। তবে মনে রাখা উচিত যে বাংলায়ও এই যুক্তাক্ষরের লিপিপদ্ধতি বিশেষভাবে শুধু সংস্কৃত শব্দের পক্ষেই খাটে। অনেক অ-সংস্কৃত খাঁটি বাংলা বা বাংলায় প্রচলিত বৈদেশিক শব্দে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের

প্রচলন নেই; যথা—বোল্‌তা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা, বাদ্‌শা, বুল্‌বুলি, মস্‌জিদ ইত্যাদি; এই সমস্ত হসন্ত-মধ্য অ-সংস্কৃত শব্দগুলিকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যথাসম্ভব পরিহার করে চলারই চেষ্টা দেখা যায়, কারণ হসন্তবর্ণগুলিকে গ্রাহ্য করা হবে কি না এ সম্বন্ধে সব সময়ই একটু দ্বিধা থেকে যায়। কিন্তু 'উৎসব' 'বৎসর' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা না হলেও খণ্ড ৎ-কে পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। যথা—

আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু 'দিক্‌চক্ররেখা', 'দিক্‌ভ্রান্ত' প্রভৃতি শব্দে হসন্ত ক্‌ কে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা হবে কি না, এ বিষয়ে সংশয় দেখা যায়। যথা—

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে চেয়ে
ওগো দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ, তৃষার্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে!

—মরীচিকা, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিক্‌ভ্রান্ত' শব্দে চারটি অক্ষর গোনা হয়েছে। কিন্তু,

উদয়-দিক্‌-প্রান্ত-তলে নেমে এসে

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দে তিন অক্ষর ধরা হয়েছে। যদি লেখা হত—

উদয়ের দিক্‌প্রান্ততলে নেমে এসে

তা হলেও খারাপ শোনাত না; কারণ 'দিক্‌ভ্রান্ত' শব্দের মতো এখানেও 'দিক্‌' কথাটিকে একটু টেনে পড়তে হত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দটিতে তিন অক্ষর না ধরে চার অক্ষর ধরেছেন। যথা—

চলেছে উজান ঠেলি' তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।

—নববধূ, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

—প্রত্যাগত, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

যা হক আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দরচনায় সংযুক্তবর্ণকে এক অক্ষর বলে ধরে নেওয়ার অভ্যাসের ফলে এই ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী অসংযুক্ত অথচ হসন্ত বর্ণগুলিকে (বিশেষতঃ অ-সংস্কৃত শব্দে) কি হিসাবে গণনা করা হবে, এ বিষয়ে খুবই একটা সংশয় রয়ে গেছে। তাই এ ছন্দে সংযুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের এত প্রসার দেখা যায়। তা ছাড়া 'ধর্‌ব, কর্‌ব, ধর্‌ত, কর্‌ত' প্রভৃতি হসন্ত-মধ্য প্রাকৃত ক্রিয়াশব্দগুলি অনেকটা ওই কারণেই এ ছন্দের ধাতুতে সহ্য হয় না ; গর্ব, সর্ব, মর্ত্য, গর্ত প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি কিন্তু এ ছন্দে অনায়াসেই চলে, শুধু উক্ত প্রাকৃত ক্রিয়াপদগুলি 'ধরিব, করিব, ধরিত, করিত' প্রভৃতি সাধুবেশধারী না হলে এ ছন্দের আসরে স্থান পায় না। তাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দটা শুধু সাধুভাষার ছন্দ হয়েই রইল ; কোনো বিদ্রোহী কবিই আজ পর্যন্ত চলতি বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করতে সাহস পান নি।

আমরা দেখলুম যে শব্দের মধ্যবর্তী হসন্ত বর্ণগুলিকে (বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দে) পরবর্তী বর্ণে যুক্ত করে দেওয়ার প্রথা থাকাতেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হতে পেরেছে এবং যেখানেই শব্দের মধ্যে হসন্ত বর্ণ অসংযুক্ত থেকে যায় সেখানেই এ ছন্দকে ইতস্ততঃ করতে এবং বহু স্থানেই পশ্চাৎপদ হতে হয়। কিন্তু যুগ্মস্বর ব্যবহাবের ক্ষেত্রেই এ ছন্দের দুর্বলতা বেশি ধরা পড়ে। আমরা দেখেছি যে সংস্কৃত ভাষায় অই্‌ আর অউ্‌ ছাড়া যুগ্মস্বর নেই, অথচ বাংলায় আই্‌, ইউ্‌, অও্‌, আও্‌ ইত্যাদি বহু যুগ্মস্বর বয়েছে। লক্ষ করার বিষয় এই যে সংস্কৃত যুগ্মস্বরদুটির জন্যে দুটি স্বতন্ত্র অক্ষব রয়েছে, যথা ঐ (অই্‌) এবং ঔ (অউ্‌) ; বাংলায় যে সব অতিরিক্ত যুগ্মস্বর আছে তাদের জন্যে কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র অক্ষর নেই, দুটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণের যোগে তাদের প্রকাশ করতে হয়। এই পার্থক্যের জন্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কতকটা মুশকিলে পড়তে হয়েছে। সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী অই্‌ এবং অউ্‌ এ দুটি যুগ্মস্বর ঐকার ঔকারের যোগে লিখিত হয় বলে এরা প্রত্যেকেই এক স্বর বলে গৃহীত হয়। কিন্তু আই্‌ ইউ্‌ প্রভৃতি যুগ্মস্বরের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর না থাকাতে এরা দ্বিস্বর বলে গণ্য হয়। এই দ্বৈধ ব্যবহারের ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তা বলা বাহুল্য। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব দ্বারে,
+
বাজাইল বজ্রভেরী। _ * * *

* * তাহাদের লাগি'
+
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া। * * *
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ন মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

* * *
+
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত প্রভাতে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিগুলিতে দুটি ঐকার ছাড়া আরও তিনটি যুগ্মস্বর (যোগ-চিহ্নিত) আছে এবং তিনটিই শব্দের মধ্যবর্তী, অন্তস্থিত নয়। কিন্তু ঐকার দুটিকে একস্বর বলে ধরা হয়েছে, কেননা একটিমাত্র বর্ণলিপি (ঐ) বা বর্ণসংকেত (ৈ) যোগেই তাকে প্রকাশ করা যায়; আর আই্ (বাজাইল, কাটাইলে) কিংবা ইউ্ (শিউলি) এ দুটিকে প্রকাশ করার মতো একমাত্র বর্ণলিপি বা বর্ণসংকেত নেই বলেই এদের দ্বিস্বর বলে গণনা করা হয়েছে। অথচ ধ্বনিমর্যাদা হিসাবে আই্, ইউ্ এবং অই্ বা ঐ এর মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। এখানেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দুর্বলতা ধরা পড়ে। এ দুর্বলতা ঢাকা দেবার জন্যই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দমধ্যবর্তী আই্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মস্বর পৃথক্‌ভাবে আ-ই, ই-উ (যথা বাজা-ই-ল, শি-উ-লি) ইত্যাদি রূপে টেনে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু শিউলি কথাটার মধ্যে যে আসলে দুটিমাত্র ধ্বনি আছে তা ঐ শব্দটিকে স্বরবৃত্ত ছন্দে বসালেই ধরা পড়বে; যথা—

আশ্বিনে ঐ | শিউলি শাখে |
মৌমাছিরে | যেমন ডাকে |

—ঋতুচক্র (৪৭), প্রবাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে সমস্ত যুগ্মধ্বনিকে একক বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতেই অই্ (ঐ) অউ্ (ঔ) এবং ইউ্ যে একই মর্যাদার ধ্বনি তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ঐ আর ঔ-কে অন্য যুগ্মস্বরগুলি থেকে পৃথক্ মর্যাদা দেওয়া হয়। তার ফল এই হয় যে আই্, ইউ্ প্রভৃতিকে টেনে পড়ে আ-ই, ই-উ ইত্যাদি রূপে

পৃথক্ উচ্চারণ করতে হয়; আর যে ধ্বনিটা মূলে এক তাকে যদি অকারণে দুয়ের মতো করে উচ্চারণ করা যায় তবে ছন্দের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দরচয়িতা কবিরা এ ছন্দের এ দুর্বলতাটা প্রতি পদেই টের পেয়ে থাকেন; তাই তাঁরা শব্দের মধ্যবর্তী ঐ এবং ঔ ছাড়া আর সমস্ত যুগ্মস্বরকেই বর্জন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এজন্যই দেখা যায় আজকাল কবিরা 'হইতে, লইয়া, যাইবে' প্রভৃতি সাধু শব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে বর্জন করার অভিপ্রায়ে 'হতে, লয়ে, যাবে' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন; অথচ আমরা আগে দেখেছি যে শব্দের মধ্যবর্তী অসংযুক্ত হসন্ত বর্ণকে পরিহার করার চেষ্টায় তাঁরা 'কর্‌ব, কর্‌ত' প্রভৃতি চলতি রূপের পরিবর্তে 'করিব, ধরিব' ইত্যাদি সাধু রূপেরই ব্যবহার করেন। তাব ফলে অক্ষববৃত্ত ছন্দের ভাষাটা সাধু ও চলতি ভাষার একটা অদ্ভুত মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। শিউলি প্রভৃতি শব্দের যুগ্ম ধ্বনিটাকে দ্বিধাবিভক্ত কবে টেনে পড়ার অভ্যাসের ফলে এক সময় কবিরা প্রয়োজনের খাতিবে ঐ এবং ঔ-কেও ভেঙে ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করতেন না; তাই বাংলা অক্ষরবৃত্তের রাজ্যে 'গউড, পউষ' প্রভৃতি শব্দে ঔকারের দ্বিধাকৃত শিথিল রূপের অভাব নেই। তবে সুখের বিষয় আজকাল আর কবিরা এ দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দেন না। আধুনিক কালেব রচনা থেকেও ঔকারের সম্প্রসারণের দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

পউষেব পাতা-ঝরা তপোবনে
  আজি কি কারণে
টলিয়া পডিল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস।

—১৩, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

বিগাঢযৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁট সাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত ক'রে গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা।

—সনেটসুন্দরী, পদ-চারণ, প্রমথ চৌধুরী

এখানে 'পউষের' এবং 'রউদ্র' কথাদুটিতে ঔকারকে ভেঙে অ-উ করা হয়েছে এবং উকারের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করা প্রয়োজন। পৌষের বা পউ্‌ষের এবং রৌদ্র বা রউ্‌দ্র এ রকম উচ্চারণ করলে ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকবে না, আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে

র-উ-দ্র না পড়ে রউ্দ্র অর্থাৎ রৌদ্র পড়লে পূর্ববর্তী 'ক্ষুদ্র' শব্দের সঙ্গে তার মিলও অব্যাহত থাকবে না।

অ-সংস্কৃত বাংলা বা বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দে যেমন অনেক সময় হসন্তবর্ণকে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত না করারই প্রচলন দেখা যায় (যথা— মাত্‌লামি, হাল্‌কা, পাল্‌টা, পশ্‌লা) তেমনি অ-সংস্কৃত শব্দে ঐ এবং ঔ-কেও অযুক্ত রাখাই রীতি, যথা—লইতে, লউক প্রভৃতি শব্দকে লৈতে, লৌক এরূপ লেখা বিধি নয়। তার ফল এই হয়েছে যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শৈল, দৈব প্রভৃতি শব্দে দুই অক্ষর ধরা হয়; কিন্তু হইল, লইব প্রভৃতিতে তিন অক্ষর ধরা হয়। মৌন, ধৌত ইত্যাদিতে দুই অক্ষর, আর হউন, লউক ইত্যাদিতে তিন অক্ষর। শুধু অক্ষরগুনতির দিক্ থেকে না দেখে ধ্বনির দিক্ থেকে বিচার করলে অক্ষরবৃত্তের এ ত্রুটিগুলোকে গুরুতর বলেই স্বীকাব করতে হবে। প্রাচীন কবিবা কিন্তু অনেক সময় হৈতে, লৈয়া ইত্যাদি রূপ ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করতেন না। এক হিসাবে এরূপ ব্যবহারকে সংগত বলে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাঁরা সব সময় এ রীতি রক্ষা করতেন না বলে ছন্দেও ত্রুটি থেকে যেত। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আই্‌লা গঙ্গাতীর॥

* * *

গঙ্গাতীবে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥

* * *

জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥

এখানে সবগুলি যুক্তস্বরই একাক্ষর বলে গণ্য হয়েছে, কেবল 'দাঁড়াইয়া' কথায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। বিশেষ লক্ষ করার বিষয়, 'আই্‌লা' শব্দে 'আই্‌'-যুগ্মধ্বনিটি এক বলেই গৃহীত হয়েছে, যদিও এর জন্য কোনো একটিমাত্র নির্দিষ্ট বর্ণলিপি নেই। 'হৈল' শব্দের 'অই্‌' এবং ভৈরবের 'ঐ' প্রাচীন কবির কাছে সমান মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিরা প্রাচীন বানান-রীতি গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নন, অথচ প্রচলিত বানান-পদ্ধতি রেখে অই্‌, আই্‌, ঐ, ঔ-কে

সমান মর্যাদা দিতেও রাজি নন, কারণ তাতে চাক্ষুষ গুনতির হিসাব ঠিক থাকে না। এভাবে কানকে চোখের অধীন করে রাখার ফলে আর যাই হক না কেন, অক্ষববৃত্ত ছন্দের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হবে না।

ঐ এবং ঔকাবের বানানের এই দ্বৈবাচাবের ফলে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিদেব আরেক রকম সমস্যা আছে, তাই এখন দেখাচ্ছি। বাংলায় কতগুলি শব্দ আছে যাব উচ্চারণ স্থির আছে, কিন্তু ঐ এবং ঔকারেব যুক্ত ও বিভক্ত দুই রূপের ফলে তাদের বানান স্থির নেই। যথা—বৈঠা, পৈঠা, পৈতা, বৌমা প্রভৃতি শব্দেব যুক্তধ্বনিকে বিযুক্ত করে বইঠা, পইঠা, পইতা, বউমা ইত্যাদি রূপেও লেখা যায়। যে ভাবেই লেখা হক না কেন, এদেব ধ্বনি যখন স্থিব আছে তখন মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে এ শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে কবিদের কিছুমাত্র ভাবনায় পড়তে হয় না। যথা—

শৈলের পৈঠায় এস তনু-গাত্রী
পাহাড়ের বুকচেরা এস প্রেমদাত্রী।

—ঝর্ণা, বিদায়-আবতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে যদি ‘পইঠায়’ লেখা হত তা হলেও ছন্দ ঠিকই থাকত, কারণ চোখের হিসাবে এদের মধ্যে অক্ষরসংখ্যার পার্থক্য থাকলেও কানের হিসাবে এ দুটি শব্দের মধ্যে ধ্বনিপরিমাণেব কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনার সময কবিরা কানকে অস্বীকার কবে চোখের দ্বাবা চালিত হয়ে থাকেন বলে এই সমস্ত দ্বিরূপ শব্দ ব্যবহারের সময় তাঁদেব প্রতারিত হবাব সম্ভাবনা আছে। সংখ্যাপূরণের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁরা হয়তো কখনও পৈঠা লিখে দুঘর ভর্তি করতে পারেন, আবার কখনও বা প্রয়োজনের খাতিরে ‘পইঠা’ লিখে তিন বলে গণ্য করতে পারেন। এ রকম করা রচনাকার্যের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু ছন্দ-সৌষ্ঠবের পক্ষে মারাত্মক নয় কি?

শব্দের অন্তস্থিত ঐকাব ও ঔকার নিয়েও কবিদের মধ্যে সংশয আছে। পূর্বেই বলেছি যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি আসলেই দ্বিমাত্রিক এবং সেজন্যই ব্যঞ্জনান্তিক বা স্বরান্তিক উভয প্রকাব যুগ্মধ্বনিকেই শব্দের অন্তে একটু টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করে পডতে হয। পূর্বে একটি দৃষ্টান্ত দিযেছি, এ স্থলে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

+ + × + × ×
দাও্, খুলে দাও্ দ্বার্, | ওই্ তার্ বেলা হল শেষ্, |
+
বুকে লও্ তারে।
| × × × × ×
শান্তি-অভিষেক্ হোক্, | ধৌত হোক্ সকল্ আবেশ্ |
| |
অগ্নি-উৎস-ধারে।

—সাবিত্রী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শব্দের মধ্যবর্তী তিনটি যুগ্মধ্বনি (দণ্ড-চিহ্নিত) একাক্ষর বা একমাত্রিক হিসাবেই উচ্চারিত হচ্ছে ; কিন্তু শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনিগুলি (স্বরান্তিক ধ্বনি যোগ-চিহ্নিত, ব্যঞ্জনান্তিক ধ্বনি গুণ-চিহ্নিত) দ্বিমাত্রিক এবং সেজন্য এগুলির দীর্ঘ বা বিলম্বিত উচ্চারণ হচ্ছে। বাংলা ছন্দরচয়িতারা কিন্তু এ ছন্দের বিচার এভাবে করেন না ; তাঁরা শুধু লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যা গুনেই এ ছন্দ রচনা করেন ; এই গুনতির হিসাবে তাঁরা যুক্তবর্ণ, অযুক্তবর্ণ, হসন্তবর্ণ, স্বরবর্ণ সকলকেই আদমসুমারির মতো সমান মর্যাদা দিয়ে থাকেন। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে স্বরান্ত ব্যঞ্জন (যুক্ত ও অযুক্ত), হসন্ত ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ সবাইকে প্রচলিত হিসাবে সমান দর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে আশ্রিত ব্যঞ্জন (অর্থাৎ হসন্ত ব্যঞ্জন)-গুলির কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, আশ্রয়দাতা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা যে যুগ্মধ্বনির সৃষ্টি করেছে তারই বিচার করতে হবে ; এ বিচারে শব্দের অ-প্রান্তবর্তী আশ্রয়দাতা স্বরগুলি (দণ্ড-চিহ্নিত) লঘু স্বরের মতো একমাত্রিক বলেই গণ্য হয়েছে (যেমন স্বরবৃত্ত ছন্দে হয়), আর শব্দের প্রান্তবর্তী আশ্রয়দাতা স্বরগুলি (গুণ চিহ্নিত) দ্বিমাত্রিক বলে গ্রাহ্য হয়েছে (যেমন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হয়)। ঠিক তেমনি আশ্রিত স্বরবর্ণগুলির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, পূর্ববর্তী আশ্রয়দাতা স্বরের (যোগ-চিহ্নিত) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে যুগ্ম স্বরের সৃষ্টি করেছে তারই ধ্বনিপরিমাণ বিচার করতে হবে এবং সে বিচারে এখানে সমস্ত যুগ্মস্বরগুলিই প্রান্তবর্তী বলে দ্বিমাত্রিক রূপে গণ্য হবে। প্রচলিত হিসাবে এ ছন্দটি আট, দশ ও ছয় অক্ষরের ত্রিপদী ছন্দ। ধ্বনিপরিমাণের হিসাবেও এ ছন্দের তিন পাদে যথাক্রমে আট, দশ ও ছয়টি ধ্বনিমাত্রা রয়েছে। দুই হিসাবেই মোটের উপর গণনার ফল সমান হয়েছে, অতএব ছন্দ ঠিক আছে। কিন্তু সর্বত্রই যে এরূপ

দুই হিসাবের মধ্যে সাম্য থাকবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ শুধু সংখ্যাগুনতির হিসাবের মধ্যে ধ্বনিপরিমাণনির্ণয়ের কিছুমাত্র চেষ্টা থাকে না। কাজেই এই সংখ্যা গোনার ফলে অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে তা আগে দেখিয়েছি। এখানে আরেকটি বিপদের কথা উল্লেখ করছি।

উপরের দৃষ্টান্তটির প্রথম পংক্তিতে একটি শব্দ হচ্ছে 'ওই', এ যুগ্মস্বরটির আসল রূপ 'ঐ'। বাঙালীর উচ্চারণে অই্, ওই্ এবং ঐ একই রকম। উক্ত দৃষ্টান্তটিতে যদি 'ওই'-এর জায়গায় 'ঐ' লেখা হত, তবু ছন্দ-পতন হত না; কারণ ধ্বনিপরিমাণে 'ওই্' আর 'ঐ' সমতুল্য অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক। কিন্তু 'ওই' না লিখে 'ঐ' লিখলে অক্ষরগুনতির হিসাবে এক অক্ষর কম পড়ে যায়; তাই কবি অতি সতর্কভাবে ঐ-কে পরিহার করে 'ওই' বসিয়েছেন। এটা লক্ষ করার বিষয় যে স্বরবৃত্ত ছন্দে কিংবা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ 'ঐ' ব্যবহার করতে কখনও ইতস্ততঃ করেন না; যথা—

ঐ বাজে রে | ঘণ্টা বাজে।
চম্‌কে উঠেই | হঠাৎ দেখে | অন্ধ ছিল | তন্দ্রা মাঝে।

(স্বরবৃত্ত ছন্দ)

—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে

(মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

—বর্ষামঙ্গল, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই 'ঐ' বর্জন করে 'ওই' ব্যবহার করেন। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

—ছবি, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অক্ষরবৃত্তে ব্যবহৃত একটিমাত্র 'ঐ' আমার চোখে পড়েছে; সেটি আছে 'পূরবী'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটিতে। যথা—

উদয়-দিগন্তে ঐ | শুভ্র শঙ্খ বাজে।

অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখার জন্যই যে রবীন্দ্রনাথ 'ঐ' ছেড়ে 'ওই' ব্যবহার করেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের প্রান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দ্বিমাত্রিক বলে 'ঐ' ছেড়ে 'ওই' ব্যবহারের আবশ্যকতা নেই। ('ঐ' একস্বর শব্দ বলে এর ধ্বনিটাকে প্রান্তিক বলেই ধরতে হবে।) উপরের দৃষ্টান্তটিতেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ থাকবে না।—

পিতৃহীন, নিরুপায়, | দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর ;
দাসী ভেবেছিনু যারে | —মা তাহার, নহেক অপর !

—সত্যদাস, জাগরণী, যতীন্দ্রমোহন

ঐটুকু ছোট পায়ে | কতদূর গেল সে যে চলি !
সেখানে যায় না যাওয়া ? | সে পথ কি দিতে পার বলি' ?

—যুগ্ম অশ্রু, নীহারিকা, যতীন্দ্রমোহন

ঐটুকু কচি বুক | কোন্ ভয়ে করে দুরু দুরু
কি বেদনা ঐ মর্মমূলে !

—দেয়ালা, নীহারিকা, যতীন্দ্রমোহন

বলা বাহুল্য এ তিনটি দৃষ্টান্তই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ওই তিনটি দৃষ্টান্তের মধ্যে চার জায়গায় 'ঐ' কথাটি দ্বিমাত্রিক রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে অথচ ছন্দপতন হয় নি, এ কথা নিশ্চয়। সুতরাং অক্ষরবৃত্তেও দ্বিমাত্রিক ধ্বনির স্থান আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

ওই বা ঐ সম্বন্ধে যা বলা হল, দই বা দৈ, বউ বা বৌ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাই সত্য। অর্থাৎ কেউ যদি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দই বা বউ না লিখে দৈ বা বৌ লেখেন তথাপি গুনতির হিসাবে অক্ষরসংখ্যা কম হলেও ছন্দপতন হবে না। কারণ যে রূপেই লেখা হক না কেন ওই, ঐ, দই, দৈ, বউ, বৌ প্রভৃতি শব্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও সর্বদাই দ্বিমাত্রিক রূপেই ব্যবহৃত হয়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে অই্ (বা ওই্) এবং অউ্-এর ন্যায় আই্, আও্, অও্ প্রভৃতি শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মস্বরও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দ্বিমাত্রিকই বটে। সুতরাং এ ছন্দে যাই, যাও, লও প্রভৃতি শব্দকে দুটি অক্ষর বলে না ধরে ঐ, দৈ, বৌ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দুটি মাত্রা বলে ধরাই সংগত। আর অই্ কিংবা অউ্ যেমন শব্দের

মধ্যে (শেষ প্রান্তে না হলেই তাকে মধ্যে বলছি) একমাত্রিক বলে গণ্য হয় (যথা শৈব, মৌন) তেমনি আই্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মস্বরকেও শব্দের মধ্যে একমাত্রা হিসাবেই গণ্য করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে অক্ষরবৃত্তে দৈ এবং দৈব, বৌ এবং মৌন কার্যতঃ সমান ; কারণ এ ছন্দে উভয়কেই দুই বলে ধরা হবে। একই কারণে 'শিউলি'কেও তিন না ধরে দুই ধরা উচিত। আর এ ছন্দে যুগ্ম-স্বরেব ন্যায় ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিও শব্দের অন্তে দ্বিমাত্রিক বলেই গণ্য হয় ; অর্থাৎ অই্ (ঐ), অউ্ (ঔ), আই্, আউ্ ইত্যাদির ন্যায় অর্, ইন্, আপ্ প্রভৃতিকেও দুটি অক্ষর না বলে দুটি মাত্রা বলাই উচিত, যদি এরা শব্দের শেষে থাকে। কিন্তু মধ্যে থাকলে অই্, অউ্ প্রভৃতির ন্যায় এরা একমাত্রিক বলেই গ্রাহ্য হবে। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয়প্রণালী হচ্ছে এ রকম—

॥ । । ॥ ॥ ॥ ॥ । । । । ॥
দাও্, খুলে দাও্ দ্বার্, | ওই্ তার্ বেলা হল শেষ্, |
। । ॥ । ।
বুকে লও্ তারে।
। । । । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ । ॥
শান্তি অভিষেক্ হোক্, | ধৌত হোক্ সকল্ আবেশ্ |
। । । । । । ।
অগ্নি-উৎস-ধারে।

আশ্রিত ব্যঞ্জন (অর্থাৎ হসন্ত বর্ণ) এবং আশ্রিত স্বর উভয়কেই হসন্ত চিহ্নের দ্বাবা চিহ্নিত করা হল এবং শব্দান্তস্থিত দ্বিমাত্রিক বা যুগ্মধ্বনিগুলি যুগ্মদণ্ড চিহ্নেব দ্বারা নির্দিষ্ট করা হল। আর অযুগ্মধ্বনি এবং শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিগুলিকে একটিমাত্র দণ্ড-চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। প্রচলিত প্রণালীতে অক্ষর না গুনে এই দণ্ডসংখ্যাগুলি গুনলেও দেখা যাবে যে এটি যথাক্রমে আট, দশ এবং ছয় ধ্বনির (অক্ষরের নয়) ত্রিপদী ছন্দ।

প্রচলিত প্রণালীতে এ ছন্দের হিসাব রাখা হয় চাক্ষুষ ভাবে অক্ষরসংখ্যা গুনে, ধ্বনিপরিমাণ নির্ণযের দ্বাবা নয়,—এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ধ্বনির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ না রেখে সব সময়ই শুধু অক্ষর গোনা হয়, এ কথা বলা অন্যায় হবে। আগেই দেখেছি 'উৎসব, বৎসর, ভৎর্সনা' প্রভৃতি শব্দে খণ্ড-ৎকে স্বতন্ত্র দেখা গেলেও তাকে স্বতন্ত্রভাবে গোনা হয় না ; একে পরবর্তী ব্যঞ্জনের

সঙ্গে যুক্ত বলেই ধরা হয়। কাজেই এখানেও ধ্বনির চেয়ে অক্ষরগুনতির প্রতিই লক্ষ বেশি। কিন্তু 'চাওয়া, পাওয়া, হাওয়া' প্রভৃতি শব্দকে দেখতে তিন দেখলেও এগুলিকে দুই বলেই ধরা হয়; কারণ এসব স্থলে 'ওয়া'র উচ্চারণ পৃথক্ হয় না, অন্তঃস্থ 'ব'-য়ের মতো এক সঙ্গেই উচ্চারণ হয়। সুতরাং এখানে ধ্বনির প্রতি লক্ষ থাকার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার 'আমারই, তোমারও, যখনই' প্রভৃতি শব্দকেও দেখতে চার দেখালেও এরা আসলে 'আমারি, তোমারো, যখনি' প্রভৃতির মতো উচ্চারিত হয়, তাই এগুলিকে তিন বলেই ধরা হয়; এখানেও অক্ষরসংখ্যার চেয়ে ধ্বনিরই প্রাধান্য। দৃষ্টান্ত—

॥ । । । । ॥
মোর্ সন্ধ্যাদীপালোক্,
॥ । । । । ॥
পথ্-চাওয়া দুটি চোখ্,
। । । । । ।
যত্নে গাঁথা মালা

—অশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
।
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?

—লিপি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'চাওয়া' এবং 'এক-ই' কোথাও তিন ধরা হয় নি; ধ্বনির প্রতি লক্ষ রেখে দুই ধরা হয়েছে।

কিন্তু ধ্বনির প্রতি বিশেষ লক্ষ না রেখে লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার প্রতি নজর রাখাই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। সুতরাং এ ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে বাংলা লিপিপদ্ধতি। আগেই দেখানো হয়েছে যে যদি বাংলার যুক্তবর্ণগুলিকে বিযুক্ত করে লেখার প্রথাই এ দেশে প্রচলিত থাকত তবে অক্ষর গোনার অন্ধ অভ্যাস হতে পারত না, সুতরাং অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই উৎপত্তি হত না। বাংলা স্বরবর্ণের লিপিপদ্ধতির ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উপর কি প্রভাব হয়েছে, এখন তাই দেখা যাক। অযুগ্মস্বরের লিপিপদ্ধতিতে (অন্ততঃ ছন্দের তরফ থেকে)

কোনো গোলযোগ নেই। কিন্তু যুগ্মস্বরের লিপিপদ্ধতি নিয়েই যত মুশকিল। আমাদের বর্ণমালায় দুটিমাত্র যুগ্মস্বর (অই্ এবং অউ্)-এর স্থান আছে; কারণ এরা সংস্কৃত ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় স্থানলাভ করেছে। এ দুটি যুগ্মস্বরের যুক্তরূপ হচ্ছে ঐ এবং ঔ; আর ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হলে এদের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র সংকেতলিপিও আছে, যথা—ৈ এবং ৌ। কিন্তু অসংস্কৃত যুগ্মস্বর (আই, আউ্ ইত্যাদি)-গুলির কোনো স্বতন্ত্র যুক্তরূপ নেই এবং তাদের জন্য কোনো সংকেতলিপিও নেই। এর ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের পথে অনেক বাধা হয়েছে।

যদি অই্ এবং অউ্-এর কোনো যুক্তরূপ ও বিশেষ সংকেতলিপি না থাকত, অর্থাৎ যদি শৈল, মৌন প্রভৃতি শব্দকে শইল, মউন ইত্যাদি রূপে লেখার রীতি থাকত, তবে অক্ষর-গোনা ছন্দের যে কি রূপ হত তা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে যদি আই্, আউ্ ইত্যাদি সমস্ত যুগ্মস্বরেরই স্বতন্ত্র যুক্তরূপ থাকত, তবে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বর্তমান রূপ হতে পারত কি না সন্দেহ। দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে আশা করি।

হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হোক ম্লান—লৈনু বিদায়।

—স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

যদি 'হউক' এবং 'লইনু' কথা দুটিকে উদ্ধৃত রূপে লেখা আবশ্যিক হত, তবে এই পংক্তিগুলিতে ছন্দ ঠিক থাকত কি না তা অনুমান করা শক্ত নয়। আবার যদি 'আই্'কে 'ী' এই সংকেতচিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করাই রীতি হত তবে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির কি আকার হত দেখা যাক—

অন্ন চী, প্রাণ চী, আলো চী, চী মুক্ত বায়ু,
চী বল, চী স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

—এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এ রকম লিখলেও কিন্তু ছন্দপতন হবে না; কারণ চাক্ষুষ গুনতির হিসাবে পার্থক্য থাকলেও ধ্বনিপরিমাণের হিসাবে 'চাই' এবং 'চী'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যেমন 'ওই্'-এর বদলে 'ঐ' লিখলে, কিংবা 'বউ' না লিখে 'বৌ' লিখলে ছন্দগত কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তেমনি 'চাই' না লিখে 'চী'

লিখলেও কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। ঠিক এভাবে যদি অও্, আও্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনি প্রকাশেরও এক-একটি সংকেতচিহ্ন থাকত তবে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কিরূপ আকৃতি ধারণ করত তা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়।

'চাই'কে 'চা' লেখাতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রথম পংক্তিতে আপাতদৃষ্টিতে চারটি অক্ষর কমে গেছে; কিন্তু ধ্বনিমাত্রাসংখ্যার (আঠারোর) কোনো পরিবর্তন হয় নি বলে ছন্দ অব্যাহতই আছে। তেমনি যাও, লও, দেই, ঢেউ প্রভৃতি কথাকেও যদি সংকেতে লেখার ব্যবস্থা থাকত তথাপি অধুনাপ্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অক্ষুণ্ণই থেকে যেত; কিন্তু অনেক স্থলেই অক্ষরসংখ্যার মধ্যে বিপর্যয় উপস্থিত হত এবং তার দ্বারাই প্রমাণ হত যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষরসংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না।*

আমরা আগেই দেখেছি যে স্বরবৃত্ত ছন্দে শুধু স্বরসংখ্যা অর্থাৎ যুগ্ম বা অযুগ্ম ধ্বনির সংখ্যাকেই গণনা করা হয়, ধ্বনিমাত্রার পরিমাণ-নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় না। পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিমাত্রার উপরই নির্ভর করে, এ ছন্দে ধ্বনিসংখ্যা অর্থাৎ স্বরসংখ্যার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ থাকে না। যথা—

। । । ।   । । । ।   । ।   । ।   । ।   ।
পদ্মকোষের্ | বজ্রমণি | ওরাই্ ধ্রুব | সুমঙ্গল্;
। । । ।   । ।   । ।   ।   । । ।   । । ।
আলাদিনের্ | মাথার্ প্রদীপ্ | ওই্ আমাদের্ | ছেলের দল্

—ছেলের দল, কুহু ও কেকা, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে স্বর বা ধ্বনি আছে, শেষ ছেদে তিনটি করে; যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি অর্থাৎ গুরু ও লঘু ধ্বনির মধ্যে কোনো পার্থক্য করা

* সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কিন্তু নির্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার কখনও ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ প্রাচীন ভারতীয় লিপিপদ্ধতিতে আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ কিংবা স্বরবর্ণ কখনও স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয় না, সর্বদাই যুক্তরূপে লিখিত বা গৃহীত হয়। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দে প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ অক্ষর প্রকৃতপক্ষে এক-একটি সিলেব্‌ল্। বাংলায় কিন্তু বহু স্থলেই যে সব আশ্রিত স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তারাও স্বতন্ত্রভাবেই লিপিবদ্ধ হয়, এইজন্যই বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উপরোক্ত মিশ্র প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে। বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ বা মুদ্রিত হরফ মাত্রকেই একটি অক্ষর বলে গণ্য করা হয়, আমরাও প্রচলিত অর্থেই অক্ষর শব্দের ব্যবহার করছি। বাংলায় অক্ষর বলতে সিলেব্‌ল্ বোঝায় না। এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক।

হয় নি, সুতরাং ধ্বনিব মাত্রাপরিমাণ স্থির নেই। অতএব এ ছন্দকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলব। পক্ষান্তরে—

। । । । ॥ ॥ । । ॥ ॥ ।
চিরযুবা | শূর্বীর্ | বিজয়ীর্ | কুঞ্জে
। । ॥ ॥ ॥ । । । । ॥ ।
আমাদের্ | মঞ্জীর্ | মদালসে | গুঞ্জে,

*　　*　　*

। । । । । । । । ॥ ॥ । । ।
ফুটে উঠি | হাসি সম | খড্গের্ | ঝলকে,
। । । । । । । । ॥ । । । । ।
মোরা করি | মনোরম | মৃত্যুরে | পলকে।

—বিদ্যুৎপর্ণা, তুলির লিখন, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে ধ্বনিমাত্রা আছে, শেষ ছেদে তিনটি করে, যুগ্ম বা গুরু ধ্বনিগুলি দ্বিমাত্রিক, কাজেই যুগ্মদণ্ড-চিহ্নিত হয়েছে, আর অযুগ্ম বা লঘু ধ্বনিগুলি একমাত্রিক বলে একটি করে দণ্ডচিহ্নে চিহ্নিত হয়েছে। এই হিসাবে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে ধ্বনির মাত্রাপবিমাণ স্থির রয়েছে বলে এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলব। বলা বাহুল্য এখানে স্বরবৃত্তের মতো ধ্বনির বা স্বরের সংখ্যা স্থির নেই।

এখন একটি অক্ষববৃত্তের দৃষ্টান্ত ধরা যাক—

। । ॥ । । । । । । । । ॥
বিপরীত | মুখে তারে | পড়েছিনু | তাই
। । । । । । ॥ । । । । ॥
বিশ্বজোড়া | সে লিপির | অর্থ বুঝি | নাই।

—৪০, নৈবেদ্য রবীন্দ্রনাথ

স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের একটি বিশেষ মিশ্রণের ফলে উদ্ধৃত পংক্তিদুটি রচিত হয়েছে, প্রত্যেকটি শব্দের পূর্বাংশে রয়েছে স্বরবৃত্তেব তত্ত্ব, সেখানে রয়েছে ধ্বনিসংখ্যারই প্রাধান্য (বিশ্ব ও অর্থ শব্দের পূর্বাংশে দুই না ধরে একই ধরা হয়েছে), আর তার শেষাংশে আছে মাত্রাবৃত্তের তত্ত্ব, ধ্বনিমাত্রাই এখানকার গোড়ার কথা (লিপির শব্দের শেষ ধ্বনিটিকে মাত্রাহিসাবে দুই ধরা হয়েছে,

সংখ্যাহিসাবে এক ধরা হয় নি)। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের এই যৌগিক রীতিতে উদ্ধৃত পংক্তিতে প্রতি পর্বে চারটি করে unit বা একক রয়েছে, শেষ পর্বে আছে দুটি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই এককগুলি কোন্ তত্ত্বের একক? ধ্বনিমাত্রার নয়, কারণ মাত্রাহিসাবে প্রথম পংক্তিতে চোদ্দ মাত্রা থাকলেও দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে ষোল (বিশ্ব ও অর্থ শব্দে একমাত্রা করে বেশি আছে); ধ্বনিসংখ্যারও নয়, কারণ এর পর্বগুলিতে সংখ্যার সাম্য নেই। অর্থাৎ এতে ধ্বনিমাত্রা ও ধ্বনিসংখ্যা কারও স্থিরতা নেই, সুতবাং এ ছন্দ মাত্রাবৃত্তও নয়, স্বববৃত্তও নয়।

পূর্বেই বলেছি এ ছন্দ আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণ-জাত একটি মিশ্র ছন্দ; কাজেই এর গোড়ায় যে তত্ত্ব আছে তার একক বা unit'কে একটা বিশেষ নাম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অগত্যা এই unitকে 'অক্ষর' নাম দিয়ে এ ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বলে অভিহিত করেছি। এ নামকরণেব অবশ্য আর-একটি কারণ আছে, সেটি হচ্ছে গোড়ায় আপাতদৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যা গুনে 'ছন্দ' রচনার অভ্যাস থেকেই এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং আজকালও প্রধানতঃ অক্ষর-সংখ্যার প্রতি লক্ষ রেখেই এ ছন্দ রচনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এদিক থেকে দেখতে গেলে একে 'অক্ষববৃত্ত' নাম দেওয়া অসংগত মনে হবে না।*

* বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ

ছন্দ-জিজ্ঞাসা (১)

"অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ" প্রবন্ধটি যখন লিখেছিলুম তখনই ভেবেছিলুম এ বিষয় নিয়ে তর্ক উঠবে। শুধু তাই নয়, তর্ক উঠুক এমন ইচ্ছেও আমি করেছিলুম। কারণ, পারস্পরিক আলোচনার দ্বারাই ক্রমশঃ সত্য নির্ণীত ও স্বীকৃত হয়। সত্যের উপর কারও একচেটে অধিকার নেই। সুতরাং আমি যা বলব তা-ই একমাত্র সত্য, এমন মিথ্যে অভিমান আমার ছিল না, এখনও নেই।

আরও একটি কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। প্রবন্ধটি যখন লিখি তখন মনে মনে খুবই ভরসা করেছিলুম যে, ওই প্রবন্ধে আমার যা প্রতিপাদ্য বিষয় সে সম্বন্ধে অন্যেরা যত তর্কই তুলুক না কেন ছন্দ দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের কাছে তার যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে ত্রুটি ঘটবে না, যদি কোথাও আমি ভুল করে থাকি তবে তিনিই তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেখিয়ে দেবেন। তাই পৌষের 'বিচিত্রা'তেই বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধের প্রতীক্ষা আমার মনে ছিল। কিন্তু পৌষের 'বিচিত্রা'য় তাঁর যে প্রবন্ধটি বেরোল সেটি পড়ে আমি শুধু দুঃখিত নয়, লজ্জিতও হয়েছি। দুঃখিত হয়েছি, কারণ ওই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে আমি যা বলতে চেয়েছি তার কিছুই বোঝাতে পারি নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, আমার নালিশের বিষয়টি কি তা তিনি ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি। ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার স্বভাবতঃই জটিল, বিষয়টি বোঝাও একটু প্রয়াসসাধ্য। তাই এ বিষয়ে কোনো প্রতিপাদ্য তত্ত্ব স্পষ্ট করে বোঝাতে ক্ষমতার প্রয়োজন। আমার বক্তব্য বিষয় আমি যদি স্পষ্ট করে বোঝাতে না পেরে থাকি, তবে সে-অক্ষমতার জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু দুঃখের চেয়েও লজ্জা পেয়েছি বেশি। কারণ আমার প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছে যে, আমি আধুনিক বাঙালি কবিদের কিছু ভর্ৎসনা করেছি এবং তাঁদের জবাবদিহি তলব করেছি। আমি গোড়াতেই বলে রাখছি, ওরকম অভিপ্রায় আমার লেশমাত্রও ছিল না। তথাপি আমার লেখায় যদি কৈফিয়ৎ-তলব বা ভর্ৎসনার সুর শুনিয়ে থাকে তবে আমি শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, সমগ্র আধুনিক বাঙালি কবিসমাজের কাছেই মার্জনা প্রার্থনা করছি।

বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমার একটি নিবেদন আছে। আমি একজন অতি আধুনিক লেখক, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আধুনিকতাই আমার একটি বিশেষ সম্পদ; এই আধুনিক যুগে জন্মেছি বলে আমি সত্যই বিশেষ গৌরব বোধ করে থাকি। কারণ, বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মাবার মতো পরম সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে বলে মনে করিনে। অন্য কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু কবিতা ও ছন্দের কথাই বলছি। বাল্যকালে যখন প্রথম কাব্য পড়তে শুরু করি তখন রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নি। প্রথমেই পড়েছিলুম মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থাবলী, তারপর হেমচন্দ্র, তারপর নবীনচন্দ্র। তার পরেই যখন রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল তখন সহসা অপ্রত্যাশিত রূপে অপূর্ব স্বর ও ধ্বনির যে বিচিত্র-লোকের সন্ধান পেলুম, আনন্দ ও বিস্ময়ের যে পুলক তখন অন্তরকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল তার তুলনা নেই। সে পুলকের স্মৃতি এখনও প্রাণে জাগরূক আছে। তখনকার দিনে তাঁর কবিত্বের চেয়ে তাঁর রচিত ছন্দের বৈচিত্র্য, নৃত্যলীলা ও স্বরঝংকারই আমার তরুণ মনকে নাড়া দিয়েছিল বেশি। তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি রবীন্দ্রকাব্যের একজন একনিষ্ঠ পাঠক এবং তখন থেকেই আমি তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারে বহু বিচিত্র ছন্দের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে আবিষ্কারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছি। এই ষোলো-সতেরো বছর যাবৎ রবীন্দ্রনাথের ছন্দের চর্চা করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে শুধু বাংলা দেশে নয়, কোনো দেশে কোনো কালে তাঁর চেয়ে বেশি সহজ ছন্দ-বোধসম্পন্ন কবি জন্মেছেন কি না সন্দেহ। আর বাংলা দেশে শুধু আমি নয়, সমগ্র বাঙালি কবিসমাজই তাঁকে একমাত্র ছন্দের গুরু বলে স্বীকার করেছে এবং তাঁর কাছেই ছন্দের দীক্ষা নিয়েছে। আজ বাংলা দেশের কাব্যসাহিত্যে যে অজস্র ছন্দের ব্যবহার চলছে তার সমস্তগুলিই রবীন্দ্রনাথের রচিত, না হয় তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত। বাংলা কাব্যে প্রচলিত অসংখ্য ছন্দের মধ্যে এমন একটি ছন্দও আছে কি না সন্দেহ যা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল না হয়েছে। প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগের এমন একটি ছন্দও নেই যা তাঁর স্বাভাবিক ছন্দ-প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে নবতর ও বিচিত্র রূপ ধারণ না করেছে। অল্প বয়স থেকে বাংলা কাব্যের যে ছন্দশাস্ত্র গড়ে তোলার বাসনা পোষণ করছি, সে তো এই রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অবলম্বন করেই। নয় বছর আগে 'প্রবাসী'তে (১৩২৯, পৌষ —চৈত্র; ১৩৩০, বৈশাখ) বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলুম;

তার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে পরোক্ষে ও সাক্ষাতে যে সস্নেহ প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছিলুম তাকেই আমার সাধনার শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার বলে গ্রহণ করেছি। আজ সেই রবীন্দ্রনাথেরই ছন্দ রচনার 'ফাঁকি' ও 'চাতুরী' আবিষ্কার করেছি—তাঁরই মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উপলক্ষ্য হয়েছি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিই আমাকে এমন নিরতিশয় ভাবে লজ্জিত করেছে।

আমার কথা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি নি, এই অক্ষমতার জন্য আজ তাঁর কাছে যে তিরস্কার লাভ করলুম তা সত্ত্বেও তাঁর ছন্দ-প্রতিভার প্রতি আমার বিস্ময়মুগ্ধ শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণই রয়েছে। যে কারণে একান্তভাবে তিরস্কৃত হয়েও একলব্যের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ব্যাহত হয় নি, সেই কারণেই তাঁর প্রতি আমার নিষ্ঠা রেখামাত্রও বিচলিত হয় নি।

এত জোরের সঙ্গে কথা বলছি এই জন্যে যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আমি রবীন্দ্রনাথের ছন্দের (তথা বাংলা ছন্দের) তত্ত্বটি ভুল বুঝি নি। বাজারে রবীন্দ্রনাথের যে কয়খানি কাব্য প্রচলিত আছে, অন্ততঃ ছন্দের তরফ থেকে সে কয়খানি আমি অধিগত করেছি তো বটেই; রবীন্দ্রনাথের উদীয়মান ছন্দ-প্রতিভার অভিব্যক্তির ধারাটি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে কবির বাল্যরচনা 'বনফুল', 'কবি-কাহিনী' প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির ছন্দবিচারও আমাকে করতে হয়েছে। নদীর উৎপত্তিস্থানের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রবাহিণীর আদি ধারাগুলিও আধুনিকদের পক্ষে দুরধিগম্য। কিন্তু তাঁর ছন্দের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি আবিষ্কারের চেষ্টায় ওই দুর্গম স্থানেও বিচরণ করতে হয়েছে। কারণ অদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ইতিহাস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি বই প্রকাশ করবার অভিপ্রায় পোষণ করছি। এই উপলক্ষেই ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দের উপর তাঁর যা-কিছু রচনা আছে সে-সমস্তও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আমাকে বুঝতে হয়েছে। তাই বলছি তাঁর ছন্দের তত্ত্ব বুঝতে পারি নি. এ কথা আমার মোটেই মনে হয় না। আমার এ ধারণা ভ্রান্ত কি না, তার বিচার আমার পূর্বপ্রকাশিত ছন্দের প্রবন্ধগুলি, সদ্যপ্রকাশিত দুটি রচনা (বিচিত্রা—পৌষ; 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান'—জয়ন্তী-উৎসর্গ) এবং অচির-প্রকাশিতব্য কয়েকটি রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই করবেন।

রবীন্দ্রনাথের বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধটিও আমার কাছে একটুও দুর্বোধ্য হয় নি। বার বার পড়ে মনে হল তিনি যা বলতে চান তার সমস্তই আমি স্পষ্ট

বুঝতে পেরেছি। কারণ তাঁর পূর্বপ্রকাশিত ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধ থেকে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনায় বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ আমার জানা আছে, তার সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের মতামতের কিছুমাত্র বিরোধ নেই।

কিন্তু তথাপি, তাঁর এই প্রবন্ধের মন্তব্যগুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা সত্ত্বেও আমাকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে অগ্রহায়ণ মাসের 'বিচিত্রা'য় আমি যে-সমস্ত কথা বলতে চেয়েছি অথচ সম্ভবতঃ বোঝাতে পারি নি সে সম্বন্ধে আমার মতামত বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করার আবশ্যকতা এখনও বোধ করি নি। কিন্তু আমার কথা আমি তাঁকে বোঝাতে পারি নি সেই অক্ষমতার জন্যই পরম দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের অবতারণা করতে হল। কারণ, আমার কথা যদি আমি বুঝিয়ে বলতে পারি তবে তিনি বিনা আপত্তিতে সানন্দে আমার কথা স্বীকার করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার কথা তাঁকে বোঝানো চাই-ই। কেননা, অন্যান্য বিদ্বজ্জনের কথা ছেড়ে দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পরিতোষ লাভ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই প্রয়োগ-বিজ্ঞানকে সাধু বলে মনে করব না। আমি জানি, আমার বক্তব্য বিষয়টিকে যদি তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেন তাহলে সে সত্য সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহের অবকাশও থাকবে না। তা ছাড়া এতদিন তাঁর কাছ থেকে ছন্দের যে অজস্র দান গ্রহণ করেছি, যদি আমি তাঁর সে-সব ছন্দের ভিতরকার আসল তত্ত্বগুলিকে আবিষ্কার করতে পেরে থাকি তবে তাই হবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতিদান। আশা করি, তিনি প্রসন্নচিত্তে আমার সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করবেন।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধটিতে সমস্ত বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে নয়, কেবলমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কথার আলোচনা করেছিলুম। আমার বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস খুব দৃঢ় বলেই কয়েকটি বিষয়ের উপর ইচ্ছে করেই খুব জোর দিয়েছিলুম। মনে ধারণা ছিল তাহলেই ও-বিষয়ে কবিদের বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আর তার ফলেই আলোচনার সূত্রপাত হবে ও সে কথাগুলির যথার্থ মূল্য নিরূপিত হবে; আর আমি যদি সত্যই কোথাও ভুল করে থাকি তা সংশোধন করে নেবার সুযোগও আমি পাব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফল হয়েছে তার ঠিক উলটো। কারণ, আমার সেই জোর-দিয়ে-বলা কথাগুলোকে রবীন্দ্রনাথ খোঁচা বা ভর্ৎসনা বলে ধরে নিয়েছেন; অথচ আমার আসল বক্তব্যটিই রয়ে গেল অনালোচিত।

ওই প্রবন্ধটিতে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমার একটি নালিশ ছিল, সে কথা সত্য। কিন্তু সে নালিশ তাঁর বিরুদ্ধে কিংবা আধুনিক বাঙালি কবিদের বিরুদ্ধে নয়; সে নালিশটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি বিশেষ ব্যবহারের বিরুদ্ধে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নালিশের বিষয়টি আমি ভাল করে বোঝাতে পারি নি। ভাল বোঝা যে যায় নি, এখন মনে হচ্ছে তার কিছু কারণও আছে। প্রথমতঃ নয় বছর আগে 'প্রবাসী'তে ছন্দ সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছিলুম সেগুলি পাঠকের জানা আছে ধরে নিয়েই নতুন আলোচনাটির উত্থাপন করেছিলুম। নতুবা পুরাতন কথার পুনরুত্থাপন করতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বড হয়ে পড়ার ভয় ছিল। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একখানি বই লেখায় হাত দিয়েছি। ওই প্রবন্ধটি তারই একটি অধ্যায়, কিন্তু প্রথম অধ্যায় নয়। সবগুলি প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল না। তাই বেছে এমন একটি অধ্যায় ছাপতে দিয়েছিলুম যাতে তর্ক বা আলোচনা ওঠার সম্ভাবনা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, আলোচনায় যদি আরও কোনো তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তা আমার পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পাবব। কিন্তু মাঝখান থেকে একটি অধ্যায় প্রকাশের ফল এই হয়েছে, আমি যে নির্দিষ্ট অর্থে সংজ্ঞা বা পরিভাষার ব্যবহার করেছি পাঠকের নিকট সেই নির্দিষ্ট অর্থটি অজ্ঞাত থাকায় মূল বিষয় নিয়েই বিভ্রাট ঘটেছে।

কিন্তু পরিভাষার কথা বলার পূর্বে আর-একটি মৌলিক বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমে হয় সৃষ্টি, বিজ্ঞান আসে তার পরে; ঠিক তেমনি প্রথমে ভাষা, পবে ব্যাকরণ; আগে কাব্য, পরে ছন্দ-শাস্ত্র। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক, এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে এত বিচিত্র ও অজস্র ছন্দ দান করেছেন যে তার ফলেই এখন একটা ছন্দ-শাস্ত্র গডে তোলার প্রয়োজন বোধ করছি, এটাও তাঁর পক্ষে গৌরবেরই কথা। যা হক, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম আবিষ্কার করা, যে নিয়ম মেনে চ'লে নিত্যনূতন সৃষ্টির কার্যে অগ্রসর হওয়া যায় সে নিয়ম কখনও সৃষ্টির পথ-রোধ করে দাঁড়ায় না। ভাষাসৃষ্টি হয় স্বভাবের প্রবর্তনায়, ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে তার অন্তরে যে-সমস্ত রীতি সক্রিয় আছে তাকে প্রকাশিত করা, পীড়িত করা নয়। কবি আপনার সহজ আনন্দবোধের দ্বারা চালিত হয়েই ছন্দ রচনা করেন; ছন্দ-শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে কবি স্বভাবতঃই যে-সব নিয়ম মেনে চলেন সেগুলিকে আবিষ্কৃত

করে সুশৃঙ্খল রূপে তাদের সাজিয়ে দেওয়া। কবির শ্রুতিরসবোধের প্রেরণাকে নিরন্তর অবদমন করাই কখনও ছন্দ-শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। কবি আনন্দ-পিপাসু অন্তরের চিরাভ্যস্ত প্রেরণাতেই ছন্দ রচনা করেন, এ কথায় কেউ কখনও সন্দেহ করে নি। কিন্তু কবিদের সেই স্বচ্ছন্দ-রচিত ছন্দের মধ্যে কোনো নিয়ম নেই, এ কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না। যা ইচ্ছে তাই লিখলেই ছন্দ হয় না; শ্রুতিরসবোধের যে-সমস্ত নিয়ম আছে ছন্দ রচনা করতে গেলে, জ্ঞাতসারেই হক অজ্ঞাতসারেই হক, স্বাভাবিক আনন্দের প্রেরণাতেই সেগুলিকে মেনে চলতে হয়। কোনো একটি বিশেষ নিয়মের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক তর্ক চলতে পারে; কিন্তু সমস্ত ছন্দের অন্তরেই একটা-না-একটা নিয়ম যে থাকবেই, এ বিষয়ে একেবারেই তর্ক চলতে পারে না। এ কথা রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বেশি করে জানেন। অথচ তিনি নিয়মমাত্রেরই বিরুদ্ধে এতটা বিমুখ কেন হলেন তা বুঝতে পারলুম না। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'যদি লেখা যেত—

সখাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

তাহলে নিয়ম বাঁচত—', কিন্তু ছন্দ বাঁচত না। কোনো রচনায় ছন্দের নিয়ম ঠিক আছে, অথচ ছন্দ ঠিক নেই—এরকম উক্তির অর্থ বুঝতে গেলে সত্যই ধাঁধা লাগে। উদ্ধৃত লাইনটিতে যদি ছন্দের নিয়ম বেঁচে থাকে তবে ছন্দও ঠিক আছে আর যদি ছন্দ ঠিক না থাকে তবে নিয়মও বাঁচে নি। এখানে যে ছন্দ ঠিক নেই এ বিষয়ে আমি কবির সঙ্গে একমত; কিন্তু নিয়ম বেঁচেছে, এ কথা যে তিনি কেন বললেন তা আমি বুঝতে পারি নি। অন্ততঃ এমন কোনো নিয়মের কথা আমি জানিনে, এ কথা আমি অসংকোচে বলতে পারি।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে প্রবন্ধে তিনি নিয়মের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ এনেছেন, সে প্রবন্ধেই তিনি বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব তথা ছন্দের দু-একটি অতি প্রয়োজনীয় নিয়মের কথাই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ এক স্থানে তিনি বলছেন, 'বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলা হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়।' দ্বিতীয়তঃ অন্যত্র আছে, 'বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো কমানো যায়'; অর্থাৎ 'বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে'। কবির এই উক্তিটি কি বাংলা ধ্বনি তথা ছন্দ-তত্ত্বের একটি নিয়ম নয়? যথাস্থানে দেখাব যে, প্রধানতঃ এ দুটি নিয়মের

উপরই আমি আমার সমস্ত আলোচনাটিকে দাঁড় করিয়েছিলুম। তৃতীয়তঃ অন্যত্র আছে, 'চলতি ভাষার কবিতা চলতি ভাষার নিয়মে এখন খুবই চলেছে'। তাহলে দেখা গেল, ছন্দের নিয়ম থাকবেই এ কথা তিনিও স্বীকার করেন।

তাঁর অভিযোগের আসল কথা বোধ করি এই যে, কবিরা নিজেদের প্রকৃতিগত আনন্দের প্রেরণায়ই ছন্দ রচনা করে থাকেন, প্রতিপদেই নিয়মকে সারথি করে অক্ষর বা মাত্রা গুনে গুনে রচনা করেন না। এ কথা আমিও কখনও অস্বীকার করি নি। তবে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, আর্ট যদিও অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-প্রেরণার সৃষ্টি তথাপি অন্ততঃ আধুনিক কালের আর্টিস্টরা আর্টের ভিতরকার বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সচেতন থাকেন তা নির্ভয়ে বলা যায়। ওস্তাদ গায়ক যে শুধু ভাল গাইতে পারেন তা নয়, সংগীতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও তিনি জানেন। তেমনি কবিরাও যখন ছন্দ রচনা করেন তখন কি ছন্দ রচনা করছেন সে বিষয়েও তাঁরা সচেতন থাকেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দ রচনার সময় এ বিষয়ে খুবই সচেতন থাকেন সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই। স্ব-রচিত ছন্দ সম্বন্ধে যদি সচেতন না থাকতেন তবে তিনি এমন নিখুঁতভাবে নিত্যনূতন ছন্দ রচনা করতে পারতেন না। এ বিষয়ে এমন সচেতন বলেই তো তিনি আজ সমগ্র দেশে ছন্দ-দ্রষ্টা ঋষিরূপে পূজিত ও অভিনন্দিত হচ্ছেন। আমার অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে আমি স্থানবিশেষে কবিদের এই সচেতনতার কথাই বলেছি। কবিরা আয়াস স্বীকার করে বা ষড়্‌যন্ত্র করে কিংবা প্রতিপদেই সচেষ্টভাবে অক্ষর গুনে গুনে রচনায় অগ্রসর হন, এমন হাস্যকর অবিশ্বাস্য কথা বলা কখনও আমার অভিপ্রায় ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-কয়েকটি কথা বলেছেন তার প্রায় সমস্ত কথাই আমার অনুকূল, তাঁর অধিকাংশ কথার মধ্যেই আমি আমার মতেরই ভাল রকম সমর্থন পেয়েছি। আর বাকি কথাগুলিও আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধ নয়। এমনটি হতে পেরেছে, তার কারণ আমার নালিশের বিষয়বস্তুটিই তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না। কাজেই যে-সব বিষয়ে আমার কোনো নালিশই নেই এবং যে-সব কথা আমি প্রতিবাদের আশঙ্কামাত্র না করে বলে গেছি, তাঁর এই প্রতিবাদের মধ্যে সে-সব কথার চমৎকার সমর্থন পেয়ে আমি সুখী হয়েছি। তাঁর এই

প্রতিবাদটি আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে। অধিকন্তু আমারই কথা সমর্থিত হয় এমন কয়েকটি নব-রচিত দৃষ্টান্ত পেয়ে আমার সুবিধাই হয়ে গেল। যথাস্থানে সে কথা বলব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার নালিশের উপর কোনো রায় পাওয়া গেল না।

উপমা বা তুলনা কখনও অকাট্য যুক্তি বলে গ্রাহ্য হয় নি। উপমা বা তুলনার দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তের চমৎকার ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুই প্রমাণিত হয না। যদি তা-ই হত, তবে উল্টো উপমা দেখিয়ে সব কথাকেই অপ্রমাণিত করা যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপমার দ্বারা আমার বক্তব্য খণ্ডিত না হয়ে অতি আশ্চর্য রকমে সমর্থিত হয়েছে। 'বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে বাড়ানো কমানো যায়' অর্থাৎ 'বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে'—এ নিয়মটির সমর্থক উপমা হচ্ছে গেঞ্জিজামা; কেননা এ জিনিসটা মধুপুরেব স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহের সঙ্গে সঙ্গে একটু বাড়তেও পারে আবার শহরে এলে একটু কমতেও পারে। কার্যতঃ এ কথারই দ্বিতীয় উপমা হচ্ছে, চিতল মাছ ধরার বেলায় ডাঙায় বসে ছিপ ফেলা আর চিংড়ি মাছ ধরার বেলায় কাদায় নামা। একই জিনিসের দুইরকম বিপরীত ব্যবহারের তৃতীয় উপমা হচ্ছে বধুর চুল; কারণ ওই একই চুল পিঠে ছড়িয়ে রোদ পোহানো যায় আর খোঁপা করে বেঁধে নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়। আশ্চর্য এই যে, আমি ঠিক এই কথাই আমার প্রবন্ধে একাধিকবার বলেছি, অবশ্য অন্য ভাষায়। যথাস্থানে তা দেখাব।

বস্তুতঃ কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ ছাড়া আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের কিছুমাত্র বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের অর্থ দুজনের মনে দুরকম থাকায় আপাততঃ তিনি আমার উক্তিগুলিকে তাঁর মতের বিরোধী বলেই মনে করেছেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, দুই পক্ষের মনে একই পারিভাষিক শব্দের দুরকম মানে থাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে যায়। কিন্তু যখন পরিভাষার মধ্যে অর্থসংগতি ঘটিয়ে দেওয়া যায় তখন দেখা যায় উভয়েরই বক্তব্য বিষয় ঠিক একই। অথচ পরিভাষার অর্থ-বৈষম্যের জন্যই বিরোধ ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে এবং তারই ফলে আমার মূল অভিযোগটিই চাপা পড়ে গেছে।

পূর্বেই বলেছি, আমার নালিশ রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির বিরুদ্ধে

নয়; একটিমাত্র বিশেষ ছন্দের বিরুদ্ধে। সে ছন্দটি হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত; মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে আমার লেশমাত্রও অভিযোগ নেই। অথচ আমার কথার নিরসন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তই রচনা করেছেন। অক্ষরবৃত্তের যে দুটি দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন তাও অন্য প্রসঙ্গে। কাজেই আমার কথার উত্তর আমি পাই নি। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে আজ পর্যন্ত আমি কোথাও এতটুকু ত্রুটি পাই নি। তাঁর রচিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কোথাও ত্রুটি পেয়েছি, এ কথাও আমি বলতে চাইনে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ যে উপাদানে রচিত হয় সে উপাদানের মধ্যেই অসম্পূর্ণতা রয়েছে এবং সে অসম্পূর্ণতা আজকালকার নয়; বাংলা কাব্যসাহিত্য যত প্রাচীন এই অসম্পূর্ণতাও বোধ হয় তত প্রাচীন। সুতরাং এর জন্য আমি আধুনিক বা প্রাচীন কোনো কবিকেই দায়ী করছি না। যে উপাদান নিয়ে আর্টিস্ট আর্ট রচনা করেন সে উপাদানেই যদি ত্রুটি থাকে তবে তার জন্য আর্টিস্টকে দায়ী করা যায় না। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথেরই দান এবং এ ছন্দ-দুটিকে সম্পূর্ণ নিখুঁত রূপেই তিনি দান করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ তিনি পূর্ববর্তীদের কাছেই পেয়েছেন। সুতরাং এ ছন্দের মৌলিক ত্রুটির জন্যে তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী নন। সে অভিযোগও আমি করছিনে। কিন্তু আমি একমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে যাকে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ তাকেই সাধারণ ভাবে সমস্ত বাংলা ছন্দ ও বাঙালি কবিদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ বলে ধরে নিয়েছেন, পারিভাষিক শব্দের অবিরুদ্ধ অর্থসংগতির অভাবে। আর তাতেই এ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলছি এবং তার বিরুদ্ধে আমার নালিশ কি সে দিকে লক্ষ থাকলে এত কথা উঠতে পারত না।

কিন্তু তর্ক হতে পারত আমি যাকে অক্ষরবৃত্তের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা বলেছি সেটা আসলেই ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা কি না। এমন তর্ক হওয়া অন্যায় তো নয়ই, বরং খুবই সমীচীন। আর আমিও ও-রকম তর্ক যাতে হয় তারই ইচ্ছে করেছিলুম। কিন্তু সে তর্ক উঠল না, উঠল অন্য তর্ক। তাই তর্কটাকে পুনরুত্থাপিত করতে চাই। কিন্তু এখানেই বলে রাখা দরকার যে, আমার সমস্ত কথাকে বিশদতর করে সেই প্রসঙ্গেরই বিচার করতে গেলে একটিমাত্র প্রবন্ধে

স্থানাভাব ঘটবে। আমি এ স্থলে মাত্র আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির উত্থাপন করব এবং তৎপরে পারিভাষিক শব্দগুলিকে বিশদতর করতে চেষ্টা করব। এ স্থলে অনেক কথারই পুনরুক্তি করতে হবে। কিন্তু সব কথার পুনরুক্তি করা সম্ভব নয়। সুতরাং পাঠক যদি অনুগ্রহ করে এ প্রবন্ধটির সঙ্গে অগ্রহায়ণের প্রবন্ধটি মিলিয়ে পড়েন তবে আশা করি আমার বক্তব্য আর অস্পষ্ট থাকবে না।

আমি বাংলা ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। কেন করেছি এবং কোন্ তত্ত্বের সাহায্যে করেছি, এ কথাটি যদি স্পষ্টরূপে বোঝাতে পারি তাহলেই আমার বিশ্বাস এই মতবিরোধের মূলটি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বাংলা ছন্দের এই ত্রিধারার পরিচয় দেবার পূর্বে আমার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সব অভিযোগ এনেছেন সেগুলো ভাল করে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

১

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলায় স্বরবর্ণ, যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্ব-দীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়।...বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক বলেই...বাংলা ছন্দে প্রাক্-হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালির কানে ঠেকে নি—এই প্রথম দেখা গেল নিয়মের ধাঁধায় পড়ে বাঙালি পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন।' হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বর গুরু বা দ্বিমাত্রিক হয়, এ কথা আমিও স্বীকার করেছি; কাজেই এ বিষয়ে কোনো ধ্বনিতত্ত্ববিদের বিধান নেবার প্রয়োজন নেই। শুধু যে অগ্রহায়ণের প্রবন্ধেই আমি এ নিয়মের উল্লেখ করেছি তা নয়; কয়েক বছর পূর্বেই বাংলা ছন্দের এ নিয়মটির প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়েছিল (প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ, ৩০৪-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আমার জন্মাবার বহু পূর্বেই যে প্রাক্-হসন্ত স্বরকে দুমাত্রা বলে ধরা হয়েছে, আমি তা অবগত আছি। কিন্তু তারও বহু পূর্বে প্রাচীন ছন্দোবিৎরা এ তত্ত্বটি অবগত ছিলেন (পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রম্ ১।৭ দ্রষ্টব্য), কেননা এ নিয়মটি শুধু বাংলার স্বকীয় নয়, সংস্কৃত উচ্চারণের পক্ষেও এ নিয়ম সত্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথিত এ নিয়মটিকে আমি একটু স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করতে চাই। যেমন জল, চাঁদ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এ দুটি শব্দের অ এবং

আ-কে 'আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের ক্ষতি পূরণ করে থাকি'। তাই ছন্দে জল এবং চাঁদ কথা দুটি দ্বিমাত্রিক বলেই গণ্য হয়। আমি এ কথাটাকেই অন্যভাবে বলতে চাই। আমার পরিভাষায় জল এবং চাঁদ শব্দের হসন্ত ল্ এবং হসন্ত দ্ এক-একটি আশ্রিত ধ্বনি এবং জ এবং চাঁ এক-একটি আশ্রেতা ধ্বনি। আশ্রিত এবং আশ্রেতা ধ্বনির যোগে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে আমি যুগ্মধ্বনি বলেছি; যেমন জল এবং চাঁদ দুটি যুগ্মধ্বনি। আর যুগ্মধ্বনিকে আমি সর্বদাই দ্বিমাত্রিক বলে ধরেছি। সুতরাং আমার মতেও জল এবং চাঁদ শব্দে দুমাত্রাই আছে। কেন একই বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করতে চাই, সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 'জল' শব্দ 'পাতা' শব্দের চেয়ে মাত্রাকৌলীন্যে কোনো অংশে কম, এমন সংশয় আমি কখনও করি নি, এখনও করিনে। কেননা, পাতা শব্দে দুটি অযুগ্মধ্বনি আছে; অতএব এ শব্দটি দ্বিমাত্রিক। আর জল শব্দে একটি যুগ্মধ্বনি, অতএব এ শব্দটিও দ্বিমাত্রিক। সুতরাং উভয় শব্দেরই মাত্রাকৌলীন্য সমান। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এ পংক্তিটির ধ্বনিনির্ণয় করব এ ভাবে।—

জল্ পড়ে,| পাতা নড়ে

এ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, 'উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে—এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছুমাত্র খটকা লেগেছে বলে আমি জানিনে, কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে, নিয়ম পেতে নয়'। আমি অবশ্য এ লাইনটিকে কান পেতেও পড়েছি, নিয়ম পেতেও পড়েছি। আমি গোড়ায়ই বলে রাখছি কান পেতে ও-লাইনটিতে কিছুমাত্র ত্রুটি পাই নি এবং নিয়ম পেতেও আমার কিছুমাত্র খটকা লাগে নি। আর এইটেই স্বাভাবিক, কেননা ছন্দের আলোচনায় কানের ভাল-লাগার রীতি যার দ্বারা আবিষ্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই ছন্দের নিয়ম বলা হয়। কানের ভাল-লাগার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য নেই, তাকে কখনই ছন্দের নিয়ম বলব না। কাজেই ছন্দের নিয়ম বজায় থাকলে কানেও ভাল লাগবে এবং নিয়ম বজায় না থাকলে কানেও ভাল লাগবে না। যা হক, উক্ত লাইনটি সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধে যে আলোচনা করেছি সেটুকু বারবার পড়ে দেখলুম; কিন্তু ওই লাইনটি নিয়ে কোথাও আমার খটকা লেগেছে এমন কথা তো আমি

ঘুণাক্ষরেও কোথাও প্রকাশ করি নি। বরং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি নিখুঁত ও সুন্দর নিদর্শন হিসেবেই আমি অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে ওই লাইনটি উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা কেন হল আমি এখনও তা বুঝতে পারি নি। এ লাইনটি সম্বন্ধে আমি যা বলেছি এখানে সে কথাই আবার সংক্ষেপে বলছি।

\+ । +। ।

উদয়্-দিগন্‌তে ঐ শুভ্‌র শঙ্‌খ বাজে

এ লাইনটিতে যুগ্মধ্বনি আছে পাঁচটি যথা—দয়্, গন্, ঐ (= অই্), শুভ্, শঙ্। তার মধ্যে যোগ-চিহ্নিত ছুটি যুগ্মধ্বনি (দয়্ এবং ঐ বা অই্) এখানে ছুই unit-এর মর্যাদা পেয়েছে। কেননা 'দয়্' ধ্বনিটি শব্দের অন্তে অবস্থিত আর 'ঐ' কথাটি একটি একস্বর (monosyllabic) যুগ্মধ্বনি। কিন্তু দণ্ড-চিহ্নিত বাকি তিনটি যুগ্মধ্বনি এক unit-এর বেশি মর্যাদা পায় নি ; কেননা এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত নয়। এইটেই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আসল নিয়ম, এ কথা বলাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। আর উদ্ধৃত লাইনটিতে এ নিয়মটি সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে এবং কাজেই এ লাইনটিকে আমি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিখুঁত আদর্শ হিসেবেই ব্যবহার করেছি। সুতরাং এ লাইনটির ছন্দ গত নির্দোষতা সম্বন্ধে আমার লেশমাত্রও সংশয় নেই।

২

রবীন্দ্রনাথ 'ইচ্ছামতো' কোথাও 'ঐ' লিখে আবার কোথাও 'ওই' লিখে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে ছুই রকমের মূল্য দিয়েছেন, এ কথা আমি কোথাও বলি নি। তিনি যথেচ্ছভাবে কোথাও 'ঐ' আর কোথাও 'ওই' লেখেন, এ কথা বলা মোটেই আমার অভিপ্রায় নয়। আমার অভিপ্রায় ঠিক তার উলটো। আমি বলতে চাই, তাঁর 'ঐ' এবং 'ওই' শব্দ ব্যবহারের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রীতি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে তিনি 'ঐ' ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তিনি সাধারণতঃ 'ওই' ব্যবহার করেন। তাঁর সমস্ত কবিতা আলোচনা করে তাঁর এই বিশেষ রীতিটি আমার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর রীতিটির একটিমাত্র ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েছিল। সেটি হচ্ছে এই—

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে

এখানে চোদ্দ অক্ষর না থাকলেও 'ঐ' দ্বিমাত্রিক বলে ছন্দ ঠিকই আছে। এ রীতিটির আর-একটি ব্যতিক্রম ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি। সেটি হচ্ছে এই—

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

—বুদ্ধদেবের প্রতি, প্রবাসী, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ

এখানেও ছন্দ ঠিকই আছে; কারণ 'ঐ' শব্দ দ্বিমাত্রিক। কিন্তু এ দুটি ব্যতিক্রম মাত্র। তাঁর সাধারণ রীতি হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'ওই' লেখা। যথা—

এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি

আমার বিবেচনায় অক্ষরবৃত্ত কিংবা অন্য যে-কোনো ছন্দে সর্বত্রই ঐ এবং ওই শব্দ যথেচ্ছভাবেই ব্যবহার করা চলে, তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন, 'উদয়-দিগন্তে ঐ' 'ঐ নামে একদিন' প্রভৃতি শব্দ স্থলে 'ঐ' না লিখে 'ওই' লিখলেও ক্ষতি হত না। আবার

এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা ওই শশী-রবি

এখানে 'ওই' না লিখে 'ঐ' লিখলেও ছন্দ অব্যাহতই থাকত। আশা করি এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা বাংলা ছন্দে ঐ এবং ওই সর্বত্রই সমান মর্যাদার ধ্বনি। 'ঐ' এক মাত্রা এবং 'ওই' দুই মাত্রা এ কথা কখনও সত্য নয়। যে ভাবেই লিখি না কেন, এ শব্দটি সর্বদাই দ্বিমাত্রিক; কারণ এটি একটি যুগ্মধ্বনি। কাজেই স্বরবৃত্ত ছন্দে ঐ বা ওই সর্বত্রই এক সিলেব্‌ল্ (মাত্রা নয়); অন্য সব ছন্দেই এটি দ্বিমাত্রিক।

৩

আকাশের ওই | আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই | লাগে

'আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে ঐ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দকে'

ঐ যে তপনের | রশ্মির কম্পন
এই মস্তিষ্কেতে | লাগে

এ ভাবে 'রূপান্তরিত করা অপরাধ'।—এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করিনে। আর হেমচন্দ্র যদিও 'স্বতঃই কানের ওজন রেখে'ই

হেথা ইন্দ্রালয়ে | নন্দন ভিতর
পতিসহ প্রীতি | সুখে নিরন্তর
দানব-রমণী | করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা | হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে | সুষমাতে ভুলি,
বদনমণ্ডলে | ভাসিছে ব্রীড়া।

প্রভৃতি 'ত্রৈমাত্রিক ভূমিকা'র ছন্দ রচনা করেছিলেন, তথাপি এরূপ রচনায় তাঁর ছন্দ-গত 'অপরাধ' হয়েছিল, এ কথাও আমি বলেছি। আমি যাকে ষণ্মাত্রিক বা ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দ বলি রবীন্দ্রনাথ তাকেই 'ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দ' বলেছেন; অন্যত্র তিনি এ ছন্দকেই 'অসম মাত্রার ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দে (অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার বা অসম মাত্রার ছন্দে) যুক্তবর্ণের দ্বারা নির্দিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে গণ্য করলে অপরাধ হয়, এ কথা আমি বহু পূর্বেই বলেছি। আমার কয়েক বছর আগেকার একটা রচনা থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি।—

"হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
—রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেক বিখ্যাত কবিতা লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথমতঃ অক্ষরবৃত্তে এই অসমপদী তালের অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে এ তাল ভাল শোনায় না, যেখানে যুক্তবর্ণ উপস্থিত হয় সেখানেই পদে পদে তালভঙ্গ হয়, শ্রুতিকটুতা দোষ হয়। এই তথ্যটি লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় মাত্রাবৃত্তের প্রবর্তন করেছেন; 'মানসী'তে তিনি সর্বপ্রথম যুক্তবর্ণের পূর্বস্বরকে দ্বিমাত্রিক বলে ধরে এ নতুন ছন্দ ব্যবহার করতে শুরু করেন। এখন অসম তালের ছন্দ সর্বদাই মাত্রাবৃত্তে রচিত হয়ে থাকে; অক্ষরবৃত্তে অসমতাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয়ে গেছে। আর-একটা উদাহরণ দিচ্ছি, 'প্রভাতসংগীত' থেকে। পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন এ রচনাটা মার্জিত শ্রুতি-রুচির উপর কতখানি অত্যাচার করে।

বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মর মর মৃদু তান,

চারিদিক হতে কিসের উল্লাসে
পাখিতে গাহিবে গান।

এখানে যুক্তবর্ণগুলো যেন গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের মতো স্বর-প্রবাহের গতি রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের ছন্দচেতনাও যেন সে গুরুভারে নিপীড়িত হচ্ছে। সুতরাং এ ভারটাকে যদি একটু লঘু করে দেওয়া যায় তবেই ছন্দের স্রোত আবার অবাধ গতিতে বয়ে চলবে,—

বায়ুহিল্লোলে ধরে পল্লব
মর মর মৃদু তান,
চারিদিক হতে কি যে উল্লাসে
পাখিরা গাহিছে গান।"

—প্রবাসী, ১৩৩০, চৈত্র, পৃ ৭৮৭

আট বছর পূর্বে আমি ওই কথাগুলি লিখেছিলুম। এখনও আমি ওই মত পরিবর্তন করি নি। যা হক আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

'প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি,'—
অনাথ-পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ
নিনাদে।

—শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, কথা, রবীন্দ্রনাথ

এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'তে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তনের পরেই রচনা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস এ দৃষ্টান্তটিও 'ত্রৈমাত্রিক ভূমিকা' বা 'অসমমাত্রার' ছন্দেই রচিত, কিন্তু তথাপি হেমচন্দ্রের 'হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর' প্রভৃতি রচনার মতো এ স্থলেও যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলেই গণ্য করা হয়েছে। তাতে কোনো 'অপরাধ' হয়েছে কি না সে বিচার কবিরাই করুন।

৪

'বৎসর, উৎসব প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই,—এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড ৎ-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর বলে চালাই, প্রবন্ধলেখক এই অপবাদ দিয়েছেন।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে আমি কোথাও এ

কথা বলি নি. আমার প্রবন্ধটিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন কথার আভাস-মাত্রও পেলুম না। সুতরাং এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা'র প্রায় দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে যে-সব কথা বলেছেন তা আমার প্রতি প্রযোজ্য নয়। আমি বরং তার উলটো কথাই বলেছি। যেমন, 'ধ্বনির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ না রেখে সব সময়েই শুধু অক্ষর গোনা হয়, এ কথা বলা অন্যায় হবে' (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, পৃ ৫৭৯)। আর এ কথার দৃষ্টান্তস্বরূপ বৎসর, উৎসব প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছি; কেননা বৎসর প্রভৃতি শব্দে দেখতে চার অক্ষর হলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মে তিন 'অক্ষর'ই ধরা হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মাত্রাবৃত্তের নিয়মে বৎসর, উৎসব প্রভৃতিকে চার 'মাত্রা' ধরা হয় এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরবৃত্তের নিয়মে এ শব্দগুলিকে দুই 'স্বর' ধরা হয়। আর এইটেই বাংলার তিন রকমের ছন্দের পক্ষে তিনটি স্বাভাবিক নিয়ম; সুতরাং বৎসর প্রভৃতি শব্দকে তিন প্রকার বিভিন্ন ছন্দের তিন রকম মাপকাঠিতে পরিমাপ করা অন্যায় নয়, এ কথাই আমি বলেছি।

৫

রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে 'উদয়-দিক্‌প্রান্ত তলে' (পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী) লিখে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে তিন অক্ষর ধরেছেন। আমি বলেছি 'উদয়ের দিক্‌প্রান্ততলে' লিখে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে চার অক্ষর ধরলেও খারাপ শোনাত না; কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র দিক্‌প্রান্ত কথাটিতে চার অক্ষর ধরেছেন; যথা—'দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার' (নববধূ, মহুয়া) এবং 'দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্রকলা' (প্রত্যাগত, মহুয়া)। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে 'শালিসির জন্যে কবিদের উপর বরাৎ' দিয়েছেন। আমিও তাঁদের শালিসি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

৬

'তোমারি, যখনি শব্দগুলির ই-কারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন করে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কিনা জানিনে, যদি করে থাকেন বাঙালি পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না।' রবীন্দ্রনাথের এ কথার প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে এমন 'অলস কবি'র কথা আমার জানা আছে এবং আমিও তাঁদের শিরোপা দিতে চাইনে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) বীরের স্বর্গই যশ, যশই জীবন

—বৃত্রসংহার, ষষ্ঠ সর্গ, হেমচন্দ্র

(২) বীরের একই মাত্র সহায় রমণী

—ঐ, দ্বাদশ সর্গ

(৩) হা দেব, এ ভাগ্য মন স্বপ্নের(ও) অতীত।

—ঐ, ত্রয়োদশ সর্গ

খুঁজলে এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখানে 'যশই, একই' শব্দে ই-কে স্বতন্ত্র অক্ষর গণনা করে প্রতি পংক্তিতে চোদ্দ অক্ষর বজায় রাখা হয়েছে (হেমচন্দ্র যশ শব্দের শ-কে অকারান্ত উচ্চারণ করতেন কি না জানিনে)। আবার 'স্বপ্নেরও' শব্দের ও-কে তিনি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র বলে মনে করতেন; তাই ওই পংক্তিতে পনেরো অক্ষর হয়ে যাবার ভয়ে ও-কে ব্র্যাকেটস্থ করেছেন।

সেই আর্যাবর্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

—ভারতসংগীত, কবিতাবলী, হেমচন্দ্র

এখানেও ওই একই কারণে 'এখনও' শব্দের ও-কে ব্র্যাকেটে রাখা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিরা এভাবে ব্র্যাকেট ব্যবহার করেন না। কেননা তাঁরা জানেন যে অক্ষরের চাক্ষুষ সংখ্যা ছন্দের পক্ষে অবান্তর, ধ্বনিসাম্যই ছন্দের মূল কথা। আর 'এখনও' শব্দে চার অক্ষর দেখালেও তার ধ্বনিগত unit তিন, তার আসল রূপ হচ্ছে 'এখনো'। সুতরাং ও-কে ব্র্যাকেটস্থ করার প্রয়োজন নেই। বোধ করি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে কবিদের এ বিষয়ে নিঃশঙ্ক করেছেন। তাই তিনি—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?

লিখতে অক্ষরসংখ্যার ভয়ে সংকুচিত হন নি; কেননা 'একই' শব্দে অক্ষর তিনটে হলেও তার ধ্বনির unit দুটির বেশি নেই। সেই জন্যে আমি রবীন্দ্রনাথকেই শিরোপা দেবার প্রস্তাব করেছি।

৭

আমি লিখেছি "আজকাল কবিরা 'হইতে, লইয়া, যাইবে' প্রভৃতি সাধু শব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে বর্জন করার অভিপ্রায়ে হতে, লয়ে, যাবে প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন"। আমার এ কথায় কবিদের ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণই নেই। কারণ আমি আজকালকার কবিদের 'ভৎর্সনা' করার উদ্দেশ্যে ও-কথা তো লিখিই নি, বরং তাদের ধ্বনিবোধের তীক্ষ্ণতার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যেই ও-কথা বলেছি। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ আমার ব্যবহৃত 'অভিপ্রায়' কথাটিতেই অপ্রশংসার ধারণা করেছেন। আমি বিনীতভাবে এ স্থানে জানিয়ে রাখছি যে 'অভিপ্রায়' শব্দটিকে আমি সজ্ঞান সচেষ্ট অভিপ্রায়, 'ষড়্‌যন্ত্র', 'ফাঁকি চালাবার বা সংকট এড়াবার মতলব' অর্থে ব্যবহার করি নি। তীক্ষ্ণ ছন্দবোধ-চালিত স্বতঃ-উদ্‌ভূত অভিপ্রায় অর্থেই আমি ও-শব্দটি ব্যবহার করেছি। প্রাচীন কবিদের রচনায়ও হব, রব, যাব, নিতে, জুড়াব প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত আছে, এদিকে রবীন্দ্রনাথ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন; তাতে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। কেননা তার মধ্যে আমি আমার মতের খুব সুন্দর সমর্থন পেলুম। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে আধুনিক এবং প্রাচীন সকল কবিরাই যে হইতে, লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার করেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই 'কানের কোনো জরুরি হুকুম অথবা ভাষার কোনো স্বতঃপরিণত ইঙ্গিত' রয়েছে। অবিকল এই কথাটি বলাই আমার অভিপ্রায়। তার উপর আমি আর একটু বলতে চাই যে, প্রাচীন কবিদের চেয়ে আধুনিক কবিরা এ-সমস্ত সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার করেন অপেক্ষাকৃত বেশি এবং তাতে আমি আধুনিক কবিদের তীক্ষ্ণতর ছন্দবোধেরই পরিচয় পাই। তা ছাড়া ওই প্রবন্ধের মধ্যে আমি কবিদের কানের এই 'জরুরি হুকুমের' কারণটিও আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি।

বাংলা ছন্দের ভাষা সম্বন্ধে যখন কথা উঠল তখন এ বিষয়ে আমার মতটাকে আর-একটু স্পষ্ট করেই বলছি। ইদানীং বাংলা রচনার রীতিবিচারের উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ঘোষিত 'সাধু বনাম চলতি ভাষার' যুদ্ধের কথা উত্থাপন করে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, 'সকলেই জানেন বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে লড়াইটাই ছিল ও-যুদ্ধের একটা প্রধান পর্ব। এর কারণ খুব স্পষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় থেকে বাংলার সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির যে রূপ চলে

আসছিল তা যেমন লতানো, তেমনি শিথিল। 'হইয়া, করিয়া, যাইয়া, হইতেছিল, করিতেছিলাম, খাইতেছিলেন'—এসব ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে আনলে তাকে গাঢ়বন্ধ করা হয় এক রকম অসম্ভব কাজ। সুতরাং বাংলা গদ্য হয়ে পড়ে নিতান্ত শিথিল। এই শিথিলতা থেকে মুক্তির জন্য লেখকেরা অনেক সময় ক্রিয়াপদ প্রায় বর্জন করে বাক্যের পর বাক্য লিখে চলতেন কিন্তু তাতে প্রায়ই আনতে হত দীর্ঘ সমাস। অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলির ঠিক ও-রূপ বজায় রেখে বাংলা গদ্যে শ্লেষ আনা যায় না, এবং শ্লেষ ছিল প্রমথবাবুর লক্ষ। সুতরাং তিনি কলকাতার ভদ্রসমাজের মুখের কথার অনুরূপে ক্রিয়াপদগুলিকে কেটে ছোট করলেন। বাংলাব ক্রিয়াপদগুলি ওর দুর্বলতার জাযগা, এই উপাযে সে দুর্বলতা প্রমথবাবু অনেকটা দূব কবেছেন' (পরিচয় ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ ১৭৫)। আমি এ বিষয়ে অতুলবাবুব সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। শুধু তাই নয়, আমি বলতে চাই তাঁব উক্তিগুলি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যতখানি সত্য, বাংলা ছন্দ, বিশেষতঃ অক্ষববৃত্ত ছন্দ, সম্বন্ধে তার চেযে বেশি সত্য। কারণ গদ্যে ধ্বনির শিথিলতা শ্রুতিরুচিকে যতটা পীডা দেয, পদ্যে ধ্বনির শিথিলতা তার চেযে বেশি পীডা দেয। কেননা গদ্যে বক্তব্য বিষযটাই থাকে মুখ্য, ধ্বনিমাধুর্যটা গৌণ, আর ধ্বনিমাধুর্যটাই হল পদ্যের অন্যতম মুখ্য লক্ষ। কাজেই পদ্যের বচনা বৈদর্ভী রীতিতে শ্লিষ্ট ও গাঢবন্ধ হওয়া গদ্যের চেযে বেশি প্রযোজনীয়। এই জন্যই আমি বাংলা অক্ষববৃত্ত ছন্দেও শব্দেব সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের পক্ষে এতটা ওকালতি করতে চাই। আমার বিশ্বাস অক্ষববৃত্ত অর্থাৎ ববীন্দ্রনাথেব কথিত সাধু ছন্দের ধ্বনিটাকে সম্পূর্ণ অব্যাহত বেখেও ও-ছন্দে শব্দের সংক্ষিপ্ত চলতি রূপ চালানো অসম্ভব নয়। আর এ কাজ কবতে পারেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই, তিনি যদি না পারেন তবে আর কেউ পারবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'সম্মুখ লড়াইয়ে পড়ে বীবের সেরা বীর
বীরবাহু চলে যখন গেলেন যমের বাড়ি

এ রকম ভাবার কোনো দোষ নেই, কিন্তু যথাস্থানে। সাধু ভাষার ঠাটের মধ্যে এটা চালানো যায় না।' এ দৃষ্টান্তটির দ্বারা আমার উক্তিটি উপহসিত হয়েছে বটে, কিন্তু অপ্রমাণিত হয় নি। কেননা আমি যে ছন্দের কথা বলেছি এ দৃষ্টান্তটি মোটেই তার অনুরূপ নয়। আমি বলতে চাই, অক্ষরবৃত্ত বা সাধু ছন্দে

প্রতি পংক্তির অক্ষরসংখ্যা (চোদ্দ বা আঠারো বা আর যাই হক) ঠিক রেখে এবং ও-ছন্দের সুপরিচিত ধ্বনিকেও ঠিক রেখে তাতে শব্দের সংক্ষিপ্ত বা চলতি রূপ চালানো অসম্ভব নয়। উক্ত দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তির চোদ্দ অক্ষরের নিয়মই পালিত হয় নি। সুতরাং এ দৃষ্টান্তটির দ্বারা আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যদি ইচ্ছে করেন তবে 'বসুন্ধরা' 'মানস-সুন্দরী' 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতির স্বজাতীয় কবিতায় চোদ্দ বা আঠারোর নিয়ম এবং ও-সব ছন্দের ধ্বনি অব্যাহত রেখেও শব্দের, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের ব্যবহার প্রবর্তন করতে পারেন, আমার তাই বিশ্বাস। আমি কবি নই, ছন্দ-রচনা করা আমার অভ্যাস নয। সুতরাং আমার এ বিশ্বাসের মূল্য কতখানি তা আমি জানিনে।

এ বিষয়ে যথাসময়ে আরও আলোচনা করব। কিন্তু এ স্থলেই আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধু ছন্দে সর্বত্রই এবং সর্বদাই সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে, এমন জেদ আমি করি নি। ধরিব, ধরিত, ধরিয়া প্রভৃতি রূপের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ বেশি নয়, কেননা সাধুবেশধারী এবং কতকটা শিথিল প্রকৃতির হলেও এগুলি শ্রুতিরুচিকে পীড়িত করে না। কিন্তু হইতে, লইয়া, যাইবে, জানাইতে, বাজাইল প্রভৃতি যে-সব শব্দের মধ্যে একটি করে যুগ্মস্বর বা dipthong আছে, অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ সাধু ছন্দে সে-সব শব্দের ব্যবহারের বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। কেননা ও-সব শব্দের মধ্যবর্তী ই-কারগুলি স্বতন্ত্র নয়, এগুলি পূর্ববর্তী স্বরের আশ্রিত। অর্থাৎ লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত রূপ হচ্ছে লইয়া বা লৈয়া, যাইবে বা যাবে। সুতরাং লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দ দ্বিস্বর অর্থাৎ dissyllabic। অতএব অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মে এ সব শব্দে দুই unit ধরা উচিত। অথচ ও-ছন্দে এসব শব্দের মধ্যবর্তী ই-কে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করে এসব শব্দকে তিন unit-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। তাতে ছন্দের গাঢ়বন্ধতা নষ্ট হয় এবং ধ্বনিতে শিথিলতা আসে। দৈব বা দইব কথাটিকে যদি দ-ই-ব রূপে উচ্চারণ করা যায় তবে ধ্বনিতে শৈথিল্য দেখা দেয়। লওয়া, হাওয়া প্রভৃতি শব্দকে যদি ল-ও-য়া, হা-ও-য়া প্রভৃতি রূপে উচ্চারণ করা যায় অর্থাৎ এসব শব্দের ও-কে যদি স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করা হয় তবে ধ্বনির গাঢ়তা নষ্ট হয়। তেমনি লইয়া, যাইবে অর্থাৎ লৈয়া, যাবে শব্দকে যদি ল-ই-য়া, যা-ই-বে রূপে

উচ্চারণ করে এদের তিন unit-এর মর্যাদা দেওয়া যায় তবে ছন্দে ধ্বনির গাঢ়তা নষ্ট হয়ে শৈথিল্য দেখা দেয়। সুতরাং লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দকে হয় দৈব, হাওয়া প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দুই unit-এর মর্যাদা দিতে হবে; নতুবা লয়ে, যাবে প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত রূপেরই ব্যবহার করতে হবে। হইতে, লইয়া, খাইয়া প্রভৃতি শব্দে তিন unit গণনা করা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি-বিরোধী এবং কাজেই তাতে তীক্ষ্ণ শ্রুতিবোধও পীড়িত হয়।

এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তিনি বলেছেন, 'ওজন বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভর্তি করবার দিকে যাঁদের বেশি ঝোঁক তাঁরাই একদিন একে পয়ারের কাঠগোড়ায় পূরে এর চেহারা বিগড়ে দিতে গিয়েছিলেন। মধ্যযুগের ফার্সীনবীশ লিখিয়েরা ফার্সীর দেখাদেখি বাংলার 'যাইবে, পাইবে' প্রভৃতি শব্দের অনির্দিষ্ট বা ভাংটা ই-কারগুলিকে গোটা বা পুরো করে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন। চীনে সুন্দরীদের পায়ের মতন কেতাবী ভাষার ছন্দের গতি, পয়ারের লোহার জুতোর মধ্যে অল্প বয়সে বাঁধা পড়ে একেবারে বেঁকেচুরে আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। বাংলা ছন্দের এই আড়ষ্ট গতিকে কেউ কেউ শালীনতা বা আভিজাত্যের লক্ষণ বলতেও কুণ্ঠিত হন নি, কিন্তু এ যে অস্বাভাবিক তা অস্বীকার করতে পারেন না' (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ১২)। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি যাকে বলেছি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'কেতাবী ভাষার ছন্দ'।

৮

আমি অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছিলুম যে ভারতবর্ষীয় লিপিপদ্ধতি, বিশেষতঃ ব্যঞ্জন-সংহতিকে যুক্তাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করার পদ্ধতি, বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তির জন্যে অনেক পরিমাণে দায়ী। এইটেই ছিল আমার ওই প্রবন্ধের একটি বড় প্রতিপাদ্য বিষয়। সে উপলক্ষেই আমি আরও বলেছি যে, কোনো কোনো বিষয়ে যদি আমাদের লিপিপদ্ধতিতে পরিবর্তন বা সংস্কারসাধন করা যায় তবে আমাদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপ অনেকটা বদলে যাবে, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ অব্যাহতই থাকবে। যেমন, আমাদের লিপিপদ্ধতিতে যদি শৈল, মৌন না লিখে শইল, মউন লেখার রীতি থাকত,

কিংবা হইল, লউন না লিখে হৈল, লৌন লেখার রীতি থাকত, তবে আমাদের 'অক্ষরগোনা' ছন্দে অনেকখানি পরিবর্তন ঘটত। আমার মনে হয় আমার এ কথা বুঝতে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোরের সঙ্গেই আমার এ কথার প্রতিবাদ করেছেন; অথচ আমার এ উক্তিকে খণ্ডন করার জন্যে কোনো যুক্তি উপস্থিত করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, 'যতক্ষণ বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি…সম্পূর্ণ বদল হয়ে না যাবে ততক্ষণ যে অক্ষর যেমন ভাবেই সাজাই না কেন বাংলা ছন্দের ধারা আজও যেমন ভাবে চলছে কালও তেমনি ভাবে চলবে।' তাঁর এই উক্তি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ অক্ষরগোনা ছন্দের উপর বাংলা লিপিপদ্ধতির প্রভাব কতখানি এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।*

অতএব দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের একটি কথাও আমি সত্য বলে স্বীকার করতে পারলুম না। তার কারণ আছে; সেটি হচ্ছে এই। আমি অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের শুধু অক্ষরবৃত্ত-শাখার বিরুদ্ধেই কয়েকটা অভিযোগ করেছিলুম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অভিযোগগুলো সাধারণভাবে সমস্ত 'বাংলা কবিতার ছন্দে'র বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য, এই কথা ধরে নিয়েই প্রতিবাদের ভূমিকা করেছেন। আর এই জন্যই তিনি আমার 'নালিশ ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি।' সুতরাং তাঁর প্রতিবাদের কোনো কথাই যে আমার প্রবন্ধের বিরোধী না হয়ে অনেক স্থলেই আমার অনুকূল হয়েছে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

যদি তাঁর প্রতিবাদের মূলেই ওই ভুলটুকু না থাকত তবে তিনি যে আমার সমস্ত কথা না হলেও অধিকাংশ কথাই সানন্দে মেনে নিতেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কেননা আমি আধুনিক বাঙালি কবিদের 'ভৎর্সনা' তো করিই নি, বরং অনেক স্থলেই তাঁদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের, ছন্দবোধের প্রশংসাই করেছি। আর স্থানে স্থানে যে-সব অভিযোগ এনেছি তা কোনো কবির বিরুদ্ধেই নয়, তা শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে আমিই প্রথম

* বাংলা লিপিপদ্ধতি ও অক্ষরবৃত্তের সম্বন্ধের উপর অবিলম্বেই আর-একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করব।

নালিশ করলুম তা নয়। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথই সে কাজ করেছেন সকলের আগে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে কি বলেছেন দেখা যাক। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, তাঁর কথিত সাধু ছন্দ এবং আমার কথিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ একই জিনিস। তিনি বলছেন—

'আমাদের সাধু ছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেক দিন আমার মনে বাজিয়াছে।......সাধু ভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি শিসা দিয়া ভর্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা-বধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমার ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করিয়াছে' (সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)।

এই কথাগুলিকেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক তেজের সঙ্গে অন্য ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি ছিল তা এ স্থলে সংগ্রহ করে দিলুম।—

'এখন আর বাংলা ভাষা ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতর, যুক্ত-অক্ষরের হর্তুকী-বয়ড়া আর হসন্তের জুঁইফুল পরিচয়ে মহাসুগন্ধি ত্রিফলার জল তৈরি করছে না। ...যুক্তাক্ষরের চড়ায় ঘেঁষড়াতে ঘেঁষড়াতে, হসন্ত-তকারের কলমীদাম দাঁড়ের আগায় ছেঁচতে ছেঁচতে, অন্যান্য হসন্ত-অক্ষরের শুশুক-পৃষ্ঠে লগি লাগাবার দুশ্চেষ্টা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। ...**মাত্রাবিচারশূন্য অক্ষরগোনা ছন্দ** এখন উড়ে কবিরা সযত্নে রক্ষা করুন, বাঙালি কবির দ্বারা আর ও-কাজ চলবে না। কারণ উচ্চারণের ধারা তফাৎ হয়ে গেছে। উচ্চারণের নিরিখ ক্রমাগতই বলছে যে, পুরোনো ছন্দ পুরোনো কাপড়ের মতো ভগ্ন হয়েছে; ওতে আর লজ্জানিবারণ হবে না। ......পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে। ছন্দবিদ্যায় বাঙালি আর পাঠশালার পোড়ো নয়, উঁচু ক্লাশে প্রোমোশন হয়েছে। ......ছন্দব্যবসায়ীরা এখন থেকে আর হসন্তের বাট তোলা, স্বরান্তের আশি

এবং সংযুক্তাক্ষরের একশো তোলা—ছন্দেশ্বরীর টাটে বসে—তিন রকম বাটখারায় মিশিয়ে ইচ্ছামতো ওজন দিয়ে—চুক্তি-ভুক্তন করতে পারবেন না।…ওজন বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভর্তি করবার দিকে যাঁদের বেশি ঝোঁক তাঁরা একে একদিন পয়ারের কাঠগড়ায় পুরে এব চেহারা বিগড়ে দিতে গিয়েছিলেন।…এ যে অস্বাভাবিক তা অস্বীকার করতে পাবেন না' (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাধু ছন্দেব মধ্যে খাঁটি বাংলার 'বাঁশির ফাঁকগুলি শিসা দিয়া ভর্তি' করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন 'পুরোনো ছন্দে'র মধ্যে 'বঙ্গবাণীর স্বরূপ-মূর্তি'টিই 'মক্তবের মুন্সীদের দুর্ম্মুশ-দলনে বা টোলের পণ্ডিতদের গোময়-লেপনে' প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে আমার নালিশ কিন্তু এত গুরুতর নয়।

১০

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কি, তা এ স্থলে সংক্ষেপে অথচ বিশদ করে বলা প্রয়োজন। তা করতে হলে নতুন দৃষ্টান্ত রচনা করতে হয়। কিন্তু আমার গদ্যরচনার হাত, পদ্যরচনা করতে স্বভাবতঃই কুণ্ঠা ও সংকোচ বোধ করি। তথাপি আমার কথাগুলির যৌক্তিকতা দেখাবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত রচনা করতে হল।

ফাল্গুনের শুক্লরাতে মিত্রদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে
বসেছে বিবাহ-সভা সুমঙ্গল গোধূলি-লগনে।
শিউলি, কুন্দ, জুঁই কিংবা স্নিগ্ধ শান্ত শারদী জ্যোৎসনা—
বৌ যেন ঐ রূপে সবারেই করিছে ভৎর্সনা।
এ হেন কনের সাথে পুত্রের বিবাহ, আজি তাই
সলজ্জ বৌমাকে দেখে বসুজার সুখ-সীমা নাই।
সানন্দ চিত্তেই তিনি জামাতাকে দেছেন যৌতুক,
সহাস্য বদন তাই, নয়নেতে অসীম কৌতুক।
এমন দুর্লভ বৌ পেয়ে তিনি মুক্ত-হস্ত আজি—
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ পাচ্ছে তাই, যাতে যেবা রাজি।
ঐ হোথা কৈ ভাজা পায় নাই নন্দী মহাশয়—
কেউ বলে,—আরও দাও, ছাড়িবার পাত্র সে যে নয়।
'দৈ-ওয়ালা কৈ গেল, শুধু থৈ খাওয়া কভু যায় ?'

এই বলি' ক্রুদ্ধ হয়ে পাত্র ছাড়ে বুদ্ধদেব রায়।—
আহত মৌচাক সম সকলেই তোলে কলরব,
তার পরে হৈ চৈ,—ভোজ, বিয়ে ভাঙে বুঝি সব।
হেনকালে লাঠি হাতে মুখে করি' ভৈরব গর্জন,
রায়েদের লাঠিয়াল মিত্রদেরে করিল তর্জন।
পাত্র ছেড়ে উঠি' পড়ি' সকলেই পলায় চৌদিকে;
বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ছুটে গিয়ে ধরিল বৌদি'কে।
সদ্য-বিবাহিতা বৌ সৈ সাথে চলে গেল ঘরে;
বসুপুত্র বই-পড়া বাবু নয় বিধাতার বরে;—
সহসা ছিনায়ে লাঠি শান্ত মুখে বলিল, 'মাভৈঃ,
একটু নড়ো না কেউ, রায়েদের লাঠিয়াল কই?'
তাহার মাভৈঃ রবে শান্ত চিত্তে ফিরিল সবাই;
মৌতাত সময় হল,—তাই শুধু বুদ্ধদেব নাই।
লাঠি ফেলি' বসুপুত্র বলিলেন আনম্র-নয়ন,—
'রহিল বৌভাত-কালে সকলেরে মোর নিমন্ত্রণ।'

বলা বাহুল্য এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ ছন্দটি সাধারণতঃ আঠারো 'অক্ষর'-এর ছন্দ নামেই পরিচিত; এক হিসেবে একে 'বর্ধিত পয়ার'ও বলা যায়। যা হক, এ দৃষ্টান্তটিতে কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে কি না সে কথা কবিরাই বলতে পারেন। আপাততঃ, ছন্দ ঠিক আছে ধরে নিয়েই আমি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার উক্তিগুলিকে বিশদ করতে চেষ্টা করছি।

প্রথমেই দেখতে পাই, যদিও এটা আঠারো 'অক্ষর'-এর ছন্দ তথাপি এর প্রতি পংক্তিতে আঠারো 'অক্ষর' নেই। দু-এক পংক্তিতে আঠারো অক্ষরের বেশি আছে; অন্যত্র আঠারো অক্ষরের কমও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছন্দের ধ্বনি অর্থাৎ কানের ওজন ঠিক আছে। কি করে তা হল তাই বলছি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যে নিয়মটির কথা আমি বলেছি সেটি হচ্ছে এই—এ ছন্দে প্রত্যেক শব্দের (word-এর) শেষ প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনিকে দুই unit বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু শব্দের অ-প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি এক unit বলেই গণ্য হয়; আর শব্দটি যদি একস্বর (monosyllabic) হয় তবে তার যুগ্মধ্বনিটাও প্রান্তবর্তী অতএব দুই unit বলেই গণ্য হয়। এ নিয়মটি যদি ঠিকমতো পালিত হয় তবে পংক্তির অক্ষরসংখ্যা বেশি হলেও ক্ষতি

হয় না, কম হলেও ছন্দ ঠিকই থাকে। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতেও এ নিয়ম বজায় আছে, তাই অক্ষরসংখ্যা কোথাও বেশি কোথাও কম হওয়া সত্ত্বেও ছন্দের প্রকৃতি ঠিক আছে; কিন্তু আকৃতি সর্বত্র সমান নেই।

বিষয়টাকে আরও খুলে বলছি। 'ফাল্‌গুনের্' শব্দটিতে যুগ্মধ্বনি আছে দুটি, ফাল্ এবং নের্; তার মধ্যে ফাল্ ধ্বনিটি এক unit-এর বেশি মর্যাদা পায় নি, কারণ এটি শব্দের শেষ প্রান্তবর্তী নয় বলে একে একটু ঠেসে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু নের্ ধ্বনিটি দুই unit বলেই গণ্য হয়েছে, কেননা এটি শব্দের প্রান্তবর্তী বলে একে একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। এরূপ সর্বত্রই। জ্যোৎসনা এবং ভৎ র্সনা শব্দের জ্যোৎ ও ভৎ র্এ দুটি যুগ্মধ্বনিকে এক-এক unit বলেই ধরা হয়েছে, এরা শব্দের অন্তে অবস্থিত নয় ব'লে; খণ্ড বা হসন্ত ত-কে স্বতন্ত্র 'অক্ষর' বলে ধরা হয় নি। 'আরও' শব্দেও তিন 'অক্ষর' ধরা হয় নি, কেননা উচ্চারণে এখানে দুটি মাত্র unit আছে; এ শব্দটির আসল রূপ হচ্ছে 'আরো'। তেমনি 'খাওয়া' শব্দেও দুই unit, যেহেতু 'ওয়া' দুটি স্বতন্ত্র অক্ষরের সাহায্যে লেখা হলেও উচ্চারণে এক unit; 'ওয়া'র আসল রূপ হচ্ছে অন্তঃস্থ ব-এ আকার বা wā; অর্থাৎ 'খাওয়া' কথার প্রকৃত উচ্চারণরূপ হচ্ছে খাwā।

উক্ত দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মস্বরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতিই বেশি লক্ষ করার বিষয়। ঐ এবং ঔ, এ দুটি যুগ্মধ্বনির কথাই আগে বলছি। এ দুটি যুগ্মধ্বনি যখনই শব্দের অন্তে স্থাপিত হয়েছে তখনই দুই মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। যেমন—বৌ, দৈ, খৈ, হৈ, চৈ, মাভৈঃ, ঐ। কিন্তু যখনই এরা শব্দের শেষ প্রান্তে নয়, তখনই এরা এক unit বলে গণ্য হয়েছে। যথা—ভৈরব, কৌতুক, যৌতুক, চৌদিকে, বৌভাত, মৌতাত, মৌচাক ইত্যাদি। 'ঐ' কথাটিও দ্বিমাত্রিক। কিন্তু যদি লেখা হত 'ঐরূপে সবারে যেন বৌ আজি করিল ভৎ র্সনা' কিংবা 'ঐরূপে বৌমাটি যেন সকলেরে করিল ভৎ র্সনা' তাহলে 'ঐ' এক unit-এর বেশি মর্যাদা পেত না; কেননা তখন 'ঐরূপ' এক শব্দ বলে গণ্য হত, তার অর্থে পরিবর্তন ঘটত এবং 'ঐ' শব্দের অন্তিম ধ্বনি বলে গণ্য হত না। বৌ, সৈ এরা দুই মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু কনের নাম যদি হত শৈলবালা তাহলে শৈ এক মাত্রার বেশি মূল্য পেত না। 'ভৈরব'এর ভৈ এক unit; কিন্তু 'মাভৈঃ রব'-এর ভৈঃ দুই unit; যেহেতু একটি শব্দের অন্তে অবস্থিত, আর-একটি নয়। 'শিউলি' শব্দেও দুই unitই ধরেছি; কেননা ইউ যুগ্মস্বরটি শব্দের অন্তে নয়।

যদি খৈ, দৈ, সৈ প্রভৃতি শব্দকে খই, দই, সই ইত্যাদি রূপে লেখা হত তবে কোনো কোনো পংক্তির আঠারো সংখ্যা পূর্ণ হত। পক্ষান্তরে যদি বউভাত, মউচাক, মউতাত ইত্যাদি রূপে লেখা যায় তবে অন্যান্য পংক্তির অক্ষরসংখ্যা আঠারোকে অতিক্রম করে যাবে। আরও, খাওয়া ইত্যাদিকে যদি খাবো, খাবো ইত্যাদি রূপে লেখা যায় তবে অক্ষরসংখ্যার আরও পরিবর্তন ঘটবে। অই-কার (ভৈরব, খৈ) এবং অউ-কার (কৌতুক, বৌভাত), এ দুটি সংকেতচিহ্নের মতো যদি আই-কার (তাই, নাই), ইউ-কার (শিউলি), উই-কার (জুঁই), এই-কার (সকলেই), এউ-কার (কেউ), আও-কার (দাও) ইত্যাদির জন্যও স্বতন্ত্র সংকেতচিহ্ন থাকত, তবে উক্ত দৃষ্টান্তটির আকৃতিতে অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যায় আরও বিপর্যয় ঘটত; কিন্তু ছন্দের প্রকৃতি ঠিকই থাকত। সেজন্যই আমি বলেছি যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষরসংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না। অতএব এ ছন্দে প্রতি পংক্তিতে, অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখার জন্যে কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই; খৈ, দৈ না লিখে খই, দই লেখার আবশ্যিকতা নেই। 'মাভৈঃ'কে তো 'মাভইঃ' লেখার উপায়ও নেই।

এ ছন্দ যখন অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে না তখন এ ছন্দের 'অক্ষরবৃত্ত' নামটিও সুসংগত নয়, এ কথা আমি স্বীকার করি। আসলে এটি একটি যৌগিক বা মিশ্র ছন্দ। কিন্তু এ ছন্দের নামকরণে একটা মুশকিল আছে। আমি বার বার unit শব্দটি ব্যবহার করেছি। Unit শব্দের দ্বারা আমি ধ্বনি-পরিমাণ বা উচ্চারণকালের unitকেই বুঝেছি, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই unit-কে কি একটা বিশেষ নাম দেওয়া যায় তা আমি ভেবে পাইনে। উক্ত দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে সর্বত্রই আঠারোটি করে unit আছে, যদিও প্রতি পংক্তিতে ঠিক আঠারো অক্ষর নেই। কিন্তু তথাপি এ জাতীয় ছন্দ কবিসমাজে অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই পরিচিত; উক্ত দৃষ্টান্তটিকে আঠারো অক্ষরের ছন্দই বলা হয়ে থাকে। তাই অগত্যা আমিও একে অক্ষরবৃত্ত নাম দিতে বাধ্য হয়েছি।

এ দৃষ্টান্তটিতে করিল, করিছে প্রভৃতি সাধু শব্দ বর্জন করে প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করতে সাহস পাই নি। তেমনি পাইল, যাইয়া প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও বর্জন করেছি। ও-সব শব্দ ব্যবহার করলে ওদের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিটাকে এক unit গণ্য করে এসব শব্দে দুই unitই ধরা উচিত, নতুবা এদের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার করা সংগত। তাই শিউলি শব্দের শিউ-কে আমি এক unit

ধরেছি। আর এক জায়গায় 'পাচ্ছে' এই নিষিদ্ধ প্রাকৃত শব্দটি ব্যবহার করেছি। তাতে ছন্দের ক্ষতি হয়েছে কি না তার বিচার বিশেষজ্ঞরাই করবেন।

১১

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা পারস্পরিক আলোচনার দ্বারাই আমাদের ছন্দগুলির যথার্থ প্রকৃতিটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সাহিত্যে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এখনও যথোচিতরূপে আলোচনা হয় নি। তার কারণ হচ্ছে এই যে, ছন্দ জিনিসটাই একটা উভচর পদার্থ; এটা যুগপৎ কাব্যসাহিত্যের বাহন এবং ধ্বনিতত্ত্ববিদ্যার উপাদান। অথচ আমাদের দেশের কবিরা ধ্বনিতত্ত্বের পারদর্শী নন এবং ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌রাও কাব্যসাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নন। তাই ছন্দের আলোচনাটা কারও হাতেই যথোচিত মর্যাদা পায় নি। আমি কবিও নই, ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌ও নই। তাতে একটা মস্ত সুবিধে এই যে, আমি নিঃসংকোচে উভয়ের এলাকায়ই বিচরণ করতে পারি। কিন্তু তার একটা মস্ত অসুবিধেও এই যে, তাতে উভয়ের হাতেই আমার মার খাবার সম্ভাবনা আছে। সে কথাটিও আমি ভুলি নি।*

* বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ

ছন্দ-জিজ্ঞাসা (২)

১

বাংলা ছন্দের পরিভাষা

পারিভাষিক শব্দের অর্থ এবং ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে এবং এ রকম মতভেদ থাকা অন্যায়ও নয়। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ আলোচনায় যিনি সংজ্ঞা-শব্দগুলিকে যে অর্থে প্রয়োগ করেন তাঁকে আলোচনার আগাগোড়া সেই অর্থকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং সে আলোচনার যথার্থ বিচার করতে হলে পাঠককে আপাততঃ সে অর্থগুলি স্বীকার করে নিতেই হবে। ছন্দের আলোচনায় আমি পারিভাষিক শব্দগুলিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছি সে সম্বন্ধে কারও মতান্তর থাকতেও পারে এবং তিনি তা বলতেও অধিকারী। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয়ে আমার বক্তব্যকে যদি বুঝতে হয় তবে আপাততঃ তৎকালের জন্য আমার প্রযুক্ত অর্থকে স্বীকার করে নিতেই হবে নতুবা আমার কথা অপরের পক্ষে বোঝাই অসম্ভব হবে এবং ফলে অনেক স্থলে আমার বক্তব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হবে। আমার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনাটি সম্বন্ধেও এই বিভ্রাটই ঘটেছে। ওই প্রবন্ধে যদিও পারিভাষিক শব্দগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা করি নি তথাপি সর্বত্রই এগুলিকে স্পষ্টার্থ করতে চেষ্টা করেছিলুম। তবু নিষ্কৃতি পাই নি। তাই এখানে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের আমার প্রযুক্ত বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট অর্থের আলোচনা করতে হল। আশা করি আমার ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হলে আমার বক্তব্য বিষয়টি আর অস্পষ্ট থাকবে না।

১। **সিলেব্‌ল্‌, ধ্বনি বা স্বর**—সিলেব্‌ল্‌ কথাটি আমি অবিকল ইংরেজি অর্থেই ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসের দ্বারা একসঙ্গে যে ধ্বনিটুকু উচ্চারিত হয় তাকেই আমি **সিলেব্‌ল্‌** বলেছি। আর ইংরেজিতে 'সিলেব্‌ল্‌' যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আমি বাংলায় **ধ্বনি** কথাটিকেই ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ অ, আঁ, অই, আউ, অন্‌, আল্‌ প্রভৃতিকে এক-একটি সিলেব্‌ল্‌ বা ধ্বনি বলেছি। আবার প্রত্যেকটি সিলেব্‌ল্‌ বা ধ্বনির অন্তরের তত্ত্ব

হচ্ছে একটি করে স্বর ; প্রত্যেক সিলেব্‌ল্‌-এর অন্তরে অনধিক একটি স্বরধ্বনি থাকবেই। তাই স্থলবিশেষে **স্বর** কথাটিকে সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছি। যথা—যখন ধ্বনিসংখ্যা বা স্বরসংখ্যার উল্লেখ করেছি তখন সর্বত্রই সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যাই বুঝিয়েছে। আর সিলেব্‌ল্‌-বৃত্ত যে ছন্দ, তাকেই বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ; যথাস্থানে তা বিশদ করা যাবে।

ছন্দের বিচারে ধ্বনি বা স্বরের অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌-এরও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সব ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌ এক রকম নয়, তারও প্রকারভেদ আছে। এক দিক্‌ থেকে বিচার করলে সব ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌কেই **অমিশ্র** ও **মিশ্র** এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অ, আ প্রভৃতি ব্যাকরণের বর্ণমালার সমস্ত স্বরবর্ণই অমিশ্র ধ্বনি ; কারণ স্বরবর্ণই ধ্বনির বিশুদ্ধ রূপ। আর স্বরান্ত ব্যঞ্জন বর্ণমাত্রকেই মিশ্র ধ্বনি বলতে পারি, কারণ তাতে বিশুদ্ধ ধ্বনি অর্থাৎ স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনের মিশাল থাকে। সুতরাং ক, কা, চি, চৌ প্রভৃতিকে মিশ্র ধ্বনি বলব। স্বরান্ত ব্যঞ্জনটি সংযুক্ত বা অসংযুক্ত দুই-ই হতে পারে। অর্থাৎ ক, ক্র, শী, শ্রী ইত্যাদি সমস্তই মিশ্র ধ্বনি।

আর-এক দিক্‌ থেকে বিচার করলে ধ্বনিকে **অযুগ্ম** ও **যুগ্ম** এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। অযুগ্ম ও যুগ্ম ধ্বনি, এই সংজ্ঞাদুটি পূর্বে কেউ ব্যবহার করেছেন কি না জানিনে। আমি কি অর্থে এ শব্দদুটির প্রয়োগ করেছি তাই বুঝিয়ে বলছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যুগ্মধ্বনি শব্দটার পরিবর্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ শব্দ ব্যবহার করলে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।' আমি গোড়ায়ই বলে রাখছি আমার প্রযুক্ত যুগ্মধ্বনি কথাটার পরিবর্তে সিলেব্‌ল্‌ শব্দ ব্যবহার করলে আমার সমস্ত আলোচনাটাই দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। কারণ আমি যুগ্মধ্বনি বলতে শুধু সিলেব্‌ল্‌ বুঝিনে, বোঝা উচিতও নয়। যুগ্মধ্বনি বলতে আমি বিশেষ এক প্রকার সিলেব্‌ল্‌ বুঝি ; অযুগ্মধ্বনি বলতে বিশেষ আর-এক প্রকার সিলেব্‌ল্‌ বুঝি। পার্থক্যটা কি দেখানো দরকার। ইংরেজিতে সিলেব্‌ল্‌ কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আমি ধ্বনি শব্দটিকে ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। অনেক সময় দেখা যায় দুটি স্বতন্ত্র সিলেব্‌ল্‌-এর যোগে একটি নতুন সিলেব্‌ল্‌-এর উৎপত্তি হয়। এ রকম যুক্ত সিলেব্‌ল্‌কেই আমি যুগ্মধ্বনি নাম দিয়েছি। যেমন, 'জ' একটি সিলেব্‌ল্‌, আর 'ল' একটি সিলেব্‌ল্‌ ; এ দুটো মিলে যখন 'জল' হয় তখন 'ল' এর অ-কার লুপ্ত হয়ে একটি

নতুন যুক্ত সিলে্‌বল্‌-এর সৃষ্টি হয়। অতএব 'জল' কথাটিকে ছন্দের তরফ থেকে একটি যুগ্মধ্বনি বলব। আর যে সিলেব্‌ল্‌টি দুটি স্বতন্ত্র সিলেব্‌ল্‌-এর যোগে উৎপন্ন নয় অর্থাৎ যে সিলেব্‌ল্‌টি স্বভাবতঃই অযুক্ত তাকেই আমি অযুগ্মধ্বনি বলেছি। 'পা' কথাটিকে বলব একটি অযুগ্মধ্বনি; কিন্তু 'পান' কথাটিকে বলব একটি যুগ্মধ্বনি; কেননা 'পা' এবং 'ন'—এ দুটি অযুগ্মধ্বনি যুক্ত হয়ে 'পান' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। দুটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণের যোগেও একটি যুগ্মধ্বনি উৎপত্তি হতে পারে। যেমন, 'উ' একটি স্বর, আর 'ই' একটি স্বর; কিন্তু এ দুটিতে মিলে গিয়ে 'উই' এই নতুন স্বরটির উৎপত্তি হয়েছে। এ রকম দুটি স্বতন্ত্র অর্থাৎ অযুক্তস্বরের যোগে যে নতুন যুক্তস্বরের উৎপত্তি হয় তাকে **যুগ্মস্বর** বলা যায়, যথা—অই, আই, অউ, আউ, অও, আও, ইউ ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে যুগ্মস্বর যুগ্মধ্বনিরই প্রকারভেদ মাত্র, স্বতন্ত্র কিছু নয়।

লক্ষ করার বিষয়, 'জ' এবং 'ল' এ দুটি স্বতন্ত্র অযুগ্মধ্বনির মধ্যে পরবর্তী 'ল' ধ্বনিটি আপন অ-কার লুপ্ত করে দিয়ে অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পূর্ববর্তী 'জ' ধ্বনিটির আশ্রয় নিয়েছে বলেই 'জল' এই যুগ্মধ্বনিটির উৎপত্তি হতে পেরেছে। 'পান' কথাটির মধ্যেও 'ন'-এর অ-কার লুপ্ত হওয়ায় 'ন' আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে 'পা'-এর আশ্রয় নিয়েছে। তেমনি 'উই' কথাটির মধ্যেও 'ই' নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে 'উ'-এর আশ্রয় নিয়েছে বলেই এই যুগ্মস্বরটির উৎপত্তি হয়েছে। এরকম সর্বত্রই। সুতরাং দেখা গেল প্রত্যেক যুগ্মধ্বনির মধ্যেই দুটি করে অংশ আছে; প্রথম অংশটি স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় অংশটি স্বাতন্ত্র্যহীন। জল, পান, উই প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিগুলির মধ্যে জ, পা এবং উ স্বতন্ত্র; এরা নিজের শক্তিতে বর্তমান। শুধু তাই নয়, ল, ন এবং ই এই তিনটি স্বাতন্ত্র্যহীন ধ্বনিকে এরা আশ্রয় দিয়ে রক্ষাও করেছে। সুতরাং প্রত্যেক যুগ্মধ্বনির পূর্ববর্তী স্বতন্ত্র অংশটিকে **আশ্রেতা ধ্বনি** এবং পরবর্তী স্বাতন্ত্র্যহীন অংশটিকে **আশ্রিত ধ্বনি** বলতে পারি। জল, পান এবং উই, এই তিনটি যুগ্মধ্বনির মধ্যে জ, পা এবং উ আশ্রেতা; আর ল, ন এবং ই আশ্রিত। যুগ্মধ্বনির আশ্রিত অংশটি ব্যঞ্জনবর্ণও হতে পারে, স্বরবর্ণও হতে পারে। সুতরাং যুগ্মধ্বনিকে **ব্যঞ্জনান্তিক** ও **স্বরান্তিক**, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, জল, পান, গাছ, সাত প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনি। আর দুই, তুই, লাউ, ঝাউ প্রভৃতি স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনি। আশ্রিত ব্যঞ্জনকে হসন্ত চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করার প্রথা

আছে। কিন্তু আশ্রিত স্বরকে নির্দেশ করার কোনো চিহ্ন প্রচলিত নেই। আমার আলোচনায় আমি আশ্রিত স্বরকেও হসন্ত চিহ্নের দ্বারাই নির্দেশ করেছি। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথও তাই করেছিলেন। কিন্তু হসন্ত স্বর, কথাটাতে স্বভাবতঃই আপত্তি হতে পারে। তাই আমার আলোচনায় আমি হসন্ত চিহ্নকেই **আশ্রয় চিহ্ন** নামে অভিহিত করেছি। এ নামটিতেই আমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়; সুতরাং এ নামে আপত্তি হবার আশঙ্কা নেই। ছন্দের বিচারে যুগ্মধ্বনির আশ্রিত অংশটিকে নির্দেশ করার অভিপ্রায়ে পূর্বোক্ত যুগ্মধ্বনিগুলিকে জল্, পান্, গাছ্, সাত্, দুই্, তুই্, লাউ্, ঝাউ্ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ করেছি।

পূর্বেই বলেছি প্রত্যেক সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনির অন্তরে একটি করে স্বর থাকবেই। কিন্তু স্বর বলতে স্বরধ্বনি বোঝাচ্ছে, স্বরবর্ণ নয়। এ কথা বলার সার্থকতা এই যে সব সময় একটিমাত্র স্বরবর্ণের দ্বারা একটি স্বরধ্বনিকে প্রকাশ করা যায় না, একাধিক বর্ণের প্রয়োজন হয়। যথা দুই, তুই, লাউ, ঝাউ প্রভৃতি শব্দে দুটি করে স্বরবর্ণের যোগে একটিমাত্র স্বরধ্বনিকে প্রকাশ করা হয়েছে। ইংরেজিতেও এরকম হয়, যথা—you, thou। কেউ বলতে পারেন, দুই, তুই প্রভৃতি শব্দে দুটি স্বরবর্ণের যোগে যুগ্মস্বরকে প্রকাশ করাই তো সংগত। আমিও তাতে আপত্তি করিনে যদি সর্বত্রই এ নিয়মটি বহাল থাকত। কিন্তু দেখা যায় বউ, মউ, দই, সই, হইল প্রভৃতি শব্দের যুগ্মস্বরটিকে দুটি বর্ণের পরিবর্তে একটি বর্ণের সাহায্যেও লেখা হয়; যথা—বৌ, মৌ, দৈ, সৈ, হৈল। তাতে ছন্দ-রচনায় কখনও কখনও দ্বৈরাচার হতে পারে। যেমন—

> হবে বা দয়ার্দ্রচিত্ত দেব আশুতোষ
> ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচী কারাবাসে?
>
> * * *
>
> সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ হাসে দেবগণ,
> আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে।
>
> —বৃত্রসংহার, দ্বাদশ সর্গ

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে 'হৈলা' এবং চতুর্থ পংক্তিতে আছে 'হইলা'। একই শব্দের ওজন দুই জায়গায় দুই রকমের হয়েছে। তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয়েছে, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু হেমচন্দ্রের পরবর্তী কবিরা কখনও 'হৈল' লেখেন বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এবং

তাঁর অনুবর্তী কবিরা স্বতঃই কানের ওজনের উপর নির্ভর করে উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'হল' এবং চতুর্থ পংক্তিতে 'হলেন' লিখবেন এবং তাতে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য না কমে বরং বাড়বে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রাকৃত বাংলার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশতঃই এ কথা বলছিনে; ছন্দ যদি মধুর হয় তবে প্রাকৃত বা সংস্কৃত কোনো বাংলাতেই আমার আপত্তি নেই। আমি আমার কানের মাধুর্য-বুদ্ধি থেকেই এ প্রশ্ন তুলছি।

'আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে' এবং
'আপনি হলেন বন্দী আপন সংশয়ে'—

এ দুটি লাইনের মধ্যে দ্বিতীয়টিই আমার কানে ভাল শোনায়। কিন্তু কেন বেশি ভাল শোনায়, এই হচ্ছে আমার জিজ্ঞাসা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কাছে আমার এই জিজ্ঞাসারই উত্তর প্রত্যাশা করছি। অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে আমি এই জিজ্ঞাসার পথেই অগ্রসর হয়েছিলুম এবং নিজেই তার একটি সমাধান করে সে বিষয়ে কবি ও ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মতামতের প্রতীক্ষা করেছিলুম।

যুগ্মধ্বনির আলোচনায় ফিরে আসা যাক। আমরা দেখেছি ঐ আর ঔ, এ দুটি যুগ্মধ্বনিকে কোনো কোনো স্থলে দুরকমে লেখা যায়—কখনও একটি বর্ণের সাহায্যে আর কখনও দুইটি বর্ণের সাহায্যে। অর্থাৎ ঔ = অউ্, যথা—বৌ, বউ্; ঐ = অই্ বা ওই্, যথা—খৈ, খই্। এই দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া আর সর্বত্রই যুগ্মস্বর দুটি স্বরবর্ণের সাহায্যেই লিপিবদ্ধ হয়। যথা—লাউ্, ঝাউ্, দাও্, দুই্ ইত্যাদি। কিন্তু দুটি স্বরবর্ণ একত্র লিপিবদ্ধ হলেই যুগ্মস্বর হয় না। 'দাও' যুগ্ম বটে; কিন্তু দিও, করিও ইত্যাদি যুগ্ম নয়, বিযুক্ত। কারণ দাও = দাও্; আর দিও, করিও = দিয়ো, করিয়ো।

ঐ এবং ঔ ছাড়া আর সমস্ত যুগ্মধ্বনি প্রকাশ করতেই দুটি অক্ষরের প্রয়োজন হয়। আর অযুগ্মধ্বনিকে লিপিবদ্ধ করতে স্বভাবতঃই একটি অক্ষরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ নিয়মটিরও ব্যতিক্রম বাংলায় আছে। অর্থাৎ দুটি অক্ষরের সাহায্যে একটি অযুগ্মধ্বনিকে প্রকাশ করতে হয় এমন দৃষ্টান্তও বাংলায় পাওয়া যায়। যথা—

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত কেঁপে। (স্বরবৃত্ত)

—মাটির ডাক, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে। (মাত্রাবৃত্ত)

—লীলাসঙ্গিনী, ঐ

নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়—
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়। (অক্ষরবৃত্ত)

—মুক্তি, ঐ

দৃষ্টান্ত-তিনটি তিনটি স্বতন্ত্র ছন্দ থেকে আহরণ করেছি। হাওয়া, ধাওয়া প্রভৃতি শব্দের 'ওয়া' অংশটিতে প্রত্যক্ষতঃ দুটি করে স্বতন্ত্র ধ্বনি রয়েছে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের তিনটি ছন্দেই হাওয়া প্রভৃতি শব্দের ওয়া-কে এক বলে ধরা হয়েছে, দুই বলে ধরা হয় নি। অথচ ছন্দ যে সর্বত্রই নিখুঁত আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে প্রত্যক্ষতঃ যা দুই, ছন্দে তা এক হল কিরূপে? এর উত্তর হচ্ছে যে চোখের কাছে যা প্রত্যক্ষ তা নিয়ে ছন্দ কারবার করে না, কানের কাছে যা প্রত্যক্ষ তা নিয়েই ছন্দের কারবার। আর ওয়া কথাটা চোখের কাছে দুই হলেও কানের কাছে একই। কারণ উক্ত শব্দগুলিতে ওয়া কথাটার আসল রূপ হচ্ছে ও্আ অর্থাৎ ওা। অন্য কথায়, অন্তঃস্থ ব-য়ে আকার দিলে যে ধ্বনি হয়, হাওয়া প্রভৃতি শব্দের ওয়া কথার ধ্বনি অবিকল তাই। ইংরেজি wa এবং বাংলা ওয়া কথার ধ্বনি অভিন্ন। সুতরাং দুটি অক্ষরের যোগে লেখা হলেও ওয়া কথাটিতে ধ্বনি আছে একটিই এবং সে জন্যেই ছন্দে ওয়া-কে এক বলেই গণ্য করা হয়। আর ওয়া বা wa ধ্বনিটি যে অযুগ্ম তা বলাই নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই ধ্বনিটির পরে কোনো আশ্রিত ধ্বনির অস্তিত্ব নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ স্থলে বাংলায় একটি অযুগ্মধ্বনি প্রকাশের জন্য দুটি স্বরবর্ণের ব্যবহার হয়েছে। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড হতে পেরেছে, কারণ বাংলা বর্ণমালা থেকে অন্তঃস্থ ব-য়ের উচ্চারণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথচ বাংলা ভাষা থেকে তা লুপ্ত হয় নি। এটাকে বাংলা বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতির একটা অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি বলে মনে করি। যা হক, আর একটু লক্ষ করা দরকার যে হাওয়া প্রভৃতি শব্দের শেষাংশস্থিত ওয়া-ই একটি অযুগ্মধ্বনির সমান। কিন্তু ওয়াকিফ, ওয়ারিশ প্রভৃতি শব্দের পূর্বাংশস্থিত ওয়া-কে দুটি অযুগ্মধ্বনি বলে গণ্য করাই বাংলা ধ্বনিবিচারের রীতি।

একটি অযুগ্মধ্বনিকে দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করার আর-এক প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। যথা—

কেউ্ যে কারে | চিনি নাক | সেটা মস্ত | বাঁচন্।
তা না হলে | নাচিয়ে দিত | বিষম্ তুর্কি- | নাচন্।

—অচেনা, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এটা স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। এর প্রতি পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্ বা স্বরধ্বনি আছে, অন্তিম পর্বে দুটি করে। সুতরাং এটিকে চতুঃস্বর-পর্বিক ছন্দ বলতে পারি। লক্ষ করার বিষয়, এর সব পর্বেই চারটি স্বরধ্বনি স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে; কেবল দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় পর্বে আপাতত দেখতে পাঁচটি সিলেব্‌ল্ দেখা গেলেও শুনতে কিন্তু চার সিলেব্‌ল্-এর মতোই শোনাচ্ছে। অর্থাৎ এই পর্বটিকে পাঁচটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণের যোগে লেখা হলেও আসলে এতে চারটির বেশি স্বরধ্বনি নেই। তার কারণ 'নাচিয়ে' কথাটির 'ইয়ে' অংশটি প্রকৃতপক্ষে দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের দ্বারা প্রকাশিত একটি স্বরধ্বনি বা সিলেব্‌ল্ মাত্র। কেননা, এখানে ইয়ে কথাটার আসল রূপ হচ্ছে ই্এ অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তঃস্থ য-য়ে এ-কার দিলে যে ধ্বনি হয় এখানে ইয়ে কথাটার ধ্বনি অবিকল তাই। ইংরেজি ye এবং নাচিয়ে-র ইয়ে অংশটি উচ্চারণ হিসেবে একই। সুতরাং এ-স্থলে নাচিয়ে শব্দটির উচ্চারণগত প্রকৃত রূপ হচ্ছে নাচ্য়ে অথবা নাচ্ye। সুতরাং দুটি অক্ষরের যোগে লেখা হলেও এখানে ইয়ে কথাটিতে ধ্বনি আছে একটিমাত্র এবং সেজন্যেই ছন্দে এটি এক বলেই গণ্য হয়েছে। আর য়ে বা ye ধ্বনিটি যে অযুগ্ম তা বলাই বাহুল্য, কেননা এই ধ্বনিটির পরে কোনো আশ্রিত ধ্বনি বর্তমান নেই। সুতরাং দেখা গেল এখানেও একটি অযুগ্মধ্বনি প্রকাশের জন্য দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের প্রয়োগ হয়েছে।

এ স্থলে বলে রাখা দরকার যে বাংলা ছন্দে সর্বত্রই ইয়ে একটিমাত্র অযুগ্মধ্বনি রূপে গৃহীত হয় না। অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ইয়ে কথাটি সর্বদাই দুটি অযুগ্মধ্বনি (ই আর য়ে) বলে গণ্য হয়, এবং ওই দুই ছন্দে ওরকম হওয়াই সংগত। শুধু স্বরবৃত্ত ছন্দেই স্থলবিশেষে ইয়ে এক ধ্বনি হিসেবে গৃহীত হয়; আবার স্বরবৃত্ত ছন্দেও অন্য স্থলে ইয়ে দুটি পৃথক্ ধ্বনি বলে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু 'ইয়ে'র এই দুরকম বিপরীত ব্যবহার একটি নিয়ম-বহির্ভূত ব্যাপার নয়, এরকম ব্যবহারেরও একটি নিয়ম আছে। সে নিয়মটি হচ্ছে এই যে, যেখানে দ্রুত

উচ্চারণের প্রয়োজন হয় সেখানে ই এবং য়ে ধ্বনিদুটি সংহত বা সংশ্লিষ্ট হয়ে একটি ধ্বনিতে পরিণত হয়। আবার যেখানে দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন নেই সেখানে এরা দুটি স্বতন্ত্র ও বিশ্লিষ্ট ধ্বনি বলেই গ্রাহ্য হয়। সংস্কৃত ভাষায়ও এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যথা—'বরেণ্যম্' কথাটি স্থানবিশেষে 'বরেণ্ ইয়ম্' রূপেও উচ্চারিত হয়। যদি তা না হত তবে গায়ত্রী ছন্দও ঠিক থাকত না। যা হক ইয়ে-র উচ্চারণ কোথায় দ্রুত হবে, কোথায় হবে না তারও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তাও দেখানো দরকার। প্রথমতঃ প্রতি ছন্দ-পর্বের পরেই একটুখানি যতি বা বিরাম থাকে বলে ছন্দ-পর্বের শেষ প্রান্তস্থিত ইয়ে কথাটি দ্রুত উচ্চারিত হয় না, সুতরাং একটি ধ্বনি বলে গণ্য হবার প্রয়োজনও হয় না। যথা—

ত্রিভুবনের | গোপন কথা- | খানি
কে জাগিয়ে | তুল্‌বে তাহার | মনে
আমি যদি | আমার মুক্তি | নিয়ে
যুক্তি করি | আপন গৃহ- | কোণে ?

—কবির বয়স, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

মাথার দিব্য | উঠো না কেউ | আগ্ বাড়িয়ে | দিতে আমায়,
চল্‌চে যেমন | চলুক তেমন | হঠাৎ যেন | গান না থামায়।

—বিদায়, ঐ

এখানে জাগিয়ে এবং বাড়িয়ে কথাদুটি ছন্দ-পর্বের শেষ দিকে আছে এবং তার পরেই যতি; সুতরাং দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। তাই ও-দুটি কথায় ইয়ে দুটি স্বতন্ত্র অযুগ্মধ্বনি বলেই গৃহীত হয়েছে। যদি ছন্দ-পর্বের শেষ প্রান্তস্থিত ইয়ে-কে দ্রুত উচ্চারণ করে একটি সিলেব্‌ল্ ধরা যায় তবে স্বভাবতঃই উচ্চারণটা অস্বাভাবিক আর ছন্দটাও বিকৃত হয়ে যায়। 'তা না হলে নাচিয়ে দিত বিষম তুর্কি-নাচন', এ পংক্তিটির দ্বিতীয় পর্বটিকে যদি 'দিত নাচিয়ে' করা যায় তা হলেই আমার এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। ইয়ে-র বিযুক্ত ব্যবহারের দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে এই ;—দিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি যে-সব শব্দ দুটিমাত্র অক্ষরের যোগে লেখা হয়, সে-সব শব্দের ইয়ে সব সময়ই বিযুক্ত থাকে, কারণ এসব স্থলে ইয়ে-র দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না। উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তের 'নিয়ে' কথাটিই তার প্রমাণ। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

যাহার লাগি | চক্ষু বুজে | বহিয়ে দিলাম | অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ | দিয়েও দেখি | বিশ্বভুবন | মস্ত ডাগর।

—বোঝাপড়া, ঐ

মন নিয়ে কেউ | বাঁচে নাক, | মন বলে যা | পায় রে
কোনো জন্মে | মন সেটা নয় | জানে না কেউ | হায় রে!

—অচেনা, ঐ

এখানে দিয়ে এবং নিয়ে শব্দেও দুটি করে সিলেব্‌ল্‌, আর বহিয়ে শব্দটিতেও দুটি সিলেব্‌ল্‌। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় বহিয়ে শব্দে ইয়ে এক সিলেব্‌ল্‌ হওয়াতে পূর্ববর্তী ব-টি প্রত্যক্ষতঃ অযুগ্ম হলেও এ স্থলে আশ্রিত হ্‌ বর্ণটির যোগে যুগ্মতা লাভ করল। কারণ এখানে বহিয়ে কথাটির আসল রূপ হচ্ছে বহ্‌য়ে, তাই বহিয়ে শব্দের ইয়ে-কে অযুগ্ম এবং বহ্‌-কে যুগ্ম বলে গণনা করতে হবে। কিন্তু 'দেয় বহিয়ে' লেখা হলে বহিয়ে কথাটিকে তিনটি স্বতন্ত্র অযুগ্মধ্বনি বলে গ্রহণ করতে হবে।

অযুগ্ম ও যুগ্ম ধ্বনির বিস্তৃত আলোচনা করতে হল; কারণ আমি সমস্ত বাংলা ছন্দকেই এ দুটি পারিভাষিক শব্দের সাহায্যেই আলোচনা করেছি। সুতরাং এ দুটি সংজ্ঞা-শব্দ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না হলে আমার সমস্ত আলোচনাই অস্পষ্ট বোধ হবে।

২। মাত্রা—সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে মাত্রা কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আমি এ শব্দটিকে ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহার করেছি। একটি হ্রস্বস্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে ও-শাস্ত্রে তাকেই এক মাত্রা বলে—একমাত্রো ভবেদ্‌ হ্রস্বঃ (শ্রুতবোধ)। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে দীর্ঘস্বরের উচ্চারণে হ্রস্বস্বরের দ্বিগুণ সময় লাগে। তাই দীর্ঘস্বরকে স্বভাবতঃই দ্বিমাত্রিক বলা হয়—দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে (ঐ)। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে মাত্রা শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'কলা' কথাটিও ব্যবহৃত হয়। 'মাত্রা'কে ইংরেজিতে বলা যায় metrical moment আর 'কলা'কে বলতে পারি metrical digit।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে সমস্ত ধ্বনিকেই লঘু এবং গুরু, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। হ্রস্বস্বর এবং হ্রস্বস্বরান্ত সমস্ত (অযুক্ত বা যুক্ত) ব্যঞ্জনের ধ্বনিকেই লঘু বলে গণ্য করা হয়। আর দীর্ঘস্বর এবং দীর্ঘস্বরান্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে গুরু বলে গ্রহণ করা হয়; তা ছাড়া, সংযুক্তাক্ষর, অনুস্বর এবং বিসর্গের

পূর্ববর্তী হ্রস্ব ধ্বনিকেও গুরু বলা হয়। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি; সুতরাং এ স্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় লঘু ধ্বনিকে এক মাত্রা এবং গুরু ধ্বনিকে দুই মাত্রা ধরা হয়। যথা—ছন্দ শব্দের দ-য়ের অ-কারকে লঘু অর্থাৎ একমাত্রিক অথচ ছ-য়ের অ-কারকে গুরু এবং কাজেই দ্বিমাত্রিক ধরা হয়; কেননা ছ-য়ের পরেই ন্দ এই যুক্তবর্ণটি আছে। অতএব ছন্দ শব্দে সবসুদ্ধ তিন মাত্রা।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি সমস্ত ধ্বনিকেই অযুগ্ম ও যুগ্ম, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে যে-সব ধ্বনিকে দীর্ঘ বলা হয়েছে বাংলায় সে-সব ধ্বনি দীর্ঘতা হারিয়ে হ্রস্বত্ব লাভ করেছে। বাংলা 'ধনী' শব্দের ঈ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না। অথচ বাংলায়ও এক স্বতন্ত্র রকমের দীর্ঘস্বরের ব্যবহার চলে; কিন্তু বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে সে দীর্ঘতার মূল্য প্রায় নেই বললেই হয়; কারণ বাংলা ছন্দ ধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। তথাপি কদাচিৎ দুই-এক জায়গায় বাংলায়ও দীর্ঘতার খুব সুন্দর প্রয়োগ হতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'চলি চলি | পা পা' | টলি টলি | যায়,
গরবিনী | হেসে হেসে | আড়ে আড়ে | চায়।

—হাসিরাশি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ

পা কথাটি যদিও বাংলায় প্রায় সর্বত্রই লঘু, তথাপি এ স্থলে দুটি পা শব্দেরই দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু এ রকম প্রয়োগ বাংলা ছন্দে খুব কমই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করা যাবে।

একটু পূর্বেই আমি বলেছি, বাংলা ছন্দ ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এ উক্তিটি অত্যন্ত ভ্রান্ত বলেই মনে হবে এবং মনে হওয়া অসংগতও নয়। কিন্তু আমি হ্রস্ব দীর্ঘ কথাদুটি অত্যন্ত সংকীর্ণ বৈয়াকরণিক অর্থে ব্যবহার করেছি, সাধারণ অর্থে ব্যবহার করি নি। নতুবা দীর্ঘ ও গুরু, এ দুটি পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। ছন্দ শব্দের ছ-য়ের অ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র অনুসারে গুরু, দীর্ঘ নয়। সংস্কৃত ছন্দের পরিভাষায় লঘু-গুরু এ সংজ্ঞা দুটিরই প্রয়োগ আছে, হ্রস্ব-দীর্ঘ শব্দের ব্যবহার নেই। আমিও সর্বত্রই হ্রস্ব-দীর্ঘ শব্দদুটিকে ব্যাকরণের প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করেছি, ছন্দ-পরিভাষার লঘু-গুরু অর্থে ব্যবহার করি নি। যেমন, জল শব্দের অ

এবং চাঁদ শব্দের আ-কে আমি গুরু বলব, দীর্ঘ বলব না। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকাররাও তা-ই করতেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রের লঘু-গুরুতার বিধানও বাংলা ছন্দের আলোচনায় পুরোপুরি খাটে না। কারণ সংস্কৃত ভাষায় ঐ (অই্) এবং ঔ (অউ্) ছাড়া যুগ্মস্বরের অস্তিত্ব নেই; অথচ বাংলায় অও্, আও্, ইউ্, উই্, এই্, এউ্, এও্, ওই্ প্রভৃতি বহু যুগ্মস্বরের প্রয়োগ আছে। আবার সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘস্বরের বহুল প্রয়োগ আছে; অথচ বাংলায় অন্ততঃ ছন্দের তরফ থেকে দীর্ঘস্বরের (ব্যাকরণের অর্থে) ব্যবহার প্রায় নেই বললেই হয়। যা হক, এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি অযুগ্মধ্বনিকেই লঘু অর্থাৎ একমাত্রিক আর যুগ্মধ্বনিকেই গুরু এবং কাজেই দ্বিমাত্রিক বলে গ্রহণ করেছি। যথা জল শব্দটার অ-কে দীর্ঘও বলব না, গুরুও বলব না; আমি সমস্ত 'জল' শব্দটাকেই একটি যুগ্ম অতএব গুরুধ্বনি বলব। কাজেই জল শব্দে দুই মাত্রাই ধরব। তেমনি, রাম শব্দটিও যুগ্ম অতএব দ্বিমাত্রিক। আবার পাতা এবং কাশী, এ দুটি শব্দে দুটি করে অযুগ্ম বা লঘু ধ্বনি আছে; সুতরাং এ দুটি শব্দও দ্বিমাত্রিক। ছন্দ বা ছন্‌দ শব্দে একটি যুগ্ম (ছন্) এবং একটি অযুগ্ম ধ্বনি আছে; সুতরাং এ শব্দে মাত্রা আছে তিনটি।

৩। **অক্ষর**—সিলেব্‌ল্ কথাটি ব্যবহার করেছি ঠিক ইংরেজি অর্থে; মাত্রা শব্দটি ব্যবহার করেছি সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের প্রচলিত অর্থে। তেমনি অক্ষর শব্দটিকে আমি বাংলা ভাষার প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ লিপিবদ্ধ ভাষার প্রত্যেকটি হরফকেই আমি এক-একটি অক্ষর নামে অভিহিত করেছি।

অক্ষর শব্দটি ব্যবহার করতে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ স্থলবিশেষে এ শব্দটির তিনটি স্বতন্ত্র অর্থ আছে। প্রথমতঃ ব্যাকরণের অর্থ। যেমন অস্ত্যাত্তরস্যাম্। ব্যাকরণের বর্ণ-বিশ্লেষণের নিয়ম অনুসারে এ কথাটিতে চোদ্দটি বর্ণ বা অক্ষর (অর্থাৎ letter) আছে, এ কথা যে-কোনো পাঠশালার ছাত্রও জানে। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের প্রযুক্ত অর্থ। ব্যাকরণের অক্ষর এবং ছন্দশাস্ত্রের অক্ষর এক জিনিস নয়। ছন্দশাস্ত্রের মতে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে সিলেব্‌ল্ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে তারই নাম অক্ষর। যেমন পূর্বোক্ত অস্ত্যাত্তরস্যাম্ কথাটিতে ব্যাকরণের মতে চোদ্দটি অক্ষর হলেও সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রমতে এখানে পাঁচটিমাত্র

অক্ষর আছে, কেননা অ-স্ত্য-ত্ত-র-স্থাম্ বাগ্‌যন্ত্রের এই পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রয়াস থেকে এই সমগ্র কথাটা উচ্চারিত হচ্ছে। অক্ষর শব্দের তৃতীয় অর্থ বাংলা ভাষার প্রচলিত অর্থ। বাংলায় সাধারণতঃ অক্ষর বলতে এক-একটি লিখিত হরফকেই বোঝায়। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। যেমন, পুণ্যবান্। এ কথাটিতে ব্যাকরণের মতে অক্ষর বা letter আছে আটটি; সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের মতে অক্ষর বা syllable আছে তিনটি। কিন্তু বাংলায় প্রচলিত অর্থে এখানে অক্ষর বা হরফ আছে চারটি, কেননা হসন্ত ন্-কেও একটি অক্ষর বলে ধরাই বাংলা রীতি। আর বাংলা ছন্দের অক্ষরও এই তৃতীয় অর্থেই গণনা করা হয়। নতুবা—

কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্

এই পংক্তিটিতে চোদ্দ অক্ষর গণনা করা সম্ভব হত না। আমিও সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে প্রযুক্ত অর্থ বর্জন করে বাংলায় প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করেছি। কেননা রাম, দাস, জল শব্দের ম, স এবং ল-এর হসন্ত উচ্চারণের কথা স্মরণ রেখে যদি সংস্কৃত প্রথা অনুসারে রাম, দাস, জল প্রভৃতি শব্দকে এক-একটি 'অক্ষর' (অর্থাৎ সিলেব্‌ল্) ধরি তবে কাশীরাম বা তাঁর স্বজাতীয় কেউ আমার উপর প্রসন্ন হবেন না। সুতরাং রাম কথাটিতে সংস্কৃত প্রথায় একটি অক্ষর না ধরে বাংলা প্রথায় দুটি অক্ষর ধরাই সমীচীন মনে করেছি। আর এইজন্যই উদ্ধৃত পংক্তিটিতে চোদ্দটি 'অক্ষর' ধরতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এভাবে বাংলা প্রথায় হরফকে অক্ষর ধরে ছন্দ রচনা করলেও ছন্দ প্রায়ই অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু তাতে ছন্দশাস্ত্রকারের মুশকিল হয়; একটু পরেই তা দেখাতে চেষ্টা করব।

২

বাংলা ছন্দের ত্রিধারা

ধ্বনি (বা স্বর), মাত্রা ও অক্ষর, আমার ব্যবহৃত এই তিনটি সংজ্ঞা-শব্দের পারিভাষিক পরিচয় দেওয়া গেল। এখন একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এদের প্রয়োগ-প্রণালীটা দেখা যাক। বাংলা 'চন্দন' শব্দটা নিয়ে বিচার করা যাক। বলা বাহুল্য এ শব্দটির অন্তিম ন-টি বাংলায় হসন্ত ন্-এর মতো উচ্চারিত হয়। ধ্বনি বা স্বর হিসেবে এখানে দুটিমাত্র ধ্বনি আছে—যথা চন্ এবং দন্; দু যুগ্মধ্বনি। মাত্রা হিসেবে এ শব্দটিতে মাত্রা আছে চারটি, কেননা প্রতে

যুগ্মধ্বনিতেই দুটি করে মাত্রা রয়েছে। আর অক্ষর হিসেবে 'চন্দন' শব্দটিতে অক্ষর রয়েছে তিনটি; হসন্তোচ্চারিত ন-টিও একটি অক্ষর বলে গণ্য হবে। তেমনি পুণ্যবান্ শব্দে ধ্বনি বা স্বর আছে তিনটি, মাত্রা পাঁচটি এবং অক্ষর চারটি।

ধ্বনির এই তিনটি প্রয়োগ-প্রণালীর উপরেই আমি বাংলা ছন্দের তিনটি শ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। রবীন্দ্রনাথ উপমাযোগে একই জিনিসের অবস্থাবিশেষে 'দুরকম বিপরীত ব্যবহারে'র কথা বলেছেন। আমি এ কথার সমর্থন করেই বলি যে একই ধ্বনি অবস্থাবিশেষে তিন রকম ভাবে ব্যবহৃত হয়। কবি যখন যে রকম ইচ্ছে সে রকম ব্যবহারই করতে পারেন; কিন্তু কবিদের এ ইচ্ছা কখনও একেবারে স্বেচ্ছাচার নয়। তাঁদের ইচ্ছাও শ্রুতি-মাধুর্যের কতগুলি নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়ম নির্ণয় করাই আমার উদ্দেশ্য। যা হক, ধ্বনির এই বিভিন্ন ব্যবহারের উপর নির্ভর করেই আমি ছন্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। ছন্দের এই তিন ধারার থিওরিটাকেই অস্বীকার করলে আমার কোনো বক্তব্যই বোধগম্য হবে না। তাই স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই তিনটি নামেরও পারিভাষিক পরিচয় দেওয়া দরকার।

১। **স্বরবৃত্ত**—স্বর বা ধ্বনির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যে ছন্দ রচিত হয় তাকেই আমি স্বরবৃত্ত ছন্দ বলেছি। এ ছন্দে মাত্রাপরিমাণ বা অক্ষরসংখ্যা স্থির থাকা আবশ্যিক নয়। পৌষের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের নবরচিত দৃষ্টান্ত থেকেই দেখাচ্ছি।—

। । ।। । ।। । ।। ।। ।

(১) এই্ যে এল | সেই্ আমারি | স্বপ্নে দেখা | রূপ্,
কই্ দেউলে | দেউ্টি দিলি, | কই্ জ্বালালি | ধূপ্।
যায়্ যদি রে | যাক্ না ফিরে | চাই্নে তারে | রাখি
সব্ গেলেও | হায়্রে তবু | স্বপ্ন রবে | বাকি।

(২) দুই্ জনে জুঁই্ | তুল্তে যখন্ | গেলেম্ বনের্ | ধারে,
সন্ধ্যা আলোর্ | মেঘের্ ঝালর্ | ঢাক্ল অন্ধ- | কারে।
কুঞ্জে গোপন্ | গন্ধ বাজায়্ | নিরুদ্দেশের্ | বাঁশি,
দোঁহার্ নয়ন | খুঁজে বেড়ায়্ | দোঁহার্ মুখের্ | হাসি।

এই দুটি দৃষ্টান্তই স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পর্বে সিলেব্‌ল্, ধ্বনি বা স্বর আছে চারটি করে। সুতরাং এটি চতুঃস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ।

এখানে এই্, সেই্, দুই্, জুঁই্, যায়্, যাক্, থন্, লেম্, নেব্ প্রভৃতি সমস্ত যুগ্মধ্বনিই এক unit বলে গৃহীত হয়েছে। ধ্বনিপরিমাণের বিচারে যুগ্মধ্বনি-গুলিকে দুমাত্রা হিসেবে ধরা হয় নি। স্বরবৃত্ত ছন্দের নিয়মই এই। দৃষ্টান্তদুটিতেই আশ্রয়চিহ্নের যোগে যুগ্মধ্বনিগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ ছন্দের পর্বগুলিতে মাত্রাসংখ্যা স্থির থাকে না।

২। **মাত্রাবৃত্ত**—ধ্বনির পরিমাণ বা quantity-র উপর ভিত্তি করে যে ছন্দ রচিত হয় তারই নাম মাত্রাবৃত্ত ; কারণ মাত্রাসংখ্যা স্থির রাখাই হচ্ছে ধ্বনি-পরিমাণ স্থির রাখার উপায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

। । । । ‖ । । ‖ । । ‖ ।

(১) মনে পড়ে | দুই্ জনে | জুঁই্ তুলে | বাল্যে।
নিরালায়্ | বনছায়্ | গেঁথেছিনু | মাল্যে।
দোঁহার্ ত- | রুণ্ প্রাণ্ | বেঁধে দিল | গন্ধে
আলোয়্ আঁ- | ধারে মেশা | নিভৃত আ- | নন্দে।

(২) কাঁধে মই্, | বলে, "কই্ | ভুঁই্ চাঁপা | গাছ্।"
দই্-ভাঁড়ে | ছিপ্ ছাড়ে, | খোঁজে কই্ | মাছ্।
ঘুঁটে ছাই্ | মেখে লাউ্ | রাঁধে ঝাউ্- | পাতা,
কী খেতাব্ | দেব তারে | ঘুরে যায়্ | মাথা।

(৩) সখাসনে | উৎ্সবে | বৎ্সর | যায়্
শেষে মরি | বিরহের্ | ক্ষুৎ্পিপা- | সায়্।
ফাগুনের্ | দিন্ শেষে | মউ্ মাছি | ও যে
মধুহীন্ | বনে বৃথা | মাধবীরে | খোঁজে।

এ তিনটি দৃষ্টান্তই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। আর তিনটি দৃষ্টান্তেরই প্রতিপর্বে চার মাত্রা করে আছে। সুতরাং এগুলিকে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত বলব। এখানে দুই্, জুঁই্, বৎ্, উৎ্, প্রাণ্, দিন্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিগুলি দ্বিমাত্রিক বলেই গণ্য হয়েছে ; এক-একটি syllabic unit বলে গণ্য হয় নি। এইটেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিয়ম।

৩। **অক্ষরবৃত্ত**—যে ছন্দে সাধারণতঃ প্রতিপর্বের (বাংলায় প্রচলিত অর্থে) 'অক্ষরে'র সংখ্যা স্থির রেখে রচিত হয় তাকেই অক্ষরবৃত্ত বলেছি। এ

ছন্দে ধ্বনির অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যাও স্থির থাকে না, ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ বা quantity'ও স্থির থাকে না। স্থির থাকে অক্ষরের সংখ্যা। যথা—

সাত্‌ কোটি | সন্তানেরে, | হে মুগ্ধ জ- | ননী,
রেখেছ বা- | ঙালি ক'রে | মানুষ্‌ ক- | রনি।

—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

এখানে পর্বগুলিতে ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা স্থির নেই; কেননা প্রথম পংক্তির প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় পর্বে তিনটি করে সিলেব্‌ল্‌ আছে কিন্তু অন্যত্র আছে চারটি করে। প্রতিপর্বের মাত্রাসংখ্যাও স্থির নেই; কেননা প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে মাত্রা আছে পাঁচটি করে, কিন্তু অন্যত্র আছে চারটি করে। সুতরাং এ ছন্দকে স্বরবৃত্তও বলা যায় না, মাত্রাবৃত্তও বলা যায় না। কিন্তু প্রতিপর্বের 'অক্ষর'সংখ্যা স্থির আছে; কেননা সবগুলি পর্বে চারটি করে অক্ষর আছে। সুতরাং এ ছন্দকে চতুরক্ষরপর্বিক অক্ষরবৃত্ত বলব।

কিন্তু বাংলায় প্রচলিত অর্থের অক্ষর বা হরফ ঠিক থাকলেই ধ্বনিও স্থির থাকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং শুধু অক্ষর সাজিয়ে ছন্দ রচনা করা অর্থাৎ ধ্বনিসাম্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হত তা হলে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় বলে চালানো অসাধ্য হত না'; কেননা, 'অক্ষরের আড়ালে ধ্বনি চুরি করা' কখনও সম্ভব নয়। তাঁর এই উক্তির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং এই কথাটাই ছিল আমার অগ্রহায়ণের প্রবন্ধের প্রধানতম বক্তব্য।

সুতরাং 'সাত কোটি সন্তানেরে | হে মুগ্ধ জননী,' প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরসংখ্যার সমতা আছে, শুধু এ কথা বললেই শেষ কথা বলা হল না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিসাম্য রক্ষার নিয়মটি কি, সেটুকু না জানা পর্যন্ত এ ছন্দের মূল তত্ত্ব জানা হবে না। আমার মতে সে নিয়মটি হচ্ছে এই—অক্ষরবৃত্ত ছন্দে একস্বর (monosyllabic) শব্দের যুগ্মধ্বনি এবং বহুস্বর শব্দের শেষ প্রান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক বা দুই unit, আর শব্দের অ-প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি এক unit বলে গণ্য হয়; অযুগ্মধ্বনি সর্বত্রই এক unit। যথা—

।+ । ।+ ।
'চম্পক্‌-অঙ্গুলি-ঘাতে সংগীত্‌ ঝংকারে'

প্রথমেই বলে রাখছি, আমি এ দৃষ্টান্তটিকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অতি সুন্দর ও নিখুঁত নিদর্শন বলে মনে করি। এ পংক্তিটির দোষ দেখানো কখনও আমার উদ্দেশ্য নয়; আমার উদ্দেশ্য এ পংক্তিটিতে ধ্বনিসংগতি কি ভাবে রক্ষিত হয়েছে তাই দেখানো। এখানে চোদ্দটি অক্ষর আছে এবং আটের পর যতি রয়েছে, আমার মতে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়। কেননা, শুধু হরফের সংখ্যা ঠিক থাকলেই ধ্বনিসংগতিও থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তবু উদ্ধৃত পংক্তিটিতে ধ্বনিসমতাও রক্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কি ভাবে সে সমতা রক্ষিত হয়েছে তাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য। এখন তাই দেখাচ্ছি।—

উপরের পংক্তিটিতে যুগ্মধ্বনি আছে ছয়টি। তার মধ্যে যোগ-চিহ্নিত দুটি (পক্ এবং গীত্) আছে শব্দের শেষ প্রান্তে; এ যুগ্মধ্বনিদুটিকে কিছু টেনে পড়তে হয়, কাজেই এ দুটি যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের মধ্যেই দুটি করে unit। আর দণ্ড-চিহ্নিত চারটি যুগ্মধ্বনি (চম্, অঙ্, সঙ্, ঝঙ্) আছে শব্দের মধ্যে; এ চারটিকে টেনে পড়তে হয় না; সুতরাং এগুলিকে একটিমাত্র unit বলেই ধরতে হবে। অযুগ্মধ্বনিগুলি সর্বত্রই এক-এক unit।

+ । +। ।
উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে

এ পংক্তিতে যোগ-চিহ্নিত যুগ্মধ্বনিদুটি দ্বিমাত্রিক, কেননা অয় শব্দের প্রান্তে অবস্থিত এবং 'ঐ' monosyllabic বা একস্বর; এগুলিকে টেনে উচ্চারণ করতে হয়। আবার দণ্ড-চিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলি (গন্, শুভ্, শঙ্) শব্দের মধ্যে অবস্থিত, আর এদের উচ্চারণও টেনে করতে হয় না, সুতরাং এরা এক-এক unit বলেই গণ্য হয়েছে। আমার বিবেচনায় এই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিরূপ নির্ণয়ের নিয়ম এবং এ নিয়ম সকল প্রকার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পক্ষেই সত্য বলে আমি মনে করি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যেখানে যেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় সেখানেই ধ্বনিসংগতিতে ত্রুটি ঘটে বলে আমার বিশ্বাস। যা হক, আমার কথিত নিয়ম অনুসারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-নির্ণয় করার প্রণালী হচ্ছে এইরূপ।—

। ‖ । । । । । । ‖ । । ।
চম্পক্-অঙ্গুলি-ঘাতে ‖ সংগীত্ ঝংকারে

। ‖ । । । ‖ । । । । । । ।
উদয়্-দিগন্তে ঐ ‖ শুভ্র শঙ্খ বাজে

যেখানে ধ্বনির unit এক সেখানে একটী দণ্ড-চিহ্ন এবং যেখানে ধ্বনির unit দুই সেখানে যুগ্মদণ্ড-চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করার বিষয়, শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির উপর যুগ্মদণ্ড স্থাপিত হয়েছে কিন্তু শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উপর যুগ্মদণ্ড স্থাপিত হয় নি, একটি দণ্ড স্থাপিত হয়েছে। আমার মতে এইটেই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আসল প্রকৃতি এবং কবিরা অক্ষর গুনেই লিখুন কিংবা কানের ওজন রেখেই লিখুন তাঁরাও সহজ ছন্দ-বোধের দ্বারা চালিত হয়ে স্বতঃই এই নিয়মটি মেনেই এ ছন্দ রচনা করেন। অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে এই ছিল আমার মূল বক্তব্য এবং এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের অভিমত কি তা জানাই ছিল আমার অভিপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-পরিভাষা

আমার ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলিকে স্পষ্টার্থ করতে চেষ্টা করলুম। এখন রবীন্দ্রনাথের পারিভাষিক শব্দগুলিরও একটু আলোচনা করা দরকার, কেননা তা হলে বোঝা যাবে আমার বক্তব্য বিষয় তিনি কেন স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি।

বেশ মনে আছে দশ বৎসর পূর্বে যখন বাংলা ছন্দের উপর কিছু লিখতে প্রবৃত্ত হই তখন রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি গ্রহণ করব কিনা, এ বিষয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছিল। পরিশেষে তাঁর পরিভাষা গ্রহণ না করাই স্থির করেছিলুম। তার কারণ, তখনই আমার মনে হয়েছিল তাঁর পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থের স্থিরতা নেই। অর্থাৎ এ শব্দগুলি তিনি সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহার করেন না, একই শব্দ দুই জায়গায় দুই রকম অর্থে ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এটি বৈজ্ঞানিক প্রথা নয়, কেননা পারিভাষিক শব্দের অর্থ সর্বত্র স্থির না থাকলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা চালানো সম্ভব নয়। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত তিনটি (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ; ১৩২৪ চৈত্র) এবং 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত একটি (১৩৩৮ পৌষ), বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর এই চারটি প্রবন্ধ থেকেই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ পারিভাষিক শব্দগুলিকে সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহার করেন না।

প্রথমেই ধরা যাক 'মাত্রা' কথাটি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'যখন

আমাদের সাধু সাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই... তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

ইহাতে চৌদ্দটি অক্ষরে চৌদ্দ মাত্রা' (সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)। প্রসঙ্গক্রমে আমি এ স্থলে বলে রাখছি যে উক্ত কারণেই আমি এ ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি। লক্ষ করার বিষয় রবীন্দ্রনাথও এ স্থলে প্রচলিত বাংলা অর্থেই অক্ষর শব্দ ব্যবহার করেছেন, কেননা এখানে হসন্ত র্ এবং হসন্ত ন্-কেও অক্ষর বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে এখানে চোদ্দ অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা নয়। এখানে দশটি অযুগ্মধ্বনিতে দশ unit এবং দুটি যুগ্মধ্বনিতে চার unit; সবসুদ্ধ এই চোদ্দ unit আছে। সুতরাং এ পংক্তিটির প্রকৃত রূপ হচ্ছে এ রকম।—

। । । । ॥ । । । । । ॥
মহাভারতের্ কথা অমৃত সমান্

এখানে তের্ এবং মান্ এই দুটি যুগ্মধ্বনিকে টেনে পড়তে হচ্ছে বলে এরা দ্বিমাত্রিক। প্রাচীনকালে তের, মান এরূপ অ-কারান্ত করে পড়ার পদ্ধতি থাকলেও আজকাল সে প্রণালী আর চলে না। কিন্তু আজকালকার প্রণালীতে উচ্চারণ করলেও এ ছন্দ নির্দোষ বলতে হবে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুতঃ এক মাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্তবর্ণ এবং অযুক্তবর্ণ কখনই এক মাত্রার হইতে পারে না।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্

পুণ্যবান্ শব্দটি কাশীরাম শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে স্বর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হালকা ও ভারী দুই রকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে' (সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)। প্রত্যেক অক্ষরই যে একমাত্রার নয়, এ কথা আমিও বলি; কেননা কাশীরামদাস শব্দের ম এবং স এক-একটি অক্ষর বটে, কিন্তু আজকাল আর কেউ রাম কিংবা দাস শব্দকে উড়ে পদ্ধতিতে অ-কারান্ত করে পড়ে না; সুতরাং এ স্থলে ম এবং স একমাত্রা তো নয়ই, আধ মাত্রাও নয়। যুক্তবর্ণ এবং অযুক্তবর্ণ কখনও একই মাত্রার হতে পারে না, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কেননা, পতি কথার প-ও একমাত্রা, প্রতি কথার প্র-ও একমাত্রা; পাবন কথার পা একমাত্রা, প্লাবন কথার প্লা-ও একমাত্রা।

রবীন্দ্রনাথও তাই বলবেন আমি জানি, কেননা তিনি এ স্থলে যুক্তবর্ণ এবং অযুক্তবর্ণ কথাদুটি দ্বারা যুগ্মধ্বনি এবং অযুগ্মধ্বনির কথাই বুঝেছেন। যুগ্মধ্বনি এবং অযুগ্মধ্বনি কখনই সমমাত্রিক হতে পারে না, এ কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ যুক্তবর্ণ এবং অযুক্তবর্ণ ব্যাকরণেরই কথা ; ছন্দশাস্ত্রে এ দুটি শব্দ ব্যবহার করা অবৈজ্ঞানিক এবং অসংগত। তাই আমি ছন্দের আলোচনায় এ দুটি শব্দকে সম্পূর্ণ বর্জন করেই চলতে চাই। তৃতীয়তঃ, উক্ত পংক্তির প্রত্যেকটি বর্ণকেই আমরা টেনে টেনে পড়ি, এ কথাও আমার কাছে সত্য মনে হয় না। কেননা, আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা ম, স এবং ন-কে হসন্ত উচ্চারণই করি ('বিচিত্রা'র প্রবন্ধ থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথও তাই করেন), সুতরাং এ তিনটি বর্ণ বা 'অক্ষর'কে টেনে পড়া সম্ভব নয়। তবে আমরা রাম, দাস এবং বান্ এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে টেনে পড়ি, পক্ষান্তরে পুণ্য শব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে (পুণ্) একটু ঠেসে উচ্চারণ করি। এই হচ্ছে এ ছন্দের (অক্ষরবৃত্তের) কায়দা এবং এজন্যই কানের ওজন ঠিক থাকে। সুতরাং এ পংক্তিটার প্রকৃত ধ্বনিরূপ হচ্ছে এরকম।—

। । ॥ ॥ । । । । । । ॥
কাশীরাম্ দাস্ কহে শুনে পুণ্যবান্

উক্ত প্রবন্ধেই অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ফল শব্দ বস্তুতঃ এক মাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের।' ফল শব্দ কখনও এক মাত্রার কথা নয়, এ শব্দটি সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই আমার কথা সমর্থন করবেন। এ শব্দটি দ্বিমাত্রিক বলেই মাত্রানিয়ন্ত্রিত ছন্দে এ শব্দটি দুই unit বলে গণ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ এ স্থলে মাত্রা শব্দটিকে সিলেব্‌ল্ কথার প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন। কেননা, ফল শব্দে একটি সিলেব্‌ল্ আছে, এ কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আবার যখন বলছেন, সাধু বাংলার ছন্দে ফল শব্দকে দুমাত্রা ধরা হয় তখন মাত্রা শব্দ quantitative unit-এর প্রতিশব্দ রূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আসল্ কথা হচ্ছে এই যে, সিলেব্‌ল্-নিয়ন্ত্রিত ছন্দে ফল শব্দকে ধরা হয় এক unit, আর মাত্রা-নিয়ন্ত্রিত ছন্দে এ শব্দটিকে ধরা হয় দুই unit। 'বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু'—রবীন্দ্রনাথ এখানে 'বৎসরে' কথাটিতে তিন 'মাত্রা' ধরেছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় আমাকে সমর্থন করে বলবেন, 'বৎসরে' কথাটিতে 'মাত্রা' আছে চার, তিন নয় ; কিন্তু 'অক্ষর'

আছে তিনটি, কেননা খণ্ড-ৎ এবং স মিলে এক অক্ষর। রবীন্দ্রনাথ এখানে মাত্রা কথাটিকে অক্ষরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং দেখা গেল তিনি মাত্রা শব্দটি কখনও সিলেব্‌ল্ অর্থে, কখনও অক্ষর অর্থে, কখনও তার আসল (অর্থাৎ ধ্বনি-quantity-র unit) অর্থে ব্যবহার করেন।

তিনি সিলেব্‌ল্ কথাটিকেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি লিখেছেন, "ইংরেজি মতে 'জল' সর্বত্রই এক সিলেব্‌ল্, 'পাতা' তার ডবল ভারী। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়।" তার ভাবখানা এই যে, যেহেতু জল শব্দটা বাংলা সেজন্য জল শব্দ বাংলায় কখনও কখনও দুই সিলেব্‌ল্ হতে পারে। তাই 'মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে' এ পংক্তিটিতে দুই এবং জুঁই কথাদুটি 'দুই সিলেব্‌ল্-এর টিকিট পেয়েছে', এ কথা বলেছেন। এখানে তিনি সিলেব্‌ল্ কথাটি মাত্রা অর্থাৎ ধ্বনি-quantity-র unit অর্থে প্রয়োগ করেছেন। জল, দুই, জুঁই শব্দগুলি ইংরেজি বা বাংলা কোনো মতেই কখনও দুই সিলেব্‌ল্ হতে পারে না, এ বিষয়ে ধ্বনিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু আমাকে সমর্থন করবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। আসল কথা হচ্ছে, জল, দুই, জুঁই প্রভৃতি syllabic measure-এ অর্থাৎ ধ্বনিসংখ্যার মাপে এক unit আর quantitative measure-এ অর্থাৎ ধ্বনির মাত্রাপরিমাণের মাপে দুই unit। কাজেই সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনিসংখ্যাত ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দে এগুলি এক-এক unit বলেই গণ্য হয়। আর মাত্রাসংখ্যাত ছন্দে অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এগুলি দুই unit বলেই গণ্য হয়।

ছন্দের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেও আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারি নি। তার কারণটা বলছি। তিনি বাংলা ছন্দকে দুই তরফ থেকে দুরকম করে ভাগ করেছেন। কিন্তু ওই দুরকম বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য নেই। এক দিক থেকে তিনি বাংলা ছন্দকে চলতি বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ এবং সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ এই দুভাগে বিভক্ত করেছেন; সাধু বাংলার ছন্দকে তিনি কখনও কখনও সাধু ছন্দ নামেও অভিহিত করেছেন। এক স্থানে (বিচিত্রা, পৌষ) তিনি বলেছেন, 'তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক-একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্ বলেই চলত।' বলা বাহুল্য তিনি এ স্থলে অক্ষরগোনা সাধু বাংলার ছন্দের কথাই বলছেন এবং সিলেব্‌ল্ মানে এ স্থলে উক্ত ছন্দের unit। এ রীতির ছন্দ যে শুধু তখনকার দিনেই চলত তা নয়, এ ধরনের ছন্দ আজকালও

চলে। তার পরেই তিনি বলছেন, 'অথচ সেদিন কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক বলে গণ্য করার দরকার আছে বলে অনুভব করেছিলুম।' আজকের দিনে একথা কারও অজানা নেই যে তাঁর ওই দরকার অনুভব করার ফলে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক নতুন শ্রেণীর ছন্দের প্রবর্তন হয়েছে, ধ্বনিঝংকারে এবং সুরমাধুর্যে এ শ্রেণীর ছন্দগুলি বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব; এ শ্রেণীর ছন্দের প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অবদান। যা হক, এই যে নতুন সুর ও নতুন রীতির ছন্দ তিনি প্রবর্তন করলেন, তিনি নিজে সে ছন্দের কি নাম দিয়েছেন এ স্থলে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তিনি এ ছন্দের কোনো বিশেষ নাম দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তবে তাঁর ছন্দের আলোচনাগুলি থেকে মনে হয় যে তিনি এ ছন্দকেও সাধু-ছন্দেরই প্রকারভেদ বলে মনে করেন। এ স্থলে তাঁর যে দুটি বাক্য উদ্ধৃত করলুম তার থেকেও আমার এ ধারণা সমর্থিত হয়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথও বাংলা ছন্দকে এক হিসেবে তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত করেন; যথা—প্রাকৃত বাংলা ছন্দের এক ধারা এবং সাধু বাংলা ছন্দের দুই ধারা।

তাঁর এই শ্রেণীবিভাগটি আমি সমর্থন করেছি, কিন্তু এই বিভাগগুলির পরিচয়সূচক নাম কয়টি আমি গ্রহণ করতে পারি নি। কারণ প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলার মধ্যে যে পার্থক্য তা অতি সামান্য, ওই পার্থক্যটি বিশেষভাবে কয়েকটি ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের মধ্যেই নিবদ্ধ। এই সামান্য পার্থক্যটির ধ্বনিগত মর্যাদা এত বেশি নয় যে তার উপর নির্ভর করে ছন্দ-বিভাগের নামকরণ করা যায়। তা ছাড়া যাকে তিনি সাধু বাংলার ছন্দ বলছেন তাতেও বহু প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার চলে এবং ইচ্ছে করলে সাধু ছন্দের ধ্বনিটি অব্যাহত রেখেও এ ছন্দে বহুল পরিমাণে প্রাকৃত শব্দ চালানো সম্ভব। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।

—ক্ষণিকা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এটি সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এখানে বিশেষভাবে সাধু বাংলার কোনো লক্ষণই নেই ; যে কয়টি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে, সব কটিরই প্রাকৃত রূপ। অথচ এ ছন্দের ধ্বনি সাধু ছন্দেরই ধ্বনি, তাঁর পরিভাষায় যাকে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলা হয় তার ধ্বনি এখানে নেই। যা হক, এ ছন্দটির যে একটি ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই এই ধ্বনির ছন্দকে আমিও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে গণ্য করেছি। কিন্তু 'সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ' এই নামটি আমি গ্রহণ করি নি। কেননা, এ ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার জন্য সাধু বাংলার ব্যবহার করতেই হবে, এমন আবশ্যিকতা নেই। আমার বিশ্বাস কোনো কবি ইচ্ছে করলে এ ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও আগাগোড়া শুধু প্রাকৃত বাংলাই চালিয়ে যেতে পারেন। এরকম কবিতা আমি এখনও দেখি নি। কিন্তু এরকম লেখাও যে সম্ভব তার প্রমাণ উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি। যা হক, আমি 'সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ' এই পরিচয়সূচক নামটি বর্জন করে এই ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি, কেননা, অক্ষরসংখ্যার সংগতি রক্ষা করাই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করেছি।

সাধু বাংলারই 'কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক বলে গণ্য করার' রীতি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছেন, এ কথা পূর্বেই বলেছি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি আমি ভিক্ষা মাগিতে
পুরাতে হইবে আশ।

—সুরদাসের প্রার্থনা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(২) "এখনো উঠাতে পারি" কর-যোড়ে যাচে
"যদি দেখাইয়া দাও কোনখানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন "আছে ওই নদীতলে"।

—নিষ্ফল উপহার, ঐ

এই দুটিই রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধু বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত। উভয়ত্রই যুগ্মধ্বনির দ্বৈমাত্রিকতা বজায় আছে এবং উভয়ত্রই সাধু বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এই ষৈমাত্রিক যুগ্মধ্বনি-ওয়ালা সাধু ছন্দেও সাধু ভাষার ব্যবহার অত্যাজ্য নয়। এ ছন্দেও প্রাকৃত বাংলার প্রচুর ব্যবহার হয় এবং ইচ্ছে করলে এ ছন্দেও সর্বত্রই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার চালানো যায়। যথা—

(৩) "স্পষ্ট বোল্‌তে কষ্ট কি বল্‌? লজ্জারো কিছু নয়!
সন্ধ্যা না হোতে সন্ধি কোরতে আস্‌বে সে নিশ্চয়।
জিত্‌তে হবেই আজ!
নইলে এ নামে লাজ!
বিদ্রোহী সাথে সন্ধি নেহাৎ সহজ ব্যাপার নাকি?
এ সব নিগূঢ় রণ-নীতি তোর শিখ্‌তে এখনো বাকী!

—সন্ধিসূত্র, বুকের বীণা, অপরাজিতা দেবী

(৪) পথ চেয়ে ব'সে আছি সেই থেকে এই,—
ছ'টা বাজে গ্যাস্‌ জ্বলে; তবু দেখা নেই!
সবাই তো এ পাড়ার ফিরে এলো ঘরে,
আজ কেন আস্‌তে সে এত দেরী করে?
কাল থেকে বোলে বোলে মান্‌লুম হার।—
কিছুতে কি ফুরসুৎ মিল্‌লো না তার?

—আঁধারে আলো, বুকের বীণা, অপরাজিতা দেবী

এ দুটি ছন্দই প্রাকৃত বাংলায় রচিত। অথচ রবীন্দ্রনাথ যাকে 'প্রাকৃত বাংলার ছন্দ' বলেন, এ দুটির ধ্বনি-প্রকৃতি সে রকম নয়, সুতরাং এ দুটি যে তাঁর প্রাকৃত বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত নয়, এ কথা নিশ্চিত। এখানে প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তের ধ্বনি-প্রকৃতি এক রকম; আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্তের ধ্বনি-প্রকৃতি এক রকম। কাজেই প্রথম দুটি সাধু বাংলায় রচিত এবং দ্বিতীয় দুটি প্রাকৃত বাংলায় রচিত বলে, এদের যথাক্রমে সাধু বাংলার ছন্দ ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ নাম দিলেই যথেষ্ট হবে না। আমার পরিভাষায় এ চারটি দৃষ্টান্তই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, কেননা এ চারটি দৃষ্টান্তই ধ্বনিমাত্রার পরিমাপে রচিত। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি ষণ্মাত্রিক; কেননা এদের প্রতিপর্বেই ছয় মাত্রা করে আছে। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থটি চতুর্মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত; এখানে প্রতিপর্বে চার মাত্রা আছে।

উপরের চতুর্থ দৃষ্টান্তটি প্রাকৃত বাংলায় রচিত, অথচ রবীন্দ্রনাথের পারিভাষিক

অর্থে এ ছন্দকে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলা যায় না। তা ছাড়া তিনি যাকে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলেন তাতেও সর্বত্রই প্রাকৃত বাংলা কথার ব্যবহার আবশ্যিক নয়। প্রাকৃত বাংলার ছন্দেও সাধু বাংলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

(১) বালিশতলে বইটি চাপা টানিয়া লয় তারে,—
পাতাগুলিন্ ছেঁড়া-খোঁড়া শিশুর অত্যাচারে।

যথাস্থানে, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) আমায় যদি মনটি দেবে—রাখিয়া যাও তবে;
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাক্‌তে হবে।

—অসাবধান, ঐ

এ দুটি রবীন্দ্রনাথের কথিত প্রাকৃত বাংলার ছন্দ। অথচ এখানে দুটি সাধু শব্দ (টানিয়া এবং রাখিয়া) আছে। আর পূর্বোক্ত চতুর্থ দৃষ্টান্তটি প্রাকৃত বাংলার ছন্দ নয়; অথচ তাতে সর্বত্রই প্রাকৃত বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে। এ জন্যই সাধু বাংলার ছন্দ প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, ইত্যাদি নাম গ্রহণ করি নি। কারণ সাধু বাংলা বা প্রাকৃত বাংলা বললে ভাষার ব্যাকরণগত রূপের কথাই বলা হয়, ধ্বনিগত রূপের কথা বলা হয় না। অথচ ধ্বনির বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখেই ছন্দের নামকরণ করতে হবে। তাই আমি এ দৃষ্টান্তদুটির নাম দিয়েছি স্বরবৃত্ত ছন্দ; কেননা এ দৃষ্টান্তদুটিতে সর্বত্রই সিলেব্‌ল্ বা স্বরের সংখ্যাগত সংগতি আছে।

যা হক, দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের সাধু বাংলার দুই ধারা এবং প্রাকৃত বাংলার এক ধারা, ছন্দের এই তিন ধারা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু ওই নামগুলি মেনে নিতে আপত্তি আছে। তাই আমি ছন্দের এই তিন ধারার নাম দিয়েছি যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সচরাচর সাধু বাংলাই ব্যবহৃত হয়; তবে স্থানবিশেষে প্রাকৃত বাংলা শব্দের ব্যবহারও চলে এবং আমার বিবেচনায় নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃত বাংলায়ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করা সম্ভব,—অবশ্য আজ পর্যন্ত তেমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে নি। মাত্রাবৃত্তেও অক্ষরবৃত্তের মতোই সাধু ও প্রাকৃত বাংলার মিশ্রণ চলে; কিন্তু এ ছন্দে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহারও চালানো যায়,—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা'য় তার বেশ সুন্দর নিদর্শন আছে। আর স্বরবৃত্ত ছন্দে

প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করাই সাধারণ নিয়ম; তবে প্রয়োজন অনুসারে দু-এক জায়গায় সাধু বাংলা শব্দও চলে—দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

ছন্দের যে তিন ধারার কথা উল্লেখ করলুম রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃ এই তিন ধারার কথা না বললেও প্রকারান্তরে তিনি বাংলা ছন্দের এই তিন ধারা স্বীকার করেন, তাঁর ছন্দ-বিষয়ক সমস্ত আলোচনা থেকে আমার এ কথাই মনে হয়েছে। আমি কিন্তু ছন্দের এই তিন বিভাগের উপরই আমার সমস্ত আলোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকে স্পষ্টতঃ তিন ভাগে বিভক্ত না করলেও তিনি যে ছন্দের এই তিন ধারার কথা স্বীকার করতেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'বাংলা দেশের মুক্তবেণীর গঙ্গাতীরে, একজন মাত্র কবির প্রতিভাবলে, আজ ছন্দের **তিন ধারা** বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে যুক্তবেণীর সৃষ্টি করেছে' (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)।

যা হক, আর-এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে সমমাত্রিক, অসমমাত্রিক ও বিষমমাত্রিক এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই বিভাগটি আমি গ্রহণ করতে পারি নি। তার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ এই নাম তিনটিতেও মাত্রা কথাটি এ শব্দের স্বাভাবিক অর্থে অর্থাৎ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের প্রযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। তিনি এই শ্রেণীবিভাগের যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় তাঁর ব্যবহৃত 'মাত্রা'র মূল্য সব জায়গায় সমান নয়; স্থলবিশেষে মাত্রা কথাটির মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন রকম। যথা—

শারদচন্দ | পবন মন্দ | বিপিন ভরল | কুসুমগন্ধ

রবীন্দ্রনাথের মতে এটি অসমমাত্রার ছন্দ; কেননা এর প্রতিপর্বে তিনের দ্বিগুণ অর্থাৎ ছয় মাত্রা রয়েছে আর তিন হচ্ছে অসম সংখ্যা। এখানে তিনি 'শারদ' শব্দেও তিন মাত্রা ধরেছেন, চন্দ কথায়ও তিন মাত্রা ধরেছেন। কেননা এ উভয় শব্দেই ধ্বনিপরিমাণের তিন unit আছে। এইটেই মাত্রা কথার আসল অর্থ। তাই আমি এ ছন্দকে বলব মাত্রাবৃত্ত ছন্দ; এটি হচ্ছে তার ষণ্মাত্রিক উপশাখা।

সংগীত ত- | রঙ্গ রঙ্গ | অঙ্গের উ- | চ্ছ্বাস

এটাকে তিনি বলেন সমমাত্রার ছন্দ; কেননা এর প্রতিপর্বে আছে দুয়ের দ্বিগুণ অর্থাৎ চার 'মাত্রা'। কিন্তু এখানে মাত্রা শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হল। পূর্বের মন্দ, গন্ধ প্রভৃতি শব্দে ধরা হয়েছিল তিন মাত্রা, কিন্তু এখানে রঙ্গ, অঙ্গ

প্রভৃতি শব্দে দুই মাত্রার বেশি ধরা হয় নি। এটি মাত্রা শব্দের প্রকৃত অর্থ নয়। এখানে আসলে মাত্রা বলতে তিনি 'অক্ষর' ধরে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত 'অক্ষর'ই হচ্ছে এ ছন্দের unit। তাই আমি এ ছন্দকে বলব 'অক্ষরবৃত্ত' এবং এর প্রতিপর্বে চারটি করে অক্ষর থাকাতে একে 'চতুরক্ষর-পর্বিক' এই উপনামে অভিহিত করব।

বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান

রবীন্দ্রনাথ এখানে এক-একটি স্বর বা সিলেব্‌ল্‌কেই এক-একটি 'মাত্রা' ধরেন। এটিও মাত্রা কথার আসল অর্থ নয়। এখানে সিলেব্‌ল্‌ বা স্বরই হচ্ছে এ ছন্দের unit। তাই আমার মতে এর নাম স্বরবৃত্ত; এ দৃষ্টান্তটি স্বরবৃত্তের 'চতুঃস্বর-পর্বিক' শাখার অন্তর্গত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, ছন্দের unit মাত্রকেই রবীন্দ্রনাথ মাত্রা নাম দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ছন্দে তিন রকমের unit ব্যবহৃত হয় এবং এই unit-গুলিই ছন্দের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এক শ্রেণীর বাংলা ছন্দের unit হচ্ছে সিলেব্‌ল্‌ বা স্বর; আর-এক শ্রেণীর unit হচ্ছে মাত্রা; তৃতীয় শ্রেণীর unit হচ্ছে অক্ষর। সুতরাং বাংলা ছন্দকে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত এই তিন ধারায় বিভক্ত করাই সংগত।

সমমাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রা, এই তিন ভাগে ভাগ করার দ্বিতীয় দোষ হচ্ছে এই যে, এই নামকরণে ছন্দের unit-এর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ছন্দ-পর্বের পরিমাপের পরিচয়। অথচ ছন্দের unit-ই তার আসল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং unit-এর পরিচয়ই তার আসল পরিচয়। ছন্দ পর্বের গঠনপ্রণালী তার বাহ্য রূপকে মাত্র নির্দেশ করে সুতরাং পর্বের পরিচয় ছন্দের আসল পরিচয় নয়, তার গৌণ পরিচয় মাত্র। কাজেই সমমাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রার বিভাগে ছন্দের বাহ্য রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়, ছন্দের অন্তরের রূপ তাতে প্রকাশিত হয় না। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। যেমন—

(১) বরষার | নির্ঝরে | অঙ্কিত | কায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়!

—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(২) এলায়ে জটিল-বক্র | নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।

—নিষ্ফল উপহার, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

(৩) কিসের তরে | অশ্রু ঝরে, | কিসের লাগি | দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

—হতভাগ্যের গান, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এ তিনটি দৃষ্টান্তই সমমাত্রার ছন্দ; কেননা তাঁর মতে তিনটি দৃষ্টান্তেই প্রতিপর্বে চারটি করে 'মাত্রা' অর্থাৎ unit আছে। কিন্তু প্রতিপর্বে চারটি করে unit থাকাই বড় কথা নয়, এটা বাহ্য সাদৃশ্যের পরিচয় মাত্র। এ দৃষ্টান্ত তিনটি পড়লেই বোঝা যাবে যে তিনটি দৃষ্টান্তে তিন রকম unit ব্যবহৃত হয়েছে; তার ফলে তিনটি দৃষ্টান্তে ধ্বনির বৈশিষ্ট্য তিন রকম হয়েছে। সুতরাং এই unit-গুলির পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত এ তিনটি ছন্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। সে পরিচয় হচ্ছে এই। প্রথম দৃষ্টান্তের unit হচ্ছে মাত্রা, দ্বিতীয়টির অক্ষর এবং তৃতীয়টির স্বর। সুতরাং এখানে যথাক্রমে মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত পেলুম। আর এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের আসল রূপ।

কাজেই দেখতে পেলুম রবীন্দ্রনাথের সমমাত্রার ছন্দও স্বর, মাত্রা ও অক্ষর এই তিন unit অবলম্বন করে তিন রকম হতে পারে। অসমমাত্রার ছন্দেরও এরকম দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিষমমাত্রার ছন্দের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত রূপের দৃষ্টান্ত দিতে পারি, অক্ষরবৃত্ত-রূপের দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। কাজেই দেখা গেল মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এ তিনটিই হচ্ছে ছন্দের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ। আর সম, অসম ও বিষম এ তিনটি হচ্ছে ছন্দের আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ।

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষার বিস্তৃত আলোচনা করতে হল এই জন্যে যে, আমার ব্যবহৃত পরিভাষার সঙ্গে তাঁর পরিভাষার অর্থের ও ব্যবহারের পার্থক্য খুবই বেশি এবং তার ফলে আমার আলোচনাটি তাঁর কাছে অনেক সময় অস্পষ্ট বোধ হয়ে থাকতে পারে। আমাদের পরিভাষার এই পার্থক্যটুকুর প্রতি যদি তিনি লক্ষ রাখেন তবে আশা করি তিনি দেখতে পাবেন যে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তা ছাড়া আমি আমার আলোচনায় যে-সমস্ত

নতুন কথার অবতারণা করেছি সে-সব বিষয়েও আমি তাঁর সমর্থনই পাব এই আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-পরিভাষার অর্থ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি বলে কেউ যেন এ কথা মনে না করেন যে আমি তাঁর রচিত ছন্দের নির্দোষতা সম্বন্ধেই সন্দিহান। কারণ ছন্দকার কবিকে যে ছন্দ-শাস্ত্রকারও হতে হবে এমন অবশ্যম্ভাবী বাধ্যবাধকতা কোনো দেশে কোনো কালে ছিল না, এখনও নেই। ছন্দশাস্ত্রকার ছন্দকারের ছন্দপ্রতিভার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়েও ছন্দের আলোচনায় তাঁর সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন, এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রতিভার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি তাঁর ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলুম এবং ছন্দশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁর মত সমর্থন করতে না পারলেও তাঁর প্রতিভার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁর ছন্দের প্রতি আমার অনুরাগ অক্ষুণ্ণই আছে। *

* বিচিত্রা ১৩৩৮ ফাল্গুন

ছন্দ-জিজ্ঞাসা (৩)

যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি

'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ পৌষের 'বিচিত্রায়' যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি; কারণ 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে প্রশ্ন তুলেছি, ওই প্রবন্ধে সে প্রশ্নের যথোচিত উত্তর পাই নি। কিন্তু মাঘের 'পরিচয়ে' তাঁর 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' পড়ে খুশি হয়েছি, কারণ তাতে আমার প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেয়েছি। তা ছাড়া, জয়ন্তী উপলক্ষে 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামক প্রবন্ধে কাব্য-রচনার প্রথম সূচনা থেকে 'মানসী'র যুগ পর্যন্ত তাঁর ছন্দের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা বলেছি, 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধে তার সম্পূর্ণ সমর্থন পেলুম। এত শীঘ্র এত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার কথার এমন চমৎকার সমর্থন পেয়ে আমি স্বভাবতঃই বিশেষ সন্তোষ লাভ করেছি। আমি বলেছি, 'রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনায় যুক্তবর্ণের বিরলতা একটি বিশেষ লক্ষ করার বিষয়'। তিনি লিখেছেন, তখনকার দিনে 'যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটি দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল'। কেন সে অভ্যাস হয়েছিল এবং কি ভাবে তার অবসান ঘটল, এ বিষয়ে আমি যা বলেছি তিনি তাঁর সব কথাই সমর্থন করেছেন। (জয়ন্তী-উৎসর্গ, ৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা এবং পরিচয়, মাঘ, ৩৮২-৩৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তা ছাড়াও, 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটিতে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বিষয়ের উত্থাপন করেছেন, ছন্দের আলোচনায় যার মূল্য খুবই বেশি। তাঁর এ প্রবন্ধটির দ্বারা বাংলা ছন্দের আসল প্রকৃতিটি বোঝবার বিশেষ সহায়তা হয়েছে। যা হক যে প্রশ্ন উপলক্ষ করে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন সে প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার আরও কয়েকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে। আমি এ প্রবন্ধে ওই জিজ্ঞাস্য বিষয়কটির আলোচনা করব এবং প্রসঙ্গক্রমে বাংলা ছন্দের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উত্থাপন করব।

১

যে-কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয়েরই আলোচনায় উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকার

যথাসম্ভব বর্জন করে চলাই রীতি। কারণ বৈজ্ঞানিক আলোচনার রীতি আর সাহিত্যিক রচনার রীতি এক নয়। ব্যাকরণ এবং শব্দতত্ত্বের আলোচনার ন্যায় ছন্দের আলোচনাও যত নিরলংকার হয়, আলোচ্য বিষয়কে নিঃসংশয়রূপে স্পষ্ট করার পক্ষে ততই ভাল। তুলনা-উপমা প্রভৃতির দ্বারা মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ই অলক্ষে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ঋজু পথটিকে লঙ্ঘন করে যাবারও সম্ভাবনা থাকে। ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিতে লক্ষ করেছি বক্তব্য বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করে তোলবার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বত্রই নানা ভঙ্গিতে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর তুলনার আশ্রয় নিয়েছেন; আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। তুলনাগুলির অধিকাংশই এমন চমৎকার যে তাতে মন আকৃষ্ট ও মুগ্ধ না হয়ে পারে না। কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস, ও-সব তুলনা যথাসম্ভব পরিহার করে আলোচনা করাই উচিত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে আশা করি। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে 'দ্বৈমাত্রিক' ছন্দের গতিকে পায়ে চলার ভঙ্গির সঙ্গে এবং 'ত্রৈমাত্রিক' ছন্দের গতিকে চাকার চলার ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনার দ্বারা ও-দুই ছন্দের সম্বন্ধে এক রকম করে একটা বিশেষ ধারণা হয় বটে। কিন্তু তার দ্বারা ও-দুই ছন্দের আসল প্রকৃতি ও পার্থক্য সম্বন্ধে বাস্তবিক উপলব্ধি হয় না। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি যথাসম্ভব তুলনার ভাষা বর্জন করে ছন্দের আলোচনা করেন তা হলে বাংলা ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করা পাঠকদের পক্ষে অনেক বেশি সহজ ও সরল হবে।

২

যে ছন্দকে আমি বলেছি স্বরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেন 'প্রাকৃতছন্দ'; আর যে ছন্দকে আমি বলেছি যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত তিনি তাকেই বলেন 'সাধু ছন্দ'। তাঁর দেওয়া এ নাম দুটি ছন্দগত নয়, ভাষাগত। তা ছাড়া যৌগিক ছন্দে যে সব সময়ই সাধু ভাষার ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো আবশ্যিকতা নেই; আর স্বরবৃত্ত ছন্দেও প্রয়োজনমতো সাধু শব্দের (অর্থাৎ সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের) ব্যবহার চলে থাকে। তাই তাঁর দেওয়া এ নামদুটি আমি গ্রহণ করতে পারি নি। এ বিষয়ে ফাল্গুনের 'বিচিত্রা'য় বিস্তৃত আলোচনা করেছি। যৌগিক ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও 'পয়ার-সম্প্রদায়', 'পয়ার জাতীয় দ্বৈমাত্রিক ছন্দ' 'দুই-মূলক সমমাত্রার ছন্দ' ইত্যাদি নামও দিয়েছেন।

ওই সব নামের যৌক্তিকতা নিয়ে এ স্থলে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ সব ছন্দকে আমি কেন 'যৌগিক ছন্দ' নাম দিয়েছি সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করব। কোন্ ছন্দকে আমি 'যৌগিক' আখ্যা দিয়েছি আশা করি সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই।

অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় আমি এই যৌগিক ছন্দেরই অন্তর্নিহিত নিয়মটি, অর্থাৎ কবিরা স্বভাবতঃই যে নিয়মটি স্বীকার করে ও-ছন্দ রচনা করে থাকেন সেই নিয়মটি, আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলুম। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি করে তার পরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া' সংগত নয়। এ বিষয়ে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি কবিদের স্বীকৃত নিয়মটি আবিষ্কার করতেই চেষ্টা করেছিলুম; কোনো নিয়ম 'জারি' করে কবিদের উপর 'জবরদস্তি' করা কখনই আমার অভিপ্রায় ছিল না। যদি আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, আমি যাকে যৌগিক ছন্দের নিয়ম বলে মনে করি সেটা ওই ছন্দের আসল নিয়ম নয়, তা হলে আমি অসংকোচে আমার ভ্রম স্বীকার করব। কোনো বিশেষ একটি নিয়মকে জবরদস্তির দ্বারা চালিয়ে দেবার মতো অন্যায় জেদ আমার নেই।

এখন দেখা যাক পূর্বোক্ত যৌগিক বা সাধু ছন্দের নিয়ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি বলেন। তিনি লিখেছেন, 'আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্ন মাত্র।... অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো বিড়ম্বনা।......অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।' এ সম্বন্ধে আমি প্রথমেই এ কথা বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ এখানে 'অক্ষর' শব্দটি বাংলায় প্রচলিত অর্থে অর্থাৎ হরফ অর্থেই ব্যবহার করেছেন; ('অক্ষর' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি)। তাই তিনি স্বভাবতঃই আক্ষরিক ছন্দ সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য করেছেন; আর তাঁর এই মন্তব্য খুবই সংগত। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে 'অক্ষর' বলতে সিলেব্‌ল্ বোঝায় এবং সমস্ত সংস্কৃত ছন্দোবিদরাই 'আক্ষরিক' বা 'অক্ষরবৃত্ত' (syllabic) ছন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একমত। কিন্তু বাংলায় 'অক্ষর' বলতে যা বোঝায় সে অর্থে আক্ষরিক ছন্দ নামে অদ্ভুত পদার্থ কোনো ভাষাতেই হতে পারে না, এ বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত। ছন্দ সম্বন্ধে যাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তারা এ বিষয়ে দ্বিতীয় মত পোষণ করতে পারে না।

ছন্দোনিপুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাই বলেছেন ; "কেবল—'বিজোড়ে বিজোড় গেঁথে জোড়ে গেঁথে জোড়'—হরফের পর হরফ সাজিয়ে কম্পোজিটার-এর নকল করলে ঠিক চলবে না। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে" ছন্দ রচনা করতে হবে (ছন্দ-সরস্বতী, ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)। আর ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করাই ছিল আমার অগ্রহায়ণের প্রবন্ধের প্রধানতম উদ্দেশ্য। মাঘের 'বিচিত্রা'য়ও আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, কেবলমাত্র অক্ষরসংখ্যার সাম্য রক্ষা করে কোনো যথার্থ ছন্দ রচনা করা যায় না। কাজেই 'যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন' আমি তাঁদের দলে নই, এ কথা আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি।

বরঞ্চ 'অক্ষরের দাসত্বে বন্দী' বলে বাঙালি কবিদের আমি দোষ দিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আমি স্বীকার করতে পারি। কারণ ভারতচন্দ্রের সময় থেকে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের সময় পর্যন্ত অক্ষরসংখ্যার সাম্য ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল বলে আমার জানা নেই। মেঘনাদবধ কাব্যখানি আগাগোড়া শুধু চোদ্দ অক্ষরের পংক্তিতেই রচিত হয়েছে। আমার এ অভিযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, 'সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত'। অবশেষে রবীন্দ্রনাথই বাংলা কবিতার ছন্দকে অক্ষরসংখ্যার 'লৌহশৃঙ্খলের ডোর' থেকে মুক্ত করেছেন। (বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—জয়ন্তী-উৎসর্গ, ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলা কিংবা কোনো ভাষাতেই নেই'। আর আমি বলেছি, 'ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হতে পারে না' (জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃ ৭৬)। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যেপে বাংলায় যত কাব্য রচিত হয়েছে তার প্রায় ষোলো আনাই ওই অক্ষরগোনা ছন্দে রচিত। ফলে ওই সময়কার কাব্যে বহু স্থানেই ছন্দের ধ্বনিগত ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়। বরঞ্চ ওই সময়কার অক্ষরগোনা ছন্দে প্রতিপদেই যে স্খলন ঘটে নি সেটাই বিচিত্র। শুধু 'অক্ষরের মাপ সমান রেখে' ছন্দ রচনা করা সত্ত্বেও ধ্বনির মাপে যে খুব বেশি দোষ ঘটে নি, তার প্রধান কারণ আমাদের লিপিপদ্ধতিতে ব্যঞ্জনসংহতিকে যুক্তাক্ষরের দ্বারা লেখার প্রথা। আমাদের

লিপিপদ্ধতির দ্বারা বাংলা যৌগিক ছন্দটি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এখানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করার স্থান আমাদের নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আক্ষরিক ছন্দ নামে কোনো অদ্ভুত পদার্থ কোনো ভাষাতেই নেই'। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই পয়ারজাতীয় (অর্থাৎ যৌগিক) ছন্দগুলির বিশ্লেষণ উপলক্ষে প্রায় সর্বদাই 'অক্ষরে'রই হিসাব করে থাকেন; 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটিতেও তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি—'আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো 'অক্ষরে' গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট 'অক্ষরের' পরে, শেষ যতি দশ 'অক্ষরে'র পরে পদের শেষে।' যদি আট 'অক্ষর' এবং দশ 'অক্ষর' গুনেই এই দীর্ঘ পয়ারের বিশ্লেষণ করতে হয়, তা হলে বলতে হবে যে এই দীর্ঘ পয়ার একটি 'আক্ষরিক' ছন্দ। আসল কথা এই যে, প্রচলিত লৌকিক কায়দায় দীর্ঘ পয়ার এবং তজ্জাতীয় সমস্ত ছন্দকেই 'অক্ষরে'র হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং কাজেই লৌকিক পদ্ধতিতে এসমস্ত ছন্দকে 'আক্ষরিক' ছন্দ বলা চলে। কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিচার করলে 'অক্ষরকে' এসব ছন্দের unit বা ব্যষ্টি বলা চলে না। বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ করতে হলে বলতে হয় যে, দীর্ঘ পয়ারের প্রতিপংক্তি আঠারো ধ্বনিব্যষ্টির যোগে রচিত; আর আট ব্যষ্টির পরে প্রথম যতি, শেষ যতি দশ ব্যষ্টির পরে।

লৌকিক কায়দায় 'পয়ার জাতীয়' সমস্ত ছন্দেরই হিসাব রাখা হয় 'অক্ষরের' মাপে। তাই লৌকিক পদ্ধতিটাকে অগ্রাহ্য না করে আমি এজাতীয় ছন্দের সাধারণ নাম দিয়েছিলুম* 'অক্ষর'-বৃত্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমাকে বলতে হয়েছিল, 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষরসংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না' (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, পৃ ৫৮০); 'কিন্তু আসলে অক্ষর-সংখ্যা এ ছন্দের মূলগত তত্ত্ব নয়; ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হতে পারে না' (জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃঃ ৭৬)। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এই শ্রেণীর ছন্দকে 'অক্ষর'-বৃত্ত নাম দিয়ে আবার এগুলিকে 'অক্ষর'-নিরপেক্ষ বলায় বিভ্রাট উপস্থিত হয়েছে। আমার এই উক্তির মধ্যে বিরোধ কল্পনা করার ফলে আমি 'অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধি' বলেও অভিযুক্ত

হয়েছি আবার 'অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বলে বাঙালি কবিদেরকে দোষ দিই' বলেও অভিযুক্ত হয়েছি। এই দুটি পরস্পরবিরোধী অভিযোগই যুগপৎ সত্য হতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। যা হক, এই উভয়সংকট থেকে ত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে আমি 'অক্ষরবৃত্ত' নামটার পরিবর্তে 'পয়ারজাতীয় সাধু' ছন্দগুলিকে 'যৌগিক ছন্দ' নামে অভিহিত করেছি। অক্ষর গুনে ছন্দের বিশ্লেষণ করার লৌকিক রীতির সঙ্গে কোনোরকম রফা না করেই এই নতুন নামকরণ করেছি। অক্ষরসংখ্যার মাপে লৌকিক কায়দায় যাঁরা ছন্দের হিসাব রাখেন এই নতুন নামে তাঁদের অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের তরফ থেকে আমাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে না, এই আশা করছি।

৩

বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার একটি ধ্বনিগত নিয়মের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সে নিয়মটি হচ্ছে এই। 'বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে।' এই নিয়মটিকে আমি কখনও অস্বীকার করি নি; বস্তুতঃ এই নিয়মটিকে ভিত্তি করেই আমি বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করেছি। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলে রাখা ভাল যে, এ নিয়মটি কেবলমাত্র বাংলা ভাষারই স্বকীয় নয়; ইংরেজি ভাষা এবং ছন্দের পক্ষেও এ নিয়মটি বহু অংশে খাটে। ইংরেজিতে অনেক সিলেব্‌ল্‌ আছে যা ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতার তরফ থেকে উভধর্মী বা common; অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে ওই সিলেব্‌ল্‌গুলি হ্রস্ব হয় আবার অবস্থাবিশেষে অন্যত্র দীর্ঘও হতে পারে। এই উভধর্মী সিলেব্‌ল্‌গুলি ইংরেজি ছন্দকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে (George Saintsbury's Manual of English Prosody, ২১-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যা হক, রবীন্দ্রনাথের কথিত বাংলার উক্ত ধ্বনিগত নিয়মটিকে একটু ভাল করে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, এ নিয়মটিকে তিনি অত্যন্ত বেশি ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। নিয়মটিকে যদি ব্যবহারে লাগাতে হয় তা হলে এটিকে আরও বিশ্লেষণ করা দরকার। বাংলা ভাষার ধ্বনি 'স্থিতিস্থাপক'; প্রয়োজনমতো তাকে টান দিয়ে বাড়ানো যায়, আবার প্রয়োজনমতো টান ছেড়ে দিয়ে তাকে কমানোও

যায় ;—শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। কখন ওই ধ্বনিকে টেনে বাড়াবার প্রয়োজন হয়, আর কখন টান ছেড়ে দিয়ে তাকে কমানো দরকার হয়, সে কথাটিও বলা চাই। কারণ ওই কথাটি না বললে এ নিয়মটিকে কাজে লাগানো যাবে না।

বাংলার ধ্বনিগত এই স্থিতিস্থাপকতা গুণটিকে কি ভাবে ছন্দরচনার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমি তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি। ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতাগুণের ব্যবহারিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখেই আমি বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করেছি। ধ্বনির যে ব্যবহারিক তত্ত্বের উপরে আমি ছন্দের শ্রেণীবিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এ স্থলে সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করছি। বাংলা ছন্দে, অযুগ্মধ্বনিকে সাধারণতঃ টেনে বাড়ানো হয় না; অযুগ্মধ্বনি প্রায় সর্বত্রই এক unit বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলার সমস্ত যুগ্মধ্বনিই উভধর্মী বা common ; কখনও একে টেনে দীর্ঘায়ত করে উচ্চারণ করা যায়, আবার কখনও একে ঠেসে হ্রস্ব আকারেও উচ্চারণ করা যায়। আমরা সর্বদা যে ভাষায় কথা বলি তাতেও ভাবপ্রকাশের স্থবিধা অনুসারে আমরা যুগ্মধ্বনিকে কখনও দীর্ঘ কখনও হ্রস্ব রূপে উচ্চারণ করে থাকি। যুগ্ম-ধ্বনিকে টেনে দীর্ঘায়ত করে আমরা যে উচ্চারণ করি আমি তাকে বলব যুগ্ম-ধ্বনির 'বিশ্লিষ্ট' উচ্চারণ, আর তাকে ঠেসে হ্রস্ব করে যে উচ্চারণ করি তাকে বলব 'সংশ্লিষ্ট' উচ্চারণ। যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বত্রই 'সংশ্লিষ্ট' অর্থাৎ হ্রস্ব রূপে উচ্চারিত হয় তাকেই আমি বলি স্বরবৃত্ত ছন্দ। কেননা এ ছন্দের unit হচ্ছে স্বর বা সিলেব্‌ল ; আর এ ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট বা হ্রস্ব বলেই এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকেও অযুগ্মধ্বনিরই মতো এক unit বলে গণনা করা যায়। যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বত্রই 'বিশ্লিষ্ট' অর্থাৎ দীর্ঘায়ত রূপে উচ্চারিত হয় তাকেই বলেছি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। কেননা এ ছন্দের unit হচ্ছে মাত্রা বা mora ; আর এ ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট বা দীর্ঘ বলেই যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে, অযুগ্মধ্বনি এক মাত্রা বলেই গণ্য হয়। যে ছন্দকে আমি স্বরমাত্রিক নাম দিয়েছি সে ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে দীর্ঘ-হ্রস্ব দুরকমেই উচ্চারণ করা যায়; অর্থাৎ এ ছন্দে সমস্ত যুগ্মধ্বনিকেই ইচ্ছে হলে বিশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারণ করা যায়, আবার ইচ্ছে হলে সংশ্লিষ্ট রূপেও উচ্চারণ করা যায়। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

| | | | | | | | . | | | | | | |

নিত্য নূতন | ছন্দ রচি' | তোমায় আমি | করব দান

এটি চতুঃস্বর-পর্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। বলা বাহুল্য আমরা এ ছন্দটি পড়ার সময় যুগ্মধ্বনিগুলিকে স্বভাবতঃই সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে থাকি। এ পংক্তিটিকেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রূপান্তরিত করা যাক।—

‖ | | ‖ ‖ | | | | | ‖ | | | | | | | |

নিত্য নূতন | ছন্দ রচিয়া | তোমায় আমরা | করিব দান

এটি হচ্ছে ষণ্মাত্র-পর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। এই পংক্তিটিকে আবৃত্তি করলেই দেখা যাবে যে আমরা স্বভাবতঃই এ ছন্দের যুগ্মধ্বনিগুলিকে টেনে দীর্ঘ করে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে থাকি; তাই এ ছন্দে অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি অনায়াসে দুই মাত্রার (mora-র) মর্যাদা পেয়ে থাকে। এবার একটা স্বরমাত্রিক ছন্দের পংক্তি উদ্ধৃত করছি।—

বিহঙ্গ-গান | শান্ত এখন | স্তব্ধ রাতের | পক্ষ-ছায়ে

—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা কি ছন্দ? যুগ্মধ্বনিগুলিকে সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে এ পংক্তিটিকে আমরা স্বরবৃত্তের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতে পারি। তা হলে এটি হবে চতুঃস্বর-পর্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ। আবার যুগ্মধ্বনিগুলিকে টেনে দীর্ঘ বা বিশ্লিষ্ট (অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক) করে মাত্রাবৃত্তের ভঙ্গিতেও এ পংক্তিটিকে আবৃত্তি করা যায়। যেমন—

| ‖ | ‖ ‖ | | | ‖ ‖ | | ‖ ‖ | | |

বিহঙ্গ-গান | শান্ত তখন | স্তব্ধ রাতের | পক্ষ-ছায়ে

এ ভাবে আবৃত্তি করলে এটিকে বলব ষণ্মাত্র-পর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যে-সব ছন্দকে এ ভাবে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট) দুই ভঙ্গিতেই আবৃত্তি করা যায় সে-সব ছন্দকেই আমি স্বর-মাত্রিক ছন্দ নাম দিয়েছি। এই পংক্তিটি হচ্ছে চতুঃস্বর-ষণ্মাত্র-পর্বিক স্বর-মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত।

এবার একটি যৌগিক ছন্দের বিশ্লেষণ করা যাক।—

| | ‖ | | | | ‖ | | | | | | ‖

মানবের | জীর্ণ বাক্যে ‖ মোর ছন্দ | দিবে নব | সুর

—ভাষা ও ছন্দ, কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিটি বাঙালি পাঠক স্বভাবতঃই যে ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে তার প্রতি লক্ষ করলেই দেখতে পাব যে, এ ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট আর শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট ; কাজেই শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি এক unit বলে গণ্য হয়েছে আর শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি দুই unit-এর মর্যাদা পেয়েছে। এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের সাধারণ রীতি ; আর এজন্যেই এ ছন্দকে নাম দিয়েছি যৌগিক ছন্দ। বাংলায় ব্যঞ্জনসংহতিকে সাধারণতঃ যুক্তবর্ণের সাহায্যেই লেখা হয়ে থাকে। ওই যুক্তবর্ণকে যদি বিযুক্ত করে লেখা যায় তা হলেই যৌগিক ছন্দের এই সাধারণ রীতিটি আরও স্পষ্ট হবে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

| | | | | | ‖ | | | | | |
সুরাঙ্ গণা নন্দনের্ ‖   নিকুঞ্ জ প্রাঙ্ গণে

| ‖ | | | | | | ‖ | | |
মন্দার্ মঞ্ জরী তোলে ‖ চঞ্ চল্ কঙ্ কণে।

—'পরিচয়' ১৩৩৮ মাঘ, রবীন্দ্রনাথ

এখানে যুক্তবর্ণগুলিকে বিযুক্ত করে লেখা হয়েছে অর্থাৎ যুগ্মধ্বনিগুলিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। আমরা এ পংক্তিদুটিকে স্বভাবতঃই যে ভাবে আবৃত্তি করি তার প্রতি লক্ষ রাখলেই দেখা যাবে যে এখানে শব্দপ্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনিগুলির (যথা— নের্, দার্, চল্) উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট ও কাজেই দ্বিব্যষ্টিক ; আর শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি-গুলির (যথা—রাঙ্, নন্, কুঞ্, প্রাঙ্ ইত্যাদি) উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট ও একব্যষ্টিক।

৪

যৌগিক ছন্দের এই নিয়মটি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশেষভাবে অনুভব করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যেই আছে। তিনি লিখেছেন 'বাংলায় হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণ জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি।··· বাংলা ছন্দে প্রাক্-হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি দেওয়া হয়েছে' (বিচিত্রা, পৌষ)। এ নিয়মটির কথাই তো আমি বলছি। আমি শুধু এটুকু যোগ করতে চাই যে, এ নিয়মটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সর্বত্রই খাটে বটে কিন্তু যৌগিক ছন্দে এ নিয়মটি শুধু শব্দ-

প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির পক্ষেই খাটে, শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির পক্ষে খাটে না। যেমন

॥ ॥
কঙ্কণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এ শব্দটির উচ্চারণ হবে এরূপ—কঙ্ কণ্ এবং শব্দটিকে চার unit বলে গণনা করা হবে; কারণ এখানে দুটি যুগ্মধ্বনির প্রত্যেকটিরই উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট এবং কাজেই দ্বিমাত্রিক। দৃষ্টান্ত—

॥ । । ॥ । । । । ॥ ॥ ॥ ॥ । ।
বন্ধ দুয়ার | খুলেছ আমার | কঙ্কণ-ঝঙ্ | কারে

—লীলাসঙ্গিনী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু যৌগিক ছন্দে 'কঙ্কণ' কথাটির উচ্চারণ হবে এরূপ—

। ॥
কঙ্ কণ্ অর্থাৎ এ ছন্দে এ শব্দের প্রথম উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট আর কাজেই তার মূল্য এক unit; কিন্তু দ্বিতীয় যুগ্মধ্বনিটির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট, অতএব তার মূল্য দুই unit। অর্থাৎ যৌগিক ছন্দে 'কঙ্কণ' শব্দটি তিন unit-এর বেশি মূল্য পায় না। যথা—

। ॥ । ॥
পিত্তল-কঙ্কণ

। । ॥ । । । । । । ॥ ॥
পিতলের থালি পরে বাজে ঠন্ ঠন্।

—দিদি, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

লক্ষ করার বিষয় এ ছন্দে 'কঙ্কণ' শব্দটিতে তিন unit ধরা হয়েছে বটে, কিন্তু 'ঠন্ ঠন্' কথা দুটিতে ধরা হয়েছে চার unit। কারণ 'কঙ্কণ' একটি অখণ্ড শব্দ; তাই তার প্রথম যুগ্মধ্বনিটি উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট ও ধ্বনিমর্যাদায় এক unit; কিন্তু 'ঠন্ ঠন্' দুটি স্বতন্ত্র শব্দ বলে দুটি যুগ্মধ্বনিই উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট এবং ধ্বনিমর্যাদায় দুই unit। শব্দটা যদি হত 'ঠঠন্' তা হলে তার প্রথম যুগ্মধ্বনিটা সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে এক unit-এর বেশি মূল্য পেত না এবং সমগ্র শব্দটা 'কঙ্কণ' শব্দের মতোই সবসুদ্ধ তিন unit বলে গণ্য হত। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তিটাকে একটু পরিবর্তিত করে যদি লেখা হয় 'পিতলের থালি পরে বাজিছে ঠন্ ঠন্' তা হলেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

যৌগিক ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট হবার কারণ এই যে, ওই ছন্দটাই আসলে গদ্যধর্মী। গদ্যের মতো প্রত্যেকটি শব্দকেই স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করার প্রয়োজন ওই ছন্দের আছে। তাই ও ছন্দে ধ্বনির প্রবাহ একেবারে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয় না; এ ছন্দে ধ্বনিপ্রবাহ প্রত্যেকটি শব্দের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে চলে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেও আমার এই উক্তির সমর্থন পাই। তাঁর উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা করছি—

॥ ॥
মহাভারতের্ কথা ॥ অমৃত সমান্

॥ ॥ + ॥
কাশীরাম্ দাস্ কহে ॥ শুনে পুণ্যবান্।

এখানে তের্, মান্, রাম্, দাস্ এবং বান্ এই পাঁচটি যুগ্মধ্বনিরই বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ, কেননা এরা শব্দের অন্তে অবস্থিত আছে। এ ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করার প্রয়োজন এই যে, এ ছন্দে প্রত্যেক শব্দকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্ররূপে উচ্চারণ করতে হয়। এক শব্দকে অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চলে না। তাই কেউ 'মহাভারতের্কথা' কিংবা 'দাস্কহে' এভাবে আবৃত্তি

॥ ॥
করে না। বাঙালি বরাবর সহজেই 'মহাভারতের্ কথা' এবং 'দাস্ কহে' পড়ে এসেছে—অর্থাৎ 'তে'-র এ-কারকে এবং 'দা'-এর আ-কারকে টেনে দীর্ঘ করে, বিশ্লিষ্ট বা দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ করে, শব্দগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। এই হল এ ছন্দের অর্থাৎ যৌগিক ছন্দের একটি নিয়ম। তার দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে যে স্থলে এক শব্দকে অন্য শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করার প্রয়োজন থাকে না সে স্থলে (অর্থাৎ শব্দের মধ্যে) যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট হ্রস্ব উচ্চারণই হয়ে থাকে। যেমন, পুণ্যবান্। এখানে 'বান্' এই যুগ্মধ্বনিটা শব্দের

॥
অন্তে আছে বলে এর বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক—বান্—উচ্চারণ হচ্ছে। কিন্তু পুণ্ যুগ্মধ্বনিটা শব্দের অন্তে নয়, তাই তার সংশ্লিষ্ট বা সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ এবং তার মূল্যও এক unit। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাঙালি পাঠক 'পুণ্যবান্' কথাটার 'পুণ্যের' মাত্রা কমিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে নি (উত্তরা ১৩৩৮ আশ্বিন পৃ ৩১৫ দ্রষ্টব্য)। যৌগিক ছন্দে 'পুণ্যবান্' কথাটার প্রথম যুগ্মধ্বনিটাকে ('পুণ্'

-কে) আমরা ঠেসে সংশ্লিষ্ট বা সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করি, তাই তার ধ্বনিমূল্য এক unit ; আর দ্বিতীয় যুগ্মধ্বনিটাকে ('বান্'-কে) আমরা টেনে দীর্ঘ বা বিশ্লিষ্ট করে উচ্চারণ করি, তাই তার ধ্বনিমূল্য দুই unit। এইটেই এ ছন্দের রীতি ; আর এজন্যেই এ ছন্দকে যৌগিক ছন্দ নাম দিতে চাই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতভেদ আছে বলে আমি মনে করি নে।

স্বরবৃত্ত (syllabic) ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট আর মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট। যেমন—

।   ।   ।   ।

পুণ্যখাতায় | জমা শূন্য, | ভণ্ডামিতে | চারটি পোয়া

—বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মধুসূদন

এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ। এখানে 'পুণ্য' এবং 'শূন্য' উভয় শব্দেই যুগ্মধ্বনির (পুণ্ এবং শূন্) সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ। কিন্তু—

॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥

পুণ্যলোভীর। নাই হলো ভীড়। শূন্য তোমার। অঙ্গনে

এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। এখানে ওই দুটি যুগ্মধ্বনিরই বিশ্লিষ্ট বা দুই মাত্রার উচ্চারণ।

॥ ॥   । ॥

কাশীরাম দাস কহে ॥ শুনে পুণ্যবান্

এখানে পুণ্-এর উচ্চারণ এক unit-এর অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কিন্তু বান্-এর উচ্চারণ বিক্ষিপ্ত। অতএব এটি যৌগিক ছন্দ।

৫

যৌগিক ছন্দের এই রীতিটির কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে খুলে না বললেও এ বিষয়ে তাঁর মত ও আমার মতের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাঁর রচিত দৃষ্টান্তগুলিই উদ্ধৃত করছি—

(১) টোট্‌কা এই। মুষ্টিযোগ ॥ লট্‌কানের। ছাল,
সিট্‌কে মুখ। খাবি, জ্বর ॥ আট্‌কে যাবে। কাল।

(২) একটি কথা। শুনিবারে ॥ তিনটে রাত্রি। মাটি।
এর পরে। ঝগ্‌ড়া হবে, ॥ শেষে দাঁত ক-। পাটি।

(৩) একটি কথা। শোনো, মনে ॥ খটকা নাহি। রেখে,
টাট্‌কা মাছ। নাই জোটে ॥ সুট্‌কি দেখো। চেখে।

তিনি লিখেছেন এই 'তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুনতি করতে গেলে দৃশ্যতঃ পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায় কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাততঃ মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার কিন্তু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয় নি।' আমিও অবিকল এই কথা বলেছি। 'অক্ষর' গুনে কোনো ছন্দেরই পরিমাপ করা যায় না, কারণ 'ধ্বনিবিচারহীন 'অক্ষর'সংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হতে পারে না।' তাই উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তিনটিতে কোনো প্রকার 'যথেচ্ছাচার' হয়েছে বলে আমি মনে করিনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হিসাব' করলেই দেখা যাবে এই ছড়া তিনটিতে পয়ার ছন্দের 'নীতি' নষ্ট করা হয় নি, তার 'নির্দিষ্ট ধ্বনি' বেড়ে যায় নি। কিন্তু পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি এবং নীতি কি, আর কি ভাবে তার 'হিসাব' করতে হবে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নি।

এ ছন্দের নীতি, নির্দিষ্ট ধ্বনি এবং তার হিসাবপ্রণালী সম্বন্ধে আমি যে নিয়মের উল্লেখ করেছি, সে নিয়মটিকে এই দৃষ্টান্ত তিনটিতে প্রয়োগ করলেই দেখা যাবে যে এগুলিতে যৌগিক ছন্দের নিয়ম সর্বদাই অক্ষুণ্ণ আছে।—

(১) টোট্‌কা এই। মুষ্টিযোগ্‌॥ লট্‌কানের। ছাল্‌
সিট্‌কে মুখ। খাবি জ্বর॥ আট্‌কে যাবে। কাল।

(২) একটি কথা। শুনিবারে॥ তিনটে রাত্রি। মাটি।
এর্‌ পরে। ঝগ্‌ড়া হবে,। শেষে দাঁত্‌ক-। পাটি।

(৩) একটি কথা। শোনো, মনে॥ খট্‌কা নাহি। রেখে,
টাট্‌কা মাছ্‌। নাই্‌ জোটে॥ শুট্‌কি দেখো। চেখে।

লক্ষ করার বিষয় শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সর্বত্রই এক unit এবং শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্বত্রই দুই unit। এইটেই আমার কথিত যৌগিক ছন্দের নিয়ম। 'লট্‌কানের ছাল'—এখানে লট্‌ যুগ্মধ্বনিটা শব্দমধ্যবর্তী বলে তার উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত

এবং তার ধ্বনিমূল্য এক unit। কিন্তু 'নের' যুগ্মধ্বনিটার উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট নয়, কারণ আমরা 'লট্‌কানের্ছাল' এ রকম আবৃত্তি করি নি; তাই তার উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট এবং তার ধ্বনিমূল্য দুই unit। তেমনি 'মুষটি যোগ' কথাটার 'মুষ্' সংশ্লিষ্ট এবং এক unit আর 'যোগ' বিশ্লিষ্ট ও তাই দুই unit। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(৪) পাৎলা করি। কাটো প্রিয়ে ॥ কাৎলা মাছ্। টিরে
টাট্‌কা তেলে। ফেলে দাও ॥ শর্ষে আর। জিরে
ভেট্‌কি যদি। জোটে তাহে ॥ মাখো লঙ্কা। বাঁটা
যত্ন করে। বেছে ফেলো ॥ টুক্‌রো যত। কাঁটা।

(৫) আই্‌ডিয়াল্। নিয়ে থাকে ॥ নাহি চড়ে। হাঁড়ি
প্রাক্‌টিক্যাল্। লোকে বলে ॥ এ যে বাড়া-। বাড়ি।
শিবনেত্র। হোলো বুঝি ॥ এই্‌বার্। মোলো
অক্‌সিজেন্। নাকে দিয়ে ॥ চাঙ্গা করে। তোলো।

(৬) কর্ণে দিলা। ঝুম্‌কা ফুল্ ॥ নাসিকায়্ নথ্।
অঙ্গ-সজ্জা। সমাধানে ॥ ভূরি মেহন্-। নৎ।

যৌগিক ছন্দের যে 'নীতি' এবং তার নির্দিষ্ট ধ্বনির যে হিসাবের কথা আমি বলেছি তাতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ নিখুঁত আছে। ওই হিসাবে সবগুলি দৃষ্টান্তেরই প্রতি পংক্তি পর্বে চারটি unit বা ধ্বনিব্যাষ্টি আছে। সুতরাং বলতে পারি যে এ দৃষ্টান্তগুলি চতুর্ব্যাষ্টিপর্বিক যৌগিক ছন্দে রচিত হয়েছে। উক্ত

'হিসাব' ছাড়া অন্য কোনো হিসাবেই এ ছন্দের ধ্বনির পরিমাপ করা যাবে না বলেই আমি মনে করি। এই হিসাব ছাড়া আর কোন্ হিসাবে আইডিয়াল, প্র্যাক্‌টিক্যাল্, অক্‌সিজেন্, ঝুম্‌কা ফুল প্রভৃতি শব্দে চার unit গণনা করা যাবে ?

৬

এবার যৌগিক ছন্দের ওই নিয়মটির ব্যতিক্রমগুলির বিচার করা যাক। উদ্ধৃত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'তিনটে রাত্রি। মাটি' না লিখে যদি লেখা হত 'তিনটে রাত। মাটি' তাহলেও ওই নিয়ম অনুসারেই ছন্দ ঠিক থাকত, কেননা তখন 'রাত' এই যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দুই মাত্রার উচ্চারণ হত। কিন্তু চতুর্থ দৃষ্টান্তের 'মাছ্‌টি' শব্দের ধ্বনিবিচার কি ভাবে করা যাবে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

পাৎলা করি। কাটো প্রিয়ে ॥ কাৎলা মাছ-। টিরে

এখানে যৌগিক ছন্দের নিয়ম অব্যাহতই আছে, কেননা 'মাছ্' এই যুগ্মধ্বনিটাতে দুই মাত্রা রয়েছে। আমি যদি এই পংক্তিটাকে একটু পরিবর্তিত করে লিখি—

পাৎলা করি। কাৎলা মাছ্‌টি ॥ কাটো দেখি। প্রিয়ে

তাহলেও যৌগিক ছন্দের নীতি নষ্ট হবে না। তখন 'মাছ্' এই যুগ্মধ্বনিটা উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট ও ধ্বনিমর্যাদায় একব্যষ্টিক বলে গণ্য হবে। মাঘের 'বিচিত্রা'য় আমি লিখেছিলুম

॥

'একটু ন'ড়োনা কেউ ॥ রায়েদের লাঠিয়াল কই'

এটাও যৌগিক ছন্দ। এখানে 'এক' ধ্বনিটাতে দুই মাত্রা। যদি একটু পরিবর্তিত করে লেখা যায়—

।

একটুও ন'ড়োনা কেউ

তাহলে 'এক' শব্দটার ধ্বনিমর্যাদা কমে যাবে। অথচ ছন্দের নীতি ঠিকই থাকবে। এটা কি করে হতে পারে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার আশ্বিনের 'উত্তরা'য় সে প্রশ্ন তুলেছেন। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উত্তর হচ্ছে এই যে, 'বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে'। এই নিয়ম

অনুসারে 'কাৎলা মাছটিরে' এখানে 'মাছ' ধ্বনিটাকে 'টেনে' বাড়ানো অর্থাৎ দ্বিব্যষ্টিক করা হয়েছে। আবার 'কাৎলা মাছটি' এখানে 'মাছ' ধ্বনিটাকে 'ঠেসে' দিয়ে তার মাত্রা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনি 'এক্‌টু নড়োনা কেউ' এখানে 'এক্‌' ধ্বনিটাকে টেনে (অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে) বাড়ানো হয়েছে, তাই এখানে দুমাত্রা। আবার 'একটুও নড়োনা কেউ' এখানে 'এক' ধ্বনিটাকে ঠেসে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে) কমানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথিত এই নিয়মটির সত্যতা সম্বন্ধে কারও সংশয় থাকতে পারে না। বাংলা যুগ্মধ্বনির এই স্থিতিস্থাপকতার কথা আমি বহুবার বলেছি।

কিন্তু তথাপি একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে যৌগিক ছন্দে কি সর্বত্রই সমস্ত যুগ্মধ্বনিকেই নির্বিচারে টেনে বাড়ানো এবং ঠেসে কমানো যায়? আমার বিশ্বাস তা যায় না। এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে টেনে বাড়ানো এবং ঠেসে কমানোর একটি বিশেষ নিয়ম আছে। সেটি হচ্ছে এই। শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে সর্বদাই টেনে বাড়ানো হয়, কখনোই ঠেসে কমানো যায় না। আবার শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিকে অধিকাংশ স্থলেই ঠেসে কমানো হয়ে থাকে; তবে ক্বচিৎ কখনও কখনও টেনে বাড়ানোও যায়। যেমন 'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান' এখানে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে (রাম্‌, দাস্‌ এবং বান্‌) টেনে বাড়ানোই হয়েছে আর শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি 'পুণ্‌'কে ঠেসে কমানোই হয়েছে। এইটেই এ ছন্দের সাধারণ রীতি।

শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিকে কোথায় কোথায় টেনে বাড়ানো যায়, সেইটেই আসল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর এই। (১) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে কখনও টেনে বাড়ানো হয় না। (২) সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রথম পদের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে বাড়ানো কমানো যায়। (৩) অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে টেনে বাড়ানো কিংবা ঠেসে কমানো যায়। (৪) অ-সংস্কৃত প্রত্যয় পরে থাকলে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে সাধারণতঃ টেনে বাড়ানোই হয় এবং ইচ্ছে করলে ঠেসে কমানোও যায়।

৭

দৃষ্টান্ত দিলেই এই নিয়ম চারটির সার্থকতা বোঝা যাবে। প্রথমেই চতুর্থ নিয়মটির আলোচনা করা যাক। এক, তিন, মাছ, এগুলি এক-একটি যুগ্মধ্বনিমূলক শব্দ। যৌগিক ছন্দে এগুলি সর্বদাই দুই মাত্রা বলেই গণ্য হয়।

কিন্তু এসব শব্দের পরে যদি টি, টে, টুকু, লা ইত্যাদি প্রত্যয় থাকে তবে এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে বিকল্পে ঠেসে কমিয়ে দেওয়া যায়। তাই 'একটু' 'মাছটি' 'দিনটা' প্রভৃতি শব্দকে যৌগিক ছন্দে তিন unit বলেও গণ্য করা যায়, আবার ইচ্ছে করলে দুই unit বলেও চালানো যায়। অর্থাৎ ছন্দরচয়িতা ইচ্ছে করলে 'এক্-টু' কথাটির 'এক' শব্দ এবং 'টু' প্রত্যয়কে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র রেখে সমগ্র কথাটিকে তিন unit বলে গণ্য করতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে তিনি 'একটু' কথাটিকে একটি অখণ্ড শব্দরূপে গণ্য করে তাকে দুই unit-এর মূল্য দিতে পারেন। এই অ-সংস্কৃত প্রত্যয়টি যদি একাধিক স্বর অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-বিশিষ্ট হয় তবে ওই প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী যুগ্মধ্বনিটিকে সাধারণতঃ ঠেসে কমানো হয় না। যথা—দিনগুলি। এখানে 'দিন্' এই যুগ্মধ্বনিটাকে টেনে বাড়িয়ে দুই unit-এর মর্যাদা দেওয়াই সাধারণ রীতি এবং 'দিনগুলি' শব্দটাতে সবসুদ্ধ চার unit ধরা হয়। কিন্তু যদি 'দিন' ধ্বনিটাকে ঠেসে কমিয়ে দেওয়াই অভিপ্রায় হয় তবে তাও করা যায় বলে আমার বিশ্বাস। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

॥

যৌবন-বেদনা-রসে ॥ উচ্ছল আমার দিনগুলি

—তপোভঙ্গ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিন' ধ্বনিটাকে টেনে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করে উচ্চারণ করা দরকার; তাই ওই ধ্বনিটার মূল্য দুই unit বা ব্যষ্টি। কিন্তু যদি আমি লিখি,—

দুঃখের দিনগুলি মোর ॥ গিয়াছে কাটিয়া

তাহলেও ছন্দের নীতি নষ্ট হবে বলে মনে করিনে। কিন্তু এখানে 'দিন' ধ্বনিটাকে ঠেসে ছোট করে উচ্চারণ করতে হবে।

এবার পূর্বোক্ত তৃতীয় নিয়মটির আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথের রচিত দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলেই বোঝাবার পক্ষে সুবিধে হবে—

(১) চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাক্‌রুণ।

(২) চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাক্‌রুণ মোর নাই কোনো দোষ।

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে 'চিমনি' শব্দের 'চিম্' যুগ্মধ্বনিতে এক unit এবং 'ঠাক্‌রুণ' শব্দের 'ঠাক' যুগ্মধ্বনিতে দুই unit। দ্বিতীয়টিতে 'চিম'কে বাড়িয়ে দুই unit

এবং 'ঠাক্'কে খর্ব করে এক unit করা হয়েছে। বাংলা যৌগিক ছন্দে অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এভাবে বাড়ানো কমানো যায়, এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে 'চিম্‌নি' শব্দে দুই unit এবং তিন unit ধরা, কোন্‌টা এ ছন্দের সাধারণ নিয়ম (rule) এবং কোন্‌টা ব্যতিক্রম (exception)? আমি বলি 'চিম্‌নি' শব্দে দুই unit এবং 'ঠাকরুণ' শব্দে তিন unit ধরাই এ ছন্দের 'সাধারণ' বিধি এবং ওই শব্দ দুটিতে যথাক্রমে তিন unit এবং চার unit ধরা এ ছন্দের পক্ষে 'বিশেষ' বিধি। অর্থাৎ যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে এক unit ধরাই সাধারণ রীতি এবং তাকে টেনে দীর্ঘ করে দুই unit ধরা বিশেষ রীতি। শুধু তাই নয়। পূর্বেই বলেছি যে, শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে টেনে দীর্ঘ বা আয়ত করা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং যৌগিক ছন্দের কোনো পর্বে যদি শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির আয়ত রূপ দেখতে পাই তবে বলব যে ওই পর্বটি মাত্রিক (quantitative) পদ্ধতিতে রচিত। ইংরেজি ছন্দে এরূপ ব্যতিক্রম প্রায়ই দেখা যায়। যেমন trochaic ছন্দে মাঝে মাঝে dactylic foot বা পর্ব দেখা যায়; iambic ছন্দে কখনও কখনও দুয়েকটা anapaestic foot-ও চালিয়ে দেওয়া যায়। তেমনি বাংলা যৌগিক ছন্দেও মধ্যে মধ্যে মাত্রিক পর্বের অদলবদল (equivalent substitute) চলে। পূর্বোক্ত প্রথম দৃষ্টান্তের 'নেই ঠাকরুণ' পদটিকে বলব যৌগিক ছন্দে মাত্রিক substitute। তেমনি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'চিম্‌নি ফেটেচে দেখে' পদটি মাত্রিক। যদি লেখা হয়—

চিম্‌নি ফেটেছে দেখে গিন্নি সরোষ

তাহলে বলব সমস্ত পংক্তিটাই মাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত অর্থাৎ quantitative ছন্দে রচিত হয়েছে।

কুস্তির আখড়ায় ভিস্তিকে ধরে
জল ছিটাইয়া দাও ধুলা যাক মরে।

এই পংক্তি দুটি আগাগোড়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটা পয়ার বটে; কিন্তু মাত্রাবৃত্ত পয়ার, যৌগিক পয়ার নয়। এর প্রতি পর্বে চার মাত্রা বা mora আছে।

রাস্তা দিয়ে | কুস্তিগির ‖ চলে ঘেঁষা | ঘেঁষি
এক্‌টা নয় | দুটো নয় ‖ এক-শোর | বেশি।

এটি যৌগিক পয়ার। কিন্তু—

খুব তার বোলচাল সাজ ফিট্‌ফাট,
তক্‌রার হ'লে আর নাই মিট্‌মাট্‌।
চষমায় চমকায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এটিকে কখনোই সাধারণ (অর্থাৎ যৌগিক) পয়ার বলা যায় না। একে পয়ারের 'ছিব্‌লেমি' বললেও চলবে না। এর আসল রূপ হচ্ছে মাত্রিক; অর্থাৎ quantitative পয়ার বললে এর আসল পরিচয় দেওয়া হয়। ধ্বনির পরিমাণ বা quantity-র মাপ রক্ষা করে এখানে সর্বত্রই যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার (moraর) মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এর প্রতি পর্বেই চার মাত্রা রয়েছে।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে, কথা যেন বন্যা ছোটে
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

এখানে 'কথা যেন বন্যা ছোটে' শুধু এই পদটিতে যৌগিক ছন্দের নীতি আছে; অন্য সর্বত্রই মাত্রিক প্রকৃতি অব্যাহত আছে। যদি লেখা হত 'কথার বন্যা ছোটে' তাহলে বলতুম এই পংক্তিকটি আগাগোড়া মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ছন্দেই রচিত।

নবারুণ চন্দনের তিলকে
দিক্‌ ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
ঊষা এলো সুপ্রভাতে
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

এটি হল খণ্ডিত যৌগিক পয়ার। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। একে যদি নিম্নলিখিত রূপে রূপান্তরিত করি—

নবারুণ-চন্দন-তিলকে
দিক্‌-ভাল এঁকে আজি দিল কে।

বরণ-পাত্র হাতে
এলো কে সুপ্রভাতে,
জয়শাঁখ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

তাহলে একে বলব খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার ; এর যৌগিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। এ দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মধ্বনি সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক বলে গৃহীত হয়েছে। যদি যুগ্মধ্বনি একেবারে বর্জন করা যায় তাহলে এ ছন্দের রূপ হবে এরকম—

অধীর বাতাস এলো সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিনশেষে দেখি চেয়ে
ঝরা ফুল মাটি ছেয়ে
লতাকে কাঙাল করে ঠকালে।

এটিকেও খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার বলাই সংগত।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক। পূর্বোক্ত চারটি নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে এই—সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রথম পদের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে বাড়ানো কমানো যায়। দৃষ্টান্ত দিলেই এ বিষয়ে সংশয় থাকবে না। যথা—

(১) সেই নির্ঝরিণী ধারা রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
'দিগ্‌দিগন্তে' প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।

—পরিচয়, মাঘ, রবীন্দ্রনাথ

(২) নবারুণ চন্দনের তিলকে
'দিক্‌-ললাটে' এঁকে আজি দিল কে।

—ঐ

(৩) উদয় 'দিক্‌প্রান্ত'-তলে নেমে এসে

—পঁচিশে বৈশাখ, পুরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই তিনটি দৃষ্টান্তেই 'দিক্‌' এই যুগ্মধ্বনিটার উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত, তাই তার মূল্য এক unit মাত্র। কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে 'দিক' ধ্বনিটার উচ্চারণরূপ বিশ্লিষ্ট ও আয়ত এবং তার মূল্যও দুই unit—

(১) কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে 'দিক্‌-দিগন্তর'
করি অন্তরাল

—বর্ষশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

(২) কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে
ওগো 'দিক্‌ভ্রান্ত' পান্থ তৃষার্থ নয়ানে
লুব্ধ বেগে !

—মরীচিকা, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

(৩) ইংলণ্ডের 'দিক্‌প্রান্ত' পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে।

—৩৯, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(৪) চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
'দিক্‌প্রান্তে' নামে অন্ধকার।

—নববধূ, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

(৫) 'দিক্‌প্রান্তে' তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

—প্রত্যাগত, ঐ

'দিক্‌চক্র' 'দিগ্‌গজ' প্রভৃতি অন্যান্য শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। কিন্তু দিগ্‌বধূ, দিগ্‌বলয়, প্রাক্তন প্রভৃতি যে সব সমাসবদ্ধ শব্দে প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে যায় সে সব শব্দের প্রথম পদের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিটিকে যৌগিক ছন্দে কখনও টেনে বাড়িয়ে দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া হয় না। যথা—

(১) জন্ম-মরণের
'দিগ্‌বলয়'-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়ে'ছিল ঘের।

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(২) পশ্চিম 'দিগ্‌বধূ' দেখে সোনার স্বপন

—পরশপাথর, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

সমাসবদ্ধ শব্দের সংযোগস্থলস্থ যুগ্মধ্বনির বৈকল্পিক দীর্ঘহ্রস্বতার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন—

(১) জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।

—শাজাহান, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) হরিণের থর থর হৃৎপিণ্ড যেমন

—পদধ্বনি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(৩) ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী

—নববর্ষ, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(৪) আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে ক্ষণে

বেদনার রুদ্র দেবতা যে।

—উৎসবের দিন, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই চারটি দৃষ্টান্তেই 'মৃৎ' এবং 'হৃৎ' উচ্চারণের আকারে সংক্ষিপ্ত এবং ধ্বনিমর্যাদায় এক unit। কিন্তু—

(১) হৃৎপাত্রে রক্ত দিয়া লিখিতেছি অন্তহীন প্রেম-পত্র তার

—কালস্রোত, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

(২) আমাদেরি হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হবে জলন্ত শলাকা

—কোনো বন্ধুর প্রতি, ঐ

(৩) প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি, হৃৎ-পত্রে প্রেমের স্বাক্ষর

—মোহমুক্ত, ঐ

এই তিনটি দৃষ্টান্তেই 'হৃৎ' উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট এবং ধ্বনিমর্যাদায় দুই unit। তেমনি জগৎ-বিখ্যাত, তড়িৎ-চকিত, বিদ্যুৎ-দীপ্ত প্রভৃতি বহু শব্দেরই সংযোগস্থলস্থিত যুগ্মধ্বনিটিকে বিকল্পে দীর্ঘ-হ্রস্ব করা যায়। শুধু যে ব্যঞ্জনসন্ধির ফলেই এমন হয় তা নয়, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ-চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

—একাল ও সেকাল, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'তড়িৎ' কথাটিতে তিন unit। কিন্তু—

তব ভাল উদ্‌ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি,

—শিবাজীউৎসব, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'তড়িৎপ্রভা' শব্দের 'তড়িৎ' দুই unit-এর বেশি মূল্য পায় নি। যদি লেখা হত 'তড়িৎপ্রভায়' তাহলেও অর্থাৎ 'তড়িৎ'কে তিন unit-এর মর্যাদা দিলেও খারাপ শোনাত না। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

আঁকি দিল দিগ্-দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুৎবহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা।

—শিবাজীউৎসব, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিগ্‌দিগন্তে' শব্দের প্রথম পদান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিটির মূল্য এক unit বটে; কিন্তু 'বিদ্যুৎবহ্নি' শব্দের প্রথম পদান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে দুই unit-এর মূল্য দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে

—তপোভঙ্গ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানেও 'বিদ্যুৎ' শব্দে তিন unit। যদি লেখা যায়—

বিদ্যুদ্‌বহ্নি সর্পসম হানে ফণা যুগান্তের মেঘে

অর্থাৎ যদি 'বিদ্যুদ্' শব্দের শেষ যুগ্মধ্বনিটিকে সংশ্লিষ্ট করে তার ধ্বনিমর্যাদা এক unit কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও ছন্দের নীতি নষ্ট হবে না।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত সাথী।

—বর্ষশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

যদি 'বিদ্যুৎ' শব্দের অন্তিম যুগ্মধ্বনিটির মাত্রাসংকোচ করে লেখা যায় 'বিদ্যুদ্দীর্ণ মহাশূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়' তাহলেও যৌগিক ছন্দের রীতি লঙ্ঘিত হত না। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আশা করি সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথমপদান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির বৈকল্পিকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই। অতএব বাগ্‌দত্তা, বাগ্‌দেবতা, বাগ্‌বিতণ্ডা, হৃৎপদ্ম, হৃদ্‌বৃন্ত, ক্ষুৎপিপাসা, প্রাঙ্‌মুখী, পরাঙ্‌মুখ প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দের সংযোগস্থলের যুগ্মধ্বনিকে যে বিকল্পে প্রসারিত ও সংকুচিত করা যাবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ কথা বলা প্রয়োজন যে ও-সব শব্দের যুগ্মধ্বনিকে সংকুচিত করাই যৌগিক ছন্দের সাধারণ বিধি, বিশেষতঃ সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথম পদটি যদি একস্বরাত্মক (monosyllabic) হয়; আর ও-রকম যুগ্মধ্বনিকে প্রসারিত করা হচ্ছে যৌগিক ছন্দের বিশেষ বিধি। তবে সমাসের প্রথম পদটি যদি একাধিক স্বর বা সিলেব্‌ল্-বিশিষ্ট হয় (যথা—বিদ্যুৎ, তড়িৎ, শরৎ ইত্যাদি) তাহলে বিশেষ বিধি অনুসারে ওই ধ্বনিটিকে প্রসারিত করলেই অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়।

৯

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই কথাটা লক্ষ করবার বিষয় যে হসন্তবর্ণের (পূর্ববর্তী স্বরের) হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছে রে।

এ ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতঃই খণ্ড ত-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে।' আবার যেমনি

পাৎলা করি কাৎলা মাছটি কাটো দেখি প্রিয়ে

এই পংক্তিটি সামনে ধরা, 'অমনি প্রাক্‌-হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না।' তাঁর এ কথা খুবই সত্য; কারণ ছন্দের ঝোঁকই পাঠককে ঠিক পথে চালনা করে। এ বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্বে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

টুন্‌টুনি কহিলেন—রে ময়ূর তোকে
দেখে করুণায় মোর জল আসে চোখে।

—ভার, কণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'টুন্‌'-এর উ-কারকে টেনে প্রসারিত করা হয়েছে। যদি লেখা হয়—

টুন্‌টুনি কহেন ডাকি,—রে ময়ূর তোকে

তাহলে 'টুন্‌'-এর উ-কারকে ঠেসে সংকুচিত করতেও কোনো বাধা নেই। দ্বিতীয়

মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—'হিং টিং ছট!'

—হিং টিং ছট, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'উৎ'-এর উ-কে ঠেসে সংকুচিত করা হয়েছে। তাকে টেনে দীর্ঘ করতেও বাধা নেই। যথা—

মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উৎকট

আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কেননা ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা পাশে?

—সবলা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

কুরুচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভৎর্সনা।

—কুরুচি, বনবাণী, রবীন্দ্রনাথ

যে আলোক আলগোছে ঘুমের ঘোমটাটুকু
তুলি নিয়ে যায়

—অমিতার প্রেম, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

এখানে 'বলগা' শব্দের যুগ্মধ্বনিটা সংশ্লিষ্ট, কিন্তু 'কুরুচি' 'আলগোছে' এবং 'ঘোমটা' শব্দের যুগ্মধ্বনিগুলি বিশ্লিষ্ট; পাঠকরা তাই স্বতঃই ছন্দের ঝোঁকে প্রাক্-হসন্ত স্বরগুলিকে টেনে দীর্ঘ করে পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পয়ারে (অর্থাৎ যৌগিক পয়ারে) 'একটি' শব্দকে তিন মাত্রার মর্যাদা যদি দাও তবে ওর হসন্ত হরণ করে অত্যাচারের দ্বারাই সেটা সম্ভব হয়।' অর্থাৎ যৌগিক বা সাধারণ পয়ারে 'একৃটি' শব্দকে 'দ্বৈমাত্রিক বলে ধরতেই হবে' (উত্তরা, আশ্বিন, পৃ ৩১৭)। কিন্তু মাঘের 'পরিচয়ে' তিনি নিজেই দেখিয়েছেন যে 'একৃটি' শব্দের হসন্ত হরণ না করেও বিনা অত্যাচারেই কেবলমাত্র ক-এর পূর্ববর্তী এ-কারকে টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করেই 'একৃটি' শব্দকে তিন মাত্রার মর্যাদা দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের এই দুই উক্তি থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যৌগিক ছন্দে অর্থাৎ সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে এক unit ধরাই এ ছন্দের 'সাধারণ' রীতি; তবে অবস্থাবিশেষে তাকে বিশ্লিষ্ট করে দুই unit-এর মর্যাদা দেওয়াও চলে। আর এজন্যেই 'একৃটি কথা এতবার হয় কলুষিত', 'একৃটি কথা শুনিবারে তিনৃটে রাত্রি মাটি' প্রভৃতি পদে 'একৃটি' শব্দে দুই unit ধরা হয়, অথচ 'একৃটি কথার লাগি তিনৃটি রজনী জাগি' কিংবা

কেবল একৃটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ

—শাজাহান, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

প্রভৃতি পদে 'একৃটি' শব্দে তিন unit ধরতেও আপত্তি নেই।

ইচ্ছা করে অবিরত
আপনার মনোমতো
গল্প লিখি একেকটি করে।

—বর্ষাযাপন, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'একেকৃটি' শব্দে চার ব্যষ্টি ধরা হয়েছে। যৌগিক ছন্দের সাধারণ বিধি অনুসারে এ শব্দটিতে তিন ব্যষ্টিও ধরা যেত। এ শব্দটি এখানে 'কেবলমাত্র অক্ষরগণনার দোহাই দিয়ে মান বাঁচিয়েচে' আমি এ কথা বলতে চাইনে। কিন্তু এ শব্দটিকে 'যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তাহলেই এ ছন্দের সাধারণ বিধি অনুসারে ধ্বনির কম্‌তি ধরা পড়ত' এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরও বলব যে এখানে পাঠক স্বভাবতঃই দ্বিতীয় এ-কারটিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করে ওই 'ধ্বনির কম্‌তি'টা পূরণ করে দেবে। অর্থাৎ ওই পদটা এই ছন্দের নিজের জোরে যতটা মর্যাদা দাবি করতে পারে তা তিন unit-এর বেশি নয়; পাঠক আর এক unit যোগ করে দিলে তবে সে চার unit এর মর্যাদা পাবে। এখানেই বলা যায়, 'ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে' (বাংলা ছন্দ; সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৯৫)। অবশ্য এ কথাও বলা দরকার যে, ওই বাইরের সুরটাকে আত্মসাৎ করার একটা ক্ষমতা আমাদের ভাষার আছে। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকত তবে বাইরে থেকে সুর যোজনা করলেও ছন্দ ঠিক থাকত না, কারণ তা অস্বাভাবিক হত। যা হক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে 'একেকৃটি' শব্দটাকে যৌগিক ছন্দে তিন unit বলেও গণ্য করা যায়, চার unit বলেও গণ্য করা যায়।

দিতেছি ভাসায়ে চির-প্রবাহিণী তটিনীর নীরে
এক-একটি ক'রে মোর দিনরাত্রিগুলি
সুগন্ধ, সুন্দরতনু এক-একটি সম্পূর্ণ পুষ্পসম।

—কালস্রোত, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

এখানে প্রথম 'এক-একটি'তে চার unit। এ শব্দটির ধ্বনিরূপ হচ্ছে 'একেকৃটি' অর্থাৎ দ্বিতীয় এ-কারটির উচ্চারণ দীর্ঘ বা বিলম্বিত। দ্বিতীয় 'এক-একটি'তে তিন unit (এটিকে টেনে দীর্ঘ করে পাঁচ unit-এ পরিণত করা সংগত হবে না); এটির প্রকৃত ধ্বনিরূপ হচ্ছে 'একেকৃটি' অর্থাৎ এর দ্বিতীয় এ-কারটি দীর্ঘ নয়। এ দৃষ্টান্তটিতে একই শব্দকে দুই জায়গায় দুই রকম মর্যাদা দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না সে বিচার আমি করতে চাইনে।

১০

যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার সমস্ত আলোচনার সারমর্ম এই। (১) এ-ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি 'সর্বদাই' বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈব্যাষ্টিক; (২) শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি 'সাধারণতঃ' সংশ্লিষ্ট ও একব্যাষ্টিক; (৩) সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের এবং সমস্ত অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিটি বিকল্পে দীর্ঘ বা দ্বৈব্যাষ্টিক হয়; (৪) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিটিকে টেনে দীর্ঘ না করাই এ-ছন্দের রীতি এবং (৫) 'অক্ষর'সংখ্যার দ্বারা এ-ছন্দের পরিমাপ করা অবৈজ্ঞানিক সুতরাং অবিধেয়।—

অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুন্ঠিত

—লগ্ন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দৃশ্যতঃ 'অক্ষর'সংখ্যা বেড়ে গেছে, অথচ ছন্দ ঠিকই আছে। আবার আমি যদি কালিদাসের প্রতিধ্বনি করে বলি—

বিষবৃক্ষ নিজে রোপি 'স্বয়ং' ছেদন করা
নহে সমীচীন

তাহলে আমার উক্ত মত নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু 'অক্ষর'সংখ্যা কম হয়েছে বলে ছন্দ ঠিক নেই এ কথা বলা চলতে পারে না। আমার নজির দেখাচ্ছি—

(১) দিনেরে 'মাভৈঃ' বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।

—সমাপন, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(২) গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে 'দইয়ে'!
অম্বলের গন্ধে 'দৈ' জমিল আপনি!

—অম্বল-সম্বরা কাব্য, হসন্তিকা, সত্যেন্দ্রনাথ

(৩) 'বরং' প্রেমের ভাণ করিয়ো না—সেই হবে ভালো।

—প্রেমিক, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

যৌগিক ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক এবং শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি 'সাধারণতঃ' সংশ্লিষ্ট ও একব্যাষ্টিক। তাই উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে অপ্রগল্‌ভ = চার; দই্‌য়ে = দুই; আর স্বয়ং, বরং, মাভৈঃ = তিন; দৈ = দুই। (দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির মূলে আছে দৈএ এবং দই)।

এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'ঐ' এবং 'ওই' সম্বন্ধে আমার পূর্বোক্ত

সিদ্ধান্তটিকে পরিবর্তিত করে জানাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথ যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দেও ঐ এবং ওই-কে সমান মর্যাদাই দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। যথা—

(১) আমি কি চেয়েছি পায়ে ধ'রে
ওই তব আঁখি-তুলে-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে আসা-আসি
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চ'লে যাওয়া?

—নারীর উক্তি, মানসী

(২) নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।

—সৃষ্টির রহস্য, মহুয়া

(৩) ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

—বলাকা, বলাকা

(৪) উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী

(৫) নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।

—মিলন, মহুয়া

(৬) ঐ নামে একদিন ধন্য হলো দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

—বুদ্ধদেবের প্রতি, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ

প্রথম দুটি দৃষ্টান্তে যদি 'ওই' না লিখে 'ঐ' লেখা হত কিংবা শেষ চারটি দৃষ্টান্তে 'ঐ' না লিখে 'ওই' লেখা হত তাহলেও ছন্দ ঠিকই থাকত; কারণ 'অক্ষরের' মাপে ছন্দ রচিত হয় না এবং ধ্বনিমর্যাদায় 'ওই' এবং 'ঐ' সম্পূর্ণ সমান।

১১

পূর্বে বলেছি যৌগিক অর্থাৎ 'পয়ার-সম্প্রদায়ে'র ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট করে এক unit ধরাই ওই ছন্দের সাধারণ নিয়ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'নিয়মের বিকল্প চলে ; কেননা বাঙালির কান (এবং উচ্চারণরীতি) সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে।' অর্থাৎ শব্দমধ্যবর্তী হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী 'স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে।' আমার প্রশ্ন হচ্ছে যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির এই সংকোচন-প্রসারণ-ক্ষমতার অর্থাৎ তার স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্র কতখানি অর্থাৎ সমস্ত শব্দেরই মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে বাড়ানো-কমানো যায় কি না। যেমন—

দেশময় রটিয়া গেছে তব নামে কলঙ্ক-কাহিনী

কিংবা ঘরছাড়া করিয়া দাও লক্ষ্মীছাড়াদেরে

ইত্যাদি রকমের পংক্তি আমি রচনা করতে পারি কি না। অর্থাৎ 'দেশময়' 'ঘরছাড়া' প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির এতখানি সংকোচন বাঙালির কান মঞ্জুর করবে কি না তাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। পক্ষান্তরে—

মদির যৌবন-রস করিয়া নিঃশেষ

এখানে যৌগিক ছন্দের সাধারণ রীতি অনুসারেই 'যৌবন'-এর ঐ-কে সংকুচিত এবং 'মদির'-এর ই-কে প্রসারিত করা হয়েছে, কারণ 'ঐ' শব্দমধ্যবর্তী এবং 'ই' শব্দান্তবর্তী। কিন্তু আমি যদি লিখি—

স্নিগ্ধ যৌবন-সুধা করিয়া নিঃশেষ

তাহলে 'স্নিগ্ধ' শব্দের ই-কারের সম্প্রসারণ বাঙালির কান মঞ্জুর করবে কি? না, 'স্নিগ্ধ'কে 'সুস্নিগ্ধ' করতে বাধ্য করা হবে?

চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাকৃরুণ মোর নাই কোনো দোষ।

এখানে 'চিম্'-কে দীর্ঘ এবং 'ঠাক'-কে খর্ব করা হয়েছে। এই ছড়াটিতেই 'গৃহিণী'-কে 'গিন্নি' করা যায় কি? তা ছাড়া আমি যদি লিখি—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ সুশীতল

তাহলে ছন্দগত অপরাধ হবে কি? না, 'সুশীতল'কে 'শীতল' করে কিংবা 'নিম্নে' কে 'সুনিম্নে' করে সংশোধন করতে হবে?

আমার বিশ্বাস যৌগিক ছন্দে অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির প্রসারণ করা গেলেও খাঁটি সংস্কৃত (অ-সমাসবদ্ধ) শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে টেনে দীর্ঘ না করাই সংগত। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) "আহা আহা" 'চীৎকার' করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত ;
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হ'য়ে ধরিবারে ধায় !

—নিষ্ফল উপহার, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

(২) কবিদল 'চীৎকারিছে' জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি ।

—যুগান্তর, নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ

(৩) সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর 'বর্ষার' মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত ।

—বর্ষাযাপন, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

(৪) 'বর্ষা' এলায়েছে তার মেঘময় বেণী

—একাল ও সেকাল, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(৫) 'জ্যোৎস্না' ডালের ফাঁকে
হেথা 'আল্পনা' আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানো আপনার ।

—চামেলিবিতান, বনবাণী, রবীন্দ্রনাথ

(৬) 'জ্যোৎস্না'-রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে

—শাজাহান, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(৭) এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে 'কল্পনে' রঙ্গময়ি ।

—এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্তগুলিতে 'চীৎকার', 'বর্ষা' 'জ্যোৎস্না' শব্দের দু-রকম মূল্য দেওয়া হয়েছে ; তা ছাড়া 'কল্পনা' শব্দে তিন এবং 'আল্পনা' শব্দে চার ব্যাষ্টি ধরা হয়েছে । (জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃ ৭৭ দ্রষ্টব্য ।) যৌগিক ছন্দে বর্ষা, জ্যোৎস্না, কল্পনা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে দুই unit ধরা যায় কিনা,

এইটেই আমার জিজ্ঞাস্য। যদি কোনো কবিযশোলিপ্সু কল্পনা-প্রবণ উৎসাহী বালক রচনা করে—

নিবিড় বর্ষা-রাতে সুখ-স্বপ্ন-পথে
চলিনু প্রফুল্ল মনে কল্পনা-রথে

তাহলে গুরু মহাশয় তাকে পাস্-মার্ক দেবেন কি? আমি যদি লিখি—

যৌগিক ছন্দ রচি' পড়েছি সংকটে

তাহলে বোধ করি 'যউ্গিক ছন্দ রচি' কিংবা 'যৌগিক ছন্দ্ রচি' এভাবে পড়েও, অর্থাৎ বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রার বৈকল্পিক দীর্ঘতার দোহাই দিয়েও, সংকট থেকে ত্রাণ পাব না। আমাকে বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি সংশোধন করে বলতেই হবে—

রচিয়া যৌগিক ছন্দ এড়ানু সংকট। *

৩ ফাল্গুন, ১৩৩৮

* বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ

ছন্দ-বিচার

যে মূলতত্ত্বকে আশ্রয় করে আমি বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি সে তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখি এবং সে বিষয়ে তাঁর মত কি তা জানতে চাই। নানা কাজে ব্যস্ত ও ক্লান্ত থাকাতে দীর্ঘ পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা করা তাঁর পক্ষে বর্তমানে কষ্টকর হবে বলে তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লেখেন। দেখা যখন হল তখন প্রথমেই ব্যবস্থা হল কিঞ্চিৎ জলযোগের। কিন্তু জলযোগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে-সমস্ত কৌতুককর বিষয়ে কথোপকথনের সূত্রপাত করলেন তার তুলনায় রসনার তৃপ্তিটা হয়ে গেল গৌণ। যা হক, রসনার কার্য সমাপ্ত হবার পর ছন্দ আলোচনার ভূমিকা করে তিনি বললেন, 'কিছু খেয়ে তো একটু সুস্থ হয়েছ, এখন তর্ক করতে পারবে।' এই বলে তিনি নিজেই ছন্দের কথা উত্থাপন করে বললেন, 'পাঁচটা unit-কে দু-গুণ করে দশ unit হয় বটে; কিন্তু এক-একটা unit তো দিনুর মতো মোটাও হতে পারে আবার একজন রোগা মানুষের মতো সরুও হতে পারে। তেমনি সব ছন্দের unit-গুলো আকারে সমান নয়।' আমি বললুম, 'ধ্বনির unit-এর আকৃতি ও প্রকৃতির এই পার্থক্য অনুসারেই তো আমি বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে চাই।'

কবি বললেন, 'কিন্তু এক সময়ে সব unit-কেই সমান মূল্য দেওয়া হত; যুগ্ম অযুগ্ম ধ্বনির পার্থক্য স্বীকার করা হত না। কিন্তু তিন unit-এর ছন্দে, যাকে আমি বলেছি অসম ছন্দ, তাতে যুগ্মধ্বনিকে এক unit ধরলে ভারি খারাপ শোনায়। এইটে অনুভব করেই তখনকার দিনে কবিরা এ-জাতীয় ছন্দে যুক্ত অক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে চলতেন। যুক্ত অক্ষর সম্পূর্ণ বর্জন করে একটি

প্রবোধবাবুর এই প্রবন্ধটি আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত দেখিয়া প্রবন্ধটি অনুমোদিত করিয়াছেন। এবং পরিশেষে তাঁহার একটি নূতন মন্তব্য যোগ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে গত বৈশাখের 'বিচিত্রা'র ৫৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' দ্রষ্টব্য।

—'বিচিত্রা' সম্পাদক।

কবিতা রচনা করতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন ; মনে করতেন কবিতাটি খুব প্রাঞ্জল, সরল ও শ্রুতিমধুর হল। কবি বিহারীলালের কাছে আমার প্রথম শিক্ষা। তাঁর রচনাতেও যুক্তাক্ষর বড় কম। আমারও বাল্যকালের রচনায় যুক্তাক্ষর খুবই কম ; তবু মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়ে ছন্দকে বন্ধুর করে তুলেছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতেই তার নিদর্শন পাবে। তখনও আমি যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা বলে ধরতে আরম্ভ করি নি ; কারণ খারাপ শোনালেও তখনকার দিনে জবাবদিহি ছিল না। কিন্তু 'মানসী'র সময় থেকে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা বলে ধরতে শুরু করেছি।'

আমি বললুম, 'তখন থেকেই তো বাংলায় এক নতুন ধরনের ছন্দের সূচনা হল।'

কবি—এ জাতীয় ছন্দ আমিই যে প্রথম করলুম তা নয়।

আমি—বৈষ্ণব পদাবলীতেও অবশ্য ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন আছে। কিন্তু তার উচ্চারণ-ভঙ্গি তো ঠিক বাংলা নয়, সংস্কৃতপন্থী।

কবি—কেন, চণ্ডীদাসের ছ' মাত্রার ছন্দ তো বাংলা-উচ্চারণ অনুযায়ী। যথা—

চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।

যা হক, 'মানসী'র সময় থেকে আমি অসম মাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রার value দিয়ে আসছি এবং এখন বাংলা সাহিত্যে এই রীতিটাই চলে গেছে। আজকাল আর কোনো কবি অসম মাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে চালাতে সাহস করেন না, আর করলেও তাঁকে কেউ ক্ষমা করবে না। কিন্তু আমি নিজেও একটিমাত্র রচনায় এ রকম করেছি, যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি' আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি।

আমি বললুম—আবৃত্তির ভঙ্গির প্রতি লক্ষ রাখলে এ ছন্দটাকে সমর্থন করাও যেতে পারে।

কবি—তা যেতে পারে। কিন্তু তবু ওটা ঠিক হয় নি। ও-রকম না করলেই ভাল হত। বাস্তবিক ও-কবিতাটির জন্যে আমি একটু কুণ্ঠিত আছি। ও-রকম করার একটু কারণও আছে। যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা হিসেব করে ছন্দ

রচনা করলে ও-ছন্দে 'অনাথপিণ্ডদ' কথাটা ব্যবহার করা মুশকিল। তাই সমস্ত কবিতাটিতেই যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলেই চালিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু অসম মাত্রার আর কোনো ছন্দেই আমি যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে গণ্য করি নি।

তার পরে কবি সম মাত্রার ও অসম মাত্রার ছন্দের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, 'সম মাত্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে এ-ছন্দে দুই চার ছয় আট দশ প্রভৃতি দুয়ের multiple-এর পর ইচ্ছামতো যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এ-ছন্দের শক্তি। আর এজন্যেই এ-জাতীয় ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ (enjambement) চালানো সম্ভব হয়েছে। আঁজাঁবমাঁ শব্দের তুমি কি বাংলা করেছ ?

আমি বললুম—প্রবহমানতা।

কবি—যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায় সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমান পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ-ছন্দে অযুগ্মসংখ্যার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন। এটাকে অবশ্য এক রকম করে সমর্থনও করা যায়। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে এ-ছন্দে অযুগ্ম unit-এর পর যতি না দেওয়াই রীতি। আর এজন্যেই অসম মাত্রার ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ বা প্রবহমানতা আনা যায় না। যে ছন্দে তিনের পরে ভাগ যাকে আমি বলেছি অসম মাত্রার ছন্দ তাতে যেখানে সেখানে থামা যায় না, লাইনের মধ্যেও থামা যায় না, একেবারে লাইনের শেষে গিয়ে থামতে হয়। যেমন—

> একদিন দেব তরুণ তপন
>
> হেরিলেন সুরনদীর জলে
>
> অপরূপ এক কুমারী রতন
>
> খেলা করে নীল নলিনী দলে।

আমি বললুম—এ-জাতীয় ছন্দকেও তো সব সময় তিন তিন মাত্রায় ভাগ করা যায় না।

কবি—হাঁ, তা ঠিক, দুয়ের multiple না হলে থামবার জায়গা পাওয়া যায় না। এজন্যেই এসব ছন্দেও ছয় মাত্রার পরেই থামতে হয়।

আমি—ছয় মাত্রার পরেই যতি থাকে বলে আমি এ-ছন্দকে ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দ বলি।

কবি—লক্ষ করলেই দেখতে পাবে অসম সংখ্যার পর ধ্বনি থামতে পারে না। সেখানে একটা ভাগ থাকলেও ধ্বনিটা পরবর্তী বিভাগের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। যেমন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী—

এখানে 'পঞ্চশরে' কথাটার পরে যতিটা স্থায়ী হয় না।

তার পর প্রসঙ্গক্রমে তিনি accent-এর বিষয় উত্থাপন করে বললেন, 'ইংরেজি ভাষার একটা মস্ত গুণ এই যে ও-ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে; সেটা ও-ভাষার accent-এর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। শব্দগুলিকে এভাবে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলেই ইংরেজি ছন্দ এরূপ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড় শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না। এজন্য বাংলায় আমরা এক ঝোঁকে অনেকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে আবৃত্তি করে যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হয় না। অর্থবোধের জন্যে বিষয়টাকে আবার ফিরে পড়তে হয়। এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন—এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে তা দেখতে পাচ্ছ। অল্প বয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম পরবর্তী কালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করেছি।

তার পর কবিকে একটু ক্লান্ত দেখে বিদায় নিয়ে যাবার সময় তিনি রহস্য করে বললেন 'অন্য সময় আবার এসো। তখন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা যাবে।' সন্ধ্যার পর আবার যখন তাঁর কাছে গিয়ে বসলুম তখন তিনি সস্নেহে বললেন 'তোমার কি কি জিজ্ঞাস্য আছে বুঝিয়ে বল দেখি। তারপরে তোমার কথার উত্তরে যা বলবার আছে তা বলব।' তখন আমি আমার বক্তব্য বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে বুঝিয়ে বলতে লাগলুম। তিনি প্রসন্ন ধৈর্যের সঙ্গে মন দিয়ে আমার

সব কথা শুনলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর যা বক্তব্য তা খুব স্পষ্ট করে বোঝাতে লাগলেন। আমি বললুম 'কয়েকটি মূল তত্ত্বকে অবলম্বন করে বাংলা ছন্দের শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে আমি আপনার কাব্যের ছন্দোনির্ণয়ের কাজেই প্রবৃত্ত হয়েছি। এ-কাজে আমি দুটি প্রণালী অবলম্বন করতে চাই। প্রথমতঃ, 'মানসী' থেকে 'বনবাণী' পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগুলিকে একে একে ধরে তার প্রত্যেকটি কবিতার ছন্দের analytic বিচার করব এবং তার পর সব কবিতার ছন্দের analysis-এর উপর নির্ভর করে একটা synthetic আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে আপনার সব কবিতাকে আমি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করব। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।'

কবি বললেন—তুমি কি কি শ্রেণীতে ভাগ করতে চাও ?

আমি—আপনি যাকে বলেছেন সাধারণ 'পয়ারজাতীয়' ছন্দ, সেগুলির কথাই আমি বলছি। এ-ছন্দগুলির সাধারণতঃ অক্ষরসংখ্যার সাহায্যেই পরিচয় দেওয়া হয়—যেমন চোদ্দ অক্ষরের পয়ার, আঠারো অক্ষরের পয়ার। তাই প্রচলিত প্রথাকে একেবারে অগ্রাহ্য না করে আমি প্রথমে এগুলিকে বলেছিলুম 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ। কিন্তু আপনি বলেছেন যে আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো ছন্দ হতে পারে না। কারণ ছন্দ তো ধ্বনি নিয়ে কারবার করে, আর অক্ষর তো ধ্বনির চিহ্নমাত্র। আমিও বারবার ওই কথাই বলেছি। কাজেই 'চোদ্দ অক্ষরের পয়ার,' 'আঠারো অক্ষরের পয়ার' এ-রকম পরিচয়টা ঠিক নয়। এ-সব ছন্দে ধ্বনির পরিবেষণটা কি ভাবে ঘটে তাই দেখা দরকার। আমি এ-ছন্দের ধ্বনি-সন্নিবেশ-প্রণালীটাই দেখাতে চেষ্টা করেছি।

কবি—যদি 'চোদ্দ অক্ষরের পয়ার' না বল তবে কি বলবে ?

আমি—আমি বলি চোদ্দ unit বা ব্যষ্টির পয়ার। এই unit-গুলির হিসাব কি ভাবে করতে হবে আমি সেটাই দেখাতে চাই। অযুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই সমান, তাকে এক unit ধরা যায়। আর যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বদা সমান নয়। আপনিই দেখিয়েছেন যে, আমাদের সাধারণ কথাবার্তাতেও আমরা যুগ্মধ্বনিকে কখনও ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করি আবার কখনও টেনে বাড়িয়ে উচ্চারণ করি। যুগ্মধ্বনির সংক্ষিপ্ত উচ্চারণকে আমি বলি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ আর প্রসারিত উচ্চারণকে বলি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। যদি সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-

ধ্বনিকে এক unit এবং বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে দুই unit ধরা যায় তাহলে আমরা সাধারণ পয়ারেও ধ্বনি-সন্নিবেশের একটা নির্দিষ্ট প্রণালী পাই।

এ বিষয়ে কবির সমর্থন পেয়ে আমি একটু উৎসাহিত হয়ে বললুম, 'ওই নির্দিষ্ট প্রণালীটা হচ্ছে এই যে, সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দে প্রত্যেকটি শব্দকে গদ্যের মতো স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারণ করতে হয়, তাই প্রত্যেক শব্দকে পরবর্তী শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন। আর এজন্যেই আমরা এ-ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করি এবং কাজেই তার মূল্য দুই unit। কিন্তু শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সাধারণত বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করি না। কাজেই তার মূল্যও এক unit-এর বেশি নয়। আপনি বলেছেন যেখানে সেখানে যুগ্ম ধ্বনি থাকা সত্ত্বেও পয়ারের ভারসাম্য নষ্ট হয় না, এটা এ-ছন্দের একটা অসাধারণ গুণ। আপনার এ-কথা খুবই সত্য। আমার মনে হয় যুগ্মধ্বনিকে আমরা প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করি বলেই যেখানে সেখানে যুগ্মধ্বনি থাকা সত্ত্বেও এ-ছন্দের ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে থাকে। কবি দৃষ্টান্তের কথা বলতেই আমি বললুম—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

এখানে তের্, রাম্, দাস্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিকে আমরা টেনে পড়ে দুমাত্রার মর্যাদা দিয়ে থাকি, হসন্ত র্, ম্, স্‌কে তো এক-একটি অক্ষর বলে গোনা যায় না। পক্ষান্তরে 'পুণ্যের' পুণ্-কে আমরা ঠেসে উচ্চারণ করি। তাই ছন্দ ঠিক থাকে। মাঘের 'পরিচয়ে' আপনি পয়ারের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছেন—

টোট্‌কা একটি মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল

এখানে অক্ষরসংখ্যা বেশি হয়েছে বটে, কিন্তু শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট বলে এই লাইনটাতে চোদ্দ unit ঠিক আছে।

তার পর আমি আর-একটি দৃষ্টান্ত দিলুম—

দিনেরে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।

কবি নিজেই বললেন, এখানে 'ভৈঃ' ধ্বনিতে দুই unit এবং 'অন্ধকারের' অন্-এ এক unit হয়েছে।

আমি বললুম, এইটেই এ-ছন্দের নিয়ম। যদি এ-ছন্দে 'ভৈরব' শব্দটা ব্যবহার করা যায় তবে 'ভৈ'-কে এক unit বলেই ধরা হবে।

কবি একটু ভেবে বললেন—

ভৈরব রবে যবে শৃঙ্গ ফুকারে

এখানে তো ভৈ-তে দুই unitই ধরা হয়েছে।

আমি বললুম—এটাও পয়ারেরই লাইন বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির পয়ার। একে আমি বলি মাত্রাবৃত্ত পয়ার। কারণ এ-ছন্দে অবস্থান নির্বিশেষে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট।

এ কথার উত্তরে কবি শুধু বললেন—সে কথা ঠিক।

তারপর আমি বললুম,—'পরিচয়ে' আপনি দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে ইত্যাদি। যাতে 'চিম্‌নি' শব্দে একবার দুই unit এবং আর-একবার তিন unit ধরা হয়েছে। পয়ারজাতীয় ছন্দে 'চিম্‌নি' শব্দে কত unit ধরা সাধারণ নিয়ম?

কবি বললেন—ও তর্কটা কি ভাবে উঠেছিল তা তো তুমি জানো। নীরেন রায় লিখেছিল 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত।' মণ্টু প্রশ্ন তুলেছিল 'একটি'কে দুই ধরতে হবে না তিন ধরতে হবে? আমি এই উপলক্ষেই 'চিম্‌নি' শব্দটাকেও এনেছিলুম। পয়ারে 'চিম্‌নি' শব্দে দুই unit ধরাই সাধারণ নিয়ম; তবে তিন unitও ধরা যায় এ কথাটাই আমি বলতে চাই।

আমি বললুম—এ-জাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক এবং কোথাও সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হয় বলেই আমি এ-ছন্দকে 'যৌগিক ছন্দ' নাম দিতে চাই। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

কবি বললেন—তুমি এসব ছন্দকে 'যৌগিক' নাম দিতে পার। আমার আপত্তি নেই। নামে কিছু আসে যায় না। ছন্দের প্রকৃতি অনুসারে ভাগ করলেই হল।

আমি—যেসব ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দ্বৈমাত্রিক তাকে আমি বলি মাত্রাবৃত্ত।

কবি—এসব ছন্দকেই আমি বলেছি অসম বা তিন মাত্রার ছন্দ।

আমি—শুধু যে ত্রৈমাত্রিক ছন্দেই যুগ্মধ্বনির ডবল মূল্য হয় তা নয়; দ্বৈমাত্রিক ছন্দেও তা হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়', 'বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে', 'এনেছি বসন্তের অঞ্জলি

গন্ধের', 'বুঝিয়াছি এ-জীবন একেবারে মরু না' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়।

কবি—এগুলি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর ছন্দ বটে, চার মাত্রায় এক-একটি ভাগ হচ্ছে। তুমি তো জানই, 'মানসী'তে আমি প্রথম এ-রকম ছন্দ রচনার চেষ্টা করেছিলুম।

আমি—'মানসী'তে 'নিস্ফল উপহার' ও 'কবির প্রতি নিবেদন', এই দুটি কবিতায় তা দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দে দ্বৈমাত্রিক যুগ্মধ্বনি ব্যবহার করায় তা ভাল হল না। কিন্তু পরে চার-চার মাত্রায় ভাগ করাতে খুব সুন্দর মাত্রিক পয়ার রচিত হয়েছে।

এ স্থলে আমি প্রসঙ্গক্রমে বললুম যে পয়ার, ত্রিপদী শব্দ দ্বারা ঠিক ছন্দ বোঝায় না, বোঝায় ছন্দোবন্ধ। কারণ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি তিন রকমের হতে পারে। যৌগিক পয়ার (সাত কোটি সন্তানেরে ইত্যাদি), মাত্রিক পয়ার (বরষার নির্ঝরে ইত্যাদি) আর স্বরবৃত্ত পয়ার। আপনি যাকে বলেন প্রাকৃত ছন্দ তাকেই আমি বলছি স্বরবৃত্ত। এ-ছন্দটা আসলে syllabic, প্রত্যেক syllable-এর একটি করে স্বর অর্থাৎ vowel থাকা চাই বলে নাম দিয়াছি স্বরবৃত্ত।

কবি বললেন—তুমি যে প্রাকৃত ছন্দকে চার-চার সিলেব্‌ল-এ ভাগ কর সেটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। আমি বলি এ ছন্দে তিন মাত্রার ভাগটাই মূল কথা। এ ছন্দে আমি যত গান রচনা করেছি তার সবগুলিতেই দাদ্‌রা তাল—সব সময়েই তিন মাত্রার ভাগ হয়।

আমি—সে কথা ঠিক বটে। আপনি 'পরিচয়ে' সে দিক্‌টা দেখিয়েছেন। গানের পক্ষে ধ্বনির মাত্রিক দিক্‌টাই মুখ্য ; কিন্তু ছন্দের পক্ষে এর syllabic দিক্‌টাই মুখ্য। গানে এ-ছন্দে প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা পাওয়া যায়, প্রকাশ্যতঃ না থাকলেও সেটা পূরণ করে নিতে হয়। কিন্তু কবিতা পাঠ বা রচনার পক্ষে এ-ছন্দের প্রতি পর্বে ছয় মাত্রার দিক্‌টা গৌণ, চার সিলেব্‌ল্-এর দিক্‌টাই মুখ্য। প্রতি পর্ব সিলেব্‌ল সংখ্যাকে তো ইচ্ছামতো পাঁচ বা ছয় করা চলে না।

কবি—এ-ছন্দে কি সর্বত্রই চার সিলেব্‌ল-এর ভাগ হয় ?

আমি—সর্বত্রই হয়, তবে স্থলে স্থলে তিনটি যুগ্ম বা দ্বিমাত্রিক সিলেব্‌লও চলে ; তাতে ছয় মাত্রা ঠিক থাকে। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়ম নয় ; exception মাত্র। এ-ছন্দের পর্বগুলিতে কখনও পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল চালানো যায় না।

কবি—তাহলে তো অন্য রকমের ছন্দ হয়ে যাবে।

আমি—কিন্তু এ-ছন্দটা মুখ্যত চার সিলেব্‌ল্‌-এর হলেও গৌণতঃ ছয় মাত্রারই বটে। ছয় মাত্রা প্রকাশ্যতঃ না থাকলেও ছয় মাত্রার স্থান ঐ ছন্দে আছে। প্রয়োজনমতো আবৃত্তির সময় তা পূরণ করা যায়। আপনি 'পরিচয়ে' দেখিয়েছেন—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ইত্যাদি ছড়াটাকে তিন মাত্রায় ভাগ করা চলে। কিন্তু সুর করে ছড়া আবৃত্তির সময় এ রীতিটা যেমন খাটে, কবিতা পাঠের সময় তা ঠিক খাটে না। যেমন 'ক্ষণিকা'র 'সেকাল' কবিতাটা।

কবি—'সেকাল' কবিতাতেও খাটে। এর লয় চারমাত্রার নয়। সেই জন্যে তিনের ভাগে যেখানে কম পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়। যেমন—

আমি— | যদি— | জন্‌ম | নিতেম |
কালি— | দাসের | কালে— ।

এ-রকম ছন্দে আমরা যে প্রত্যেক পর্বে ফাঁক ভরিয়ে নিই তা নয়, গানের তালের মতোই যেখানে সুবিধে পাই সেখানেই কর্তব্য সেরে নিয়ে থাকি। তাতে ছন্দোনৃত্যের বৈচিত্র্য ঘটে। ভাল করে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, ঐ লাইনটাতে 'আমি যদি' দুই দুই মাত্রায় দ্রুত পাঠ করে 'জন্ম' এবং 'নিতেম' শব্দের কাছ থেকে উভয়ের জরিমানা ডিক্রি করে নিয়েছি। নইলে ছন্দের তাল কাটতই কেননা এটা নিঃসন্দেহ তিন মাত্রার তাল। 'কালিদাসের' শব্দটাতেও ঐ রকম রফা নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। অর্থাৎ কালিতে যেটুকু কম পড়েছে দাসের মধ্যে সেটা আদায় করে নিতে হল। সব ফাঁকগুলি সমান ভরিয়ে দিয়েও আমি কবিতা লিখেছি।

আমি—সেই রকম ছন্দকেই আমি বলেছি স্বর-মাত্রিক। এ-ছন্দে স্বরসংখ্যা ও মাত্রা-পরিমাণ দুটোই যুগপৎ ঠিক থাকে বলে এ-ছন্দকে স্বর-মাত্রিক নাম দিয়েছি।

কবি—স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দাও দেখি।

আমি—বিহঙ্গ গান শান্ত তখন অন্ধরাতের পক্ষছায়ে, —এখানে প্রতি পর্বে চার স্বর ও ছয় মাত্রা ঠিক আছে।

কবি—'পূরবী'র 'বিজয়ী' কবিতাটিতে আমি মাত্রার ফাঁক পূরণ করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্বত্র তা আমি পারি নি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে কবিতাকে তো খর্ব করতে পারিনে। কাজেই এ

লেখকের ছন্দবিচার নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংযোজন।

কবিতাটিতে কোনো কোনো জায়গায় মাত্রার ফাঁক আর পূরণ করা হয় নি। যারা কবিতা পড়বে তারাই ফাঁক পূরণ করে নেবে। ছন্দের ঝোঁক আপনিই পাঠককে ঠিক পথে চালায়।

তার পর কবি প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি 'বলাকা'য় যে নতুন রকমের ছন্দ রচনা করেছি তাকে তুমি কি নাম দিয়েছ? তাকেও কি তুমি প্রবহমান ছন্দ বল?

আমি বললুম—'বলাকা'র নতুন ছন্দও প্রবহমান বটে, কিন্তু শুধু প্রবহমান বললে এ ছন্দের পুরো পরিচয় দেওয়া হয় না। কারণ এ-ছন্দে তো পংক্তির একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য নেই, এ বিষয়েও এ-ছন্দে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তাই এ-ছন্দকে আমি বলেছি মুক্তক।

কবি—মুক্তক? এ নাম চলতে পারে।

আমি—অবশ্য শুধু বাইরের বাঁধন থেকেই মুক্তি ঘটেছে, ভিতরের বাঁধন থেকে নয়।

কবি—তা তো হবেই।

আমি—কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দকে আমি শুধু মুক্তক বলিনে, বলি যৌগিক মুক্তক। কারণ 'পলাতকা'র ছন্দও তো মুক্তক, সে-ছন্দকে বলেছি স্বরবৃত্ত মুক্তক।

কবি—মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও মুক্তক রচনা করা যায় কি না আমি তাই ভাবছি। কিন্তু তাতে মুশকিল আছে। এ-ছন্দ গড়িয়ে চলে কি না, যেখানে সেখানে থামানো যায় না।

আমি—কিন্তু পাঁচ মাত্রার ছন্দে তো কতকটা মুক্তক আপনি রচনা করেছেন। 'মহুয়া'র 'সাগরিকা' কবিতাটি কতকটা মুক্তক ছন্দে রচিত।

কবি—আজকাল ছ' মাত্রার মুক্তক রচনার চেষ্টা আমি করছি।

তার পর তিনি তাঁর কবিতার খাতা থেকে কয়েকটি নব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। ছ'মাত্রার ছন্দ, পংক্তিতে পংক্তিতে মিল আছে, কিন্তু পংক্তিদৈর্ঘ্যের কিছু স্থিরতা নেই, অথচ কবিতার ভাব বহু পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তাঁর এই ছ'মাত্রার মুক্তক ছন্দের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হলুম। আজও তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকার্যে কিছুমাত্র বিরাম ঘটে নি। আজও তিনি নূতন ছন্দ রচনায় সমানভাবে নিরত রয়েছেন।

পরের দিন আবার যখন তাঁর কাছে গেলুম তখন তিনিই ছন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন,—ছন্দ এমন একটা বিষয় যাতে সকলে একমত হতে পারে না। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারব এমন আশা করা যায় না। ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিস; এক-এক জনের কান এক-এক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তির ভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে। আমি দেখেছি কেউ কেউ খুব বেশি টেনে টেনে আবৃত্তি করে, আবার কেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে আর আবৃত্তি করারও অভ্যাস থাকা চাই। আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি; এমন কি কোনো গদ্য রচনাও যখন ভাল করে লিখব মনে করি তখন গদ্য লিখতে লিখতেও আবৃত্তি করি। কারণ, রচনার ধ্বনি-সংগতি ঠিক হল কি না তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।

আমি—গদ্য রচনার মধ্যেও যে rhythm থাকা প্রয়োজন, একমাত্র কানের সাহায্য ছাড়া তো সে rhythmকে আয়ত্ত করার কোনো উপায় নেই।

কবি—বাংলায় rhythmic prose রচনা নেই। এক সময়ে আমি rhythmic prose রচনার চেষ্টা করেছি। লিপিকাতে সে rhythm ধরতে পারবে। লিপিকার রচনাগুলিকে আমি প্রথমে rhythm রক্ষার জন্যে পদ্যের মতো ভাঙা ভাঙা লাইনেই লিখেছিলুম। পরে গদ্যের মতো করেই ছাপানো হয়েছে।

আমি—Rhythmic proseকে rhythm অনুযায়ী ভেঙে ভেঙে রচনা করার সার্থকতা আছে। তাতে rhythmটা সহজে ধরা পড়ে।

কবি—তা আছে। আমি এক সময় সত্যেনকে বলেছিলুম বাংলায় rhythmic prose রচনা করতে। কিন্তু সে তো তা করলে না। সে কবিতার ছন্দের ঝংকারে এমন আকৃষ্ট হল যে সে শেষের দিকে একরকম ছন্দে পাওয়া হয়েই গিয়েছিল। অবন্ (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এক সময় rhythmic prose লিখতে চেষ্টা করেছিল। তার লেখা আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু বেশি প্রলম্বিত এবং অসংশ্লিষ্ট হওয়াতে চলল না।

আমি—আপনি rhythmic prose এর আদর্শ কেমন হবে তা দেখিয়ে দিন না।

কবি—'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের proseএ যে rhythm রয়েছে তাতে

সে দেশের লোকেরা আকৃষ্ট হয়েছে। মনে করেছি বাংলা গদ্যেও ও-রকম rhythm রেখে কিছু রচনা করব। কিন্তু আমাকেই সেটা করতে হবে কেন? আধুনিক কালের কবিরাই এ কাজটা করে না কেন? আধুনিক কবিরা যে মিল বর্জন করে লাইন ভেঙে ভেঙে কবিতা রচনা করছে তাতে কিছু দোষ নেই। মিল না দেওয়াটা মোটেই অন্যায় নয়। কিন্তু অমিল কবিতা রচনা করা খুবই শক্ত, তাতে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন।

আমি—অমিল অসমপংক্তিক কবিতা তো আপনিই সর্বপ্রথমে রচনা করেছেন। কিন্তু ও-রকম কবিতা তো একটির বেশি পাই নে। 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা'-ই তো তার একমাত্র নিদর্শন।

কবি—ও-ছন্দের কবিতা আরও রচনা করেছিলুম। কিন্তু সেগুলি আর প্রকাশ করা হয় নি।

কবি বললেন—মিল জিনিসটার প্রতি কিছুকাল পূর্বেকার কবিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সতর্কতা ছিল না। তাঁদের অনেকে পংক্তির শেষে কোনো রকমে একটুখানি মিল ঘটিয়েই তৃপ্ত হতেন; অনেক সময় তো শুধু 'রে' 'হে', ইত্যাদি দিয়েই মিলের কাজ শেষ করতেন।

আমি—আপনিই প্রথমে বাংলায় dissyllabic (দ্বিদল) trisyllabic (ত্রিদল) মিলের [illegible]র্শ দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পংক্তির শেষ পর্বে মিলের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির উত্থানপতনের দ্বারা যে cadence-এর সৃষ্টি হয় তা-ও আপনার কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল।

তারপর আবার ছন্দের কথা উঠল। কবি বললেন—ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা কর। কিন্তু ছন্দ এমন হওয়া উচিত, এমন হওয়া উচিত নয়, এ কথা বলে' না। ছন্দ কেমন হবে তা কবিরাই ঠিক করবেন, তাঁরা নিজের কান আর ছন্দবোধের উপর নির্ভর করে নতুন নতুন ছন্দ রচনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্যে এক সময়ে ছন্দের ভাগ অত্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল, কোথাও ব্যতিক্রম হত না। তারপর কোল্‌রিজ প্রভৃতি কবিরা এসে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করলেন, তাঁরা কাটা কাটা ছন্দের ভাগ মানলেন না, কোথাও বেশি, কোথাও কম চালাতে লাগলেন। প্রথম প্রথম তাতে আপত্তি হয়েছিল। পরে কিন্তু তাঁদের প্রথাটাই চলে গেল। সুতরাং ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।

আমি—আমার আদর্শটাও তাই। কবিদের কি করা উচিত, কি করা

অনুচিত তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কবিরা বর্তমানে কোন্ নিয়মে ছন্দ রচনা করছেন আমি তাই আবিষ্কার করে দেখাতে চাই। আমার কাজ হচ্ছে শুধু Induction। State-এর law-এর মতো কোনো law চালিয়ে দিতে চাইনে। Nature-এর law-এর মতো ছন্দের law; সেটি শুধু আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেই আমার কাজ শেষ হয়। কেউ যদি কোনো নতুন নিয়মের ছন্দ চালায় তবে তাও চলবে। তার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা তো বৈয়াকরণিকের কাজ নয়।

কবি—শাস্তির ব্যবস্থা আছে বৈ কি। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যে-ছন্দ কানকে খুশি করতে পারবে না, সে-ছন্দ কেউ পড়বে না। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি আছে? কাজেই যেখানটাতে কান খুশি হয় না সেখানটাতে ছন্দপতন হয়েছে এ কথাও বলা চলে।

আমি—তা তো চলে। কেন ছন্দপতন হয়েছে তাও তো দেখা দরকার। তারপরে অন্য প্রসঙ্গে আমি বললুম—ইংরেজ কবিরা পংক্তির এবং পর্বের দৈর্ঘ্যে অনেক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। ও-রকম বৈচিত্র্য আপনার কবিতাতেও প্রচুর আছে এবং তাতে যে কত ছন্দোবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে তার সীমা নেই। আমি এই বৈচিত্র্যকে বোঝাবার জন্যে 'বর্ধিত' এবং 'খণ্ডিত' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছি। যেমন একটি পংক্তিতে আছে চোদ্দ unit, তার [illegible]র পংক্তিতে যদি থাকে দশ unit তবে বলি দ্বিতীয় পংক্তিতে চার unit-এর একটি পর্ব খণ্ডিত হয়েছে; তার পরের পংক্তিতে আবার চার unit-এর দুটি পর্ব যোগ করে আঠারো unit-এর একটি বর্ধিত পংক্তি রচিত হতে পারে। এভাবে যোগ-বিয়োগের দ্বারা যে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আপনার রচনায় পাই।

আমাদের আলোচনা চলছে এমন সময় একজন ফরাসী অধ্যাপক কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অন্যান্য কথার পর কবি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফরাসী কাব্যে quantitative ছন্দ আছে কি?

অধ্যাপক—না, ফরাসী কাব্যে quantitative ছন্দ চলে না। শুধু syllabic ছন্দই চলে। তারপর তিনি কবিকে প্রশ্ন করলেন আপনি কোন্ ছন্দ ব্যবহার করেন?

কবি—আমি quantitative ও syllabic দুরকম ছন্দই ব্যবহার করে থাকি।

অধ্যাপক—আপনি বাংলায় free verse রচনা করেছেন কি ?

কবি—আমি অনেক free verse রচনা করেছি।

তারপর অধ্যাপক মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বর্তমানে ফরাসীতে free verse যেমন চলে rhythmic prose-ও তেমনি চলে। Rhythmic prose রচনার ভঙ্গি এমন যে তাতে কবিতার ধ্বনিস্পন্দ ধরা পড়ে কিন্তু তা কোনো ছন্দের নিয়মের আমলে আসে না।

তারপরে কবিকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে এলুম। কি প্রশান্ত ধৈর্য ও স্নেহের সঙ্গে তিনি আমার সমস্ত কথা শুনলেন এবং নিজের বক্তব্য আমাকে বুঝিয়ে বললেন, সে কথা স্মরণ করে এই কথাই বিশেষভাবে অনুভব করলুম যে তিনি শুধু অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী কবিই নন, ব্যক্তিগত সহৃদয়তাতেও তিনি অনন্যসাধারণ ; তাঁর প্রতিভার ন্যায় তাঁর মহত্ত্বও সর্বতোমুখী।

পরিশেষ

কবির পুনশ্চ বক্তব্য

সেদিনকার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ছন্দে সিলেব্‌ল্ প্রধান, অথবা মাত্রা-প্রধান। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো, সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা। ষাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্বে ঊর্ধ্বসংখ্যা কয় সিলেব্‌লের স্থান আছে তা আমি পূর্বে বিচার করে দেখি নি। 'বিচিত্রা' সম্পাদক বলেন ছয় বা পাঁচ বা চার সবই চলে। আমি তাঁকে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করতে অনুরোধ করেছিলুম। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করে দৃষ্টান্ত স্বয়ং রচনা করেছেন, পাঠকদের গোচর করা গেল—

> আজিকে তোমারে ডাক দিয়ে বলি, শুন গো সখী,
> তোমার বীণায় বাজে অপরূপ ছন্দ ও কি ?
> কোনো পদ তার চার সিলেবিলে কোনোটা পাঁচে,
> এ যেন মিতালি ঝাঁপতালে আর কাবালী নাচে !
> এ যেন আঠারো বরষের পাশে ষোড়শী নারী,
> যে বলে ইহারে অমিল, তাহার সঙ্গ ছাড়ি।

চারে পাঁচে মিল হয় না, এ কোন্ দেশের কথা ?
চারে পাঁচে নয়, তার অভিনয় যথা ও তথা।
চারের সহিত পাঁচের প্রণয় রসিকে জানে,
অরসিক জনে শাস্ত্রই মানে, মানে না কানে।
কানের মাঝারে ছন্দের বাসা, নিয়মে নহে।
কানে মানে না যে সুধীজন তারে বে-কানা কহে।
অসমে অসমে কত অপরূপ সাম্য আছে !
কত মধুভরা ফুল ফোটে, জানো, কাঁটার গাছে ?

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বরষা ঝরে, বরষা ঝরে তরুর দেহে
লতা দুলে দুলে পরশে তারে, পরশে তারে সজল স্নেহে
ঘন তমসার সজল মায়া বিছালো ছায়া নেত্রে তব,
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে হাস্য ঝরে কি অভিনব !

না জানি আজি গাহ চুপি চুপি কি গান সখী,
এ কি এ আলো নয়নে তোমার আজি নিরখি !
বুঝি না কি যে আছে তব মনে সঙ্গোপনে,
প্রণয়ী জনে কেন অকরুণ বিদায় খনে !

আর কত বল মিলাইব মিল চারে ও পাঁচে।
এখনো কাহারো মনে সন্দেহ কিছু কি আছে ?
সেদিন সন্ধ্যা, গুরুদেব-গৃহে উঠিল কথা,
চার পাঁচ দিয়ে ছন্দ করার নাহিক প্রথা।
গুরুর আদেশে ত্রিবিধ প্রমাণ দিলাম এনে,
দেখিব এখন কি বিধি করেন প্রবোধ সেনে।

দেখা যাচ্ছে, 'আজিকে তোমারে' ছয় সিলেব্ল্, তার পরেই 'ডাক দিয়ে বলি' পাঁচ সিলেব্ল্। পরবর্তী ছত্রে 'তোমার বীণায়' চার সিলেব্ল্, আবার 'বাজে অপরূপ' পাঁচ। প্রাকৃত বাংলা ছন্দেও এ-রকম দৃষ্টান্ত আছে, যথা—

৫ ৪ ৩ ১

শিবুঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে । দান ।

এই একটা লাইনেই দেখা যাচ্ছে চার অসমান সংখ্যক সিলেব্‌ল্‌-পিণ্ড নিয়ে একই ষাণ্মাত্রিক ছন্দ রচিত ।*

* বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ

বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ

জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রা'য় 'ছন্দ-বিচার' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ছন্দ-বিষয়ক যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, নানা দিক্ থেকে তার বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে করি। ওই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি সেটিকে আনুপূর্বিক দেখে অনুমোদন করেছেন। শুধু 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি নূতন মন্তব্য যোগ করে দিয়েছেন। কাজেই মনে হচ্ছে, বাংলা ছন্দের পরিভাষা, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আমার মত সমর্থন করেছেন। একমাত্র 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত ও আমার মতে খুবই পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে দেখা যাক কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতসাম্য আছে। প্রথমতঃ যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি, প্রবহমানতা (enjambement), মুক্তক প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দকে আমি যে-সব নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করি তাতে তাঁর আপত্তি নেই। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এবং নামকরণ বিষয়েও বিশেষ মতভেদ আছে বলে মনে হয় না। 'প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি' প্রভৃতি ষড়্ব্যষ্টিপর্বিক ছন্দের কবিতাতে তিনি কেন যুগ্মধ্বনিকেও এক ব্যষ্টি বা unit রূপে ব্যবহার করেছিলেন তাও এই উপলক্ষেই জানা গেল। 'স্বরমাত্রিক' ছন্দ সম্বন্ধেও মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ হবার কারণ নেই। 'পূরবী'র 'বিজয়ী' কবিতাটির ছন্দ কিরূপে প্রধানতঃ স্বরমাত্রিক হয়েছে এ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা থেকেই আমি এ অনুমান করছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার ফলে যে-বিষয়টা সব চেয়ে বেশি করে অনুভব করেছি সেটি এই যে, বাংলা যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি এ-ছন্দকে যেভাবে বিশ্লেষণ করি তিনিও ঠিক তাই করেন। মাঘের (১৩৩৮) 'পরিচয়ে' যৌগিক অর্থাৎ তাঁর কথিত সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক স্থানে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার থেকেও এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। ওই মন্তব্যটুকু এ স্থলে উদ্ধৃত করলেই আমার কথা প্রমাণিত হবে। যথা—

—রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি—

এটা সংস্কৃত বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়। বাংলা প্রাকৃতের অনিবার্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত করে ফাঁক ভর্তি করে নিয়েছে। 'রূপ' এবং 'ডুব' আপন উ-কার ধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। 'সাগরের' শব্দ আপন এ-কারকে পরবর্তী হসন্ত র-য়ের পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েছে। এই উপায়ে ঐ পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে চলেছে। অর্থাৎ এ-ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই রকমের ছন্দে দুই মাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্যায়ে যে অবকাশ পায় তা নিয়ে তার গৌরব। বস্তুতঃ এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে তার ধ্বনি-সমারোহ বাড়িয়ে তুললে এ-ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হোলো রূপসিন্ধুতলে।

—পৃ ৩৮৮

অর্থাৎ 'রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি' এই পয়ারের পংক্তিটার ধ্বনিবিন্যাস হচ্ছে এ-রকম—

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
রূপ্ সাগরের্ তলে ॥ ডুব্ দিনু আমি

এখানে স্পষ্টই দেখা যচ্ছে যুগ্মধ্বনিগুলির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ এবং তাদের ধ্বনিমূল্য দুই মাত্রা; তাই রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বলেছেন 'দুই মাত্রার ধ্বনি'। অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে আমিও যৌগিক ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণ ঠিক এভাবেই করেছিলুম। লক্ষ করার বিষয়, এই পংক্তিটিতে যুগ্মধ্বনিগুলি সর্বত্রই শব্দের অন্তে অবস্থিত। আর, যৌগিক ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ যে সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক, এ কথা আমি বহুবার বলেছি। এই পংক্তিটিতে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি একটিও নেই; কাজেই যৌগিক ছন্দের পয়ারে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির প্রকৃতি কিরূপ, তা এই দৃষ্টান্তটি দ্বারা বোঝা যায় না। সুতরাং আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

॥ ।
আজ শতবর্ষপরে পরে

। ॥ । ॥ । ॥
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে

॥ ॥
কাঁপিবে না আমার পরাণ ?

—বসুন্ধরা, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনিগুলি (আজ্, দর্, পের্, বের্, সার্, রাণ্) সমস্তই বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈব্যষ্টিক এবং শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলি (বর্, সুন্, রণ্, পল্) সমস্তই সংশ্লিষ্ট ও একব্যষ্টিক। সুতরাং দেখা গেল এই সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কোথাও সংশ্লিষ্ট ও একব্যষ্টিক এবং কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈব্যষ্টিক। এইরূপে যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট এই দুই প্রকৃতির যোগে উৎপন্ন বলেই সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দকে 'যৌগিক' ছন্দ নামে অভিহিত করেছি। মাঘের 'পরিচয়' থেকে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনিও এ ছন্দের উক্ত রকম ধ্বনিবিশ্লেষণেরই পক্ষপাতী। বৈশাখের 'বিচিত্রা'তেও দেখিয়েছি যে যৌগিক (অর্থাৎ সাধারণ পয়ারজাতীয় সাধু) ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত পদ্ধতি ও আমার পদ্ধতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। সর্বশেষে 'ছন্দ-বিচার' প্রবন্ধটি থেকে নিঃসংশয়ে দেখা গেল যে যৌগিক ছন্দের ধ্বনিসন্নিবেশ-প্রণালী সম্বন্ধে কবিগুরুর সঙ্গে আমার লেশমাত্র মতভেদ নেই। এই উপলক্ষে মাঘের 'পরিচয়' থেকে উদ্ধৃত তাঁর উক্তিটির সঙ্গে জ্যৈষ্ঠের বিচিত্রায় যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যটি ('ছন্দ-বিচার', পৃ ৫৭৬-৭৮) তুলনা করলেই আমার এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে চাতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে একটি কথা বলা অন্যায় হবে না। উপরে উদ্ধৃত—'রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি' এই পংক্তিটিকে যৌগিক পয়ার এবং মাত্রিক পয়ার, এই দুইটি স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা যায়। আর এই দুই ভঙ্গিতে একই পংক্তির ধ্বনি-প্রকৃতি দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায়ে দেখা দেয়। যৌগিক ছন্দে এই পংক্তিটির ধ্বনিরূপ হচ্ছে এই—

॥ ॥ ॥
রূপ্ সাগরের্ তলে ॥ ডুব্ দিনু আমি

এখানে প্রত্যেকটি শব্দ পরবর্তী শব্দ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়'। এইটে গদ্যের মতো যৌগিক ছন্দের একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি ও লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ যৌগিক ছন্দের যতিস্থাপন রীতি। এই পংক্তিটিতে আট unit বা ব্যষ্টির পর অর্ধ যতি এবং

পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি। অর্ধ যতিটির দ্বারা সমগ্র পংক্তিটা দুইটি পদে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এই পদদুটি এক-একটি ঈষদ্-যতির দ্বারা দুটি করে পর্বে বিভক্ত হয় নি। অর্থাৎ ঈষদ্-যতি লুপ্ত হওয়াতে দুটি করে পর্ব যুক্ত হয়ে দুটি যুক্ত-পর্বিক পদ উৎপন্ন হয়েছে। (ছন্দোবিশ্লেষ—প্রবাসী ১৩৩৮ ফাল্গুন-চৈত্র দ্রষ্টব্য)। এই যুক্ত-পর্বিক পদের চালটা যৌগিক ছন্দের একটি বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা' (সবুজপত্র ১৩২১ শ্রাবণ, পৃ ২২৮)। যা হক, শব্দের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা এবং যুক্তপর্বের চাল যৌগিক ছন্দের দুটি বিশেষত্ব। মাত্রিক ছন্দে এ দুটি লক্ষণের কোনোটিই সাধারণতঃ দেখা যায় না। অর্থাৎ মাত্রিক ছন্দে শব্দগুলি সুস্পষ্টভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না এবং যুক্তপর্বের চালও এ-ছন্দে খুব বিরল। উপরের পংক্তিটিকে যদি চতুর্মাত্রিক ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে তার ধ্বনিরূপ হবে এ-রকম—

রূপ্ সাগ। রের্ তলে॥ ডুব্ দিনু। আমি

এখানেও যৌগিক ছন্দের মতো যুগ্মধ্বনির মূল্য দ্বৈমাত্রিক। কিন্তু এ-ছন্দের মাত্রা যৌগিক ছন্দের মাত্রার চেয়ে লঘুতর; তাই এ-ছন্দের গতি চপল এবং তার তাল নৃত্য-পরায়ণ। যৌগিক ছন্দের গতি মন্থর এবং তার তাল ধীর। যা হক, এই মাত্রিক বিশ্লেষণটির প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এখানে যুক্তপর্বের চাল নেই; অর্ধ ও পূর্ণ যতির ন্যায় ঈষদ্-যতিও এখানে সুস্পষ্ট। সে জন্যেই এ-ছন্দে লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালও নেই। আর এইটেও এ-ছন্দের গতির চপলতার হেতু। দ্বিতীয়তঃ, এ-ছন্দে শব্দের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা আবশ্যক নয়; এ-ছন্দে শব্দগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন বলে গণ্য করলেও ছন্দের প্রকৃতিতে ত্রুটি ঘটে না। উপরের দৃষ্টান্তটিকে যথাযথভাবে আবৃত্তি করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। অর্থাৎ উপরের দৃষ্টান্তটিকে যদি

রূপ্সাগ। রের্তলে॥ ডুব্দিনু। আমি

এ ভাবে লেখা যায় তাহলে এর চাতুর্মাত্রিক প্রকৃতিটি ধরা পড়বে। 'বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়' (নিষ্ফল উপহার, মানসী) 'অঞ্জনা নদীতীরে খঞ্জনী গাঁয়ে' (সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ) প্রভৃতি পংক্তির সঙ্গে এটির তুলনা করলেই আমার এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি হবে। কিন্তু যৌগিক ছন্দে এভাবে এক শব্দকে অন্য শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার যো নেই, কেননা তাহলে ও-ছন্দের মূল প্রকৃতিরই

বিকার ঘটবে। এ বিষয়ে যৌগিক ছন্দ হচ্ছে পুরোপুরি গদ্যধর্মী এবং এখানেই তার গৌরব ও এরিস্টোক্রেসি।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

১

এবার বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন প্রাকৃত ছন্দ বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ আমি তাকেই বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ অর্থাৎ syllabic ছন্দ, কেননা আমার বিবেচনায় এ-ছন্দ সিলেব্‌ল্‌-এর বিভাগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমার বিশ্বাস বাংলা দেশের কবি এবং পাঠকরা সকলেই এ-ছন্দকে সিলেব্‌ল্‌-নিয়ন্ত্রিত বলেই মনে করেন। এ-রকম বিশ্বাস পোষণ করার পক্ষে আমার অনুকূল নজিরও আছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-ছন্দকে সিলেব্‌ল্‌-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন বলেই আমার ধারণা ছিল এবং তাঁর রচনার বিশ্লেষণ করেই আমার এ ধারণা হয়েছিল। কিন্তু মাঘের 'পরিচয়ে' যখন প্রথম দেখলুম তিনি এ-ছন্দকে স্বরবৃত্ত বা 'সিলেব্‌ল্‌'-বৃত্ত বলে গণ্য না করে 'মাত্রা'বৃত্ত বলে গণ্য করেছেন তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। পরে আশ্বিনের 'উত্তরা'য়ও দেখা গেল 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' প্রভৃতি প্রাকৃত ছন্দের ছড়াটাকে তিনি চার-চার সিলেব্‌ল্‌-এ ভাগ না করে ছয়-ছয় মাত্রায় ভাগ করেছেন। কিন্তু এটা কিছুতেই আমার কাছে যুক্তিসহ বলে বোধ হল না। তাই স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করি। কিন্তু তৎপূর্বে এ বিষয়ে কবিগুরুর অভিমতটা আরো বিশদরূপে জানার প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ আলোচনা হয় তখন বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করি। কিন্তু 'ছন্দ-বিচার' এবং 'কবির পুনশ্চ বক্তব্যে' (বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ) দেখা গেল প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে চার সিলেব্‌ল্‌-এর ছন্দ বলে গণ্য করতে কবিগুরুর খুবই আপত্তি আছে, তিনি এটাকে ছয় মাত্রার ছন্দ এবং সাধু বাংলার যাণ্মাত্রিক ছন্দের সগোত্র বলেই মনে করেন।

২

একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু ছন্দও সংগীতের মতোই একটি ধ্বনিশিল্প, সেহেতু ছন্দ মাত্রেই প্রত্যক্ষতঃ হক বা পরোক্ষতঃই

হক ধ্বনিপরিমাণ বা quantityর একটা স্থান থাকবেই ; কেননা সম্পূর্ণরূপে ধ্বনি-পরিমাণ-নিরপেক্ষ ধ্বনিশিল্প রচনা করা স্বভাবতঃই অসম্ভব। কারণ ধ্বনির উচ্চারণে যে কাল ব্যয়িত হয় সেই কালের পরিমাণটাই মোটামুটিভাবে ঐ ধ্বনির পরিমাণ এবং কালনিরপেক্ষ ধ্বনি হতে পারে না ; তার কল্পনাটাও স্ববিরোধী। ধ্বনিপরিমাণেরই পারিভাষিক নাম 'মাত্রা'। অতএব বোঝা গেল সম্পূর্ণরূপে 'মাত্রা'-নিরপেক্ষ ছন্দ হতেই পারে না ; কোনো ভাষাতেই পারে না। মুখ্যতঃ হক গৌণতঃ হক, কোনো ছন্দই একেবারে মাত্রানিরপেক্ষ নয়। তাই যখন বলা হয় অমুক ছন্দটা মাত্রিক বা quantitative নয়, তখনই মনে রাখতে হবে যে সেটা মুখ্যতঃ মাত্রিক নয় ; সেটা গৌণতঃও মাত্রিক নয় এ কথা বলা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। কেননা সমস্ত ভাষার সমস্ত ছন্দই মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ মাত্রিক (quantitative) হতে বাধ্য। ছন্দোবিৎরা যখন বলেন সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ কিংবা বৈদিক ত্রিষ্টুপ্ জগতী প্রভৃতি ছন্দ quantitative নয় পরন্তু syllabic, তখন বুঝতে হবে ওসব ছন্দ প্রত্যক্ষতঃ এবং প্রধানতঃ quantitative নয় বটে কিন্তু পরোক্ষতঃ এবং গৌণতঃ এগুলি quantitative বটেই। পার্সী ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার ছন্দও মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরবৃত্ত বা syllabic, ছন্দোবিৎদের এই অভিমত। কিন্তু ওসব ছন্দও যে গৌণতঃ মাত্রাবৃত্ত এ কথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি ছন্দ স্বরবৃত্ত (syllabic) না মাত্রাবৃত্ত (quantitative) এ বিষয়ে ছান্দসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে ও-ছন্দ প্রধানতঃ স্বরবৃত্ত, কারও মতে প্রধানতঃ মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু ফরাসী ছন্দ যে syllabic এ বিষয়ে দ্বিমত নেই ; যাঁরা ইংরেজি ছন্দকে মাত্রাপরিমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁরাও স্বীকার করেন যে ফরাসী ছন্দ সিলেব্‌ল্-নিয়ন্ত্রিত। 'French prosody, except in eccentric instances, has been from the first and is to the present day, strictly syllabic' (G. Saintsbury's Manual of English Prosody, p. 14). রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে ফরাসী অধ্যাপকের আলোচনা হয়েছিল, তিনিও এ কথার সমর্থন করে বলেছেন যে ফরাসী ছন্দ syllabic (বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৮১)। কিন্তু তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ফরাসী ছন্দও মাত্রিক, কেননা ছন্দমাত্রই ধ্বনিপরিমাণকে মেনে চলতে বাধ্য। সুতরাং ফরাসী ছন্দের আসল পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় যে, ও-ছন্দ মুখ্যতঃ স্বরবৃত্ত এবং গৌণতঃ মাত্রিক।

বাংলা ছন্দের যে শ্রেণীটা মুখ্যতঃ quantitative তাকেই আমি বলেছি মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু বাংলা ছন্দের আরও দুটি শ্রেণী আছে যা গৌণতঃ মাত্রিক বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ নয়। সে দুটি হচ্ছে স্বরবৃত্ত এবং যৌগিক। বাংলা ছন্দের এ দুটি শ্রেণীও যে গৌণতঃ মাত্রিক এ কথা বলা বাহুল্য বলেই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন যে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ মুখ্যতঃ স্বরবৃত্তক syllabic নয়, ও-ছন্দ মুখ্যতঃই মাত্রিক। এ বিষয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনে।

৩

বাংলায় স্বরবৃত্ত বা syllabic ছন্দ বলে কোনো ছন্দ আছে কি না সেটাই আগে দেখা প্রয়োজন। ১৩১৪ সালে 'আলেখ্য' গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, "এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (syllabic) ; 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার পূর্ব হতে এ-ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী কবিগণ প্রায়ই এ-ছন্দ বর্জন করে 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্তিত করেন। আমি সেই পুরানো মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি।" অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে syllabic ছন্দ বলেই মনে করতেন। তিনি syllabic কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'মাত্রিক' কথাটি ব্যবহার করেছেন ; আমার মনে হয় 'মাত্রিক' শব্দটিকে 'syllabic' অর্থে প্রয়োগ করা সংগত নয়। যা হক, আমি এই syllabic ছন্দকেই বলছি 'স্বরবৃত্ত' ছন্দ (বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য)।

সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে syllabic বা 'শব্দ-পাপড়ি'র সংখ্যা গুণেই বিশ্লেষণ করেছেন (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ১০-১৫)। প্রাকৃত বাংলার ছন্দে প্রতি পর্বে সাধারণতঃ চারটি করে সিলেব্‌ল্ বা 'শব্দ-পাপড়ি' থাকে বলে তিনি এ-ছন্দকে 'চারের ঘরানা ছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন (ঐ, পৃ ২৩)। এই 'চারের ঘরানা' ছন্দকেই আমি বলেছি চতুঃস্বর (tetrasyllabic) স্বরবৃত্ত ছন্দ। ইদানীং দিলীপকুমার (পরিচয়—বৈশাখ, পৃ ৭১৮-৭২০) এবং শৈলেন্দ্রকুমারও (বিচিত্রা—আষাঢ়, পৃ ৭৪২-৪৪) প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে সিলেব্‌ল্-সংখ্যাত ছন্দ বলেই গণ্য করেছেন।

পূর্বোক্ত ফরাসী অধ্যাপকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন যে তিনি quantitative এবং syllabic দুরকম ছন্দই ব্যবহার করে থাকেন (বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৮১)। কিন্তু বাংলার যে-ছন্দটি সাধারণতঃ syllabic ছন্দ বলে

গণ্য হয়ে থাকে সে-ছন্দটি যখন তিনি যাগ্মাত্রিক হিসাবে বিশ্লেষণ করেন, তখন তাঁর এই উক্তির সার্থকতা কি? রবীন্দ্রনাথ কোন্ বাংলা ছন্দকে syllabic বলে গণনা করেন তা বোঝা গেল না। আমার বিবেচনায় প্রাকৃত ছন্দকেই syllabic ছন্দ বলে মনে করতে হবে, নতুবা syllabic ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তিটিকেই নিরর্থক বলে গণ্য করতে হবে।

৪

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত ছন্দের বিশ্লেষণ করতে চান কিরূপে? তাঁর মতে এ ছন্দের প্রতি পর্বার্ধে তিন মাত্রা ধরতে হবে; প্রকাশ্যতঃ তিন মাত্রা না থাকলেও প্রতি পর্বার্ধে তিন মাত্রার অবকাশ আছে, আবৃত্তির ঝোঁকে ওই ফাঁক পূরণ করে নিতে হয় (পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৩৭৯-৮০ এবং ৩৮৮-৮৯)। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ আসলে যাগ্মাত্রিক ছন্দ এবং এইটেই এ-ছন্দের যথার্থ পরিচয় (বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৮২)। বাংলা প্রাকৃত ছন্দের এই মাত্রাগত প্রকৃতিটিকে অর্থাৎ এর যাগ্মাত্রিক প্রকৃতিটিকে আমিও কখনও অস্বীকার করি নে। আমি শুধু বলতে চাই এইটুকু যে, এ-ছন্দের syllabic দিক্‌টাই এর আসল কথা, এর মাত্রিক দিক্‌টা এ-ছন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে গৌণ। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি তাই এখন দেখানো দরকার।

ছন্দবিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ বক্তব্যে' মন্তব্য করেছেন, 'এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ছন্দে সিলেব্‌ল্ প্রধান, অথবা মাত্রা প্রধান। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো, সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা।' তাঁর এই উক্তিটি বড়ই গুরুতর। প্রশ্ন উঠেছিল বাংলা প্রাকৃত ছন্দের স্বরূপ নিয়ে, সকল ছন্দ সম্বন্ধে নয়। কিন্তু তিনি ওই প্রশ্নটিকে প্রয়োগ করেছেন সমস্ত ছন্দের সম্বন্ধেই। তাঁর এই উক্তি থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই হয় যে, সিলেব্‌ল্-প্রধান অর্থাৎ syllabic ছন্দ বলে কোনো ছন্দই হতে পারে না। যদি এ কথা বলাই তাঁর অভিপ্রায় হয় তবে আমি মনে করি যে তাঁর এই উক্তি কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, ছন্দ-বৈয়াকরণিকরা syllabic ছন্দের অস্তিত্ব-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বৈদিক অনুষ্টুপ ত্রিষ্টুপ প্রভৃতি 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দ যে syllabic এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত (পরিচয় ১৩৩৯ বৈশাখ, পৃ ৫৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য)। আর, বাংলা প্রাকৃত ছন্দও আসলে syllabic। এ বিষয়েও বাংলাদেশের

অধিকাংশ ছন্দোরসিক কবি ও পাঠক যে নিঃসন্দেহ, এ-রকম মনে করার হেতু আছে। এ বিষয়ে কিছু নজির পূর্বেই দেওয়া হয়েছে এবং এই মতের পক্ষে যে-সব যুক্তি আছে তা যথাস্থানে উপস্থাপিত করব।

কিঙ্কিণীর ঝংকার যদি ঘুন্টির সংখ্যা ও সন্নিবেশপ্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে ওই ঘুন্টির সংখ্যা ও সাজানোর ভঙ্গি বৈজ্ঞানিকের চোখে কখনও গৌণ নয়, এ কথা অবশ্যই বলব। বীণাযন্ত্রের ধ্বনিমাধুর্যই সংগীতরসিকের কাম্য বটে; কিন্তু যেহেতু ওই যন্ত্রের তারের সংখ্যা ও সন্নিবেশপ্রণালীর উপর সে মাধুর্য একান্তভাবেই নির্ভর করে সে-জন্যে ওই তারগুলি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সে কথা সংগীত-বৈজ্ঞানিকের নিকট কখনোই গৌণ নয়। যদি তাই হত তাহলে বীণাযন্ত্রই কখনও উৎপন্ন হত না। বাক্যের অর্থই সাহিত্যিকের নিকট মুখ্য; কিন্তু বৈয়াকরণিকের নিকট বাক্যের ক্রিয়া, কর্তা, কর্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতি এবং তাদের সন্নিবেশপ্রণালীটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। ছন্দো-ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাটিই প্রযোজ্য। বাংলা প্রাকৃত ছন্দের প্রতি পর্বের ধ্বনিটা যাণ্মাত্রিক বটে; কিন্তু কোন্ বিশেষ-সংখ্যক সিলেব্‌ল্ এবং তাদের কোন্ বিশেষ সাজানোর ভঙ্গি থেকে ওই যাণ্মাত্রিক ধ্বনিটা উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ছন্দো-বৈয়াকরণিকের নিকট সেটা কখনোই গৌণ হতে পারে না। কবির 'পুনশ্চ বক্তব্য' থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি বাংলায় দুরকম যাণ্মাত্রিক ছন্দ স্বীকার করেন, যথা—সাধু যাণ্মাত্রিক এবং প্রাকৃত যাণ্মাত্রিক। এই দুরকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের পার্থক্য কোথায় তা দেখা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত—

(১) দুটি বোন্ তারা | হেসে যায় কেন | যায় যবে জল | আনতে?
দেখেছে কি তারা | পথিক কোথায় | দাঁড়িয়ে পথের | প্রান্তে?

—দুই বোন, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) কামিনী, মালতী, | আমি তিন জন | দেখে লোক জন | অল্প,
জল তোল্‌বার | মিছে ছল করে | জুড়তুম সেথা | গল্প।

—সুখের সাহারা, নতুন খাতা, কিরণধন

(৩) চলেন তিনি- | গোপন চালে- | স্বাধীন তাঁহার | ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে- | দিচ্চে, এবং | কেই বা তাঁরে- | নিচ্চে।

—অচেনা, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের ছন্দ 'সাধু' যাণ্মাত্রিক এবং

তৃতীয়টির ছন্দ প্রাকৃত যাণ্মাত্রিক। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের ভাষাও তৃতীয়টিরই মতো 'প্রাকৃত' বাংলা। সুতরাং এ দুটির ছন্দকে সাধু যাণ্মাত্রিক বলার কোনো সার্থকতাই নেই। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ওই দুরকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের পার্থক্যটা ভাষাগত নয় এবং এই যাণ্মাত্রিক ছন্দ-দুটিকে 'সাধু' এবং 'প্রাকৃত' এই দুটি বিশেষণে বিশেষিত করলেই এদের আসল পার্থক্যটাকে নির্দেশ করা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ এই দুরকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের আর-একটি পার্থক্যের নির্দেশ করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাকৃত যাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রতি পর্বে 'কবিরা বিনা দ্বিধায় (দুয়েক মাত্রার) ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ—সে-সব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়' (পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৩৮০)। প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিশেষ মূল্যবান্ বলেই আমি মনে করি। প্রাকৃত বাংলা ছন্দের আসল প্রকৃতির একটা দিক্ তাঁর এই উক্তিতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর এই মন্তব্যটির যথার্থ মর্যাদা কতখানি, ছন্দরসিকমাত্রই তা অনুভব করবেন। এ বিষয়ে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা যাবে এবং আমরা দেখব যে শুধু এই কথাতেই প্রাকৃত ছন্দের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না, তার syllabic প্রকৃতির নির্দেশ করা একান্ত আবশ্যক। যা হক, দেখা গেল প্রাকৃত বাংলার যাণ্মাত্রিক ছন্দে প্রতি পর্বে দুই-এক মাত্রার ফাঁক রাখা সম্ভব এবং অধিকাংশ স্থলেই সে ফাঁক রাখাও হয়। কিন্তু সাধু বাংলার যাণ্মাত্রিক ছন্দে সে-রকম ফাঁক রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দুরকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য বলা যেতে পারে যে, একটি হচ্ছে বে-ফাঁক যাণ্মাত্রিক ছন্দ এবং আর-একটি হচ্ছে স-ফাঁক যাণ্মাত্রিক ছন্দ। কিন্তু এই পার্থক্যটিও গৌণ এবং উভয় ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য নয়। কেননা, প্রাকৃত বাংলার ছন্দও অনেক সময় বেফাঁক হয়ে থাকে এবং এভাবে ছন্দ রচনা করা খুবই সহজসাধ্য। তাহলেই এই ফাঁকের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এই উভয় ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে নির্দেশ করে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। যথা—

(১) ফাগুন যামিনী, | প্রদীপ জ্বলিছে | ঘরে
দখিন বাতাস | মরিছে বুকের | পরে।

—ভ্রষ্টলগ্ন, কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ

(২) আজকে কেবল | বউ কথা কও | ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার | পুষ্প-পাগল | শাখে।

—সংবরণ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

সাধু এবং প্রাকৃত বাংলার পার্থক্য কিংবা ফাঁকের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে আশ্রয় করে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তদুটির ছন্দোগত পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ একটিকে সাধু ষাণ্মাত্রিক এবং আর-একটিকে প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দ বললেই এদের ছন্দের পার্থক্য কোথায় তা ধরা পড়বে না। আবার একটিকে বে-ফাঁক এবং আর-একটিকে স-ফাঁক বলারও উপায় নেই; কেননা এ দুটির কোনোটিতেই মাত্রার ফাঁক নেই। অথচ দৃষ্টান্তদুটিতে যে ছন্দোগত পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়ে সংশয় করা চলে না; ওই পার্থক্যটি সম্বন্ধে কানই নিঃসন্দেহরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর এ ক্ষেত্রে কানের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নয় এ বিষয়ে বোধ করি কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তদুটির ছন্দোগত পার্থক্য কোথায়? আমার মতে সে পার্থক্যটি হচ্ছে সিলেব্‌ল্-সংখ্যা নিয়ে। একটি হচ্ছে সিলেব্‌ল্-নিরপেক্ষ ষাণ্মাত্রিক ছন্দ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সিলেব্‌ল্-সাপেক্ষ ষাণ্মাত্রিক ছন্দ। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে মুখ্যতঃ মাত্রাবৃত্ত (ছয় মাত্রার) ছন্দ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গৌণতঃ ষাণ্মাত্রিক এবং মুখ্যতঃ syllabic অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দ। প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে আমি কেন syllabic বা স্বরবৃত্ত বলি যথাস্থানে তা বোঝাতে চেষ্টা করব।

৫

প্রাকৃত বাংলা ছন্দের পর্বগুলোতে যে কবিরা বিনা দ্বিধায় মাঝে মাঝে দুই-এক মাত্রার ফাঁক রেখে দিতে পারেন তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ও-ছন্দটা মাত্র গৌণতঃ ষাণ্মাত্রিক, মুখ্যতঃ নয়। যদি এ-ছন্দটা মুখ্যতঃই ষাণ্মাত্রিক হত তাহলে ওভাবে মাঝে মাঝে মাত্রার ফাঁক রাখাই সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধু বাংলার ষাণ্মাত্রিক ছন্দটা মুখ্যতঃই ষাণ্মাত্রিক বলে ও-ছন্দে মাঝে মাঝে মাত্রার ফাঁক রেখে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া, এ-ছন্দটি যদি মুখ্যতঃই ষাণ্মাত্রিক হত তাহলে এ-ছন্দের কোনো পর্বে কখনও ছয় মাত্রার বেশি থাকতে পারত না। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, এ-ছন্দের পর্বে কখনও কখনও ছয় মাত্রার বেশি অর্থাৎ সাত মাত্রা এবং এমন কি আট মাত্রাও থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(১) শেষ বসন্তের | সন্ধ্যা-হাওয়া | শস্যশূন্য | মাঠে
উঠল হাহা | করি।

—পরামর্শ, কণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) তোমরা যদি | পুনর্জন্মে | হও পুনর্বার | সমালোচক

—কর্মফল, ঐ, ঐ

×

(৩) নবরত্নের | সভার মাঝে | রইতাম একটি | টেরে

—সেকাল, ঐ, ঐ

×

(৪) রোগের ঋণের | শেষ রাখ না, | কলঙ্কের শেষ | রাখবে কি?

—মৃত্যু-স্বয়ংবর, অভ্র-আবীর, সত্যেন্দ্রনাথ

×

(৫) এম্‌নি কশাই | মাষ্টার মশাই | শুনবে নাকো | সে ওজর।

—নাম-কাটা সেপাই, নতুন-খাতা, কিরণধন

×

(৬) মন-চুরির সেই | মন্ত্রখানা—
আমার যেটা | ছিল জানা,
বিলিয়ে সেটা | দিলেম পথে | ঘাটে।

—পয়লা তারিখ বোশেখ মাসে, ঐ, ঐ

×

(৭) সে যদি তোর | থাক্‌তো, খানিক | আবদার কর্ত্তিস্ | শোবার আগে,
দাবি কর্ত্তিস্ | চুমা।

—মাতৃহারা, আলেখ্য, দ্বিজেন্দ্রলাল

(৮) অনেক বাক্য | হানাহানি;

×

গর্জন-বর্ষণ | অনেকখানি।

—বিবাহ-যাত্রী, ঐ, ঐ

লক্ষ করার বিষয়, ঢেরা-চিহ্নিত পর্বগুলিতে ছয় মাত্রার বেশি আছে; প্রথম ছটি দৃষ্টান্তে আছে সাত মাত্রা করে এবং শেষ দুটি দৃষ্টান্তে আছে আট

মাত্রা করে। এখানে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে; প্রয়োজন হলে আমাদের কাব্যসাহিত্য থেকে এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি আমাদের কবিরা এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহু স্থলেই তাঁর কথিত প্রাকৃত বাংলা ছন্দের ষাণ্মাত্রিকতার বিধি লঙ্ঘন করে থাকেন। এর থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই করা চলে যে, হয় রবীন্দ্রনাথের কথিত ষাণ্মাত্রিকতার বিধি প্রাকৃত বাংলার ছন্দের পক্ষে গৌণ, না হয় উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে (এবং রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও) ছন্দ-পতন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার কি মীমাংসা করেন তা জানতে উৎসুক আছি।

৬

পূর্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে আট পর্বেই ষাণ্মাত্রিকতার বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় ওই আটটি পর্বেই চার সিলেব্‌ল্‌-এর বিধি রক্ষিত হয়েছে। তার থেকে শুধু এই অনুমানই করা যায় যে, প্রাকৃত বাংলার ছন্দ রচনার সময় কবিরা (এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও) স্বতঃই প্রতি পর্বে চার সিলেব্‌ল্‌ রক্ষা করে থাকেন; প্রতি পর্বে ছয় মাত্রার বেশি হচ্ছে কি কম হচ্ছে সেটা তাঁদের নিকট গৌণ বলেই গণ্য হয়।

প্রাকৃত ছন্দের ষাণ্মাত্রিক প্রকৃতিটা গৌণ বলেই কবিরা বিনা দ্বিধায় এ ছন্দের পর্বে দু-এক মাত্রার ফাঁকও রাখেন এবং দু-এক মাত্রা বেশিও রাখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করি যে, এ ছন্দটা মূলতঃ ষাণ্মাত্রিকই বটে। কিন্তু ওই ষাণ্মাত্রিকতাই এ ছন্দের আসল কথা নয়, ওর ভিতরকার চার সিলেব্‌ল্‌-এর সমাবেশটাই এ ছন্দের আসল কথা। আমার বক্তব্য এই যে, চার সিলেব্‌ল্‌-এর যোগে ছয় মাত্রা রক্ষা করাই প্রাকৃত ছন্দের সাধারণ বিধি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ ছন্দের পর্বে প্রকাশ্যতঃ ছয় মাত্রা থাকে না। প্রায়শঃই দু-এক মাত্রা উহ্য থাকে; আবৃত্তির ঝোঁকে স্বরকে টেনে সে অভাব পূরণ করে নিতে হয়। আবার কখনও কখনও দু-এক মাত্রা বেশিও থাকে; তখন সেই সাত বা আট মাত্রার ধ্বনিকে ঠেসে কমিয়ে ছয় মাত্রায় পরিণত করতে হয়। যথা—

এই কি তবে- | অন্তিম বিকাশ?
এই কি জীবের | চরম গতি-?
নাই কি কিছু- | পরে-?

—সত্যযুগ, আলেখ্য, দ্বিজেন্দ্রলাল

এখানে তিনটি পর্বে প্রকাশ্যতঃ পাঁচ মাত্রা করে আছে। কিন্তু প্রত্যেকটিতেই এক মাত্রার ফাঁক আছে, আবৃত্তির ঝোঁকে আপনি তা পূরণ হয়ে যায়। আবার, একটি পর্বে ('অন্তিম বিকাশ') আছে প্রকাশ্যতঃ সাত মাত্রা; কিন্তু এখানেও আবৃত্তির ঝোঁকে ধ্বনিকে ঠেসে এক মাত্রা কমিয়ে নিতে হচ্ছে। অতএব দেখতে পাচ্ছি, এ ছন্দ আসলে ষাণ্মাত্রিকই বটে। কিন্তু এ ছন্দের গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, ওই ছয় মাত্রা চারটি সিলেব্‌ল্‌-এর যোগে উৎপন্ন হওয়া চাই। প্রকাশ্যতঃ এর পর্বের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়; কিন্তু সিলেব্‌ল্‌-এর পক্ষে সে কথা খাটে না। অর্থাৎ এ ছন্দের পর্বে সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যাকে যথেচ্ছ ভাবে বাড়ানো কমানো যায় না। (এ বিষয়ে দু-একটি ব্যতিক্রম আছে; যথাসময়ে তার আলোচনা করা যাবে)। সাধারণ ষাণ্মাত্রিক ছন্দে পর্বগত সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার কোনো স্থিরতা নেই; এ ছন্দের পর্বে তিন, চার, পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্‌ থাকতে পারে। কিন্তু প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রতি পর্বে অনধিক চার সিলেব্‌ল্‌ থাকবেই। এইটেই এ ছন্দের প্রধান কথা; তাই আমি এ ছন্দকে চতুঃস্বর (tetra-syllabic) স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে অভিহিত করেছি। এ ছন্দের পর্বে যদি চারের অধিক সিলেব্‌ল্‌ থাকে তবে অমনি পাঠকের শ্রুতিরুচি পীড়িত হয় অর্থাৎ ছন্দ-পতন ঘটে। 'পুনশ্চ বক্তব্যে' রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রাকৃত বাংলা ছন্দে প্রতি পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌ থাকা আবশ্যক নয়; পাঁচ সিলেব্‌ল্‌ও চলতে পারে। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তটি হচ্ছে এই—   ৫   ৪   ৩   ১

শিবু ঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান

এখানে শেষ পর্বে আছে এক সিলেব্‌ল্‌। এ ছন্দে শেষ পর্বে এক থেকে চার পর্যন্ত সিলেব্‌ল্‌ অনায়াসেই থাকতে পারে। সুতরাং এক সিলেব্‌ল্‌ আছে বলে কোনো বিশেষত্ব হয় নি। দ্বিতীয় পর্বে আছে চার সিলেব্‌ল্‌, আর এইটেই এ ছন্দের সাধারণ নিয়ম। তৃতীয় পর্বে আছে তিন সিলেব্‌ল্‌, এইটে একটি ব্যতিক্রম এবং এরকম ব্যতিক্রম এ ছন্দে চলে থাকে। কিন্তু প্রথম পর্বে আছে পাঁচ সিলেব্‌ল্‌। আমি বলি এটা এ ছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমাদের দেশে প্রচলিত যেসব ছড়া আছে সেগুলিকে সর্বদাই টেনে সুর করে পড়তে হয় এবং ওই সুরের দ্বারাই ছন্দের অনেক ত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যিক কবিতায় ওসব ত্রুটি কখনো মার্জনীয় নয়। ঠিক এই কারণেই এই ছড়ার

লাইনটিতে 'শিবু ঠাকুরের' পর্বটি মার্জনীয় হতে পারে। কিন্তু কবিতার ছন্দে এরকম পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর পর্ব কানের সমর্থন পাবে মনে করি নে। আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় শৈলেন্দ্রবাবুও এই কথাই বলেছেন। তা ছাড়া, এই ছড়াটিও আমরা বাল্যকালে যেভাবে শুনেছি ও শিখেছি তাতে আমরা 'শিব ঠাকুরের'ই পেয়েছি, 'শিবু ঠাকুরের' নয়। আমার বিশ্বাস ছড়ার পক্ষেও 'শিবু ঠাকুরের' কথার চেয়ে 'শিব ঠাকুরের'ই অধিকতর সংগত।

প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যে কোনো পর্বে পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্ কখনোই হয় না তার প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি যে, বাংলা সাহিত্যে এ ছন্দের প্রবর্তক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যসাহিত্যে এ ছন্দে পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর একটিমাত্র পর্বও আমি খুঁজে পাই নি। যদি এরকম একটিমাত্র পর্বও পাওয়া যায় তা হলে প্রাকৃত বাংলা ছন্দের চতুঃস্বর প্রকৃতি সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করা আবশ্যক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তো তর্কের খাতিরে উপরের ছড়ার পংক্তিটিতে একটি পর্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর অস্তিত্ব সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে ঠিক অনুরূপ রচনায় কি করেছেন দেখা যাক।—

কবে বিষ্টি | পড়েছিল, | বান এল সে | কোথা ?
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল, | কবেকার সে | কথা ?

—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, কড়ি ও কোমল

এখানে তো তিনি 'শিবু ঠাকুরের' লেখেন নি। কেন ? কারণ 'শিবু' লিখলেই কবির স্বাভাবিক ধ্বনিরসবোধ পীড়িত হবে। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বাহিরে ছিল | সাধুর আকার | মনটা কিন্তু | ধর্ম-ধোয়া।
... ...
যেমন কর্ম | ফল্‌ল ধর্ম | বুড় শালিকের | ঘাড়ে রোঁয়া।

—মধুসূদন

এখানে দুটি পর্বে ('বাহিরে ছিল,' 'বুড় শালিকের') পাঁচ সিলেব্‌ল্ আছে এবং তাতে ছন্দে ত্রুটি ঘটেছে বলে আমি মনে করি। কেননা ওই দুই পর্বের ধ্বনি আমার কানের সমর্থন পাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ এই দুই পংক্তির ছন্দকে নিখুঁত মনে করেন কি না জানবার ঔৎসুক্য হয়। কিন্তু তাঁর কোনো রচনাতেই ওরকম একটিমাত্র পর্বও আজ পর্যন্ত পাই নি বলে মনে হয়,—তিনিও ও-দুটি পর্বকে নিখুঁত মনে করবেন না। আর-একটি দৃষ্টান্ত—

ছেলে ঘুমুলো | পাড়া জুড়ুলো | বর্গী এলো | দেশে—
বুলবুলিতে | ধান খেয়েছে | খাজনা দেব | কিসে ?

এ ছড়াটার ছন্দ সম্বন্ধে কি বলা যায় ? এটাকে কি পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত বলব ? না, রবীন্দ্রনাথের কথিত প্রাকৃত বাংলার ষাণ্মাত্রিক ছন্দ বলব ? যদি এটাকে বলা হয় পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, তা হলে তো এর পর্বের সিলেব্‌ল্-সংখ্যার অসমতা নিয়ে কোনো তর্কই হতে পারবে না। কিন্তু যদি বলা যায়, এটা প্রাকৃত বাংলার ষাণ্মাত্রিক ছন্দ, তা হলে এর প্রথম দুটি পর্বকে 'শিবু ঠাকুরের' পর্বটির স্বজাতীয় বলে গণ্য করতে হবে ; অর্থাৎ বলতে হবে ছড়াতে এরকম চললেও কবিতায় এরকম চলে না, অন্ততঃ আজ পর্যন্ত কেউ এরকম চালান নি। আমার বিবেচনায় এটিকে পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত বলে গণ্য করাই সংগত ; কারণ এই দুই পংক্তির সব পর্বেই (অবশ্য শেষ দুটি পর্ব ছাড়া) পাঁচ মাত্রা করে আছে।

৭

প্রাকৃত বাংলার ছন্দ যে সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা-নিরপেক্ষ ষাণ্মাত্রিক ছন্দ নয় এবং এটি যে আসলে একটি চতুঃস্বর-ষাণ্মাত্রিক ছন্দ, এ কথার সপক্ষে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের রচিত এ ছন্দের যে-কোনো একটি পংক্তি নিয়ে সিলেব্‌ল্-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে পরীক্ষা করলেই এ ছন্দের যথার্থ স্বরূপটি ধরা পড়বে। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েচি অরূপরতন আশা করে' এই পংক্তিটির ছন্দ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—

রূপ সাগরে- | ডুব দিয়েচি- | অরূপ রতন | ইত্যাদি।

অর্থাৎ এ ছন্দটা যে আসলে ষাণ্মাত্রিক তিনি তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমি বলি এটা ষাণ্মাত্রিক বটে ; কিন্তু এর প্রতি পর্বের ছয় মাত্রা সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা-নিরপেক্ষ নয়, পরন্তু প্রতি পর্বেই চারটি সিলেব্‌ল্-এর যোগে ওই ছয় মাত্রাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। প্রতি পর্বের মাত্রাপরিমাণ স্থির রেখে যদি এর সিলেব্‌ল্-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো যায় তা হলেই দেখা যাবে যে, মাত্রাপরিমাণ ঠিক থাকা সত্ত্বেও ছন্দ ঠিক থাকে না। যেমন—

(১) রূপের সাগরে | ডুব দিয়েছি | অরূপ রতন | আশা করি

কিংবা

(২) রূপসাগরে | ডুব দিলাম | অরূপ রতন | আশা করি

এখানে প্রথমটিতে 'শিবুঠাকুরের' এই নজিরে এক সিলেব্‌ল্ বাড়িয়েছি। কিন্তু ছয় মাত্রা ঠিক রেখেছি। অথচ এই পংক্তিটিতে যে ছন্দপতন ঘটেছে এ বিষয়ে সন্দেহমাত্রও নেই। রবীন্দ্রনাথের কথিত ষাণ্মাত্রিকতাই যদি এ ছন্দের আসল কথা হত তা হলে সিলেব্‌ল্-সংখ্যার এই পরিবর্তনে ছন্দ অব্যাহতই থাকত। কিন্তু তা যখন থাকে নি তখন বলতে হবে যে, ষাণ্মাত্রিকতাই এর আসল কথা নয়, চতুঃস্বরতাই এর মূল কথা; কেননা চারটি সিলেব্‌ল্ ঠিক রেখে মাত্রাসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিতে এ ছন্দের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণই থাকে।

উপরে দ্বিতীয় পংক্তিটির দ্বিতীয় পর্বে এক সিলেব্‌ল্ কমিয়েছি, 'তিন কন্যে'র নজিরে; কিন্তু মাত্রাপরিমাণে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তথাপি এই পংক্তিটিতেও যে ছন্দ-পতন ঘটেছে তা সকলেই স্বীকার করবে। বিশেষ লক্ষ করার বিষয় এখানে চতুর্থ পর্বটি দু মাত্রার ফাঁক থাকা সত্ত্বেও নিখুঁত আছে, কারণ ওখানে চার সিলেব্‌ল্ আছে। অথচ দ্বিতীয় পর্বটিতে মাত্র এক মাত্রার ফাঁক আছে, তথাপি এ পর্বটির পঙ্গুতা ঘোচে নি; কারণ এখানে চার সিলেব্‌ল্ নেই।

আশা করি এখন আর সন্দেহ নেই যে, প্রাকৃত বাংলা ছন্দের ষাণ্মাত্রিকতাই প্রধান কথা নয়, এর চতুঃস্বরতাই প্রধান কথা। অর্থাৎ চার সিলেব্‌ল্-এর যোগে স-ফাঁক বা বে-ফাঁক ছয় মাত্রা রক্ষা করাই এ ছন্দের রীতি।

রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দের যে বে-ফাঁক দৃষ্টান্তটি রচনা করেছেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

স্বপ্ন আমার | বন্ধনহীন | সন্ধ্যাতারার | সঙ্গী
মরণযাত্রী | দলে,
স্বর্ণবরণ | কুজ্ঝটিকায় | অস্তশিখর | লঙ্ঘি'
লুকায় মৌন | তলে।

—পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৩৮০

এ ছন্দটাকে 'প্রাকৃত' বলার কোনো কারণ নেই; কেননা এখানে প্রাকৃত বাংলার বিশেষ কোনো লক্ষণই নেই। তথাপি এটিকে তিনি প্রাকৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত বলেই গ্রহণ করেছেন; তার কারণ এই যে, এটিতে প্রাকৃত বাংলা ছন্দের ধ্বনি অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ধ্বনি রয়েছে। লক্ষ করার বিষয় এর প্রতি পর্বেই চারটি করে সিলেব্‌ল্ রয়েছে। কিন্তু যদি তৃতীয় লাইনের দ্বিতীয় পর্বটিতে এক সিলেব্‌ল্ বাড়িয়ে লেখা যায় 'কুজ্ঝটিকাতে', তা হলে অমনি

প্রাকৃত ছন্দের ধ্বনিটিতে পঙ্গুতা ঘটবে। চতুঃস্বর ছন্দের কোনো পর্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্ বসালেই ছন্দে স্খলন ঘটে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু আরও লক্ষ করা প্রয়োজন যে, 'কুজ্ঝটিকাতে' লিখলেও ওই লাইনটাকে সিলেব্‌ল্-নিরপেক্ষ যাণ্মাত্রিক ছন্দ হিসাবে অতি অনায়াসেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দের ধ্বনি অর্থাৎ আবৃত্তির ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত হিসাবে ওই লাইনটাকে যে লয়ে আবৃত্তি করা হয়, নিছক যাণ্মাত্রিক হিসাবে আবৃত্তির লয় তার চেয়ে বিলম্বিত হবে। কেননা, স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট। যুগ্মধ্বনির এই উচ্চারণ-পার্থক্যের জন্যই স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আবৃত্তির লয়ে এমন পার্থক্য ঘটে। যথাসময়ে এ বিষয়ে আরও বলা যাবে।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' এই স-ফাঁক যাণ্মাত্রিক (অর্থাৎ চতুঃস্বর যাণ্মাত্রিক) পংক্তিটার ফাঁক ভরিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিতরূপে রূপান্তরিত করেছেন—

বৃষ্টি পড়্‌চে টাপুর টুপুর নদেয় আস্‌চে বন্যা

—পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৩৭৯

এটা হল বে-ফাঁক যাণ্মাত্রিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেন এভাবে ফাঁক ভর্তি করা সত্ত্বেও ছন্দের মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণই রইল অর্থাৎ স-ফাঁক ও বে-ফাঁক যাণ্মাত্রিক ছন্দ মূলতঃ একই। আমি পূর্বেই বলেছি ফাঁক রাখা ও ফাঁক পূরণ নিয়েই এ দুই ছন্দের আসল পার্থক্য নয়; আসল পার্থক্য প্রাকৃত যাণ্মাত্রিকে সিলেব্‌ল্-সংখ্যার স্থিরতা এবং তথাকথিত সাধু যাণ্মাত্রিকে সিলেব্‌ল্-সংখ্যার অ-স্থিরতা। লক্ষ করার বিষয়, 'বৃষ্টি পড়ে' প্রভৃতি লাইনটার স-ফাঁক ও বে-ফাঁক উভয় রূপেই প্রতি পর্বে চার সিলেব্‌ল্ আছে এবং সেজন্যই এই উভয় রূপের মধ্যে ধ্বনিগত বিশেষ পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সেজন্যই এই উভয় রূপের ছন্দ মূলতঃ একই। কিন্তু যদি সিলেব্‌ল্-সংখ্যার মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো যায় তবে ছন্দ অপরিবর্তিত থাকবে না। যদি এই ছন্দের ধ্বনিকে অপরিবর্তিত রাখতে হয় তবে এর প্রতি পর্বের সিলেব্‌ল্-সংখ্যাকেও অপরিবর্তিত রাখতে হবে। আর যদি সিলেব্‌ল্-সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটানো যায় তা হলে প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা পূরণ করে দিতে হবে, নতুবা ছন্দ-পতন ঘটবে। কেননা, যখন সিলেব্‌ল্-সংখ্যা ঠিক থাকে তখন মাত্রার ইতরবিশেষে ক্ষতি হয় না; আবার মাত্রাসংখ্যা যখন ঠিক থাকে তখন সিলেব্‌ল্-সংখ্যা ঠিক

রাখা আবশ্যিক নয়। সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা স্থির না থাকলেও শুধু মাত্রাসংখ্যার স্থিরতার দ্বারাই ছন্দ-রক্ষা হয়। উপরের লাইনটিতে যদি সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা ঠিক না রেখে লেখা যায়—

বৃষ্টি পড়িছে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান

কিংবা বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদীতে এল | বান

তা হলে ছন্দ নিখুঁত থাকবে না। এমন কি, 'বৃষ্টি পড়িছে টাপুর টুপুর নদীতে এল বান' এরূপ লিখে তৃতীয় পর্বে এক মাত্রার ফাঁকের দোহাই দিলেও ছন্দের পঙ্গুতা ঘুচবে না। সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা ঠিক না রেখে ছন্দ ঠিক রাখতে হলে প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা পূরণ করে দিয়ে লিখতে হবে—

বৃষ্টি পড়িছে | টাপুর টুপুর | নদীতে আসিল | বান।

নতুবা ছন্দ ঠিক থাকবে না। সুতরাং আমরা দেখলুম যে, এক রকম ছন্দের প্রতি পর্বে চার সিলেব্‌ল্‌ ঠিক রেখে ছয় মাত্রার স্থলে দু-এক মাত্রার ফাঁক রাখা চলে; এই ছন্দকেই আমি বলি স্বরবৃত্ত চতুঃস্বর ছন্দ। এর ষাণ্মাত্রিকতাটা যে গৌণ সে-সম্বন্ধে বোধ করি আর সন্দেহ নেই। আর-এক রকমের ছন্দের প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা থাকা চাই-ই, সিলেব্‌ল্‌ সংখ্যার স্থিরতা রক্ষা করা আবশ্যিক নয়। এই ছন্দটাকেই মুখ্যতঃ ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বলা যায়, অপরটাকে নয়। এই জন্যেই—

বৃষ্টি পড়্‌ছে টাপুর টুপুর নদেয় আস্‌ছে বন্যা,
শিব ঠাকুরের হয় পরিণয় দান হবে তিন কন্যা।

এটাকে বলব স্বরবৃত্ত ছন্দ, যদিও এর প্রতি পর্বেই ছয় মাত্রা ঠিক আছে। কেননা, এ ছন্দটা স্বরসংখ্যা-নিরপেক্ষ নয়। এর চতুঃস্বরতাই মুখ্য কথা; ষাণ্মাত্রিকতাটা গৌণ। আবার—

বৃষ্টি পড়িছে টাপুর টুপুর নদীতে আসিল বন্যা,
শিবু ঠাকুরের বিবাহবাসরে দান হবে তিন কন্যা।

এটাকে বলব ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। কেননা, এটা সম্পূর্ণরূপেই স্বরসংখ্যা-নিরপেক্ষ। এটার ষাণ্মাত্রিকতাই মুখ্য কথা এবং এর পর্বের সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার প্রশ্নটা একেবারেই অবান্তর।

৮

এবার উপেনবাবুর ঘোষিত 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা

প্রয়োজন। উপেনবাবু দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন বটে এবং অস্ত্রাগারের দ্বার উন্মোচন না করে স্ব-নির্মিত দারুণ অস্ত্রই প্রাণপণে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু কি এবং তাঁর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের লক্ষ্য কি, সে বিষয়ে তাঁর লক্ষমাত্রও নেই। সুতরাং তাঁর শাণিত শর যে লক্ষ্যবেধ করতে সমর্থ হয় নি, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। শুধু হুংকারে এবং টংকারেই লড়াই ফতে হয় না; স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। 'বাংলা ছন্দে চার সিলেব্‌লের সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌লের মিল হয় না' (ছন্দের দ্বন্দ্ব, বিচিত্রা—বৈশাখ, পৃ ৫৬৮), এমন কথা আমি কখনও বলি নি। কিংবা 'ছন্দে সিলেব্‌ল্ প্রধান অথবা মাত্রা প্রধান' (কবির পুনশ্চ বক্তব্য, বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৮২), প্রশ্নটা তাও ছিল না। আমার বক্তব্য ছিল প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত 'ছন্দের পর্বগুলিতে কখনও পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্ চালানো যায় না' (ঐ, পৃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য)। আমার এই উক্তিটিকে অপ্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে তিনি 'গুরুর আদেশে' যে 'ত্রিবিধ প্রমাণ' হাজির করেছেন তার প্রত্যেকটিই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, একটিও প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত নয়। আর তাঁর রচিত মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তের মধ্যে অভিনবতাও আছে। যথা—

(১) ঘন তমসার সজল মায়া বিছালো ছায়া নেত্রে তব,
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে হাস্য ঝরে কি অভিনব!

(২) বুঝি না কি যে আছে তব মনে সঙ্গোপনে,
প্রণয়ী জনে কেন অকরুণ বিদায়-ক্ষণে!

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই দৃষ্টান্ত-দুটিতে রচনানৈপুণ্য এবং ছন্দের নূতনত্ব আছে; এই নূতনত্ব চার সিলেব্‌ল্-এর সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর যোগে নয়, ছয় মাত্রার সঙ্গে পাঁচ মাত্রার যোগে।

কিন্তু মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত দ্বারা যে স্বরবৃত্তের স্বরূপ নির্ণীত হতে পারে না, একথা বোধ করি উপেনবাবুকে বলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে তিন, চার, পাঁচ, ছয় সব সিলেব্‌ল্ই চলে সে কথা সকলেই জানে। সুতরাং এই সর্বজনবিদিত তথ্যটি প্রমাণিত করার জন্যে তিনি এতটা কষ্ট স্বীকার না করলেও পারতেন। আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় অমূল্যবাবু এবং শৈলেন্দ্রবাবু উভয়েই এ কথা বলেছেন। সুতরাং আমার আর কিছু না বললেও চলত। কিন্তু উপেনবাবুর মনে প্রতীক্ষা আছে; কেননা তিনি বলেছেন 'দেখিব এখন কি বিধি করেন

প্রবোধ সেনে।' তাই দু-একটি কথা বলতে হল। কিন্তু তাঁর রচিত দৃষ্টান্ত-তিনটি দেখেও কোনো নতুন বিধি করার আবশ্যকতা বোধ করি নি। কেননা একটি পুরানো 'বিধি'তেই আমি ওই সিলেব্‌ল্-সংখ্যার বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছি। আমি সেটির প্রতিই উপেনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৩৩০ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী' (পৃ ৮৫) থেকে সেটি উদ্ধৃত করছি।—'কবিরা অনেক সময় কেবল স্বরসংখ্যা ঠিক রেখেই ছন্দ রচনা করেন। এইটেই খাঁটি স্বরবৃত্ত ছন্দ; এ ছন্দে মাত্রাপরিমাণ স্থির থাকে না। আবার অনেক সময় তাঁরা কেবল মাত্রাসংখ্যা ঠিক রেখেই কবিতা রচনা করেন। এইটেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ; এ ছন্দে স্বরসংখ্যা স্থির থাকে না'। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, 'স্বর' কথাটি আমি সিলেব্‌ল্ অর্থেই ব্যবহার করেছি।

আশা করি উপেনবাবু এখন তাঁর ত্রি-শূল অস্ত্রের ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু নিরস্ত্র হয়েছেন বলেই যে তিনি নিরস্ত হবেন এমন আশা আমি করি নে। কেননা, নিরস্ত্র হলেও যে অনেকে নিরস্ত হন না, সে কথা কে না জানে? তিনি নিরস্ত্র হন বা না হন আমার পক্ষে আশ্বস্ত হবার একটু কারণ আছে। কোনো ছন্দেই চার সিলেব্‌ল্-এর সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর মিল হয় না, আমি এ কথা বলেছি এরূপ অকারণ আশঙ্কা করে তিনি আমার সঙ্গ ছাড়বেন এরূপ ভয় দেখিয়েছিলেন। আমার উক্তরূপ কৈফিয়তের পরে আশা করি তিনি আমাকে সঙ্গপরিত্যাগের শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন। পরিশেষে তাঁকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। ছন্দের বিচারে তিনি কানকে মানেন; আমি কানকে মানি নে কল্পনা করে তিনি আমার বিরুদ্ধে কানখাড়া করেছেন। আমার জবাব এই যে, আমি কানকে তো মানি বটেই; উপরন্তু আমি ছন্দের যে শাস্ত্র ও নিয়ম রচনা করতে প্রয়াসী সেটা তো ওই কানেরই নিয়ম। কানকে যে মানে না তাকে সুধীজন 'বে-কানা কহে', এ বিষয়ে আমি উপেনবাবুর সঙ্গে একমত। কিন্তু গুরুর নিকট এক ছন্দের দৃষ্টান্ত রচনার আদেশ পেয়ে যিনি অন্য ছন্দের দৃষ্টান্ত রচনা করে হাজির করেন, সুধীজনেরা তাঁকে কি কহেন?

৯

পরিশেষে অমূল্যবাবুর ছন্দোবিশ্লেষণ-প্রণালী সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলেই বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। তিনি বলেন, 'বাংলা ছন্দ মাত্রেই মাত্রা-ছন্দ'; বাংলায় সিলেব্‌ল্-এর ছন্দ নেই। অর্থাৎ তাঁর মতে সমস্ত বাংলা ছন্দই

quantitative এবং বাংলায় syllabic ছন্দের অস্তিত্ব নেই। তাঁর এই মতটা আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের মতের সহিত অভিন্ন বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, কবির মতের সঙ্গে অমূল্যবাবুর মতের পার্থক্য খুবই গুরুতর। অমূল্যবাবু দু-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে যে-ভাবে ছন্দোবিশ্লেষণ করেছেন তার থেকেই এই পার্থক্যটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। যথা—

বাপ বললেন | কঠিন হেসে | তোমরা মায়ে | ঝিয়ে
এক লগ্নেই | বিয়ে করো | আমার মরার | পরে।

—নিষ্কৃতি, পলাতকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মতে এইটে হচ্ছে 'ষাণ্মাত্রিক' ছন্দ। অমূল্যবাবু বলেন এটি হচ্ছে 'চাতুর্মাত্রিক' ছন্দ। তবেই দেখা যাচ্ছে উভয়ের মতের মধ্যে একমাত্র 'মাত্রা'র কথা ছাড়া আর কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। আমি বলি এইটে হচ্ছে 'চতুঃস্বর' (tetrasyllabic) ছন্দ। অমূল্যবাবু যদি এখানে 'মাত্রা' শব্দটিকে ব্যষ্টি বা unit (এ ক্ষেত্রে ছন্দের সিলেব্‌ল্) অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন, তা হলে তাঁর মতে ও আমার মতে অমিল নেই। কেননা, আমিও আলোচ্য ছন্দের unit অর্থেই 'স্বর' কথাটি ব্যবহার করেছি এবং সিলেব্‌ল্‌কেই এ ছন্দের unit বলে গণ্য করেছি। কিন্তু সম্ভবতঃ অমূল্যবাবুর অভিপ্রায় অন্য রকম; তিনি ধ্বনির মাত্রাপরিমাণের (quantity-র) unit অর্থেই 'মাত্রা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ, 'বাপ বল্‌লেন' এবং 'এক লগ্নেই' এই তিন-সিলেব্‌ল্-আত্মক পর্ব-দুটিতেও তিনি চার মাত্রাই গণনা করেছেন বলে বোধ হল। যদি তাই হয়, তা হলে তাঁর কথিত 'মাত্রা' আর সিলেব্‌ল্ যে আলোচ্য ছন্দেও দুটি ভিন্ন বস্তু তা সুস্পষ্ট। কিন্তু কোন্ গণনাপদ্ধতি অনুসারে তিনি উক্ত দুটি পর্বেও চার মাত্রার হিসাব করেন তা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি। আর, কেনই বা তিনি সমস্ত বাংলা ছন্দকেই মাত্রা-ছন্দ বলে মনে করেন তাও ঠিক জানি নে। যত দিন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত মত বিশদ রূপে প্রকাশিত না হবে তত দিন তাঁর মতের আলোচনা করা সম্ভব হবে না। যা হক, চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দে কিরূপে মধ্যে মধ্যে ত্রিস্বর (trisyllabic) পর্বের সমাবেশ ঘটে, এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাব। সুতরাং এ প্রসঙ্গটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রইল। (এই প্রসঙ্গে প্রবাসী ১৩২৯ মাঘ, পৃ ৫০০-৫০১; বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ, পৃ ৫১০ এবং জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য।)

প্রাকৃত বাংলা ছন্দের স্বরূপটি দেখছি ক্রমেই নানা তর্কের জালে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এটি হচ্ছে মূলতঃ ষাণ্মাত্রিক; অমূল্যবাবুর মতে এটি চাতুর্মাত্রিক। আবার সত্যেন্দ্রনাথের মতে এটি মুখ্যতঃ 'চারের ঘরানা' অর্থাৎ tetrasyllabic হলেও গৌণতঃ পাঞ্চমাত্রিক। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন— "তুমি যাকে চারের ঘরানা—চারালী বা লাচারী—বলছ, তাকে পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালীও বলতে পার। ... (কারণ) লঘুর্ভবেদ্ একমাত্রো...ব্যঞ্জনঞ্চার্ধ-মাত্রকম্।"—ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ২৩। এই প্রসঙ্গে বিচিত্রা ১৩৩৮ চৈত্র, পৃ ৪০১ দ্রষ্টব্য। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি এ ছন্দটা কারও মতে চাতুর্মাত্রিক, কারও মতে পাঞ্চমাত্রিক এবং কারও মতে ষাণ্মাত্রিক; আবার এক মতে ছন্দটা মূলতঃ syllabic এবং আর-এক মতে সিলেব্‌ল্-এর কথা এ ছন্দের পক্ষে একান্তই গৌণ। এই নানা তর্কের জাল বিদীর্ণ করে এ ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করা সহজসাধ্য হবে না।

পরবর্তী প্রবন্ধে এ ছন্দের প্রকৃতিগত আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করব। আশা করি তাতে এর গঠনপ্রণালীগত জটিলতার কতকটা অবসান ঘটবে।

অনুলেখ

শ্রাবণের 'পরিচয়ে' দেখলুম রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সংস্কৃত বাংলায় অনেক স্থলেই যে শব্দের পরিমাপ দুইয়ের, তার ওজনও দুইয়ের, যেমন—তো-মা স-নে; কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় প্রায়ই সে স্থলে মাপ দুইয়ের হলেও ওজন তিনের, যেমন—তো-মার সঙ-গে।" আমিও বস্তুতঃ ওই কথাই বলেছি। আমার ভাষায় প্রাকৃত অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি পর্বার্ধে সিলেব্‌ল্-সংখ্যা দুই এবং মাত্রা-পরিমাণ তিন। অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতি পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্-কে আশ্রয় করে ছয়টি করে মাত্রা থাকে; আর এইটেই এ ছন্দের আসল রীতি। সুতরাং 'পরিচয়ে'র 'ছন্দ-বিতর্ক' প্রবন্ধটি থেকে এ কথা নিসংশয়ে প্রমাণিত হল যে, আমি স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণ যে-ভাবে করি তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণপ্রণালীর যথার্থ পার্থক্য কিছুই নেই।*

* বিচিত্রা ১৩৩৯ ভাদ্র

ছন্দ-সংকট

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে যে খোলা চিঠি লিখেছেন, প্রেসে পাঠাবার পূর্বেই লেখক সেটিকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে যদি আমার কিছু বক্তব্য থাকে তবে মূল রচনার সঙ্গেই আমাকে তা প্রকাশ করবার স্থযোগ দেওয়া। তাঁর এই সাধু অভিপ্রায়ের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর রচনাটি সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য সংক্ষেপে জ্ঞাপন করছি। অনিলবরণ আমার বাংলা ছন্দের আলোচনা-গুলিকে যে খুব সূক্ষ্মভাবেই প্রত্যালোচনা করেছেন এবং প্রায় সর্বত্রই যে আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলিকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন তার বিশেষ পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। তা ছাড়া, তিনি আমার কথিত যৌগিক ছন্দের নিয়ম সম্বন্ধে যে কয়েকটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেছেন তাতেও তাঁর এই সূক্ষ্ম বিচারেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যা হক, আমার কথিত নিয়ম সম্বন্ধে তাঁর মনে যেসব সংশয় দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে আমার যা যা মনে হয়েছে তাই সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

অনিলবরণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেই ছন্দের তত্ত্ববিচারেও বাংলার গুরুস্থানীয় বলে মনে করেন। কিন্তু দিলীপকুমার স্বরবৃত্ত (syllabic) ছন্দের প্রকৃতি-বিচারে রবীন্দ্রনাথের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে অনিল-বরণ দিলীপকুমারেরই মতাবলম্বী, কেননা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি-নির্ণয়ের আলোচনায় তিনি তাঁর 'সূক্ষ্ম কবিশ্রুতিরই' পরিচয় পেয়েছেন। এ বিষয়ে আমিও অনিলবরণের ন্যায় দিলীপকুমারেরই সমর্থক। স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যথাসময়ে ও যথাস্থানে আমি বিস্তৃত আলোচনা করব। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু যৌগিক ছন্দের নিয়ম ও তার ব্যতিক্রমগুলি সম্বন্ধেই কয়েকটি মাত্র কথা বলতে চাই।

অনিলবরণ সত্যই বলেছেন যে, আমি বাংলা ছন্দের যেসমস্ত নিয়ম বার করছি সেগুলি first formulations মাত্র। আমার দাবিও তার চেয়ে বেশি নয়। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, আমার ছন্দের আলোচনা এখনও শেষ হয় নি; আমার নিজেরই যা বক্তব্য আছে তার সমস্ত কথা এখনও

আমার বলা হয় নি। সুতরাং আমার সমস্ত কথা বলা না হওয়া পর্যন্ত আমার আলোচনার মধ্যে যে অপূর্ণতা থাকবেই তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আর আমার সব কথা বলা হবার পরেও যে বাংলা ছন্দের সম্বন্ধে সব কথা বলা শেষ হবে না সে বিষয়েও আমি সচেতন আছি। কারণ জাতীয় সাহিত্যের কোনো একটা দিকের আলোচনাও এক জীবনে নিঃশেষ করা সম্ভব নয়। ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের আলোচনা শুরু হবার পর সাড়ে তিন শো বছরেরও বেশি কেটে গেল; কিন্তু এখনও কি ও বিষয়ে সমস্ত সমস্যার নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত হয়েছে? আজ যদি বাংলা ছন্দের first formulations হয়ে থাকে তবে তাতে যে অনেক অসম্পূর্ণতা মিলবে তাতে বিচিত্র কিছুই নেই।

বাংলা ভাষায় প্রাক্-হসন্ত স্বরবর্ণের (অর্থাৎ আমার পরিভাষায় যুগ্মধ্বনির) বৈকল্পিক হ্রস্বদীর্ঘতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মূলসূত্র বা dictum-এর উল্লেখ করেছেন সে বিষয়ে অনিলবরণ বলেছেন—"কিন্তু এই সূত্রের প্রয়োগ কি হইবে, স্বরবর্ণ কোথায় কতটা টানা চলিবে বা চলিবে না, সে সম্বন্ধে তিনি কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে যান নাই।" আমি ঠিক এই কথাই বলেছি বৈশাখের 'বিচিত্রা'য়। আর অনিলবরণ এ কথাও ঠিকই বলেছেন যে, আমি ওই dictum-এর প্রয়োগবিধির প্রতি লক্ষ রেখেই বাংলা ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত (quantitative), স্বরবৃত্ত (syllabic) ও যৌগিক ('অক্ষরবৃত্তে'র চেয়ে 'যৌগিক' নামটাই আমি পছন্দ করি), এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওই dictum-এর প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নি; তাই ছন্দের এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তাঁর কোনো স্পষ্ট মতামত জানা যায় নি। কিন্তু শুধু dictum দিয়ে তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে কিছু না বললে কিরূপ মুশকিল হয় তা একটু দেখানো দরকার।

রবীন্দ্রনাথের dictum-টির অর্থ হচ্ছে এই যে, বাংলা যুগ্মধ্বনিকে আমরা প্রয়োজনমতো টেনে বাড়িয়ে তাকে দুই unit-এর মর্যাদাও দিতে পারি, আবার প্রয়োজনমতো তাকে ঠেসে কমিয়ে এক unit বলেও গণ্য করতে পারি। এই কথাকেই আমি অন্যভাবে বলেছি। আমি বলি, যুগ্মধ্বনিকে আমরা কখনও উচ্চারণ করি বিশ্লিষ্টভাবে, কখনও করি সংশ্লিষ্টভাবে; আর যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ যখন বিশ্লিষ্ট তখন তার মূল্য দুই unit এবং তার উচ্চারণ যখন সংশ্লিষ্ট তখন তার মূল্য এক unit। এই মূলসূত্রটিকে অবলম্বন করে

আমি বাংলা ছন্দকে কি ভাবে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করি তাও এখানে বলা দরকার। (১) যে ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ অবস্থান-নির্বিশেষে সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট (অর্থাৎ দ্বি-ব্যষ্টিক) তাকেই আমি বলি 'মাত্রাবৃত্ত' (quantitative) ছন্দ। (২) যে ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ অবস্থান-বিশেষে সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ এক-ব্যষ্টিক) তাকে আমি নাম দিয়েছি 'স্বরবৃত্ত' (syllabic)। (৩) আর যে ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ অবস্থান বিশেষে কোথাও বিশ্লিষ্ট কোথাও সংশ্লিষ্ট সে ছন্দকে আমি বলছি 'যৌগিক' ছন্দ, কেননা যুগ্মধ্বনির দু-রকম উচ্চারণের যোগে এ ছন্দ গঠিত। এই যৌগিক ছন্দের যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কোথায় বিশ্লিষ্ট এবং কোথায় সংশ্লিষ্ট, এই বিষয় নিয়েই আসল প্রশ্ন। আমি বলেছি—এ ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট এবং শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট, এইটেই এ ছন্দের সাধারণ নিয়ম। অনিলবরণও এই সাধারণ নিয়মটির সত্যতা অস্বীকার করেন না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম (exceptions) সম্বন্ধে। এ বিষয়ে একটু পরেই আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলিকে উপলক্ষ করে বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধেই তিনি একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কার্যতঃ এইরূপ বিভাগে (কিছু) মুশকিল হয়।' তাঁর কি মুশকিল হয়েছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। মাত্রাবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁর বোধ করি কোনো সংশয় নেই। 'যৌগিক' নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী করা যায় কি না, তাঁর সংশয় বোধ হয় সে বিষয়ে। সাধারণ (অর্থাৎ বাংলার প্রাচীন) পয়ারজাতীয় ছন্দের সাধারণ নিয়ম ও তার ব্যতিক্রম যা-ই হক না কেন, এ ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ যে কোথাও বিশ্লিষ্ট, কোথাও সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বোধ করি তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথও দেখিয়েছেন যে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভণিতায় 'পুণ্যবান্' শব্দের 'বান্'-কে আমরা টেনে অর্থাৎ বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু 'পুণ্'-কে আমার ঠেসে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বা সংকুচিত করে উচ্চারণ করি। সুতরাং এই সাধারণ বা প্রাচীন পয়ারজাতীয় ছন্দ যে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর ছন্দ এবং এর প্রকৃতি যে 'যৌগিক', এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

এবার যৌগিক ছন্দের সাধারণ নিয়মটির ব্যতিক্রমগুলি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলছি। সাধারণ নিয়ম অনুসারে যৌগিক ছন্দে শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির

উচ্চারণ সর্বদাই এবং সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্বি-ব্যষ্টিক; এ নিয়মের কোথাও এবং কোনো সময়েই ব্যতিক্রম হয় না। আর পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়ম অনুসারেই এ ছন্দে শব্দ মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি 'প্রায়' সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট বা এক-ব্যষ্টিক; এ নিয়মের ব্যতিক্রম যৌগিক ছন্দে আছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলিও যথেচ্ছাচার নয়; এর মধ্যেও একটি গূঢ়তর কারণ সক্রিয় আছে বলেই আমি মনে করি। সুতরাং এগুলিকেও ঠিক নিয়মভঙ্গ বলতে পারি নে। এই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ)—

চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাক্‌রুণ।

এটা যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ার—শুধু 'ঠাক্‌রুণ' শব্দে মাত্রাবৃত্তের কায়দায় চার unit ধরা হয়েছে। কিন্তু 'চিম্‌নি' শব্দে যৌগিক ছন্দের রীতিতে দুই unit-ই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত লিপিপদ্ধতি অনুসারে এ শব্দটার রূপ হচ্ছে 'চিম্নি'।

চিম্‌নি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাক্‌রুণ মোর নাই কোনো দোষ।

এটাও যৌগিক পয়ার অর্থাৎ সাধারণ পয়ার— শুধু 'চিম্‌নি' শব্দে মাত্রাবৃত্তের কায়দায় তিন unit ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে এখানে 'ঠাক্‌রুণ' শব্দে যৌগিক ছন্দের রীতিতে তিন unit-ই ধরা হয়েছে। প্রচলিত লিপিপদ্ধতি অনুসারে এখানে এ শব্দটার রূপ হচ্ছে 'ঠাক্রুন'। লক্ষ করার বিষয় এখানে 'ঠাক্‌রুণ' শব্দের 'ঠাক্' সংশ্লিষ্ট ও একব্যষ্টিক; কিন্তু 'রুণ্' বিশ্লিষ্ট ও দ্বিব্যষ্টিক। কেননা 'রুণ্' শব্দান্তবর্তী এবং 'ঠাক্' তা নয়। যদি লেখা হয়—

চিম্‌নি ফেটেছে দেখে গিন্নি সরোষ,
ঝি বলে ঠাক্‌রুণ মোর নাই কোনো দোষ।

তা হলে আমি বলব এখানে প্রথম পংক্তিটা মাত্রিক পয়ারের পংক্তি; কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিটা যৌগিক পয়ারের পংক্তি। কেননা প্রথম পংক্তিতে যুগ্মধ্বনি অবস্থান-নির্বিশেষে সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট; কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে যুগ্মধ্বনি অবস্থান-বিশেষে কোথাও বিশ্লিষ্ট, কোথাও সংশ্লিষ্ট। যা হক, এভাবে পয়ারে একটি পংক্তিকে মাত্রিক আর-একটি পংক্তিকে যৌগিক প্রকৃতি দেওয়া যায় কিনা তা আমি বলতে পারি নে। কেননা এরকম দৃষ্টান্ত আমি কোনো কবির

রচনাতেই পাই নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের dictum অনুসারে এ দৃষ্টান্তটিও নির্দোষ।

ফাল্গুনের সমাগমে দক্ষিণের বায়
নির্মল নদীজলে উর্মি জাগায়।

এ-রকম পয়ার রচনা করা ছন্দ হিসেবে নির্দোষ কি? কিন্তু উক্ত dictum অনুসারে এটিও নির্দোষ। আমার নিজের বিশ্বাস এ-রকম রচনা করা চলে না; অন্ততঃ আজ পর্যন্ত কোনো কবি এ-রকম রচনা করেন নি। আমি মনে করি এই পংক্তি-দুটিকে নিম্নলিখিত দুই রূপের এক রূপে পরিবর্তিত করা আবশ্যক।—

ফাল্গুনের সমাগমে দক্ষিণের বায়
সুনির্মল নদীজলে তরঙ্গ জাগায়।— যৌগিক পয়ার

ফাল্গুন-সমাগমে দক্ষিণ বায়
নির্মল নদীজলে উর্মি জাগায়।— মাত্রিক পয়ার

গত পৌষের 'বিচিত্রা' থেকে রবীন্দ্রনাথের রচিত দুটি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করলেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।—

উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ, হায়,
তারকার মৈত্রী ছেড়ে মৃত্তিকারে চায়।

এটি যৌগিক পয়ার; কেননা এখানে যুগ্মধ্বনি অবস্থান-বিশেষে কোথাও বিশ্লিষ্ট, কোথাও সংশ্লিষ্ট। কিন্তু—

সখাসনে উৎসবে বৎসর যায়,
শেষে মরি বিরহের ক্ষুৎপিপাসায়।

এটি হচ্ছে মাত্রিক পয়ার; কেননা এখানে যুগ্মধ্বনি অবস্থান-নির্বিশেষে সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট।

সখাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

এই পংক্তিটি সম্বন্ধে কি বলা যাবে? এখানে 'মহোৎসবে' কথাটিতে চার ব্যষ্টি ধরা হয়েছে যৌগিক ছন্দের রীতিতে; অর্থাৎ এখানে যুগ্মধ্বনিকে (হোৎ) ঠেসে কমান হয়েছে। আবার 'বৎসর' কথাটিতেও চার ব্যষ্টি ধরা হয়েছে মাত্রাবৃত্তের রীতিতে; অর্থাৎ এখানে যুগ্মধ্বনিকে (বৎ, সর্) টেনে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বাংলা ছন্দে এ-রকম চলে কি? রবীন্দ্রনাথের মতে চলে না, কেন না তাঁর মতে এই পংক্তিটাতে ছন্দপতন ঘটেছে, অথচ তিনি বলেছেন এই পংক্তিটাতে

নিয়ম বেঁচেছে। কিন্তু কোন্ নিয়ম বেঁচেছে? আমার কথিত কোনো নিয়মই এই পংক্তিটাতে বাঁচে নি, সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজের কথিত মূলসূত্র বা dictumই এখানে বেঁচেছে; কিন্তু তথাপি এখানে ছন্দরক্ষা হয় নি। dictumটি হচ্ছে এই—"একটু কমিবেশিতে মামলা চলে না, বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে", কিংবা "বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে।" অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই ওই পংক্তিটির বিরুদ্ধে মামলা এনেছেন, বাংলা ভাষার ওইটুকু প্রশ্রয়কে তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর কথিত বাংলা যুগ্মধ্বনির 'স্থিতিস্থাপকতা' শক্তিও ওই পংক্তিটিকে ছন্দপতন দোষ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই দেখিয়েছেন যে, যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ারে 'ঠাকুরুণ' শব্দকে প্রয়োজন মত তিন unitও ধরা যায়, চার unitও ধরা যায়। তাই যদি হয় তবে উদ্ধৃত যৌগিক বা সাধারণ পয়ারের পংক্তিটিতে 'বৎসর' শব্দে চার unit ধরা যাবে না কেন? এখানেই তাঁর dictumএর অপূর্ণতা; অর্থাৎ প্রয়োগবিধির উল্লেখ না করে শুধু dictumএর জোরে ছন্দের বিচার করা চলে না।

আর-একটি শব্দের প্রয়োগের প্রতি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের dictumএর বিচার করা যাক। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যৌগিক পয়ারে 'চিম্নি' কথাটিকে প্রয়োজনমতো দুই unitও ধরা যায়, তিন unitও ধরা যায়। কিন্তু যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ারে 'নিম্ন' কথাটিকে 'চিম্নি' শব্দের মতো বিকল্পে দুই বা তিন unit বলে গণ্য করা যায় কি? অর্থাৎ—

চিম্নি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ

এই পংক্তিটির নজিরে—

নিম্নে পড়েছে ঝরে শুষ্ক ফলদল

এই পংক্তিটিকে নির্দোষ বলতে পারি কি? কিংবা—

ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাকুরুণ

এই পংক্তিটির নজিরে—

সথাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

এই পংক্তিটিকে নির্দোষ বলব না কেন? কবির dictum তো সর্বত্রই বহাল আছে। যা হক, প্রয়োগের বিধি নির্দিষ্ট না হলে শুধু dictumএ

ছন্দের বিচার করা চলে না, এ কথা অনিলবরণ নিজেই স্বীকার করেছেন। উপরের দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, নিম্ন, বৎসর প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে যৌগিক ছন্দে সম্প্রসারিত করে দু মাত্রা বলে গণ্য করা হয় না; পক্ষান্তরে চিম্‌নি, ঠাক্‌রুণ প্রভৃতি অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে যৌগিক ছন্দে সম্প্রসারিত করা হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় আমি প্রথম ও কথা বলেছি; তার পরে বৈশাখের বিচিত্রায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছি। এ স্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অনিলবরণ প্রশ্ন তুলেছেন, আমার কথিত সাধারণ নিয়ম অনুসারে একধারে, রাজদণ্ড, মানদণ্ড, বণিক্‌লক্ষ্মী প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দকে এক শব্দ বলে গণ্য করে এক, রাজ, মান, ণিক্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে গণ্য করা হয় না কেন? এ বিষয়েও বৈশাখের বিচিত্রায় বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তথাপি এ স্থলে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমি বলেছি যৌগিক ছন্দে সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এক unit ধরা হয়ে থাক। কিন্তু সমাসবদ্ধ শব্দকে একটি অখণ্ড শব্দ বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা আমি বলি নি। ব্যাকরণের দিক্ থেকে সমাসবদ্ধ শব্দ অখণ্ড বটে; কিন্তু ছন্দের দিক্ থেকে সমাসবদ্ধ শব্দকে অখণ্ড বলে গণ্য করা আবশ্যিক নয়। কবি ইচ্ছা করলে সমাসবদ্ধ (বা বাংলা প্রত্যয়ান্ত) শব্দকে বিচ্ছিন্ন বা দ্বিধাবিভক্ত বলেও গণ্য করতে পারেন। এ কথার প্রথম আভাস দিয়েছি 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামে আমার পুস্তিকায় (পৃ ১৫-১৬) এবং বিস্তৃত আলোচনা করেছি বৈশাখের বিচিত্রায়। আমি 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটির দিক্-কে বিকল্পে এক বা দুই unit ধরা যায় এ কথা বলেছি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দু-রকম প্রয়োগই করেছেন। কিন্তু আমার এই উক্তিতে অনিলবরণ মহাসংকটে পড়ে একেবারে 'বল্ মা, তারা, দাঁড়াই কোথা?' বলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এরূপ উৎকণ্ঠিত হবার বিশেষ কারণ নেই। কেননা, কোন্ স্থলে সমাসবদ্ধ শব্দকে বিকল্পে অখণ্ড বা বিচ্ছিন্ন বলে গ্রহণ করতে হবে তা এমন নয় যে তাকে কোনো নিয়মের অন্তর্গত করা যায় না এবং এমন বৈকল্পিক শব্দও বাংলায় অসংখ্য নয়। দিক্‌প্রান্ত, দিক্‌চক্র প্রভৃতি শব্দে যেমন দিক্-কে বিকল্পে এক বা দুই ব্যষ্টি বলে গণ্য করা যায়, তেমনি মৃৎপিণ্ড, হৃৎপাত্র প্রভৃতি শব্দের মৃৎ, হৃৎ-কেও যৌগিক ছন্দে বিকল্পে দুই unit বলে গণ্য করা যায় বলে আমার বিশ্বাস।

যদি তা না যেত তবে আধুনিক শক্তিমান্ কবিদের রচনায় ও-রকম বৈকল্পিক ব্যবহার দেখা যেত না। মোহিতলাল কিংবা বুদ্ধদেব 'হৃৎপাত্র' শব্দে চার unit ধরে ভুল করেছেন বলে আমি মনে করি নে। বস্তুতঃ আমি এটা লক্ষ করেছি যে, দিক্, মৃৎ, হৃৎ প্রভৃতি একস্বর (monosyllabic) যুগ্মধ্বনিমূলক শব্দ যেসব ক্ষেত্রে অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয় অথচ ব্যঞ্জনসন্ধির সূত্র অনুসারে অচ্ছেদ্য হয়ে না যায়, সেসব ক্ষেত্রে অনেক কবিই এসব শব্দকে দুই unit বলেই গণ্য করেন (অক্ষরসংখ্যার নজিরে কিনা জানি নে)। অথচ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওসব শব্দকে এক unit বলে গণ্য করাই সংগত মনে করেন। আর আমার বিশ্বাস ওসব শব্দকে এক unit ধরলেই যৌগিক ছন্দের ধ্বনিটা দৃঢ় এবং শুনতে ভালো হয়; দুই unit ধরলে যদিও ছন্দপতন হয় বলে মনে করি নে, কিন্তু তাতে যৌগিক ছন্দের ধ্বনিতে শৈথিল্য আসে বলে মনে হয়। ঠিক এই কারণেই 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতেও তিন unit ধরাই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। অথচ বোধ করি শুধু কানের দ্বারা চালিত হয়ে একরকম নিজের অজ্ঞাতসারেই স্থানে স্থানে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে চার unit ধরেছেন এবং তার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, 'দিক্' কথাটিতে দুই ধরলেও কানে বাধে না অর্থাৎ ছন্দপতন হয় না। হৃৎ, মৃৎ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

কিন্তু যুগ্মধ্বনিটা যদি একটি একাধিক স্বরবিশিষ্ট শব্দের অন্তে থাকে (যথা— তড়িৎ, বিদ্যুৎ, মহৎ ইত্যাদি), তা হলে যুগ্মধ্বনিকে দুই unit বলে গণ্য করলেই ভালো শোনায়; এক unit বলে গণ্য করলে যে ছন্দপতন ঘটে তা মনে করি নে, কিন্তু তাতে ধ্বনিটা একটু কর্কশ লাগে বলে মনে হয়। যেমন, 'তড়িৎ-প্রভাবৎ' শব্দটিতে ছয় unit গণনা করলে অন্ততঃ আমার কানে একটু বাধে, কিন্তু তাতে ছন্দপতন হয় তা বলি নে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্র-লিখা।

—শিবাজী-উৎসব, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিগ্' কথায় এক unit অথচ 'বিদ্যুদ্'-এ তিন unit ধরা হয়েছে। তাতে কিছু দোষ হয়েছে বলে মনে করি নে। পক্ষান্তরে অবস্থাবিশেষে 'দিগ্' শব্দকে বাড়িয়ে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করে দুই এবং 'বিদ্যুদ্' শব্দকে সংশ্লিষ্ট করে কমিয়ে দুই করলেও ছন্দ নষ্ট হত না। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই তার নিদর্শন আছে

(বিচিত্রা ১৩৩৭ বৈশাখ দ্রষ্টব্য)। তেমনি 'তড়িৎপ্রভাবৎ' কিংবা বিদ্যুদ্‌বহ্নি'-র নজিরে যদি 'বণিকূলক্ষ্মী' শব্দে বিকল্পে চার unit ধরা যায় তা হলে আপাততঃ আমাদের আশ্চর্য লাগলেও যৌগিক ছন্দের রীতি অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করি।

বণিকূলক্ষ্মী এনেছিল সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন

এ-রকম লিখলে হয়তো প্রথম প্রথম কানে একটু বাধতে পারে ; কিন্তু 'তড়িৎ-প্রভাবৎ' সম্বন্ধেও তাই খাটে। আসল কথা 'তড়িৎপ্রভা' এবং 'বণিকূলক্ষ্মী', এই উভয় ক্ষেত্রেই বিকল্পে চার বা পাঁচ unit ধরা চলে ; আর পাঁচ ধরলেই চারের চেয়ে একটু ভালো শোনায় বলে আমার মনে হয়। কিন্তু 'বণিকূলক্ষ্মী' (অর্থাৎ বণিক্লক্ষ্মী) শব্দে চার unit ধরার মধ্যেও কোনো inherent বাধা আছে বলে মনে করি নে ; যদি তা থাকত তা হলে রবীন্দ্রনাথ 'তড়িৎপ্রভা' শব্দেও চার ব্যষ্টি ধরতে পারতেন না।

বাংলা যৌগিক ছন্দের উপরে পূর্বাভ্যাস ও সংস্মৃতির (associationএর) প্রভাব কতখানি সেটি একটি বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়। এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীন ছন্দ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন। সুতরাং এ ছন্দের সঙ্গে যে বহু কালের বহু অভ্যাস ও সংস্মৃতি জড়িত হয়ে আছে তা বিচিত্র নয়। এইসমস্ত অভ্যাস ও সংস্মৃতির স্তর উদ্‌ঘাটন না করলে এ ছন্দের যথার্থ প্রকৃতিটি উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। এখানে সে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ওই অভ্যাস ও সংস্মৃতির মূলে আমাদের লিপিপদ্ধতি এবং সংস্কৃত ব্যাকরণেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। নিজের কানের উপর নির্ভর করে বাংলার কবিরা হৃৎপাত্র, দিক্‌প্রান্ত, মৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শব্দে চার unitও ধরে থাকেন। কিন্তু হৃদ্রোগ, দিগ্বধূ, মৃন্ময়ী প্রভৃতি শব্দে কখনও চার unit ধরবেন না। এর মূলে বাংলা লিপিপদ্ধতি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব নেই কি ? 'একটি' শব্দে সচরাচর তিন unitই ধরা হয়, কিন্তু 'ব্যক্তি' শব্দে সর্বদাই দুই, অনুরূপ কারণেই। 'হইল' শব্দে তিন, কিন্তু 'শৈল' শব্দে দুই।

রাজদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দে যে চার ব্যষ্টি ধরা হয় তার মূলেও পূর্বাভ্যাস এবং সংস্মৃতির প্রভাব রয়েছে বলেই আমি মনে করি। এক সময়ে রাজদণ্ড, মানদণ্ড, শব্দের জ এবং ন-কে অকারান্ত করেই উচ্চারণ করা হত ; তখন এ

শব্দ-দুটিতে চার 'অক্ষর' (সিলেব্‌ল্) -ই ছিল। কিন্তু ক্রমে যখন ওই অকারটি লুপ্ত হয়ে জ এবং ন-এর হসন্ত উচ্চারণ হতে লাগল তখনও পূর্ব সংস্মৃতির ফলে হসন্ত জ্ এবং ন্‌-কে পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল না এবং হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরকে টেনে দীর্ঘ করে লুপ্ত অকারের ক্ষতিপূরণ করা হল। তাই ওসব শব্দে চার সিলেব্‌ল্ না থাকলেও এরা চার 'অক্ষর'এর শব্দ বলেই গণ্য হতে লাগল। এ-রকম সর্বত্রই। অর্থাৎ যেখানেই অকার লুপ্ত হয়ে কোনো বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ হয়েছে সেখানেই ওই হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে টেনে দীর্ঘ করে লুপ্ত অকারের ক্ষতিপূরণ করা হয়ে থাকে। এই কথাটি মনে রাখলেই আর-অর্ডিন্যান্স জারি করে কোথাও হাইফেন বসাবার প্রয়োজন হবে না।

অকার লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হসন্তোচ্চারিত বর্ণকে একটি স্বতন্ত্র 'অক্ষর' বলে গণ্য করার এবং তৎপূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে টেনে দীর্ঘ করে অকারলোপের ক্ষতিপূরণ করার এই যে অভ্যাস হল, তার সংস্মৃতি বা associationএর প্রভাব অন্যত্রও দেখা দিল। অর্থাৎ যেসব অ-সংস্কৃত শব্দে (যথা—টুন্‌টুনি, বুল্‌বুলি, বাব্‌লা, চব্‌কা, বল্‌গা ইত্যাদি) স্বাভাবিক হসন্ত বর্ণ পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয় না সেই হসন্তবর্ণগুলিও (অকারলোপের ইতিহাস না থাকা সত্ত্বেও) এক-একটি স্বতন্ত্র 'অক্ষর' বলে গণ্য হল এবং তৎপূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘত্ব লাভ করে তার ক্ষতিপূরণ করল। এইটেই হচ্ছে টুন্‌টুনি, বাব্‌লা প্রভৃতি শব্দের হসন্ত ন্‌ এবং ব্‌-কে এক-একটি স্বতন্ত্র 'অক্ষর' বলে গণ্য করার হেতু। এই associationএরই প্রতিক্রিয়া ক্রমে সংস্কৃত শব্দেও দেখা দিয়েছে এবং সেজন্যেই হৃৎপাত্র, মৃৎপিণ্ড, দিক্‌প্রান্ত প্রভৃতি যেসব সংস্কৃত শব্দে হসন্তবর্ণ পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয় না সেসব শব্দেও হসন্তবর্ণের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘত্ব অর্জন করে হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে। 'হৃৎপাত্র' প্রভৃতি শব্দে চার unit ধরার মূলে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে এই associationএর প্রভাব আছে বলে আমি মনে করি। রাজদণ্ড, মানদণ্ড টুনটুনি, বুলবুলি হৃৎপাত্র, মৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শব্দে এই associationএর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তার আলোচনা খুবই ঔৎসুক্যকর।

অনিলবরণ লিখেছেন—"যাহারা, একধার, রাজদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতিতে এ, রা, মা-কে টানিয়া পড়িতে চিরঅভ্যস্ত, তাহারা অনায়াসে মৃৎপাত্র, হৃৎপাত্র প্রভৃতিতেও মৃ, হৃ-কে টানিয়া পড়িবে ; অতএব এখানে ছন্দ-ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা নাই।" অনিলবরণের এই কথার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে সন্দেহ নেই ;

কারণ এখানেও যৌগিক ছন্দের উপর পূর্বাভ্যাস ও associationএর প্রভাবের নিদর্শনই পাচ্ছি। কিন্তু এই unconscious অভ্যাস ও association তো আমাদের কানকে ঠিক তার উলটো দিকেও নিয়ে যেতে পারে, এ কথাটিও মনে রাখা দরকার। আর-একটু বুঝিয়ে বলছি। 'রাজদণ্ডে'র রাজ্-কে বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করার অভ্যাসের ফলে আমরা 'মৃৎপাত্রে'র মৃৎ-কেও যেমন বিশ্লিষ্ট করে উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হচ্ছি, তেমনি 'মৃৎপিণ্ড' প্রভৃতি শব্দের মৃৎ-কে সংক্ষিপ্ত করার অভ্যাসের ফলে (মৃৎপিণ্ড-কে তিন unit ধরলেই, যেমন রবীন্দ্রনাথ করেন, 'মৃৎ'-এর উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত হবে) প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দের 'প্রাণ' 'মান'-কেও সংক্ষিপ্ত করার অভ্যাস অতি অনায়াসেই হতে পারে। মৃৎপিণ্ড, মার্তণ্ড প্রভৃতি শব্দে যদি তিন unit ধরা যায় তা হলেই এদের analogyতে প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দেও তিন unit ধরা শক্ত হবে না, অর্থাৎ কানকে ওভাবে অভ্যস্ত করা কঠিন হবে না।

প্রখর মার্তণ্ড-তাপে বিদগ্ধ ধরণী

এই লাইনটার ধ্বনি যাদের কানে অভ্যস্ত তাদের কানে

কঠোর প্রাণদণ্ড-বিধি করিল প্রচার

এই লাইনটিও খারাপ শোনাবে না। এ-রকম metrical liaison বা 'ছন্দসন্ধি' সম্পূর্ণ অভাবনীয় বলে এবং চোখের চিরন্তন অভ্যাসের ফলে তাতে প্রথম প্রথম আপত্তি হবেই। কিন্তু শুধু ধ্বনি এবং কানের উপর নির্ভর করলে আমাদের কান অতি অনায়াসেই এবং অচিরেই প্রাণদণ্ড-কে হৃৎপিণ্ড বা মার্তণ্ড থেকে পৃথক্ বলে অস্বীকার করতে ইতস্ততঃ করবে না। প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দের হসন্ত বর্ণকে যদি পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত করে লিপিবদ্ধ করার প্রথা থাকত তা হলে ওসব শব্দকে চার unitএর মর্যাদা দেওয়া হত না বলেই আমি মনে করি। যুক্ত করা যে হয় নি তার মূলে ধ্বনিগত কোনো হেতু ছিল না ; কারণটি হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণগত association এবং সেই association আজ পর্যন্ত আমাদের যৌগিক ছন্দটিকে নিয়ন্ত্রিত করছে।⊥

আমার মনে হয় অনিলবরণ রবীন্দ্রনাথকে একটু ভুল বুঝেছেন। 'বৎসর' কথাটিকে টেনে বড়ো করা চলে, কিন্তু 'হৃৎপাত্র'কে টেনে বড়ো করা ভুল, এ কথা বলা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় নয়। তাঁর মতে যৌগিক ছন্দে 'বৎসর' এবং 'হৃৎপাত্র উভয় শব্দকেই তিন unit বলে গণ্য করতে হবে ; যৌগিক ছন্দেই

'হৃৎপাত্র'কে চার unit গণনা করা তিনি ভুল মনে করেন। তেমনি 'বৎসর' শব্দকেও তিনি যৌগিক ছন্দে চার unit বলে গণনা করা ভুলই মনে করেন। অন্য ছন্দে (অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে) তিনি 'বৎসর'-কে চার বলেই গণনা করেন; সে ক্ষেত্রে 'হৃৎপাত্র'-কেও টেনে বড়ো করে পাঁচ মাত্রা বলে গণনা করা হবে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে যৌগিক ছন্দে বৎসর ও হৃৎপাত্র উভয়ই তিন্ ব্যষ্টি আর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এ শব্দ-দুটি যথাক্রমে চার ও পাঁচ মাত্রা। তাঁর মতে কোনো ছন্দেই 'হৃৎপাত্র' শব্দে চার unit নয়। কিন্তু আমি মনে করি যৌগিক ছন্দে দিক্, দিন, রাজ, মান প্রভৃতির ন্যায় হৃৎ-কেও দুই unit বলে গণ্য করা চলে; কিন্তু সমাসবদ্ধ শব্দে হৃৎ-কে এক বলে গণ্য করলেই ভালো শোনায়। 'বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে', রবীন্দ্রনাথের এই dictumটি সম্বন্ধেও অনিলবরণ একটু ভুল বুঝেছেন। কারণ এটি যে শুধু চলতি ভাষার প্রতিই প্রযোজ্য তা নয়; রবীন্দ্রনাথ এটিকে চলতি এবং সাধু উভয় ভাষারীতির প্রতিই প্রযোজ্য মনে করেন। বস্তুতঃ এই dictumটির ব্যাখ্যা করা উপলক্ষ্যে তিনি যে দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন সেগুলি সাধু ভাষা এবং সাধু অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দেরই (বৎসর, মৃৎপ্রদীপ ইত্যাদি) দৃষ্টান্ত। দ্রষ্টব্য বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ, পৃ ৭১৩। ওই dictumটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এ স্থলে অনাবশ্যক।

যা হক, যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি প্রয়োগের মূলনীতি হচ্ছে এই—(১) শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট ও তার মূল্য দুই unit, (২) শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ 'সাধারণতঃ' সংশ্লিষ্ট ও তার মূল্য এক unit, (৩) সমাসবদ্ধ শব্দকে কবি বিকল্পে অখণ্ড বা বিচ্ছিন্ন বলে গ্রহণ করতে পারেন; বিশেষতঃ যেখানে সমাসান্তর্গত শব্দ-দুটি স্বর বা ব্যঞ্জন সন্ধি এবং যুক্তবর্ণের দ্বারা অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত নয়। এই নিয়ম-তিনটির সঙ্গে আর-একটি সাধারণ সূত্র মনে রাখা দরকার যে, সংস্কৃত শব্দে কোনো বর্ণের অকার লুপ্ত হয়ে হসন্ত উচ্চারণ হলে ওই বর্ণের আশ্রেতা স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করে লুপ্ত অকারের ক্ষতি পূরণ করা হয়; অর্থাৎ অকার লুপ্ত হবার ফলে যে যুগ্মধ্বনির উৎপত্তি হয় তার উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট বা দ্বিমাত্রক হয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট বা একমাত্রক হয় না। যথা, রাজদণ্ড, মানদণ্ড ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই সাধারণ সূত্রটি সচরাচর পালিত হলেও এটি যৌগিক ছন্দের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় রূপে অত্যাবশ্যক নয়; এই সূত্রটি পালন না করলেও যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

অর্থাৎ মানদণ্ড, রাজদণ্ড প্রভৃতি শব্দে তিন unit ধরলেও যৌগিক ছন্দের নীতি নষ্ট হবে বলে মনে করি নে। রবীন্দ্রনাথ একটি দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন (পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ)—

একটা নয় দুটো নয় এক শোর বেশি।

এখানে 'একটা' শব্দে দুই unit, কিন্তু 'একশো'-তে তিন unit। আমি যদি লিখি—

একশো নয় দুশো নয় তেরো শোর বেশি

তা হলেও যৌগিক ছন্দের নীতি অব্যাহতই থাকবে, কেননা এখানে 'একশো'-কে একটি অখণ্ড শব্দরূপে গণনা করা হয়েছে। যা হক, উপরে যৌগিক ছন্দের যে তিনটি (সাধারণ সূত্রটি নিয়ে চারটি) নিয়মের কথা বললুম তার মধ্যে দ্বিতীয় নিয়মটির কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনিলবরণ এইসব ব্যতিক্রমের আলোচনা করার উপর অত্যন্ত বেশি জোর দিয়েছেন, কারণ তিনি মনে করেন অনুসন্ধান করলে এ-রকম ব্যতিক্রম অনেকই মিলতে পারে। আমার কিন্তু মনে হয় যথার্থ ব্যতিক্রম বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যেও বেশি মিলবে না। আর যেগুলিকে আপাততঃ ব্যতিক্রম বলে মনে হয় সেগুলিও ব্যাকরণের নিপাতনের মতো নিছক ব্যতিক্রম নয়; সেগুলিও কোনো না কোনো সাধারণ সূত্রের এলাকার মধ্যে পড়ে। এইসব ব্যতিক্রম সম্বন্ধে অন্যত্র (বৈশাখের বিচিত্রা) বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ওসমস্ত ব্যতিক্রমের অধিকাংশই অ-সংস্কৃত বাংলা শব্দের মধ্যবর্তী হসন্ত ব্যঞ্জনকে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত না করার অভ্যাস থেকেই উৎপন্ন। যেমন, বাব্‌লা, টুন্‌টুনি, মস্‌জিদ, বাদ্‌শা, দর্‌কার, কার্‌বার, গোল্‌মাল, তোল্‌পাড় ইত্যাদি শব্দের মধ্যবর্তী হসন্ত বর্ণটিই এসব শব্দের unit-সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায় যৌগিক ছন্দে। অন্যান্য ছন্দে অবশ্য এদের যথার্থ মর্যাদা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। 'গোলমাল' শব্দটিকেই ধরা যাক। এ শব্দটিকে যে যৌগিক ছন্দে চার unitএর মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে তা সকলেই জানে। যথা—

ভিক্ষুকের গোলমালে তোলপাড় পাড়া।

কিন্তু যদি এ শব্দটিকে তিন unit বলে গণ্য করে লেখা যায়—

ভীষণ গোলমাল করি ছুটিল জনতা

তা হলেও যৌগিক ছন্দের নীতি নষ্ট হবে বলে মনে করি নে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত'* এবং অনিলবরণের 'ছন্দের হসন্ত' পড়ে মনে হয়, যৌগিক ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় উপলক্ষ্যে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছে তাঁদের মতে শব্দমধ্যবর্তী হসন্ত ব্যঞ্জনই যেন তার মূলে। কিন্তু তা নয়; যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী হসন্ত (অর্থাৎ আশ্রিত) স্বরবর্ণও আশ্রিত ব্যঞ্জনের চেয়ে কম সমস্যার সৃষ্টি করে নি। অর্থাৎ এ ছন্দে ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনির চেয়ে স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনির সমস্যাও কম নয়, বরং বেশি। অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় আমি উভয় সমস্যার কথাই উত্থাপন করেছিলুম। এ স্থলে সে সমস্যার পুনরুত্থাপন করতে চাই নে। শুধু দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, যৌগিক ছন্দে 'চিম্‌নি' শব্দে 'চিম্' এই ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিটা বিকল্পে এক এবং দুই unit বলে গণ্য হতে পারে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তা হলে 'হই্‌ল' 'চাই্‌তে' 'শিউ্‌লি' 'কেউ্‌টে' প্রভৃতি শব্দের হই্, চাই্, শিউ্, কেউ্ এই স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনিগুলিকে কেন বিকল্পে এক এবং দুই unit ধরা হবে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনিগুলি সর্বদাই দুই unit বলে গণ্য হয়; অথচ আমাদেরই প্রাচীন সাহিত্যে এগুলি এক unitএর মর্যাদাও পেয়েছে। যথা—

বঙ্গদেশে প্রমাদ হই্‌ল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আই্‌লা গঙ্গাতীর॥

—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ

এখানে হই্ এবং আই্ এ দুটি স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনি এক unit বলেই গণ্য হয়েছে। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ক্রুদ্ধ হইলা ইন্দ্রজায়া শচী কারাবাসে।
... ...
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে।

—বৃত্রসংহার, দ্বাদশ সর্গ, হেমচন্দ্র

এখানে প্রথম 'হই্' এক unit এবং দ্বিতীয় 'হই' দুই unit। কিন্তু আজকাল হইল, চাইতে, শিউলি, কেউটে প্রভৃতি প্রায় সমস্ত যুগ্মধ্বনিই দুই unit বলে গণ্য হয়। যে জিনিসটা মূলে এক তাকে এভাবে সর্বত্র টেনে দীর্ঘ করে দুই করলে কি ধ্বনিতে শৈথিল্য দেখা দেয় না? অথচ মজা এই যে, 'হইল' শব্দে তিন unit, অথচ 'শৈল' শব্দে দুই unit। 'পইতা' শব্দে তিন unit,

কিন্তু 'পৈতা'-তে দুই; অর্থাৎ এ শব্দটিতে বিকল্প চলে। কিন্তু আজকাল আর 'পৈতে' লেখা হয় না বলে এ শব্দটিতে বিকল্পও চলে না। চাইতে, কেউটে প্রভৃতি শব্দে কখনও বিকল্প চলে না, কেননা বাংলায় আই্‌কার, এউ্‌কার নেই। সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী ঐকার এবং ঔকার যৌগিক ছন্দে সর্বত্রই এক unit। কেননা ওসব শব্দে ঐ এবং ঔ-কে অই এবং অউ লেখার প্রথা নেই; আমরা শইল এবং গউরব লিখি নে। কিন্তু অ-সংস্কৃত শব্দে বিকল্প চলে, কেননা এ ক্ষেত্রে উভয় রকম বানানই চলে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী ঐ কিংবা ঔ-কে বিশ্লিষ্ট করে দুই unit বলে গণ্য করলে ছন্দের ধ্বনিতে শৈথিল্য দেখা দেয়। যথা—

বোল্‌তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক!
মধুকর কহে তারে— তুমি এস ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচ, দেখে যাই।

—হাতে-কলমে, কণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনি 'বোল্‌' এবং স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনি 'মউ' এ দুটিই শব্দমধ্যবর্তী অথচ দুটিই এখানে বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক হয়েছে। এরূপ যে করা যায় না তা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এভাবে বিশ্লিষ্ট করলে ছন্দের ধ্বনিটা কিছু শিথিল হয়।

মহাগর্বে বোল্‌তা কহে মৌমাছিরে ডেকে

এই লাইনটির সঙ্গে উদ্‌ধৃত লাইন-কটি মিলিয়ে দেখলেই এ কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। কিন্তু ছন্দের ধ্বনিকে কোথায় শিথিল করা প্রয়োজন এবং কোথায় দৃঢ় করা প্রয়োজন তা সম্পূর্ণরূপেই কবির উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ ও মাঘ দ্রষ্টব্য।

যা হক, সংস্কৃত অ-সমাসবদ্ধ শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি যৌগিক ছন্দে সর্বত্রই এক unit বলে গণ্য হয়ে থাকে, এই আমার প্রধান বক্তব্য এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রমকেই আমি যথার্থ ব্যতিক্রম বলে মনে করি। আর এই যথার্থ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যসাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায় এবং এই ব্যতিক্রমগুলির সংখ্যা এত কম যে, আমি এখনও এগুলির অন্তরে কোনো বিশেষ তত্ত্বের (principleএর) সন্ধান খুঁজে পাই নি। এ বিষয়ে

আমি প্রথম আভাস দিয়েছি 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' পুস্তিকায় (পৃ ১৫)। বৈশাখের বিচিত্রায় (পৃ ৫১৫-১৬) এ বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা করেছি। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব।—

যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।

—অতীতকাল, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'যুগান্তরের' কথাটিতে মাত্রাবৃত্তের কায়দায় ছয় unit ধরা হয়েছে; অর্থাৎ এখানে ওই কথাটি যৌগিক ছন্দে মাত্রিক substitute। আমি এ পর্যন্তই বলতে পারি; কিন্তু কোন্ কোন্ স্থলে এ-রকম substitution চলে আমি সে কথা বলতে পারি নে। আর যত দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কিংবা অন্য কোনো প্রতিভাশালী কবির রচনায় এ-রকম substitution এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত না মিলবে তত দিন পর্যন্ত এরূপ substitutionএর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে নিঃসন্দেহে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় বলেই মনে করি। 'If Tagore favours it, that ends the matter', শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি অনুসারে আমি পূর্বোক্ত ব্যতিক্রমগুলিকে আর্ষ বা আপ্ত প্রয়োগ বলে গ্রহণ করতে রাজি আছি। শুধু তাই নয়; এই ব্যতিক্রমগুলিতে যে ভাষার প্রচ্ছন্ন শক্তির সন্ধান এবং ভবিষ্যতের নতুন বিকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে, অনিলবরণের এ কথা মেনে নিতেও আপত্তি নেই। আমার বক্তব্য এই যে, যত দিন পর্যন্ত এইসব ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যথেষ্টসংখ্যক না হবে এবং যত দিন পর্যন্ত এদের ভিতরকার principleটিকে formulate না করা যাবে তত দিন পর্যন্তই এগুলি ব্যতিক্রম বা আর্ষপ্রয়োগ বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ তত দিন পর্যন্ত সাধারণ লেখকের রচনায় এগুলিকে সাধু বলে গণ্য করা হবে না। কিন্তু যখন এই ব্যতিক্রমগুলিকে কোনো তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যাবে তখনই আর এগুলিকে যথার্থ ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা হবে না। যা হক, আমি যদি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির অনুসরণ করে লিখি—

যে শঙ্খরব আজি মুহুর্মুহু ধ্বনিছে চৌদিকে
অর্থ তার পার কি বুঝিতে?

তা হলে 'যে শঙ্খরব' অংশটিকে যৌগিক ছন্দে মাত্রিক substitute বলে স্বীকার করে এই লাইনটিকে নির্দোষ বলা হবে কি না, রবীন্দ্রনাথ এটিকে নিখুঁত বলে স্বীকার করবেন কি না, তাই আমার জিজ্ঞাস্য। যদি তিনি এটিকে নিখুঁত

বলে স্বীকার করেন তা হলে এই ব্যতিক্রমগুলিকেও কোনো একটি সাধারণ তত্ত্বের অন্তর্গত করে formulate করা শক্ত হবে না।

অনিলবরণ অনেক বিচারের পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে— "ছন্দ সম্বন্ধে নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া সহজ নহে" এবং "কৃত্রিম নিয়ম বাঁধিয়া কবিদের এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করিবার চেষ্টা কেন?" ছন্দের নিয়ম বা formula তৈরি করা যে সহজসাধ্য নয়, এটি একটি truism; ভুক্তভোগী মাত্রই এ কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু কাজটি সহজসাধ্য নয় বলেই এ কাজে আনন্দ আছে; আর সেজন্যই এ কাজের প্রয়োজনীয়তাও এত বেশি। কঠিন কাজের জন্যই বিশেষ সাধনার প্রয়োজন হয়। যে কাজ বিনা আয়াসেই সম্পন্ন হয় তার মূল্য কি? অনিলবরণ 'কৃত্রিম' নিয়ম বলতে কি বুঝেছেন তা জানি নে। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমি ছন্দের যেসব নিয়ম formulate করতে চাই তা 'কৃত্রিম' নয়, কেননা কোনো মনগড়া নিয়ম জারি করা আমার অভিপ্রায় নয়। কবিদের অবলম্বিত ছন্দগুলির বিশ্লেষণ করে ওসব ছন্দের অন্তর্হিত নিয়মকে আমি inductionএর সাহায্যে ধরতে চেষ্টা করেছি এবং করছি। আর inductionএর সাহায্যে প্রাপ্ত নিয়মকে আর যা-ই বলা যাক না কেন, কখনও 'কৃত্রিম' বলা যায় না; কেননা এ নিয়ম তো অর্ডিন্যান্স নয় যে এগুলি পালন না করলেই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আমার inductions অসম্পূর্ণ হতে পারে কিংবা একেবারেই ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু 'কৃত্রিম' নয়। অন্য কেউ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের induction করেন এবং তা যদি অধিকতর সংগত হয় তবে তাঁর induction মেনে নিতে আমি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করব না। কিন্তু induction করার প্রয়োজনীয়তা নেই এ কথা মানতে পারি নে; কারণ তা হলে কোনো দেশে কোনো ভাষারই ব্যাকরণ, ছন্দ এবং অলংকার নিয়ে কখনও আলোচনাই হত না।

আর অনিলবরণের সব চেয়ে বড়ো ভুল হচ্ছে এই মনে করা যে, এইসব ছন্দের নিয়ম বার করার মধ্যে 'কবিদের স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা' রয়েছে; তাঁর এ কথা মনে করা একেবারেই ভুল। কারণ আমি তো নিয়ম 'বার' করতেই চাই, নিয়ম 'জারি' করতে নয়। তা ছাড়া, আমার ছন্দের আলোচনা বা ছন্দের নিয়ম কবিদের জন্য মোটেই নয়; অর্থাৎ তাঁরা ছন্দোবিৎ-এর নিয়ম মেনে ছন্দ রচনা করবেন এটা কখনও কোনো ছন্দোবিৎ-এর অভিপ্রায় হতে পারে না। কবিরা আপন মনে ছন্দ রচনা করবেন; ছন্দোবিৎ এসে তার থেকে

নিয়ম বার করবেন নিজের জিজ্ঞাসা তৃপ্তির জন্যে, ভাষাতাত্ত্বিকের আলোচনার জন্যে, প্রথম শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্যে, কিন্তু কবিদের guidanceএর জন্যে নয়। এ কথাটুকু স্বীকার না করলে ছন্দোবিৎ-এর প্রতি অবিচার করা হবে। কবিরা যে ছন্দের আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, কিংবা সে আলোচনায় যোগ দেবেন না, তাও নয়। কেননা কোনো বিশেষ ধরনেব নিয়ম বা induction ঠিক হল কি না তা বলতে তাঁরা সম্পূর্ণ অধিকারী; বরং অন্য দশ জনের চেয়ে তাঁরা বেশি অধিকারী, কেননা ছন্দ নিয়েই তাঁদের কারবার। যা হক, এই সমস্ত ছন্দের নিয়ম বার করবার মধ্যে যে কবিদের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা বিন্দুমাত্রও নেই, এ কথা আমি জোরের সঙ্গেই বলব। সুবিখ্যাত ইংরেজি ছন্দ-তাত্ত্বিক অধ্যাপক Saintsburyর ন্যায় আমিও বলতে পারি—

"These rules are not imperative or compulsory precepts, but observed inductions from the practice of Bengali facts. He that can break them with success, let him."

—*Historical Manual of English Prosody*, *p. 30*

শ্রীঅরবিন্দের উক্তিতেও ঠিক এই কথারই সমর্থন পাই। ছন্দের নিয়ম imperative কিংবা comqulsory নয় বলেই তো কবিরা যুগে যুগে নতুন নতুন ছন্দের উদ্‌ভাবন করছেন এবং ছন্দোবিৎরাও নতুন নতুন নিয়ম আবিষ্কারে ব্যাপৃত আছেন। ওসব নিয়ম imperative হলেই কবিদের স্বাধীনতা হরণ ঘটত, নতুন ছন্দও উদ্‌ভাবিত হত না এবং নতুন নিয়মও formulated হতে পারত না।

উত্তরা ১৩৩৯ ভাদ্র

ছন্দ-প্রসঙ্গ

বাংলা ছন্দের ধ্বনির 'ইউনিট' বা ব্যষ্টি নির্ধারিত হয় তিনটি বিভিন্ন উপায়ে। ধ্বনিব্যষ্টি নির্ণয়ের এই তিনটি পদ্ধতির প্রতি লক্ষ রেখে বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা— স্বরবৃত্ত (সিলেবিক), মাত্রাবৃত্ত (কোয়ান্টিটেটিভ) এবং যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেকটি পর্ব (মেজার) ইংরেজি ছন্দের ন্যায় মুখ্যতঃ ধ্বনি বা স্বরের অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌এর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্ব নিয়মিত হয় ধ্বনির মাত্রা-পরিমাণ (কোয়ান্টিটি অফ সাউণ্ড) -এর দ্বারা। এ ছন্দে অযুগ্মধ্বনিকে লঘু বা একমাত্রক এবং যুগ্মধ্বনিকে গুরু বা দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করতে হয়। আর প্রতি পর্বের মাত্রাসংখ্যা দ্বারাই এ ছন্দের আকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলার বহু-প্রচলিত মামুলি ছন্দগুলিকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি, যেহেতু প্রচলিত প্রথায় দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই এ ছন্দের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু অক্ষরগণনার উপরে ভিত্তি করে কোনো ছন্দই রচিত হতে পারে না; কারণ ছন্দের মূলতত্ত্ব অক্ষর নয়, ধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার লিপিপদ্ধতিতে যদি যুক্তবর্ণের ব্যবস্থা না থাকত তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তিই হতে পারত না। পক্ষান্তরে যুগ্মস্বর (ডিফ্‌থঙ্‌) -গুলিকে একাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থা যদি বাংলায় থাকত তা হলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপ অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যেত। কিন্তু আপাততঃ অক্ষরগণনার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলেও একটি ধ্বনিতত্ত্ব আছে, নতুবা এ-রকম ছন্দ রচনা করাই সম্ভব হত না। সে তত্ত্বটি এই— এ ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দই (ওয়ার্ড) শেষাংশে মাত্রাবৃত্তধর্মী এবং পূর্বাংশে স্বরবৃত্তধর্মী। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণজাত একটি যৌগিক ছন্দ।

যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গতি অত্যন্ত মন্থর ও নিস্তরঙ্গ, এর ধ্বনি একঘেয়ে, যতি অনিয়মিত, এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, বহু শতাব্দী যাবৎ কবিদের অজ্ঞাতসারেই খাঁটি প্রাকৃত বাংলার স্বরবৃত্ত ধ্বনি, সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ এবং সংগীতের সুরের মিশ্রণে এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। বহু দিনের বহু অভ্যাসের স্তর উদ্‌ঘাটিত না করলে এ ছন্দের

প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপা পড়ে গেছে; ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র্য এ ছন্দে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়, ধ্বনিবৈচিত্র্য হিসেবে এ ছন্দ অত্যন্ত নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়ে। অক্ষরবৃত্তের এই ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে বহুকাল যাবৎ, বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের সময় থেকে, বিশেষ চেষ্টা চলছে। তখনকার কবিরা সংস্কৃত ছন্দের আশ্রয় নিয়েই বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে তাঁদের সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছে। অবশেষে যখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করলেন তখন থেকেই বাংলা ছন্দে বহু বৈচিত্র্য ঘটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ থেকে কিভাবে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হল, এ প্রবন্ধে তাই দেখাতে চেষ্টা করব।

এ কথা পূর্বেই বলেছি যে, শুধু দৃশ্যমান অক্ষরের সংখ্যা গুনে কোনো সত্যিকারের ছন্দ রচনা করা সম্ভব নয় এবং তথাকথিত 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দের মূলেও শুধু অক্ষরসংখ্যাটাই আসল তত্ত্ব নয়। যদি বাংলা ভাষার যুক্ত ব্যঞ্জনগুলিকে বিযুক্ত করে লেখা যায়, কিংবা বিযুক্ত যুগ্মস্বরগুলিকে যুক্ত করে লেখা হয় তবেই দেখা যাবে, এ ছন্দে প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান অক্ষরের সংখ্যাসাম্যই মূল কথা নয়; কারণ তা হলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্বত্রই অক্ষরসংখ্যার বৈষম্য দেখা দেবে অথচ ছন্দ ঠিকই থাকবে। মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তও অক্ষরসংখ্যার উপরে নির্ভর করে না; তাই বাংলার যুক্তব্যঞ্জনকে বিযুক্ত করলে কিংবা বিযুক্ত স্বরকে যুক্ত করলেও এ দুই ছন্দে কোনো পরিবর্তন হবে না; এরা যেমন আছে তেমনই থাকবে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেক শব্দের প্রথমাংশ স্বরবৃত্তের স্বধর্মী আর শেষাংশ মাত্রাবৃত্তের স্বধর্মী। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ ছন্দের শব্দগুলির শেষাংশেও যদি ধ্বনি-'সংখ্যা'র রীতি চালানো যায় তবে আমরা পাব স্বরবৃত্ত ছন্দ; আর শব্দগুলির প্রথমাংশেও যদি ধ্বনি-'মাত্রা'র রীতি চালানো যায় তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হবে। আসলেও বাংলা সাহিত্যে এ দুটি ছন্দের আবির্ভাব এভাবেই হয়েছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সর্বদাই এক 'ইউনিট' গণনা করা হত। রবীন্দ্রনাথও অল্প বয়সের রচনায় সর্বত্রই শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এক 'ইউনিট' হিসেবেই গণ্য করেছেন। যথা—

\+
বসন্তবাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদুবাস।...

\+
আমার যৌবন-কুসুমকাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
চরণ তাহার জড়াবে না?

—জাগ্রত স্বপ্ন, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দটি হচ্ছে ছয়-ছয়-আট 'অক্ষরে'র সুপরিচিত লঘু ত্রিপদী, শুধু শেষ দুটি পংক্তিতে দুটি করে বেশি অক্ষর আছে। এখানে শব্দের মধ্যবর্তী দুটিমাত্র ধ্বনি (ঢেরা-চিহ্নিত) যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিমাত্রক, প্রথমটি (সন্) ব্যঞ্জনান্তিক এবং দ্বিতীয়টি (যউ্) স্বরান্তিক; বাকি সবগুলি ধ্বনিই অযুগ্ম, সুতরাং একমাত্রক। একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যাবে ওই ঢেরা-চিহ্নিত স্থান-দুটিতেই ছন্দের ধ্বনি যেন ঠিক শোনাচ্ছে না; ওই দুটি জায়গাতেই একটু দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়, তবু শ্রুতিকটুতা ঘোচে না। এর কারণ হচ্ছে মাত্রাবৃদ্ধি। ওই দুটি পর্বে বা পংক্তিচ্ছেদে এক মাত্রা করে কমিয়ে যদি লেখা হত—

বসন্ত বায়ে | আঁখি মুদে আসে

এবং মম যৌবন | -কুসুমকাননে

তা হলেই কিন্তু ওই দুটি যুগ্মধ্বনি শ্রুতিকটু শোনাত না।

'মানসী' রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন, লঘুত্রিপদী-জাতীয় যেসব ছন্দের প্রতি পর্বে ছয়ের প্রাধান্য সেসব ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দু মাত্রার মর্যাদা না দিলে ছন্দ ঠিক থাকে না। তাই 'মানসী'র যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ লঘুত্রিপদী-জাতীয় ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এক না ধরে দুই ধরতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যা না গুনে ধ্বনি-'মাত্রা'র ওজন রক্ষা করে লঘুত্রিপদী-জাতীয় ছন্দ রচনা করতে শুরু করেন। এভাবেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আবির্ভাব হয়েছে। ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে রচিত 'ভুল-ভাঙা' নামক কবিতাটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কবিতা;

কারণ এই 'ভুল-ভাঙা' কবিতাটিতেই সর্বপ্রথমে শুধু অক্ষর গুনে ছন্দ রচনার ভুল ভেঙেছে। অক্ষরবৃত্তের শিকল-ভাঙা সর্বপ্রথম বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দটির একটু নমুনা দিচ্ছি।—

চেয়ে আছে আঁখি, । নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর;
।
বাহুলতা শুধু। বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।
... ...
।
বসন্ত নাহি। এ ধরায় আর
আগের মতো;
। ।
জ্যোৎস্নাযামিনী। যৌবনহারা
জীবন হত।

—ভুলভাঙা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি যেখানে যেখানে দ্বিমাত্রক হয়েছে তা দণ্ডচিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হল। ওই 'বন্ধন' কথাটিই সর্বপ্রথমে অক্ষর গুনতির বন্ধনপাশ ছিন্ন করেছে।

স্বরবৃত্ত ছন্দ বহুকাল যাবৎই ছেলে-ভুলানো ছড়া, বাউলের গান প্রভৃতি লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু প্রকৃত রসসাহিত্যে এ ছন্দ অনেক কাল পর্যন্ত স্থান পায় নি। রামপ্রসাদের গানেই এ ছন্দের সর্বপ্রথম বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তার পরে নিধুবাবুর টপ্পা, ঈশ্বর গুপ্তের ও হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতা এবং মধুসূদনের প্রহসনেও এ ছন্দের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলিও লোকসাহিত্যেরই অনুবর্তন মাত্র; বিশুদ্ধ সাহিত্যে এঁরা এ ছন্দকে সযত্নে বর্জন করেছেন। আর এসব দৃষ্টান্ত অনেক স্থানেই বিশুদ্ধ স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত নয়; কোথাও ছড়া-পাঁচালির মতো ভাঙা-ভাঙা, কোথাও সাধু ছন্দের সঙ্গে মিশ্রিত।

স্বরবৃত্ত ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে সাধু সাহিত্যের আসরে অভিনন্দিত করেন। তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় এ ছন্দেরই প্রাধান্য দেখা যায়। 'ক্ষণিকা'র যুগে তিনি এ ছন্দকে সর্বপ্রথমে কবিতা রচনার একটি বিশিষ্ট

বাহনরূপে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সে সময় থেকে এ ছন্দটি কবিসমাজে খাঁটি বাংলা ছন্দ বলে আদৃত হয়ে আসছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষণিকাতেই এ ছন্দের সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন, তা নয়। 'ক্ষণিকা'র (১৩০৬ সাল) বহুকাল পূর্বেই 'ছবি ও গান'-এ (১২৯০ সাল) এ ছন্দের সর্বপ্রথম রচনা দেখতে পাই। 'ছবি ও গান'-এর স্বরবৃত্ত ছন্দের এই একটি বিশেষ মূল্য আছে যে, ওর থেকেই আমরা বুঝতে পারি স্বরবৃত্ত ছন্দ লোকসাহিত্যের অনিয়মিত আকৃতি পরিত্যাগ করে কিরূপে কাব্যসাহিত্যে ব্যবহারযোগ্য সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

|

একলা পাখি। গাছের শাখে।

+

কাছে তোর। বসে থাকে,।

|

সারা দুপুর। -বেলা শুধু। ডাকে।

+ | |

যেন তার। আর কেহ নাই,।

+ |

সারাদিন। একলাটি তাই।

|

স্নেহভরে। তোরে নিয়েই। থাকে॥

—আদরিণী, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি দেখলেই বোঝা যায় যে, ওটি আমাদের সুপরিচিত আট-আট-দশের দীর্ঘ ত্রিপদীর ছাঁচে ঢালা। বাস্তবিক পক্ষে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির অনেক স্থলেই, বিশেষভাবে ঢেরা-চিহ্নিত তিনটি স্থলে, অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিও রয়েছে। স্বরবৃত্তের দিক্ থেকে দেখতে গেলে ওই তিন জায়গায় ছন্দপতন হয়েছে। এরূপ হবার কারণ এই যে, এখানে কবি আসলে ঠিক স্বরবৃত্ত রচনা করতেই চান নি; তিনি চেয়েছেন প্রচলিত দীর্ঘ ত্রিপদী রচনা করতে। অথচ শব্দান্তস্থিত কয়েকটি যুগ্মধ্বনিকে (দণ্ড-চিহ্নিত) প্রয়োজনমতো এক ইউনিট বলেও গণ্য করেছেন। তাই এখানে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের একটা মিশ্রণ হয়েছে। 'ছবি ও গান'-এ এরূপ এবং এর চেয়েও বেশি মিশ্রণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আর-একটি নমুনা দিচ্ছি—

\+
ধীরে ধীরে প্রভাত হল,
আঁধার মিলায়ে গেল,
উষা হাসে কনকবরনী ;
বকুল গাছের তলে
কুসুম রাশির পরে
বসিয়া পড়িল সে রমণী।
আঁখি দিয়ে ঝরঝরে
অশ্রুবারি ঝরে পড়ে,
ভেঙে যেতে চায় যেন বুক ;
\+
রাঙা রাঙা অধর দুটি
কেঁপে কেঁপে ওঠে কত,
করতলে সকরুণ মুখ।

—বিরহ, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

এটি অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঢেরা-চিহ্নিত দুটি স্থানে ব্যতিক্রম আছে ; অর্থাৎ স্বরবৃত্তের ন্যায় এ দুটি জায়গায় যুগ্মধ্বনিকে এক ইউনিট ধরা হয়েছে। আসল কথা, অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে এক ইউনিট বলে ধরা যায় কি না রবীন্দ্রনাথ তাই পরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষাকার্যের ফলেই 'ছবি ও গান'-এ অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের কমবেশি মিশ্রণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা ও মিশ্রণের ফলেই রবীন্দ্রনাথ অবশেষে স্বরবৃত্ত ছন্দের আসল প্রকৃতির সন্ধান পেয়েছিলেন। 'ক্ষণিকা'য় আমরা তারই পরিচয় পাই। 'উৎসর্গে' স্বরবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদীর পূর্ণাঙ্গ নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

অতি সুদূর দীর্ঘ পথে
আকুল তব আঁচল হতে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন এলে দুয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি।

—৩৬, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

সুতরাং দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভিতর থেকেই আবিষ্কার করেছিলেন, স্বরবৃত্ত ছন্দেরও সাহিত্যিক রূপের সন্ধান তেমনি অক্ষরবৃত্তের মধ্যেই পেয়েছিলেন। কারণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত উভয়েরই মূলতত্ত্ব পাশাপাশি অবস্থিত আছে।

পঞ্চপুষ্প ১৩৩৮ মাঘ

ছন্দোবিশ্লেষ

ছন্দের অন্তরের প্রকৃতি নির্ভর করে অযুগ্ম ও যুগ্ম -বিশেষে ধ্বনি সমাবেশের উপরে, আর ছন্দের আকৃতি অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় যতিস্থাপন ও পর্বগঠনের রীতির দ্বারা। যতি ও পর্ব খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; কারণ যতিস্থাপন ও পর্বগঠনের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের উপরে নির্ভর করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, বাংলা ছন্দের যতি তিন রকমের। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছি।

আপাতত। এই আনন্দে॥ গর্বে বেড়াই। নেচে,
কালিদাস তো। নামেই আছেন॥ আমি আছি। বেঁচে।

—সেকাল, ক্ষণিকা. রবীন্দ্রনাথ

ছন্দের দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে, এক-একটি সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনিই হচ্ছে এ দৃষ্টান্তটির unit বা ব্যষ্টি; সুতরাং এ ছন্দটি হচ্ছে স্বরবৃত্ত বা syllabic। আর ছন্দোবন্ধের দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে, চারটি করে ব্যষ্টির পরেই ধ্বনির গতি একটু করে বিরত হচ্ছে। ধ্বনিগতির এই বিরামকেই ছন্দের পরিভাষায় বলা হয় যতি (pause), আর ধ্বনিশ্রেণীর যে অংশের পর একটি করে যতি থাকে সে অংশটুকুকে বলা যায় পর্ব (measure) বা গণ (group)। পর্ব ও গণ যদিও একই জিনিস তথাপি তাদের অর্থের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। পর্ব মানে হচ্ছে দুটি ছেদের মধ্যবর্তী অংশ; আর কয়েকটি ব্যষ্টির সমবায়ে গঠিত একটি অংশকে বলা যায় একটি গণ। যেমন উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রত্যেকটি পংক্তিই চারটি যতি বা ছেদের দ্বারা চারটি পর্বে বিভক্ত হয়েছে; আর চারটি করে সিলেবল্ বা ধ্বনির যোগে একটি করে গণ গঠিত হয়েছে। যা হক, ছন্দের আলোচনায় পর্ব ও গণ কার্যতঃ একই জিনিস। আমাদের আলোচনায় আমরা গণ শব্দের পরিবর্তে পর্ব কথাটাই ব্যবহার করব। উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটিতে প্রত্যেকটি পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্ বা স্বর আছে; সুতরাং এগুলিকে চতুঃস্বর পর্ব (tetrasyllabic measure) নাম দিতে পারি। অতএব ছন্দোবন্ধের তরফ থেকে এ ছন্দটিকে বলব চতুঃস্বরপর্বিক ছন্দ। আবার যেহেতু এখানে প্রতি পংক্তিতেই চারটি করে পর্ব আছে আর শেষ পর্বে দুটি করে স্বর কম আছে সেজন্যে এ ছন্দটির আর-এক পরিচয় হচ্ছে এই যে, এটি অপূর্ণ চৌপর্বিক

(tetrameter catalectic) ছন্দ। অতএব উদ্‌ধৃত পংক্তি-দুটি হচ্ছে স্বরবৃত্ত ছন্দের চতুঃস্বর অপূর্ণ চৌপর্বিক ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত।

এবার এই পংক্তি-দুটির যতিবিচার করা যাক। একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যাবে যে, এখানে যে চার স্থানে যতি স্থাপিত হয়েছে তার সবগুলিতে ধ্বনির বিরতিকাল সমান নয়। চতুর্থ পর্বের পরবর্তী যতিতে ধ্বনি সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়েছে; সুতরাং এ যতিটিকে বলতে পারি **পূর্ণযতি**। প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে ধ্বনির বিরতি অতি অল্পসময় স্থায়ী; সুতরাং এ দুটি যতিকে **ঈষদ্‌যতি** নাম দেওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্বের পরবর্তী যতিটি কিন্তু চতুর্থ যতিটির মতো পূর্ণবিরতি-সূচকও নয়, আবার প্রথম ও তৃতীয় যতি-দুটির মতো ঈষদ্‌বিরতি-সূচকও নয়; এটির স্থায়িত্বকাল মাঝামাঝি রকমের। তাই এ যতিটিকে **অর্ধযতি** নামে অভিহিত করতে পারি। এ বিষয়ের বিশদতর আলোচনা দ্রষ্টব্য 'প্রবাসী' ১৩৩০ চৈত্র, ৭৮২-৮৩ পৃষ্ঠায়। উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটিতে ঈষদ্‌যতি নির্দেশ করার জন্যে একটি ছেদচিহ্ন এবং অর্ধযতি নির্দেশ করার জন্যে যুগ্মচ্ছেদ-চিহ্ন ব্যবহার করেছি; পূর্ণযতি নির্দেশ করার জন্যে কোনো চিহ্ন ব্যবহার করি নি।

কালব্যাপ্তির দিক্ থেকে যতির এই প্রকারভেদের বিষয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়।

তরুণী । বেয়ে শেষে ॥ এসেছি । ভাঙা ঘাটে

এই পংক্তিটির ছন্দোবিশ্লেষণ উপলক্ষে মাঘের 'পরিচয়ে' তিনি লিখেছেন— "সাত মাত্রার পরে একটা করে যতি আছে, কিন্তু বিজোড় অঙ্কের অসাম্য ওই যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে।" অর্থাৎ উদ্‌ধৃত পংক্তিটির শেষ প্রান্তে একটা 'সম্পূর্ণ স্থিতি' বা পূর্ণ যতি আছে; আর পংক্তির মধ্যস্থলে যে যতিটি আছে সেটি 'পুরো বিরাম' বা পূর্ণযতি নয়, সেটি হচ্ছে অর্ধযতি। তা ছাড়া প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে ছেদচিহ্নের দ্বারা যে বিভাগটি নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানেও একটি করে ঈষদ্‌যতি রয়েছে।

২

যতির এই প্রকারভেদের দ্বারা ছন্দোবন্ধ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবার তাই দেখাব। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।—

দুঃখ সহার। তপস্যাতেই ॥ হোক বাঙালির। জয়,
ভয়কে যারা। মানে তারাই ॥ জাগিয়ে রাখে। ভয়।
মৃত্যুকে যে। এড়িয়ে চলে ॥ মৃত্যু তারেই। টানে,
মৃত্যু যারা। বুক পেতে লয় ॥ বাঁচতে তারাই। জানে।

—চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দটির unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে সিলেব্‌ল্ বা স্বর। সুতরাং এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ। এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে চোদ্দটি করে স্বরব্যষ্টি (syllabic unit) আছে এবং আট স্বরের পরে অর্ধযতি ও পংক্তির শেষ প্রান্তে পূর্ণযতি রয়েছে। সুতরাং এটিকে 'স্বরবৃত্ত পয়ার' বলতে পারি। পূর্বে বলেছি ঈষদ্‌যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছন্দপংক্তির অংশকে বলা যায় পর্ব। কিন্তু অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত ছন্দপংক্তির অংশকে কি বলা যাবে? ওই রকম অংশকেই বলা যায় ছন্দের পদ। ঈষদ্‌যতি ও অর্ধযতির বিভাগ অনুসারে ছন্দপংক্তিকে 'পর্ব' ও 'পদ'-এ বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ছন্দের 'পদ'-বিভাগ আছে বলেই ছন্দোবদ্ধ রচনার নাম হয়েছে 'পদ্য'।

মৃত্যু যারা। বুক পতে লয় ॥ মরতে তারাই। জানে

এই পংক্তিটিকে ঈষদ্‌যতি ও পর্ববিভাগের দিক্ থেকে বলব 'অপূর্ণ চৌপর্বিক'; শেষ পর্বে দুটি স্বর বা সিলেব্‌ল্ কম আছে। আবার অর্ধযতি ও পদবিভাগের দিক্ থেকে এই পংক্তিটিকে বলা যায় অপূর্ণ দ্বিপদী; দ্বিতীয় পদে আটটি স্বর নেই বলে এ পদটি পূর্ণ নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে এখানে এক-একটি পদে দুটি করে পর্ব আছে। বাংলা কবিতায় এ-রকম দ্বিপর্বিক পদই বেশি প্রচলিত। কিন্তু ত্রিপর্বিক পদও আজকালকার ছন্দে যথেষ্ট পাওয়া যায়।—

যন্ত্র-জাঁতায়। পরান কাঁদায়, ॥
ফিরি ধনের। গোলকধাঁধায়, ॥
শূন্যতারে। সাজাই নানা। সাজে।

—মাটির ডাক, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটি ছন্দ হিসেবে স্বরবৃত্ত এবং ছন্দোবন্ধ হিসেবে ত্রিপদী। অতএব এটিকে 'স্বরবৃত্ত ত্রিপদী' বলতে পারি। প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরে অর্ধযতি এবং তৃতীয় পদের পরে পূর্ণযতি রয়েছে। প্রথম দুটি পদে দুটি করে পূর্ণ পর্ব রয়েছে; এ দুটি দ্বিপর্বিক পদ। কিন্তু তৃতীয় পদে দুটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অর্ধ পর্ব আছে;

তাই এটিকে অপূর্ণ ত্রিপর্বিক বা সার্ধ দ্বিপর্বিক পদ বলতে পারি। অর্ধযতির বিভাগ অনুসারে এই শ্লোকাংশটিকে বলা যাবে ত্রিপদী; কিন্তু ঈষদ্‌যতির বিভাগ অনুসারে এটিকে বলতে হবে অপূর্ণ সপ্তপর্বিক। এবার একটি স্বরবৃত্ত চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আমার প্রিয়ার । মুগ্ধ দৃষ্টি ॥
করছে ভুবন । নূতন সৃষ্টি, ॥
মুচকি হাসির । সুধার বৃষ্টি ॥
চলছে আজি । জগৎ জুড়ে।

—অতিবাদ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্তটির চারটি পদেই দুটি করে পর্ব আছে। সুতরাং এটিকে দ্বিপর্বিক চৌপদী বলে পরিচয় দেওয়া যায়। একটি ত্রিপর্বিক চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

পাকা যে ফল । পড়ল মাটির । টানে ॥
শাখা আবার । চায় কি তাহার । পানে ? ॥
বাতাসেতে । উড়িয়ে-দেওয়া । গানে ॥
তারে কি আর । স্মরণ করে । পাখি ?

—দান, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে চার পদেই দুটি করে পূর্ণ পর্ব ও একটি অর্ধ পর্ব রয়েছে। সুতরাং এটিকে অপূর্ণ ত্রিপর্বিক বা সার্ধ দ্বিপর্বিক চৌপদী বলে অভিহিত করা যায়। মনে রাখা উচিত যে পয়ার (বা দ্বিপদী), ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের নাম নয়, ছন্দোবন্ধের নাম।

আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আশা করি উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ-প্রণালী থেকেই ছন্দপংক্তিকে ঈষদ্‌যতি ও অর্ধযতির সংস্থানের প্রতি লক্ষ রেখে পর্ব ও পদে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে।

৩

যতির প্রকারভেদ এবং পর্ব ও পদ বিভাগের উপলক্ষে আমি বহুবার 'ছন্দপংক্তি' কথাটা ব্যবহার করেছি। ছন্দের আলোচনায় 'পংক্তি' বলতে ঠিক কি বোঝায় তা বিবেচনা করে দেখা দরকার।

আমাদের আলোচনা থেকে এ কথা আশা করি বোঝা গেছে যে, এক-একটি ঈষদ্‌যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিসমষ্টির নাম হচ্ছে পর্ব, অর্ধযতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন

ধ্বনিশ্রেণীর অংশকেই বলেছি পদ, আর তেমনি ধ্বনিগতির সূচনা থেকে ওই গতির পূর্ণ বিরতি বা যতি পর্যন্ত যে ধ্বনিশ্রেণী তারই নাম 'ছন্দপংক্তি'। 'ছন্দপংক্তি' কথাটাকে আমি একটা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করছি; প্রচলিত অর্থের ছত্র বা লাইন শব্দ থেকে পংক্তি কথাটির পার্থক্য রক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ পদ্যের একটি ধ্বনিশ্রেণীকে দুই বা ততোধিক 'ছত্রে' সাজিয়ে লেখা হলেও ছন্দের আলোচনায় তাকে এক 'পংক্তি' বলেই গণ্য করতে হবে। গতির আরম্ভ থেকে পূর্ণ বিরতি পর্যন্ত ধ্বনিশ্রেণীটি যদি নাতিদীর্ঘ হয় তবে তাকে এক লাইনেও লেখা যায়, আবার দু-তিন সারে সাজিয়েও লেখা যায়, তা ছাড়া দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যেসব ছন্দোবন্ধে ওই ধ্বনিশ্রেণীটি অতি দীর্ঘ সেসব স্থলে ওটিকে দুই, তিন কিংবা চার সারে সাজিয়ে লেখা ছাড়া পদ্যের চাক্ষুষ আকৃতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যত সার বা ছত্রেই লেখা হক না কেন, গতির প্রারম্ভ থেকে পূর্ণ বিরতি পর্যন্ত সমগ্র ধ্বনিশ্রেণীটিকে একটি ছন্দপংক্তি বলে গণ্য করাই ছন্দের আলোচনার পক্ষে সংগত ও সুবিধাজনক। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দুঃখের । বরষায় ॥ চক্ষের । জল যেই ॥ নামল

—১, গীতালি, রবীন্দ্রনাথ

এই ধ্বনিশ্রেণীটি ঈষদ্‌যতির দ্বারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পঞ্চপর্বিক। আবার অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে বলে একে ত্রিপদী বলব। এখানে এই ধ্বনিশ্রেণীটিকে এক সারেই লেখা হয়েছে হয়েছে বটে; কিন্তু অর্ধযতির বিভাগ অনুসারে এটিকে তিন সারে সাজিয়েও লেখা যায়। কিন্তু যেভাবেই লেখা হক না কেন, এই ধ্বনিশ্রেণীটিকে একটিমাত্র 'ছন্দপংক্তি' বলেই অভিহিত করব। পূর্বে স্বরবৃত্ত ত্রিপদীর যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে সেটি তিন সারে লিখিত হলেও এক পংক্তি বলেই গণ্য হবে। আর স্বরবৃত্ত চৌপদীর দৃষ্টান্ত-দুটিও চার লাইনে লিখিত হয়েছে; তথাপি ছন্দের আলোচনায় এগুলিকে এক-এক পংক্তি বলেই গণ্য করব।

ছন্দপংক্তির যে সংজ্ঞা দেওয়া গেল তার ব্যতিক্রমগুলির কথাও এ স্থলে বলা প্রয়োজন। অধিকাংশ ছন্দেই পংক্তির শেষ প্রান্তে পূর্ণযতি স্থাপিত হয়। এর দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাতে ঈষদ্‌যতি অর্ধযতি ও পূর্ণযতির স্থাপনরীতি নিয়মিত ও নির্দিষ্ট নয়; এবং এক ছত্রে

সাজানো ধ্বনিশ্রেণীর শেষ প্রান্তে পূর্ণযতি স্থাপিত হওয়া আবশ্যিক নয়, বরং ওই ধরনের ছন্দে লাইন ও ছত্রের শেষে পূর্ণযতি স্থাপন না করাই ও ছন্দের রীতি। ওসব ছন্দে ছত্রের শেষ প্রান্তে পূর্ণযতির পরিবর্তে অর্ধযতি এবং এমন কি ঈষদ্‌যতিও স্থাপিত হতে পারে ; আবার ছত্রের মধ্যেও যে-কোনো পর্বের বা পর্বার্ধের পরেই অর্ধযতি বা পূর্ণযতি স্থাপিত হতে পারে। এসব ছন্দে ধ্বনির গতি প্রতি ছত্রের নির্দিষ্ট (বা অনির্দিষ্ট) দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে ছত্রের পর ছত্রে প্রবাহিত হতে থাকে এবং প্রয়োজন অনুসারে ছত্রের প্রান্তে কিংবা মধ্যেও ধ্বনিগতি বিরত হতে পারে। যেসব ছন্দে এভাবে ছত্রের অন্তে পূর্ণযতি থাকা আবশ্যিক নয় সেসব ছন্দকে আমি বলেছি **প্রবহমান** ছন্দ। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'লাইন-ডিঙোনো চাল', তাকেই আমি বলেছি 'প্রবহমানতা'। এই প্রবহমানতা বা 'লাইন-ডিঙোনো চাল'-টাকেই ফরাসি ভাষায় বলা হয় *enjambement*। ও শব্দটার ইংরেজি রূপ হচ্ছে enjambment। যা হক, এই প্রবহমান ছন্দেও যে ধ্বনিশ্রেণী এক ছত্রে সাজানো থাকে তাকেও আমি 'পংক্তি' নামেই অভিহিত করব, কেন না প্রবহমান ছন্দের ছত্রকে ইচ্ছামত ভেঙে-চুরে দু-তিন সারে সাজিয়ে লেখা চলে না, তাই এসব ছন্দের এক-একটি সার বা ছত্রকে এক-এক 'পংক্তি' বলে অভিহিত করলে অর্থের বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রবহমান ছন্দের পংক্তিগুলিকে বলতে পারি প্রবহমান বা 'অ-যতিপ্রান্তিক পংক্তি' (run-on বা unstopt lines); কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এই প্রবহমান পংক্তির অন্তে পূর্ণযতি থাকা আবশ্যিক না হলেও একটি করে অর্ধ বা ঈষৎ যতি থাকা প্রয়োজন। আর যেসব ছন্দ প্রবহমান নয় সেসব ছন্দের পংক্তিগুলিকে শুধু 'পংক্তি' বা 'যতি-প্রান্তিক পংক্তি' (end-stopt lines) বলতে পারি।

৪

বাংলা ছন্দকে আমি ধ্বনিব্যষ্টি বা unitএর প্রকৃতিভেদে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ওরফে অক্ষরবৃত্ত, এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। ছন্দের এই তিন ধারার মধ্যে শুধু যৌগিক ও স্বরবৃত্ত ধারাতেই প্রবহমান ছন্দোবদ্ধ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যেও শুধু দ্বিপদী অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দোবন্ধকেই প্রবহমান আকার দেওয়া হয়ে থাকে। ইংরেজিতে যেমন শুধু Iambic pentameterএই প্রবহমান (run-on) ছন্দোবদ্ধ রচনা

করা যায়, বাংলাতে তেমনি শুধু যৌগিক ও স্বরবৃত্ত পয়ার বা দ্বিপদীকেই প্রবহমান আকার দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশ প্রবহমান ছন্দোবন্ধ চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারেই রচিত হয়েছে। চোদ্দ unit বা ব্যষ্টির প্রবহমান যৌগিক পয়ারের দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' (মানসী), 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী), 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (চিত্রা) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করতে পারি। এগুলি হচ্ছে সমিল প্রবহমান যৌগিক পয়ারের দৃষ্টান্ত। যদি এসব প্রবহমান পয়ারের পংক্তিপ্রান্তস্থিত মিলটি উঠিয়ে দেওয়া যায় তা হলেই এ ছন্দোবন্ধ তথাকথিত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে পরিণত হবে। অর্থাৎ অমিল প্রবহমান যৌগিক পয়ার আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ একই জিনিস। আজ পর্যন্ত বাংলায় যত অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচিত হয়েছে তার সবই চোদ্দ ব্যষ্টির অমিল প্রবহমান যৌগিক পয়ার। আঠারো ব্যষ্টির অমিত্রাক্ষর ছন্দ কেউ রচনা করেন নি। কিন্তু আঠারো ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারে অর্থাৎ বর্ধিত যৌগিক পয়ারে অতি সুন্দর সমিল প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী), 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা) প্রভৃতি কবিতার নাম করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন আঠারো 'অক্ষরের' 'দীর্ঘ পয়ার' বা 'বড়ো পয়ার' তাকেই আমি বলেছি 'বর্ধিত যৌগিক পয়ার'।

স্বরবৃত্ত পয়ারেও প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচনা করা সম্ভব। চোদ্দ স্বরের পয়ারে প্রবহমান ছন্দোবন্ধ কেউ রচনা করেছেন বলে মনে হয় না। আঠারো স্বরের বর্ধিত পয়ারে প্রবহমানতার দৃষ্টান্তও খুব কম আছে। এ-রকম ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'সরযূ' (বেলাশেষের গান) এ দুটি কবিতার উল্লেখ করতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথের 'ইচ্ছামুক্তি' (বেলাশেষের গান) নামক আঠারো স্বরের স্বরবৃত্ত পয়ারে রচিত সনেটটিতেও প্রবহমানতার আভাস পাই; তাঁর 'কবির তিরোধান' (ঐ) নামক কবিতাটিতেও ও-রকম আভাস আছে। যা হক, এ স্থলে বর্ধিত স্বরবৃত্ত পয়ারের প্রবহমানতার দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি;

তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিনগণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাসবায়ু।

—পূরবী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

২। ধাত্রী তুমি সম্রাটেদের ; সরিৎ-স্রোতে সাগর-ঢেউএর ফেনা
উথলাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষলে বারম্বারই
পীযূষদানে। কবির গানে অমর যারা, যারা সবার চেনা,
মানুষ হল তোমার স্নেহে, তারা সবাই জৈত্র-ধনুধারী।

—সরযু, বেলাশেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

যৌগিক বা স্বরবৃত্ত পয়ারে রচিত প্রবহমান ছন্দোবন্ধকে বলতে পারি 'সম-পংক্তিক' প্রবহমান ছন্দ; কেননা, এজাতীয় ছন্দোবন্ধে প্রতি পংক্তির দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ব্যষ্টিসংখ্যা, চোদ্দ বা আঠারো, কবিতার আদ্যন্ত সর্বত্রই সমান থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় আর-এক প্রকার প্রবহমান ছন্দোবন্ধ আছে যাতে প্রতি পংক্তির দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ ব্যষ্টিসংখ্যার সমতা রক্ষিত হয় না। এজাতীয় ছন্দোবন্ধকে বলতে পারি **অসমপংক্তিক** প্রবহমান ছন্দোবন্ধ। এই অসমপংক্তিক প্রবহমান ছন্দোবন্ধকে আমি **মুক্তক** নামে অভিহিত করেছি। কেননা এজাতীয় ছন্দোবন্ধে সুনির্দিষ্টরূপে নিয়মিত যতিস্থাপন, পরিমিত পদগঠন এবং পংক্তিদৈর্ঘ্যের বন্ধন থেকে ছন্দের সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকায়' যৌগিক মুক্তক এবং তাঁর 'পলাতকা'য় স্বরবৃত্ত মুক্তকের প্রবর্তন হয়েছে, এ কথা সকলেই জানেন। 'বলাকা'র মুক্তকগুলিতে পংক্তিপ্রান্তে মিল রয়েছে। কাজেই এগুলিকে বলব স-মিল মুক্তক। অ-মিল মুক্তকের একমাত্র নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্ফল কামনা' নামক কবিতাটির (মানসী) উল্লেখ করা যেতে পারে। সমপংক্তিক ও অসমপংক্তিক প্রবহমান ছন্দের বিশদতর আলোচনা দ্রষ্টব্য 'জয়ন্তী-উৎসর্গ,' ৮২-৮৯ পৃষ্ঠায়।

৫

পদ্যের ঈষদ্‌যতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতির সঙ্গে গদ্যের কমা, সেমিকোলন ও দাঁড়ি বা full stop, এই তিনটি বিরামচিহ্নের যথাক্রমে তুলনা করলেই ওই যতি-তিনটির আসল প্রকৃতিটি বোঝা যাবে। গদ্যের ন্যায় পদ্যেও এই বিরাম-চিহ্ন-তিনটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ওই চিহ্ন-তিনটি শুধু ভাবগত যতিকেই নির্দেশ করে, ছন্দোগত যতিকে নয়। ভাব যেখানে বিরত

হয়, ছন্দের ধ্বনি সেখানে বিরত নাও হতে পারে; আবার ছন্দের ধ্বনি যেখানে বিরত হয়েছে, ভাবের প্রবাহ সেখানে স্তব্ধ না হতেও পারে। সুতরাং পদ্যরচনায় কমা, সেমিকোলন ও দাঁড়ি যথাক্রমে ঈষদ্‌যতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতির নির্দেশক নয়। ওই চিহ্ন-তিনটি ভাবগত ঈষদ্‌বিরতি, অর্ধবিরতি ও পূর্ণবিরতিকে নির্দেশ করে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

চিন্তা দিতেম। জলাঞ্জলি, ॥ থাকতো নাকো। ত্বরা,
মৃদু পদে। যেতেম, যেন ॥ নাইকো মৃত্যু। জরা।

—সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে ভাবের ঈষদ্‌বিরতি-সূচক তিনটি কমা চিহ্ন আছে। কিন্তু ওই তিন স্থলে ছন্দের ঈষদ্‌যতি নেই। প্রথম কমাটি যেখানে আছে সেখানে রয়েছে ছন্দের অর্ধযতি; আর দ্বিতীয় কমাটির স্থানে ছন্দের পূর্ণযতি রয়েছে; কিন্তু তৃতীয় কমাটির স্থানে ছন্দে কোনো যতি, এমন কি ঈষদ্‌যতিও নেই। অথচ যেখানে ছন্দোগত ঈষদ্‌যতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতি ঘটেছে সেসব স্থলে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি নেই।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই কথাগুলি শুধু অপ্রবহমান ছন্দের প্রতিই প্রযোজ্য, প্রবহমান ছন্দের প্রতি নয়। প্রবহমান ছন্দোবন্ধে যেসব স্থলে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্ন থাকে সেসব স্থলে অধিকাংশ সময়ই ছন্দোগত কোনো একপ্রকার যতি থাকে। পংক্তির প্রান্তে কিংবা মধ্যে যে-কোনো স্থলেই দাঁড়ি-চিহ্ন থাকে, পূর্ণযতিও সেখানেই থাকে; সেমিকোলনের দ্বারা পূর্ণযতি বা অর্ধ-যতি সূচিত হয়; আর কমা চিহ্ন ঈষদ্‌যতি বা অর্ধযতিকে নির্দেশ করে। এরূপ হবার কারণ এই যে, প্রবহমান পদ্যছন্দ গদ্যছন্দের অনেকটা কাছাকাছি ও সমধর্মী; এবং সেজন্যেই প্রবহমান ছন্দ ধ্বনিপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যধর্মী ভাবপ্রবাহকেও অনুসরণ করে থাকে। এইজন্যেই মহাকাব্যে, বিশেষতঃ নাট্যকাব্যে, প্রবহমান ছন্দের এত উপযোগিতা। দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে প্রবহমান ছন্দ শুধু গদ্যধর্মী ও ভাবানুসারীই নয়, ধ্বনিপ্রবাহের গতি ও যতি রক্ষা করে চলাও তার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই এ ছন্দোবন্ধে কমা-সেমিকোলনে ঈষৎ, অর্ধ বা পূর্ণ যতি থাকা যেমন প্রয়োজন, স্থানবিশেষে ওসব চিহ্ন না থাকলেও যতিস্থাপন আবশ্যক। তবে যেসব স্থলে ভাবগত ও ছন্দোগত যতির সমন্বয় ঘটে, সেসব স্থলে একটু বৈচিত্র্য হয়।—

বলেছিনু 'ভুলিব না', যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সে দিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কত দিন ফিরে ফিরে।

—কৃতজ্ঞ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই আঠারো ব্যষ্টির যৌগিক প্রবহমান পয়ারটিকে যথারীতি আবৃত্তি করে পড়লেই টের পাওয়া যাবে, ধ্বনিপ্রবাহ ও ভাবপ্রবাহ কেমন চমৎকার ভঙ্গিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পরস্পর পাশাপাশি চলেছে। ধ্বনিপ্রবাহের গতি ও যতির একটা স্বকীয় ভঙ্গি আছে, অথচ সর্বত্রই সে ভাবের গতি ও যতিকে অনুসরণ করে চলেছে, কোথাও তাকে লঙ্ঘন করে চলছে না। অ-প্রবহমান ছন্দে এমন হয় না; কেননা, সেখানে ধ্বনিরই প্রাধান্য, ভাব ধ্বনির অনুগামী মাত্র; কাজেই ধ্বনির গতি ও যতি ভাবের গতি ও যতিকে লঙ্ঘন করে যেতে পারে। একটু পূর্বে 'ক্ষণিকা' থেকে যে দৃষ্টান্তটি উদ্‌ধৃত করেছি তাতেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।

৬

এবার বাংলা ছন্দের যতি ও পংক্তি বিভাগগুলির সঙ্গে ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের যতি ও পংক্তি বিভাগের তুলনা করা যাক। ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রে যতি বা pauseএর প্রকারভেদ স্বীকার করা হয়। ওই শাস্ত্রে যতিকে অবস্থিতি অনুসারে প্রান্তবর্তী (final) ও মধ্যবর্তী (internal বা middle), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অপ্রবহমান ইংরেজি ছন্দের পংক্তিপ্রান্তবর্তী যতিটি পূর্ণবিরতি-সূচক বলে ওই অন্তিম যতিটিকে অনেক সময় দীর্ঘ যতি বা strong pause বলে অভিহিত করা হয়। পংক্তিমধ্যবর্তী যতির দ্বারা সমগ্র পংক্তিটি খণ্ডিত হয়ে যায় বলে ওই মধ্যযতিটিকে অনেক সময় গ্রীক পরিভাষা অনুসরণ করে ছেদযতি বা caesura বলা হয়ে থাকে। কালব্যাপ্তির দিক্ থেকে এই মধ্যযতি বা ছেদযতিটির বিশেষ কোনো নাম নেই। ধ্বনিপ্রবাহের যে ঈষৎ বিরতির দ্বারা পংক্তিপর্ব গঠিত হয় তারও কোনো নাম নেই, এমন কি তাকে যতি বলে গণ্যই করা হয় না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

Ring out | the feud || of rich | and poor,
Ring in | re-dress || to all | man-kind.

—Tennyson

এটি অন্ত্যগুরু দ্বিস্বর চৌপর্বিক (Iambic tetrameter) ছন্দ। এখানে প্রতি পংক্তির শেষেই একটি করে অন্ত্যযতি আছে; আর দ্বিতীয় পর্বের পরে রয়েছে মধ্যযতি বা ছেদযতি। প্রথম-দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়-চতুর্থ পর্বের মধ্যে ধ্বনিপ্রবাহের যে ছেদ রয়েছে তাকে ইংরেজিতে যতি বলে গণ্য করা হয় না; বাংলার পদ্ধতিতে এটিকে আমরা ঈষৎ যতি বা weak pause বলতে পারি। অন্ত্যযতিটিকে কালব্যাপ্তির দিক্ থেকে দীর্ঘ যতি বা strong pause বলা হয়; অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের কথিত পূর্ণযতির স্থানীয়। কিন্তু মধ্যযতিটিকে কালব্যাপ্তির দিক্ থেকে কিছু বলা হয় না। আমরা এটিকে কালব্যাপ্তির দিক্ থেকেও মধ্যযতি (medial pause) বলতে পারি, কারণ কালপরিমাণ হিসেবে এটি ঈষদ্‌যতি ও দীর্ঘযতির মধ্যবর্তী।

ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রে এক-একটি পর্বকে বলা হয়, measure বা 'প্রমাণ', কারণ ওই পর্বের দ্বারাই সমগ্র পংক্তিটা 'প্রমিত' হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ওই পর্বের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় বলেই ছন্দের নাম হয়েছে metre। ওই measure বা পর্বেরই আর-একটি নাম হচ্ছে foot অর্থাৎ পদ। কিন্তু লাইনের মধ্যবর্তী ছেদযতির (caesurar) দ্বারা বিচ্ছিন্ন পংক্তিখণ্ডকে ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রে কোনো নাম দেওয়া হয় না। কারণ ইংরেজি ছন্দে ওই ছেদযতিটির অবস্থানের কোনো নির্দিষ্ট রীতি নেই; এটি পংক্তির মধ্যস্থল কিংবা অন্য যে-কোনো পর্বের মধ্যে কিংবা প্রান্তে স্থাপিত হতে পারে। তাই ছেদযতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন পংক্তিখণ্ডের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন নেই; ফলে ছন্দশাস্ত্রে ওরকম পংক্তি-খণ্ডের বিশেষ নামকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। কিন্তু বাংলায় অর্ধযতিটির অবস্থান নির্দিষ্ট এবং তাই ওটির দ্বারা বিচ্ছিন্ন পংক্তিখণ্ডটি পরিমিত ও সুনির্দিষ্ট। বস্তুতঃ ওরকম পংক্তিখণ্ডের দ্বারাই বাংলা ছন্দপংক্তি গঠিত ও প্রমিত হয়ে থাকে; তাই ওই পংক্তিখণ্ডকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া প্রয়োজন। অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পংক্তিচ্ছেদকে 'পদ' বলা হয়েছে। আর তাতেই ছন্দপংক্তিকে ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি আখ্যা দেওয়ার সার্থকতা। বাংলা

ছন্দের আলোচনায় 'পর্ব'কে measure এবং 'পদ'কে foot বলে ও-দুটি শব্দের পার্থক্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এক-একটি শ্লোককে চারটি 'পদ', পাদ বা চরণে বিভক্ত করা হয়। ছন্দশাস্ত্রকার গঙ্গাদাস তাই 'পদ্যং চতুষ্পদী' (ছন্দোমঞ্জরী ৩।৪), এই কথা বলে গ্রন্থারম্ভ করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় পদ বা পাদ শব্দে যেমন 'চরণ' বোঝায়, তেমনি ওই শব্দের দ্বারা কোনো পদার্থের চতুর্থাংশকেও বোঝায়। তাই শ্লোকের পদ বা পাদ বলতে যেমন ছন্দের চরণ বুঝি তেমনি শ্লোকের চতুর্থাংশও বুঝি। বাংলায় 'পদ' শব্দে শ্লোকাংশ বোঝায় বটে, কিন্তু শ্লোকের চতুর্থাংশই বোঝায় না। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ও বাংলা 'পদ' শব্দের পার্থক্য আরও বেশি। বাংলায় 'ছন্দপংক্তি'র যে সংজ্ঞা দিয়েছি, সংস্কৃত ছন্দে 'পদ' শব্দের সেই সংজ্ঞা। অর্থাৎ উভয়ত্রই গতির প্রারম্ভ থেকে পূর্ণ বিরতি পর্যন্ত সমগ্র ধ্বনিশ্রেণীটাকেই বোঝায়। তফাত এই যে, বাংলা ছন্দপংক্তিকে অবস্থাবিশেষে ভেঙে দুই বা ততোধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা চলে; আর সংস্কৃত ছন্দে অবস্থাবিশেষে দুটি পদকে এক ছত্রে লেখা হয়ে থাকে, বিশেষত অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি যেসব ছন্দে পদের দৈর্ঘ্য বেশি নয়।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে জিহ্বার অভীষ্ট বিরামস্থানকেই 'যতি' বলা হয়। 'যতি-র্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানম্' (ছন্দোমঞ্জরী ১।১৮); 'রসজ্ঞাবিরতিস্থানং কবিভির্যতিরুচ্যতে' (শ্রুতবোধ ৪)। কিন্তু কোথায় রসনার বিরতি ঘটবে সে কথাও বহু ছন্দোবন্ধের সংজ্ঞার মধ্যেই নির্দিষ্ট আছে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে কালব্যাপ্তি অনুসারে যতির প্রকারভেদ স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দেও যে কালব্যাপ্তি অনুসারে যতির তারতম্য আছে তার আভাস পাওয়া যায় পিঙ্গলচ্ছন্দসূত্রম্-এর টীকাকার হলায়ুধের[১] টীকায় উদ্ধৃত একটি শ্লোক থেকে। সে শ্লোকটি হচ্ছে এই—

১ বাংলা দেশের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে পিঙ্গলচ্ছন্দসূত্রম্-এর টীকাকার হলায়ুধ এবং লক্ষ্মণসেনের (খ্রী ১১৭৯-১২০৭) সভাপণ্ডিত ও 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা হলায়ুধ একই ব্যক্তি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা অন্য রকম। তাঁদের মতে পিঙ্গলচ্ছন্দসূত্রম্-এর টীকাকার হলায়ুধ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের (খ্রী ৯৪০-৬২) সমসাময়িক। এই হলায়ুধ ছিলেন একজন বৈয়াকরণ ও কবি; তাঁর কাব্যের নাম 'কবিরহস্য'। 'অভিধানরত্নমালা' নামে তাঁর একখানি শব্দকোষও পাওয়া গেছে।

যতিঃ সর্বত্র পাদান্তে শ্লোকার্ধে চ বিশেষতঃ।
সমুদ্রাদিপদান্তে চ ব্যক্তাব্যক্তবিভক্তিকে॥

—পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্ ৬।১

এই বিধানটি থেকে মনে হয় শ্লোকের, বিশেষতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দের, প্রথম পদের পরবর্তী যতিটির চেয়ে দ্বিতীয় পদের পরবর্তী যতিটি অধিকতর স্থায়ী। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ । অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্ একম্ । অবধীঃ কামমোহিতম্॥

এই অনুষ্টুপ্ শ্লোকটির দুটি করে পদ এক লাইনে সাজানো হয়েছে। একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যাবে যে, প্রথম পদের পরবর্তী যতিটির স্থিতিকাল দ্বিতীয় পদের পরবর্তী যতিটির চেয়ে কম। অর্থাৎ প্রথমটি অর্ধযতি, দ্বিতীয়টি পূর্ণযতি। অনুষ্টুপ্ ছন্দে পদমধ্যবর্তী যতি অর্থাৎ ছেদযতি নেই। অন্যান্য সংস্কৃত ছন্দে মধ্যযতি বা ছেদযতির বহুল প্রয়োগ আছে। যথা—

কস্যৈকান্তং । সুখমুপনতং । দুঃখমেকান্ততো বা,
নীচৈর্গচ্ছ- । ত্যুপরি চ দশা । চক্রনেমিক্রমেণ।

—মেঘদূত, উত্তরমেঘ

এটি হচ্ছে সতেরো 'অক্ষর' অর্থাৎ সিলেবল্-এর মন্দাক্রান্তা ছন্দের দুটি পদ। শাস্ত্রানুসারে এ ছন্দের প্রতি পদে যথাক্রমে চার, ছয় এবং সাত অক্ষরের পরে যতি স্থাপিত হয়। উর্ক্ত দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটি পদ তিনটি যতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। লক্ষ করলে টের পাওয়া যাবে যে, প্রথম দুটি যতির চেয়ে তৃতীয় যতিটির স্থিতিকাল দীর্ঘতর। অর্থাৎ মধ্য বা ছেদযতি-দুটিকে যদি বলি 'লঘুযতি', তবে অন্ত্য যতিটিকে বলতে পারি 'গুরুযতি'। যা হক, এই যতি-তিনটির দ্বারা বিচ্ছিন্ন পদের বিভাগ-তিনটিকে কি নাম দেওয়া যায়? সংস্কৃত ছন্দোবিৎরা কোনো নাম দেন নি। এক-একটি ছত্রের সমগ্র ধ্বনিশ্রেণীটাকেই যখন পদ বলা হয়েছে তখন ওই বিভাগগুলিকে আর 'পদ' বলা সংগত নয়। আমাদের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে ওই বিভাগগুলিকে 'পর্ব' আখ্যা দিতে পারি। তা হলেই মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রত্যেকটি পদকে ত্রিপর্বিক পদ এবং সমগ্র শ্লোকটাকে ত্রিপর্বিক চৌপদী বলতে পারি। মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রতি পদের পর্বগুলি অক্ষর অর্থাৎ সিলেবল্-সংখ্যা হিসেবে সমান দীর্ঘ নয়; সুতরাং

এ ছন্দের পদগুলিকে অসমপর্বিক পদ বলা যায়। একটা সমপর্বিক পদওয়ালা ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং। মুহুরনুপততি-। স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ। শরপতনভয়াদ্। ভূয়সা পূর্বকায়ম্।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথম অঙ্ক

এটি হচ্ছে একুশ 'অক্ষর' বা সিলেবল্-এর স্রগ্ধরা ছন্দ। এ ছন্দের পদগুলিও মন্দাক্রান্তার পদের মত ত্রিপর্বিক। তবে মন্দাক্রান্তার পদগুলি অসমপর্বিক; আর এর পদগুলি সমপর্বিক, কেননা এখানে সাত সাত অক্ষরের পর যতি রয়েছে। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, মন্দাক্রান্তার অসমান পর্বগুলিকে সমান করেই স্রগ্ধরা ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। মন্দাক্রান্তার শেষ পর্বে আছে সাত অক্ষর, স্রগ্ধরাতেও তাই; শুধু তাই নয়, উভয়ত্রই লঘুগুরুবিশেষে ধ্বনি-সন্নিবেশপ্রণালী অবিকল একরকম। মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয় পর্বে আর-একটি লঘুবর্ণ বসালেই স্রগ্ধরার দ্বিতীয় পর্ব তৈরি হয়। মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্ব ও স্রগ্ধরার প্রথম চারটি 'অক্ষর' অবিকল এক জিনিস; বস্তুতঃ মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্বে একটি লঘু ও দুটি গুরুধ্বনি যোগ করলেই স্রগ্ধরার প্রথম পর্ব পাওয়া যায়। অতএব দেখা গেল, মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্বে তিনটি অক্ষর এবং দ্বিতীয় পর্বে একটি অক্ষর যোগে তিনটি অসমান পর্বকে সমান করেই স্রগ্ধরার সৃষ্টি হয়েছে। যা হক, আমাদের অবলম্বিত প্রণালীতে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, স্রগ্ধরাও মন্দাক্রান্তার মত ত্রিপর্বিক চৌপদী ছন্দ; শুধু পর্বগঠনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।*

৮

ছন্দের বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে যতি ও পর্বের ব্যবহারবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইংরেজি ছন্দের প্রতি পংক্তিতে এবং সংস্কৃত ছন্দের প্রতি পদে যতি থাকতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই; এ-রকম পংক্তি বা পদ যদি হ্রস্ব হয় তবে তা যতিহীন হয়। কিন্তু দীর্ঘ পংক্তি বা পদে এক বা একাধিক মধ্যযতি অর্থাৎ ছেদযতি থাকাই বিধি। পংক্তিপ্রান্তিক যতি অবশ্য দীর্ঘ হ্রস্ব সকল প্রকার পংক্তি বা পদেই থাকবে। বাংলা ছন্দেও পংক্তিমধ্যবর্তী

* প্রবাসী ১৩৩৮ ফাল্গুন

অর্ধযতিটি থাকা অবশ্যম্ভাবী নয়। যদি এক পংক্তিতে দুএর অধিক পর্ব থাকে তবে দ্বিতীয় পর্বের পর অর্ধযতি থাকে; যদি পংক্তিতে দুটিমাত্র পর্ব থাকে তবে তাদের মধ্যে একটি ঈষদ্‌যতি থাকে এবং পংক্তিপ্রান্তে থাকে পূর্ণযতি, অর্ধযতি কোথাও থাকে না; আর যদি পংক্তিতে একটিমাত্র পর্ব থাকে তবে ঈষদ্‌যতি ও অর্ধযতি থাকে না, একেবারে প্রান্তিক পূর্ণযতি থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। গগন-তলে
আগুন জ্বলে।
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

—পালকির গান, কুহু ও কেকা, সত্যেন্দ্রনাথ

২। শঙ্খচিলের। সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে। মেঘ চলেছে!

—ঐ ঐ ঐ

৩। মিথ্যে তুমি। গাঁথলে মালা॥
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি। কণ্ঠে আমার॥
দেবে তুলে?

—উৎসৃষ্ট, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

প্রথম দৃষ্টান্তটি একপর্বিক, তাই ওতে ঈষদ্‌যতি বা অর্ধযতি নেই। দ্বিতীয়টি দ্বিপর্বিক; তাই পংক্তিমধ্যে একটি করে ঈষদ্‌যতি রয়েছে, কিন্তু অর্ধযতি নেই। তৃতীয়টি ত্রিপর্বিক; এখানে প্রথম পর্বের পরে ঈষদ্‌যতি ও দ্বিতীয় পর্বের পরে অর্ধযতি রয়েছে। প্রত্যক দৃষ্টান্তেই পংক্তিপ্রান্তে পূর্ণযতি রয়েছে।

বাংলা ছন্দের প্রতি পংক্তিতে একটি, দুটি বা তিনটি অর্ধযতি থাকতে পারে। যেসব পংক্তিতে একটি অর্ধযতি থাকে তাকেই দ্বিপদী (বা পয়ার) বলা হয়ে থাকে। দুটি অর্ধযতিওয়ালা পংক্তিকে ত্রিপদী আর তিনটি অর্ধযতিওয়াল পংক্তিকে চৌপদী বলা হয়। দ্বিপদী (বা পয়ার), ত্রিপদী ও চৌপদীর দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। বাংলা ছন্দপংক্তিতে তিনের অধিক অর্ধযতি থাকতে

পারে না, অর্থাৎ বাংলায় বহুপদী পংক্তি রচনা করা যায় না। হেমচন্দ্র বহুপদী পংক্তি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়েছে এ কথা বলা যায় না।

ইংরেজি ছন্দের ছেদযতি (caesura) পর্বের প্রান্তে বা মধ্যে স্থাপিত হতে পারে। বাংলায় কিন্তু অর্ধযতি সর্বদাই পর্বের প্রান্তে স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ছন্দেই ঈষদ্‌যতিটি শব্দের মধ্যেও স্থাপিত হতে পারে অর্থাৎ উভয় ছন্দেই শব্দের মধ্যে পর্ব বিভক্ত হতে পারে। বাংলার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। বিচ্ছেদও সু। -দীর্ঘ হত, ॥
অশ্রুজলের। নদীর মতো ॥
মন্দগতি। চলত রচি ॥
দীর্ঘ করুণ। গাথা।

—সেকাল, ক্ষণিকা. রবীন্দ্রনাথ

২। কীর্তিকে কেউ। ভালো বলে, ॥ মন্দ বলে। কেহ,
বিশ্বাসে কেউ। কাছে আসে, ॥ কেউ করে সন্। -দেহ।

—আশা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'সুদীর্ঘ' ও 'সন্দেহ' কথা-দুটিতে শব্দের মধ্যেই পর্ববিভাগ ঘটেছে অর্থাৎ ঈষদ্‌যতি স্থাপিত হয়েছে। আমাদের প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে এভাবে শব্দের মধ্যে পর্ববিভাগের প্রচলন খুব বেশি ছিল। যা হক, বাংলায় শব্দের মধ্যে পর্ববিভাগ করার অর্থাৎ ঈষদ্‌যতি স্থাপন করার ব্যবস্থা থাকলেও শব্দের মধ্যে পদবিভাগ করার অর্থাৎ অর্ধযতি স্থাপন করার ব্যবস্থা নেই। সংস্কৃত ছন্দে কিন্তু অবস্থাবিশেষে শব্দের মধ্যেও ছেদযতি স্থাপিত হতে পারে।

বাংলা ছন্দের ঈষদ্‌যতির আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, কবি ইচ্ছে করলে এটিকে স্পষ্টতর করে অর্ধযতিতে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু এই স্পষ্টতাকে অর্থাৎ ঈষদ্‌যতির এই পদোন্নতিটিকে কানের কাছে প্রকটিত করার উদ্দেশ্যে একটি করে অধিকতর মিল দিতে হয়। কারণ কানের সম্মতি না পেলে ধ্বনির গতি কিংবা যতি সমস্তই ব্যর্থ হয়। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বিশদ হবে।—

১। কোথায় গেছে। সে দিন আজি। যে দিন মম
তরুণ কালে। জীবন ছিল। মুকুলসম ;

সকল শোভা। সকল মধু। গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে। বদ্ধ ছিল। বন্দী মতো।

—উৎসৃষ্ট, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

২। তোমার তরে। সবাই মোরে। করছে দোষী,
হে প্রেয়সী!
বলছে— কবি। তোমার ছবি। আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি। গাচ্ছে নিতি। তোমার কানে;
নেশায় মেতে। ছন্দে গেঁথে। তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে। বাংলা দেশে। উচ্চ কথা।

—ক্ষতিপূরণ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এ দুটিই স্বরবৃত্ত ত্রিপর্বিক ছন্দ। কিন্তু প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির পর্ববিভাগগুলিকে তথা ছেদযতিগুলিকে স্পষ্টতর করা কবির অভিপ্রায়। তাই দ্বিতীয়টিতে পর্বে পর্বে একটি অধিক মিলের সমাবেশ হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটি একপর্বিক ত্রিপদীর ভঙ্গিতেই রচিত হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে line rhyme বলা হয়, এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের মিলগুলি ঠিক সে প্রকৃতির নয়। আমাদের ত্রিপদী ছন্দোবন্ধে যে রকম মিলের ব্যবস্থা আছে, এ মিলগুলি সেই প্রকৃতির। অর্থাৎ এ দৃষ্টান্তটির আসল রূপ হচ্ছে এই।—

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী,
হে প্রেয়সী!
বলছে— কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে।

উপরের দৃষ্টান্ত-দুটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ ছন্দের পর্ববিভাগগুলি সর্বদাই খুব স্পষ্ট থাকে; তাই ঈষদ্‌যতির স্থায়িত্বের তারতম্য খুব বেশি হতে পারে না। কিন্তু যৌগিক ছন্দে ঈষদ্‌যতিটিকে অস্পষ্টও রাখা যায়, আবার খুব স্পষ্ট করেও তোলা যায়।—

বেণীবন্ধ । তরঙ্গিত ॥ কোন্ ছন্দ । নিয়া,
স্বর্গবীণা । গুঞ্জরিছে ॥ তাই সন্ধ্যা । -নিয়া ।

—পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, রবীন্দ্রনাথ

এটি চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ার। এটির প্রতি পংক্তিতে প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পর ঈষদ্‌যতি এবং দ্বিতীয় পর্বের পরে অর্ধযতি রয়েছে। প্রথম ঈষদ্‌যতিটিকে যদি আরও স্পষ্ট করে তুলে অর্ধযতিতে পরিণত করা যায় তা হলে এটির কি রূপ হবে দেখা যাক।—

দেখ দ্বিজ ॥ মনসিজ ॥ জিনিয়া মূ । -রতি,
পদ্মপত্র ॥ যুগ্মনেত্র ॥ পরশয়ে । শ্রুতি ।
অনুপম ॥ তনু শ্যাম ॥ নীলোৎপল । আভা
মুখরুচি ॥ কত শুচি ॥ করিয়াছে । শোভা ।

—মহাভারত, কাশীরাম দাস

এখানে প্রথম ঈষদ্‌যতিটি অর্ধযতিতে এবং প্রথম পর্ব-দুটি দুটি পদে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ ছন্দটিকে 'ত্রিপদী পয়ার' বলতে পারি। এ ছন্দের প্রাচীন নাম হচ্ছে 'তরল পয়ার'। যদি এ ছন্দের তৃতীয় পর্বের পরবর্তী ঈষদ্‌যতিটিকেও অর্ধযতির শ্রেণীতে প্রোমোশন দেওয়া যায় তা হলে এ ছন্দের আকৃতি হবে এরূপ।—

কি রূপসী, ॥ অঙ্গে বসি, ॥ অঙ্গ খসি ॥ পড়ে।
প্রাণ দহে, ॥ কত সহে, ॥ নাহি রহে ॥ ধড়ে ॥

—বিদ্যাসুন্দর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

এটিকে বলতে পারি 'চৌপদী পয়ার'। এ ছন্দের প্রাচীন নাম হচ্ছে 'মালঝাঁপ'।

পাঠক হয়তো লক্ষ করে থাকবেন পয়ারের অন্তর্গত ঈষদ্‌যতিগুলিকে যতই স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে ধ্বনির গতিবেগ ততই খরতর হচ্ছে। এর কারণটি হচ্ছে এই। যৌগিক পয়ারে ধ্বনির সাধারণ গতিক্রম হচ্ছে খুব দীর্ঘ, তাই তার তাল এবং লয় খুব বিলম্বিত। কিন্তু যদি এ ছন্দের ঈষদ্‌যতিগুলিকে অর্থাৎ পদের ছেদগুলিকে স্পষ্ট করে তোলা যায় তা হলে ধ্বনির গতিক্রম হ্রস্ব হয়ে পড়ে, তাই তার তাল এবং লয়টাও খুব দ্রুত হয়। সুতরাং যৌগিক পয়ারের ধ্বনিকে যদি গাম্ভীর্য ও ধীরগতি দান করতে হয় তা হলে তার ঈষদ্‌যতি ও পর্ববিভাগগুলিকে খুব অস্পষ্ট কিংবা বিলুপ্ত করে দিতে হয়।

যৌগিক অর্থাৎ তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ ছন্দে অতি সহজেই পর্ববিভাজক ঈষদ্‌যতিগুলিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে দুটি পর্বকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়। এই তত্ত্বটির উপরেই যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং এ তত্ত্বটিকে ভালো করে বোঝা দরকার।

যৌগিক ছন্দে, বিশেষতঃ পয়ারে, ধ্বনিবিন্যাসের স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিবিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। ...এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হলে সে পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের এ কথা খুবই সত্য। যৌগিক ছন্দের এই ছেদবৈচিত্র্যের হেতু কি তার সন্ধান করা প্রয়োজন। যৌগিক ছন্দের গদ্যপ্রকৃতি ও-ছন্দের একটা মস্ত কথা। এই গদ্যপ্রকৃতির ফলে ও-ছন্দের ধ্বনিগত ব্যবহারে লক্ষ করার মতো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, এ ছন্দের প্রত্যেকটি শব্দ (word) সর্বদাই পরবর্তী শব্দ থেকে নিজের পার্থক্য রক্ষা করে চলে, স্বরবৃত্ত ছন্দের মতো দুটি পৃথক্ শব্দ কখনও পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যায় না। শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই সে শব্দটিকে পরবর্তী শব্দ থেকে পৃথক্ করে রাখে। দ্বিতীয়তঃ, যৌগিক ছন্দের উচ্চারণের গদ্যপ্রকৃতি রক্ষার জন্যে ও-ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ গদ্যপ্রথায় প্রায় সর্বদাই সংশ্লিষ্ট, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ভঙ্গিতে বিশ্লিষ্ট হয় না। সুতরাং দেখা গেল যৌগিক ছন্দের প্রত্যেকটি শব্দই গদ্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়। যৌগিক ছন্দের এই গদ্যপ্রকৃতি রক্ষার তৃতীয় প্রণালী হচ্ছে শব্দের মধ্যে যতিস্থাপন-বিমুখতা। আমরা পূর্বে দেখেছি স্বরবৃত্ত ছন্দে শব্দের মধ্যে অতি সহজেই পর্ববিভাগ অর্থাৎ ঈষদ্‌যতিস্থাপন চলতে পারে। কিন্তু যৌগিক ছন্দে এমনটি হবার জো নেই। অথচ যৌগিক ছন্দেও স্বরবৃত্তের ন্যায় প্রতি পর্বের পরিমাণ হচ্ছে চার ব্যষ্টি। সুতরাং যদি এমন হয় যে, চার ব্যষ্টির একটি পর্ববিভাগ করতে হলে কোনো একটি শব্দের মধ্যেই ঈষদ্‌যতি বা ছেদ স্থাপন করতে হয় তা হলে ওই ঈষদ্‌যতিটিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে দুটি পর্বকে একত্র জুড়ে একটি জোড়া পর্ব অর্থাৎ যুক্তপর্ব গঠন করতে হবে। কিন্তু যৌগিক ছন্দেও পংক্তিমধ্যবর্তী অর্ধযতিটি কখনও বিলুপ্ত হয় না। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি সহজবোধ্য হবে।—

স্বরাঙ্গনা । নন্দনের ॥ নিকুঞ্জ প্রাঙ্ । -গণে
মন্দার মঞ্ । -জরী তোলে ॥ চঞ্চল কঙ্ । -কণে ।
বেণীবন্ধ । তরঙ্গিত ॥ কোন্ ছন্দ । নিয়া,
স্বর্গবীণা । গুঞ্জরিছে ॥ তাই সন্ধ্যা । -নিয়া ।

এ দৃষ্টান্তটির তৃতীয় পংক্তিতেই যৌগিক পয়ারের প্রকৃত রূপটি স্পষ্টভাবে আছে, অর্থাৎ চার ব্যষ্টির তিনটি পূর্ণপর্ব ও একটি অর্ধপর্ব এবং মধ্যবর্তী ঈষদ্‌যতিগুলি সুব্যক্ত রয়েছে। প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঈষদ্‌যতিটি শব্দের মধ্যে পড়েছে, এ-রকম শব্দমধ্যবর্তী ঈষদ্‌যতি যৌগিক ছন্দের প্রকৃতিবিরোধী ; তাই এ ছন্দে ওই ঈষদ্‌যতিটিকে অস্বীকার করে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বটিকে একটি যতিবিহীন যুক্তপর্ব বলেই গণ্য করা সংগত। উপরের দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ পর্বকেও তেমনি যতিহীন যুক্তপর্ব বলেই ধরা উচিত। দুটি পূর্ণপর্ব যুক্ত হলে তাকে 'পূর্ণ যুক্তপর্ব' বা শুধু **যুক্তপর্ব** বলব ; আর, একটি পূর্ণপর্ব ও একটি অর্ধপর্ব যুক্ত হলে তাকে 'খণ্ডিত যুক্তপর্ব' বা **সার্ধপর্ব** বলা যাবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, বাংলা ছন্দে প্রায় সর্বদাই দুটি পর্বের পরেই অর্ধযতি স্থাপিত হয় অর্থাৎ প্রায়শঃই দুই পর্বে একটি পদ গঠিত হয়, বিশেষতঃ যৌগিক ছন্দে। সুতরাং যৌগিক ছন্দের যুক্তপর্ব আর পূর্ণপদ একই জিনিস ; আর সার্ধপর্বকে 'খণ্ডিত পদ' নামে অভিহিত করতে পারি। সুতরাং পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই ।—

স্বরাঙ্গনা । নন্দনের ॥ নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে
মন্দার মঞ্জরী তোলে ॥ চঞ্চল কঙ্কণে ।
বেণীবন্ধ । তরঙ্গিত ॥ কোন্ ছন্দ । নিয়া,
স্বর্গবীণা । গুঞ্জরিছে ॥ তাই সন্ধ্যানিয়া ।

অর্থাৎ এখানে প্রথম পংক্তির প্রথম পদে আছে দুটি পূর্ণপর্ব আর দ্বিতীয় পদে একটি সার্ধপর্ব ; দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পদে একটি যুক্তপর্ব, দ্বিতীয় পদে একটি সার্ধপর্ব ; তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদে দুটি পূর্ণপর্ব, দ্বিতীয় পদে একটি পূর্ণ ও একটি অর্ধ পর্ব ; চতুর্থ পংক্তির প্রথম পদে দুটি পূর্ণপর্ব, দ্বিতীয় পদে একটি সার্ধপর্ব ।

প্রকৃত পক্ষে এই পূর্ণ, অর্ধ, যুক্ত এবং সার্ধ পর্বের দ্বারাই সমস্ত যৌগিক ছন্দ, অর্থাৎ যৌগিক পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক প্রভৃতি সমস্ত

ছন্দোবন্ধই গঠিত হয়ে থাকে। যৌগিক ছন্দের রচনাপ্রণালীর প্রতি লক্ষ রাখলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। দ্রষ্টব্য জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃ ৮২-৮৩।

সুতরাং দেখা গেল যৌগিক পয়ারের আসল বা বিযুক্ত রূপ হচ্ছে ৪।৪॥৪।২ ; আর তার যুক্ত রূপ হচ্ছে ৮॥৬। যৌগিক ছন্দের যুক্তপর্ব এবং সার্ধপর্ব গঠন করার প্রণালীটাও দেখা দরকার। যুক্তপর্ব গঠিত হতে পারে দু রকমে— যথা ৩+৩+২=৮ অথবা ২+৪+২=৮ ; তার মধ্যে প্রথম প্রণালীটাই সাধারণতঃ বেশি চলে। আর সার্ধপর্ব গঠনের প্রণালীও দু রকম— যথা ৩+৩=৬ অথবা ২+৪=৬ ; এ ক্ষেত্রেও প্রথম প্রণালীটাই বেশি প্রচলিত। সুতরাং যৌগিক পয়ারের যুক্তরূপের বিশ্লেষণ হচ্ছে এই—৩+৩+২॥৩+৩ অথবা ২+৪+২॥ ২+৪। যৌগিক পয়ারের আসল বা বিযুক্ত রূপের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

শীর্ণ শান্ত । সাধু তব ॥ পুত্রদের । ধরে
দাও সবে । গৃহছাড়া ॥ লক্ষ্মীছাড়া । করে।

—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

যৌগিক পয়ারের সাধারণ যুক্তরূপেরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

পড়েছে তোমার 'পরে ॥ প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি ॥ অর্ধেক কল্পনা।

—মানসী, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

আমি বলেছি যৌগিক ছন্দের বিযুক্ত পর্বের গঠনবিধি হচ্ছে চার-চার ; আর যুক্তপর্ব গঠনের সাধারণ বিধি হচ্ছে তিন-তিন-দুই। দুই-তিন-তিন কিংবা তিন-দুই-তিন এই পর্যায়ে 'অক্ষর' অর্থাৎ ব্যষ্টি বিন্যাস করা সংগত নয়, তাতে শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে। তাই মধুসূদনের 'বাড়ায় মাত্র আঁধার' কিংবা 'মাৎসর্য বিষদশন' প্রভৃতি পদগুলি নির্দোষ নয়। (দ্রষ্টব্য জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃ ৭৫)। তার কারণ—

বাড়ায় মা । -ত্র আঁধার
কিংবা মাৎসর্য বি । -ষদশন

এভাবে পর্ববিভাগ করলে ঈষদ্‌যতির উভয় পার্শ্বে একটি করে ব্যষ্টি থাকে এবং তা কানে ভালো শোনায় না। এ নিয়মটি যে শুধু বাংলাতেই খাটে তা নয়, পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্-এর টীকাকার হলায়ুধও এ নিয়মের উল্লেখ করেছেন—

পূর্বোত্তরভাগয়োরেকাক্ষরত্বে তু (পদমধ্যে) যতির্দুষ্যতি,

এবং এই শব্দমধ্যবর্তী পর্ববিভাগদোষের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পংক্তিটি উদ্‌ধৃত করেছেন—

এতস্যা গ- । গুতলমমলং । গাহতে চন্দ্রকক্ষম্ । —মন্দাক্রান্তা

চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হল সেসব কথা সাধারণভাবে সমস্ত যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধেই খাটে। দৃষ্টান্তযোগে তা এখানে দেখাবার প্রয়োজন নেই। শুধু আঠার ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারের বিশ্লেষণ-প্রণালীটা একটু দেখাব। এ ছন্দের আসল অর্থাৎ বিযুক্ত রূপ হচ্ছে এ-রকম—৪।৪॥৪।৪।২ ; আর এ ছন্দের যুক্ত রূপটি হচ্ছে আসলে এ-রকম—৮॥৪।৬ ; কিন্তু কখনও কখনও এটি ৮॥৬।৪-এর আকারও ধারণ করে। এই বর্ধিত পয়ারে দ্বিতীয় পদে প্রথম পর্বের পরে একটা ঈষৎ ছেদ থাকলেই ছন্দের ধ্বনিটা একটু বেশি শ্রুতিমধুর হয়। এ ছন্দের যুক্ত রূপের সাধারণ বিশ্লেষণপ্রণালী হচ্ছে এই —৩+৩+২॥৪।৩+৩। চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারের অন্য বিশ্লেষণগুলিও এর পক্ষে খাটে। যা হক, এই বর্ধিত যৌগিক পয়ারের আসল বা বিযুক্ত রূপের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

হিমাদ্রির । ধ্যানে যাহা ॥ স্তব্ধ হয়ে । ছিল রাত্রি । দিন
সপ্তর্ষির । দৃষ্টিতলে ॥ বাক্যহীন । স্তব্ধতায় । লীন।

—পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দেরই যুক্ত রূপেরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ছিল যা প্রদীপ্তরূপে ॥ নানা ছন্দে । বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ । তরঙ্গের ॥ কম্পনে হানিছে । শূন্যতল।

—সমুদ্র, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রথম পংক্তিটা এ ছন্দের আসল যুক্ত রূপ এবং এটিই দ্বিতীয় প্রকার যুক্ত রূপের চেয়ে ভালো শোনায়। এ ছন্দের দ্বিতীয় পদের চার-ছয় রূপটিই ছয়-চার রূপের চেয়ে অধিকতর শ্রুতিমধুর। এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, এই ছোটো বা বড়ো পয়ারকে যখন প্রবহমান (enjambed) আকারে রচনা করা যায় তখন এর মধ্যে ঈষৎ, অর্ধ বা পূর্ণ যতি স্থাপনের বহু বৈচিত্র্য ঘটে এবং ফলে পংক্তির অন্তরের গঠনের মধ্যেও নানা প্রকারভেদ দেখা যায়। কিন্তু তথাপি ওই প্রবহমান অবস্থাতেও পূর্বোক্ত বিশ্লেষণপ্রণালী অধিকাংশ স্থলে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) প্রভৃতি চোদ্দ ব্যষ্টির স-মিল

প্রবহমান (enjambed) পয়ার, 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা) প্রভৃতি আঠার ব্যষ্টির স-মিল প্রবহমান পয়ার, 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাট্যকাব্যের চোদ্দ ব্যষ্টির অ-মিল প্রবহমান পয়ার, 'ছবি' ও 'শা-জাহান' (বলাকা) প্রভৃতি স-মিল মুক্তক এবং 'নিষ্ফল কামনা' (মানসী) নামক অ-মিল মুক্তক ইত্যাদি কবিতার রচনাপদ্ধতির প্রতি লক্ষ করলেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। আঠার ব্যষ্টির অ-মিল প্রবহমান পয়ার এবং অ-মিল মুক্তকের দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধদেবের 'কোনো বন্ধুর প্রতি' ও 'শাপভ্রষ্ট' (বন্দীর বন্দনা) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়।

৯

যৌগিক অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পর্বের বিযুক্ত রূপের চেয়ে যুক্ত রূপের ব্যবহার বেশি। এ ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য, ধীরবিলম্বিত গতিক্রম এবং গুরুগম্ভীর বিষয়ের বাহন হবার উপযোগিতা, এ তিনটি বিশেষ গুণের প্রধান কারণই হচ্ছে ওর পর্বের যুক্ত রূপ। যদি এ ছন্দকে লঘু ভাবের বাহন করার প্রয়োজন হয় তবে পর্বগুলির যুক্ত রূপের পরিবর্তে বিযুক্ত রূপের ব্যবহারের দ্বারা এর ধ্বনিটাকে লঘু এবং গতিটাকে দ্রুত করে নেবার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটিকেই অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন।—

"আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চার মাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা।" —সবুজপত্র ১৩২১ শ্রাবণ, পৃ ২২৮।

ভাবটা লঘু না হলেও এ ছন্দে বিযুক্ত পর্বের ব্যবহার চলে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শুধু বিযুক্ত পর্বের ব্যবহারে এ ছন্দের চাল খাটো হয়, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। পূর্বোদ্ধৃত 'সুরাঙ্গনা নন্দনের' ইত্যাদি পংক্তিগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

যৌগিক ছন্দে বিযুক্ত পর্বের চেয়ে যুক্ত পর্বের ব্যবহারই বেশি বটে; কিন্তু চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত এবং চতুর্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্ত পয়ার এবং মাত্রিক পয়ারে যুক্ত পর্বের চেয়ে বিযুক্ত পর্বেরই ব্যবহার বেশি। চতুঃস্বর এবং চতুর্মাত্রক ছন্দে যুক্ত পর্বের চাল অর্থাৎ 'লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চাল'-টা বেশি খাপ খায় না। এজন্যেই এ দুটি ছন্দকে যৌগিক ছন্দের মতো খুব গুরুগম্ভীর চালের উপযোগী করা যায় না। এ কথা মাত্রাবৃত্তের চেয়েও স্বরবৃত্তের পক্ষে বেশি খাটে। স্বরবৃত্ত

ছন্দের প্রবণতাই হচ্ছে চার-চার স্বরের পরে ঈষদ্‌যতিকে আশ্রয় করে পর্বে পর্বে বিভক্ত হয়ে পড়ার প্রতি ; যুক্ত পর্বের চালে এ ছন্দের ধ্বনি যেন পীড়িত হয়।

কর গো হতশ্রী ধরায় ॥ রূপের পূজা । প্রবর্তন ;

কত যুগ আর । চলবে অলীক ॥ পরীর রূপের । শবসাধন ?

—কবর-ই-নূরজাহান, অভ্র-আবীর, সত্যেন্দ্রনাথ

বলা বাহুল্য, এটি চতুঃস্বর চৌপর্বিক ছন্দ। এখানে প্রথম পংক্তির প্রথম পদটি ছাড়া অন্য সর্বত্রই পর্ববিভাগ অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু ওই প্রথম পদটিতে 'হতশ্রী' শব্দের হ-এর পরে ঈষদ্‌যতি অর্থাৎ পর্ববিভাগের ছেদ থাকার কথা। যৌগিক ছন্দে এমন অবস্থায় ও জায়গায় ঈষদ্‌যতিটি বিলুপ্ত হয়ে যুক্তপর্বের সৃষ্টি হয় এবং তাতেই ও-ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও পদমর্যাদা ; কেননা তাতেই ধ্বনিগাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাবও অব্যাহত থাকে। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে ওই জায়গায় ঈষদ্‌যতি ও পর্ববিভাগের ব্যবস্থা না করলে ধ্বনি পীড়িত হয় ; আবার ওখানে পর্ববিভাগ করলে ভাবটা খণ্ডিত হয়ে যায়। ওই স্বরবৃত্ত পদটার এই সমস্যাটি লক্ষ করার বিষয়।

চতুর্মাত্রক ছন্দে যুক্ত পর্বের চাল চতুর্ব্যষ্টিক যৌগিক ছন্দের চেয়ে কম সহ্য হলেও চতুঃস্বর স্বরবৃত্তের চেয়ে বেশি সহ্য হয়। চতুর্মাত্রক ছন্দ রচনার সময় তাই খুব বিবেচনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুক্ত ও অযুক্ত পর্বের পরিবেশন করতে হয়। মোটের উপর এ ছন্দে যুক্ত পর্বের চেয়ে অযুক্ত পর্বেরই ব্যবহার বেশি, এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ললিতগমনা কে গো ॥ তরঙ্গ । -ভঙ্গা !

জয়তু যমুনা জয়, ॥ জয় জয় । গঙ্গা !

... ...

কালীয় নাগের কালো ॥ নির্মোক । পরে কে !

হরজটা । ভুজগেরে ॥ ভুজতটে । ধরে কে !

—যুক্তবেণী, বেলাশেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদটি যুক্তপর্বিক, কেননা ঈষদ্‌যতি ও পর্ববিভাগ শব্দের মধ্যে পড়েছে। অন্য সবগুলি পদই বিযুক্তপর্বিক।

চতুর্মাত্রক ছন্দ প্রায় সর্ব বিষয়েই চতুর্ব্যষ্টিক যৌগিক ছন্দের অনুরূপ ; যে-যে রকমের ধ্বনিবিন্যাস যৌগিক ছন্দের প্রকৃতিবিরোধী সেগুলি চতুর্মাত্রক ছন্দেরও

প্রকৃতিবিরোধী। কেবল দুটি বিষয়ে এদের পার্থক্য লক্ষ করা উচিত। প্রথমতঃ, চতুর্মাত্রক ছন্দে শেষ পর্বে অসমসংখ্যক মাত্রা বেশ ভালো শোনায়; উপরের দৃষ্টান্তটিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু পনের ব্যষ্টির যৌগিক পয়ার নিতান্ত শ্রুতিকটু হবে। তের বা এগার ব্যষ্টির খণ্ডিত পয়ারও ভালো শোনায় না, কিন্তু তের বা এগার মাত্রার খণ্ডিত পয়ার খুব শ্রুতিমধুর হয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গগনে গরজে মেঘ, ॥ ঘন বরষা,
কূলে একা । বসে আছি ॥ নাহি ভরসা।
... ...
শূন্য নদীর তীরে ॥ রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল । নিয়ে গেল ॥ সোনার তরী।

—সোনার তরী. রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুর্মাত্রক অপূর্ণ চৌপর্বিক ছন্দ; প্রতি পংক্তিতে তের মাত্রা (morae) আছে। প্রতি পংক্তির শেষ পদটি এবং প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদটি যুক্তপর্বিক। যদি তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ যৌগিক ছন্দে এটি রচিত হত তা হলে তার শ্রুতিমাধুর্য রক্ষা করা সম্ভব হত না। অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যা ঠিক রেখে তের অক্ষরের খণ্ডিত পয়ার ভালো শোনাত না। এ দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মধ্বনির বিরলতা লক্ষ করার বিষয়। যুগ্মধ্বনির বাহুল্যে এ ছন্দটি কেমন তরঙ্গিত হয়ে ওঠে দেখা যাক।—

পথপাশে । মল্লিকা ॥ দাঁড়াল আসি;
বাতাসে সু । -গন্ধের ॥ বাজাল বাঁশি।
... ...
কিংশুক । কুঙ্কুমে ॥ বসিল সেজে,
ধরণীর । কিঙ্কিণী ॥ উঠিল বেজে।

—বরযাত্রা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

পূর্বের দৃষ্টান্তটির মতো এটিও তের মাত্রার খণ্ডিত পয়ার। এ-রকম তের ব্যষ্টির খণ্ডিত যৌগিক পয়ার রচনা করতে গেলেই দেখা যাবে তাতে ধ্বনির সমতা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব।

চতুর্ব্যষ্টিক যৌগিক ছন্দের সঙ্গে চতুর্মাত্রক ছন্দের দ্বিতীয় পার্থক্য এই। যৌগিক ছন্দের পদ সাধারণতঃ যুক্তপর্বিক, বিযুক্তপর্বিক পদ বিরলতর; আর

মাত্রিক ছন্দের পদ সাধারণতঃ বিযুক্তপর্বিক, যুক্তপর্বিক পদ বিরলতর। অর্থাৎ যৌগিক পয়ারের সাধারণ বিশ্লেষণরূপ হচ্ছে—৩+৩+২॥৩+৩; আর চতুর্মাত্রক পয়ারের সাধারণ রূপ হচ্ছে—৪।৪॥৪।২। তাই যৌগিক পয়ারকে মাত্রিক পয়ারে রূপান্তরিত করতে হলে এই পার্থক্যটির প্রতি লক্ষ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নিম্নে যমুনা বহে ॥ স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, ॥ শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে ॥ পশি জলধার
ছল ছল করতালি ॥ দেয় অনিবার।

—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ যৌগিক পয়ারকে মাত্রিক পয়ারে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাত্রিক পয়ারের চতুর্মাত্রপর্বিক প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ না থাকাতে তিনি ওই মাত্রিক পয়ারে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই পরবর্তী কালে তিনি এই মাত্রিক পয়ারটিকে যৌগিক আকার দিয়েছিলেন। যথা—

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে ॥ যমুনার জল ;
দুই তীরে গিরিতট, ॥ উচ্চ শিলাতল।
সংকীর্ণ গুহার পথে ॥ মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে গর্জি ॥ উঠে অনিবার।

—নিষ্ফল কামনা, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ করার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের চতুর্মাত্রপর্বিক প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ রাখলে মাত্রিক পয়ারের ধ্বনিতেও একটা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আনা যায়। ওই 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতেই যেসব স্থলে পর্বগুলির চতুর্মাত্রক আকার রক্ষিত হয়েছে সেখানে ধ্বনিমাধুর্য অব্যাহতই আছে। যথা—

বরষার। নির্ঝরে ॥ অঙ্কিত। কায়
দুই তীরে। গিরিমালা ॥ কতদূর। যায়!

আগ্রহে। যেন তার ॥ প্রাণ মন। কায়
একখানি। বাহু হয়ে ॥ ধরিবারে। যায়

—মানসী, রবীন্দ্রনাথ

'এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী' (কথা ও কাহিনী), এই যৌগিক পংক্তিটিরও যেমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, 'বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়' এই মাত্রিক পংক্তিটিরও তেমনি একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আমি কোনোটিকেই বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক নই। পয়ারের যৌগিক ও মাত্রিক, এই দ্বিবিধ রূপের প্রতিই আমার কানের আকর্ষণ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, 'দ্বৌ কর্তব্যৌ'।

পয়ারের সম্বন্ধে যা বলা হল, খণ্ডিত পয়ারের সম্বন্ধেও তা খাটে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

হেথা কেন । দাঁড়ায়েছ, । কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তল । -ছবি ?
... ...
শ্রান্তি লুকাতে চাও । ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে । আসে।

—কবির প্রতি নিবেদন, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এটি হচ্ছে দশ মাত্রার খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার, চার মাত্রার একটি পর্ব খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার রচনার চেষ্টা সফল হয় নি; এই পংক্তিগুলির ধ্বনি কানের দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে না। তার কারণ এই— যেসব স্থলে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার হয়েছে সেখানেই পর্বগুলি যুক্ত আকার ধারণ করেছে, অথচ এ ছন্দে যুক্ত পর্বের চেয়ে বিযুক্ত পর্বেরই প্রাধান্য। 'কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে' পদটিতে দুটি পর্ব এমন ভাবে যুক্ত হয়েছে যে, শব্দের মধ্যেও পর্ববিভাগ করা সম্ভব নয়। 'যেন কাষ্ঠপুত্তল' পদটিতে ধ্বনিসমাবেশ হচ্ছে দুই-তিন-তিন এই পর্যায়ে, অথচ যৌগিক বা মাত্রিক কোনো পয়ারেই এই পর্যায় স্বীকৃত হয় না। তাই এই পংক্তি-ক'টির ধ্বনি কানকে খুশি করতে পারছে না। কিন্তু যদি এই বাধাগুলিকে পরিহার করা যায় তবে বেশ সুন্দর খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার রচনা করা সম্ভব, এ কথা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের রচনা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। যথা—

সুন্দরী । ওগো শুক । -তারা,
রাত্রি না । যেতে এসো । তূর্ণ।
স্বপ্নে যে । বাণী হল । সারা
জাগরণে । করো তারে । পূর্ণ।

—শুকতারা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

খণ্ডিত মাত্রিক পয়ারের ন্যায় পূর্ণ মাত্রিক পয়ারও পরবর্তী কালেই রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিণতি লাভ করেছে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'মানসী'র যুগেই কি করে তার সূত্রপাত হয়েছিল তা আগেই দেখানো হয়েছে।—

আমি তব । জীবনের ॥ লক্ষ্য তো । নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে, ॥ হে চিরবিরহী ।
... ...
মার্জনা । করো যদি ॥ পাবে তবে । বল,
করুণা করিলে নাহি ॥ ঘোচে আঁখি । -জল ।

—দায়মোচন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এখানে যুক্তপর্বিক পদ রয়েছে মাত্র দুটি। আর যেসব স্থলে যুগ্মধ্বনি আছে সেসব স্থলের পদগুলি বিযুক্ত আছে। তাই এই মাত্রিক পয়ারটির ধ্বনি কোথাও ব্যাহত হয় নি। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের রচিত চতুর্মাত্রক ছন্দের একটি অতি সুন্দর নিদর্শন আছে। এখানে সেটি থেকেও কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

চম্পক । তরু মোরে ॥ প্রিয় সখা । জানে যে,
গন্ধের । ইঙ্গিতে ॥ কাছে তাই । টানে যে ।
মধুকর । -বন্দিত ॥ নন্দিত । সহকার
মুকুলিত । নতশাখে ॥ মুখে চাহে । কহ কার ।
... ...
পুষ্পচয়িনী বধূ ॥ কঙ্কণ । -ক্বণিতা,
অকথিতা । বাণী তার ॥ কার সুরে । ধ্বনিতা ॥

—মাঘের আশ্বাস

এটি হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত চৌপর্বিক বা দ্বিপদী ছন্দ। এই পংক্তি-ক'টির সবগুলি পদই বিযুক্তপর্বিক ; কেবল পঞ্চম পংক্তির প্রথম পদটি যুক্তপর্বিক।

মাত্রিক পয়ার বা দ্বিপদী সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হল মাত্রিক ত্রিপদী সম্বন্ধেও সেগুলি অবিকল খাটে। এ স্থলে আমি আট মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীর কথাই বলছি, ছ মাত্রার লঘু ত্রিপদীর কথা নয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

তোমারে ঘেরিয়া ফেলি ॥
কোথা সেই করে কেলি ॥
কল্পনা, মুক্ত পবন ?

বহিয়া নূতন প্রাণ ॥

ঝরিয়া পড়ে না গান ॥

ঊর্ধ্বনয়ন এ ভুবনে।

—কবির প্রতি নিবেদন, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে যৌগিক ত্রিপদীকে মাত্রিক আকারে রূপান্তরিত করার চেষ্টা রয়েছে। তাই মাত্রাবৃত্তের চতুর্মাত্রপর্বিক প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ দেখা যায় না; যৌগিক ত্রিপদীর ভঙ্গিতেই সর্বত্র যুক্তপর্বিক পদের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এটা মাত্রাবৃত্তের প্রকৃতিবিরোধী। সেজন্যেই এই পংক্তি-ক'টিতে মাত্রাবৃত্তের ঠিক ধ্বনিটি ধরা পড়ে নি। এর ধ্বনিটা কানকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তাই রবীন্দ্রনাথ যৌগিক ত্রিপদীকে মাত্রিক আকৃতিতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন মাত্রাবৃত্তের বিযুক্তপর্বিক প্রকৃতিটি তাঁর কাছে ধরা পড়ল তখন তিনি মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করার স্থান এটা নয়। তাই এ স্থলে শুধু দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।—

১। ইঙ্গিতে সংগীতে

নৃত্যের ভঙ্গীতে

নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

—বরযাত্রা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

২। এনেছি বসন্তের

অঞ্জলি গন্ধের,

পলাশের কুঙ্কুম, চাঁদিনির চন্দন।

... ...

তব আঁখিপল্লবে

দিয়ো আঁকি বল্লভে

গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন।

—বধূমঙ্গল, প্রবাসী ১৩৩১ ভাদ্র, রবীন্দ্রনাথ

প্রবাসী ১৩৩৮ চৈত্র

বাংলা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা

ছন্দ রচনা একটি ধ্বনিশিল্প। কি কি উপায়ে ধ্বনিকে কাজে লাগানো যায় তার উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। আর ধ্বনির মূল্য নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকেই ছন্দের বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেও তাই দেখা যায় প্রথমেই ধ্বনির মূল্য বা পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ লক্ষ করার বিষয় এই যে, আমাদের প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রকাররা ধ্বনির পরিমাণ নির্ণয় উপলক্ষে শুধু স্বরধ্বনিরই পরিমাপ করেছেন, ব্যঞ্জনধ্বনিকে গণ্য করেন নি। যেমন, নদী শব্দের ঈ-কেই তাঁরা গুরু বা দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করেছেন; দ্-কে তাঁরা গ্রাহ্য করেন নি। তাতে ধ্বনি নির্ণয়ের কোনো ব্যাঘাত হয় না। কেননা দ্ আর ঈ যুগপৎ উচ্চারিত হচ্ছে; সুতরাং ঈ উচ্চারণের যা মূল্য দী উচ্চারণেরও সেই মূল্য। আর-একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। যেমন দিব্য এবং দীপ। সংস্কৃত শাস্ত্রমতে দিব্য শব্দের ই-কার গুরু বা দ্বিমাত্রক, কেননা ই-কারের পরে ব্য এই যুক্তবর্ণটি রয়েছে। আর দীপ শব্দের ঈ তো গুরু বা দ্বিমাত্রক বটেই, কেননা এটি স্বভাবদীর্ঘ। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রমতে দিব্য শব্দের ই এবং দীপ শব্দের ঈ ধ্বনিপরিমাণের মর্যাদায় সমান। কিন্তু এখানে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন মনে আসে, আমরা দিব্য শব্দের ই-কে দীর্ঘ করে অর্থাৎ দীপ শব্দের দীর্ঘ ঈ-র সমান করে উচ্চারণ করি কি না; শিক্ষা এবং দীক্ষা শব্দের ই এবং ঈ উচ্চারণে সমান কি না। যদি দিব্য এবং দীপ শব্দের ই এবং ঈ উচ্চারণে সমান না হয় তবে প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রকাররা ধ্বনির পরিমাপে এদের সমান মর্যাদা দিলেন কিরূপে? এ প্রশ্নের একটি উত্তর এই হতে পারে, দিব্য শব্দের ই উচ্চারণের আকারে হ্রস্বই বটে, কিন্তু পরবর্তী যুক্তবর্ণ ব্য-এর অন্তর্গত হসন্ত ব্যঞ্জনটির ভার পড়াতে ই-কারের গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এই উত্তরটিও সন্তোষজনক মনে হয় না। কেননা দিব্য শব্দের ই-কার উচ্চারণের আকারে হ্রস্বই আছে অথচ আর-একটি ব্যঞ্জনের ভার বহন করতে হচ্ছে বলে এর গুরুত্ব বা ওজনবৃদ্ধি হল কিরূপে, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। আমি মনে করি দীপ শব্দের ঈ এবং দিব্য শব্দের ই-র মধ্যে তুলনা ঘটানোই ঠিক নয়। আমার মনে হয় দীপ শব্দের ঈ এবং দিব্য শব্দের ইব্, এ দুটি ধ্বনির পরিমাণ বা গুরুত্ব সমান অর্থাৎ

ঈ এবং ইব্ এ দুটি ধ্বনির উচ্চারণকাল সমান এ কথা বললেই ঠিক হয়। কেননা দুটি একজাতীয় হ্রস্ব ধ্বনির (হ্রস্ব ই) যোগেই ঈ-র উৎপত্তি হয়, আর ইব্‌ও হচ্ছে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনির সমবায়। সুতরাং এদের উচ্চারণকাল সমান এ কথা বলা যেতে পারে।

কিন্তু এ স্থলেই বলা সংগত, এই যে উচ্চারণকালের কথা বলা হল সে কাল হচ্ছে একটা conventional বা রূঢ় কাল। কারণ ঈ এবং ইব্ উচ্চারণ করতে বস্তুতঃই সমান কাল লাগে কি না, এ দুটি ধ্বনির উচ্চারণের আয়তন সকলের মুখেই সমান হবে কি না, এ সব প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু কাল কথাটিকে conventional বা রূঢ় অর্থে ব্যবহার করলে ওসব প্রশ্ন আর উঠতেই পারবে না। কেননা কাল্ কথাটির রূঢ়ার্থ ই হচ্ছে এই যে, ঈ এবং ইব্-কে যে যেভাবেই উচ্চারণ করুক না কেন, ছন্দে ও-দুটি ধ্বনির উচ্চারণকাল সমান বলেই গ্রাহ্য হয়ে থাকে। আর সে কারণেই ছন্দের বিচারে দীপ এবং দীপ্ত শব্দের ঈ এবং ঈপ্-কেও সমমাত্রক অর্থাৎ সমকালব্যাপী বলেই গ্রহণ করা হয়; ঈ এবং ঈপ্-এর উচ্চারণকালের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করা হয় না।

যা হক, আমরা দেখলুম যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের পদ্ধতিতে নদী শব্দের অ-কে এক মাত্রা এবং ঈ-কে দু মাত্রা বলেই ধরা হয়। কিন্তু ন-কে এক মাত্রা এবং দী-কে দু মাত্রা ধরলেও ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের আলোচনায় এই দ্বিতীয় প্রণালীই অবলম্বন করব। আর দিব্য শব্দের ই এবং দীপ ও দীপ্ত এই উভয় শব্দের ঈ, এই তিনটি ধ্বনি সংস্কৃত প্রথায় সমমাত্রক বা সমকালব্যাপী। আমাদের অবলম্বিত প্রণালীতে আমরা বলব, ওই তিনটি শব্দের দিব্, দী এবং দীপ্ এই তিনটি ধ্বনি সমকালব্যাপী বা সমমাত্রক।

এখন দেখা যাক বাংলা ছন্দের ধ্বনিবিচারে এই প্রণালী কতখানি প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ অর্থাৎ স্বরধ্বনি কি কি বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত থাকে সেটাই আগে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ কথা সকলেই জানে যে, বাংলায় কার্যতঃ দীর্ঘ স্বর নেই এবং কোনো বাংলা ছন্দই স্বাভাবিক ভাবে স্বরবর্ণের দীর্ঘতাকে স্বীকার করে না। অবশ্য কোনো কোনো অবস্থাবিশেষে বাংলা ছন্দেও স্বরবর্ণ কদাচিৎ দীর্ঘতা লাভ করে; কিন্তু সেটা সাধারণ নিয়ম নয়, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। বাংলায় স্বরবর্ণের স্বাভাবিক দীর্ঘতা না থাকলেও গুরুতা আছে প্রচুর পরিমাণেই। স্বরবর্ণের দীর্ঘতা ও গুরুতার মধ্যে পার্থক্য কি,

তা বোঝা প্রয়োজন। আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরের স্বরূপ কি, তা সকলেই জানে এবং এসব বর্ণের উচ্চারণদীর্ঘতাই সংস্কৃত ছন্দের মাধুর্যের একটি মূল কারণ। কিন্তু এই স্বভাবদীর্ঘ স্বরবর্ণগুলি বাংলায় তাদের প্রকৃতিগত ধ্বনিস্বরূপটিকে বিসর্জন দিয়ে হ্রস্বত্ব লাভ করেছে; এইজন্যই বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ছন্দে স্বরের দীর্ঘতা যেমন আছে, গুরুতাও তেমনি আছে। দীর্ঘ স্বর তো গুরু বলে গণ্য হয়ই; তা ছাড়া পরে যদি অনুস্বার, বিসর্গ এবং সংযুক্ত বর্ণ থাকে তবে তৎপূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরটিও গুরুত্ব লাভ করে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

। × ×× ×।।
কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

এখানে ঢেরা (×)-চিহ্নিত স্বরগুলি স্বভাবতঃই দীর্ঘ, তাই গুরুও বটে। কিন্তু দণ্ড (।)-চিহ্নিত তিনটি স্বর স্বভাবতঃ হ্রস্ব হলেও এ স্থলে যুক্তবর্ণের পূর্বে অবস্থিত আছে বলে গুরুত্ব অর্জন করেছে। তেমনি 'প্রমত্তঃ' শব্দের অন্ত্য অকারটিকে পরবর্তী বিসর্গের ভার বহন করতে হচ্ছে বলে ওটিও গুরুত্ব লাভ করেছে। 'কান্তা' শব্দের দ্বিতীয় আকারটি স্বভাবদীর্ঘ, অতএব গুরু; কিন্তু প্রথম আকারটি স্বভাবতঃ দীর্ঘ তো বটেই, সংযুক্তপূর্বও বটে। অতএব এটি উভয় কারণেই গুরু। তাই ছন্দশাস্ত্রকার নিয়ম করেছেন—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ।

—গঙ্গাদাস, ছন্দোমঞ্জরী ১।১।

বাংলায় স্বরবর্ণের গুরুত্বের যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে হলে উদ্ধৃত সংস্কৃত বিধানটির আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েই বোঝাবার চেষ্টা করছি। পূর্বোক্ত 'কশ্চিৎ' শব্দের অ-কারটি 'বর্ণঃ সংযোগপূর্বঃ' বলে গুরু হয়েছে; কিন্তু উদ্ধৃত বিধানমতে 'চিৎ'-এর ই-কারটিকে লঘু ধরব, না গুরু ধরব? শাস্ত্রকার বলবেন পরবর্তী 'কান্তা' শব্দের ক-কারের সঙ্গে খণ্ড ৎ-কে সংযুক্ত বলে গণ্য করে ইকারকে গুরু বলে ধরতে হবে; সংস্কৃত ভাষায় অসংযুক্ত-হসন্ত বর্ণ প্রায় স্বীকৃত হয় না, বিশেষতঃ বাক্যের মধ্যস্থলে। এটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু—

×
১। দিঙ্‌নাগানাং। পথি পরিহরন্‌। স্থূলহস্তাবলেপান্‌।

×
২। রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে। তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্‌।

এ দু জায়গায় পরিহরন্-এর অন্ত্য অকার এবং সন্-এর অকারকে লঘু বলব, না গুরু বলব? উভয় শব্দের পরেই যতি রয়েছে, সুতরাং ন্-কে পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত করার উপায় নেই। অথচ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উভয় জায়গাতেই ছন্দের নিয়ম অনুসারে অকারকে গুরু বলে ধরা হয়েছে। সংস্কৃত কাব্য থেকে এ-রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখা গেল হসন্ত বর্ণ পরে থাকলেও পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর গুরু বলে গণ্য হয়ে থাকে। ছন্দশাস্ত্রকার পিঙ্গলাচার্য কিন্তু সংযোগান্ত, সানুস্বার, উষ্মান্ত (অর্থাৎ বিসর্গান্ত) বর্ণের ন্যায় ব্যঞ্জনান্ত বর্ণকেও গুরু সংজ্ঞা দিয়েছেন (ছন্দঃসূত্রম্ ১।৭)।

কিন্তু আসল কথা এই যে, ব্যঞ্জনান্ত স্বরবর্ণকে যদি গুরু বলে স্বীকার করা যায় তবে সংযোগ, অনুস্বার ও বিসর্গের যোগে গুরুত্ব বিধানের কোনো প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না, কারণ ওই তিনটি ব্যাপারের মূলেও ওই হসন্ত ব্যঞ্জনের কথাই রয়েছে। যথা—কশ্চিৎ, এই শব্দের অকারকে যুক্তান্ত আর ইকারকে ব্যঞ্জনান্ত বলার কোনো সার্থকতা নেই। কারণ ওই কথাটি আসলে কশ্‌চিৎ; সুতরাং অকার ও ইকার উভয়ই ব্যঞ্জনান্ত বলেই গুরু, এই গুরুত্ব বিধানের জন্য কোনো দুটি ব্যঞ্জনের সংযুক্ত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভারতীয় লিপিপদ্ধতিতে সংযুক্ত বর্ণের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ব্যাপার, আবশ্যিক নয়। ধ্বনির রাজ্যে যুক্তাক্ষর বলে কোনো একটা বিশেষ ব্যাপার নেই; আছে শুধু ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনির অস্তিত্ব। ছন্দশাস্ত্র ধ্বনিবিজ্ঞানেরই একটা বিশেষ প্রকাশ; সুতরাং ছন্দের আলোচনা শুধু ধ্বনির দিক্ থেকেই হওয়া উচিত, ধ্বনিপ্রতীক অর্থাৎ বর্ণলিপির চাক্ষুষ রূপের দ্বারা ওই আলোচনাকে বিকল করা সংগত নয়। ধ্বনিবিজ্ঞান বা ছন্দশাস্ত্রের আলোচনায় সংযুক্তাক্ষর প্রভৃতি সংজ্ঞা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং বর্জনীয়। আমরা চিরার্জিত চোখের অভ্যাসবশতঃই ভ্রম করে ছন্দের আলোচনায় যুক্তবর্ণ প্রভৃতি সংজ্ঞা ব্যবহার করে থাকি। তবেই দেখতে পাচ্ছি স্বরবর্ণের গুরুত্ব বিষয়ে যুক্তবর্ণের কোনো প্রভাব নেই, আছে যুক্তবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হসন্ত বর্ণের প্রভাব। কশ্চিৎ শব্দে অকারের গুরুত্ব হয়েছে শ্চ-এর কৃপায় নয়, শ্-এর কৃপায়; তেমনি খণ্ড-ৎই ইকারকে গুরুত্ব দান করেছে।

ঠিক এই একই কারণে অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্বস্থিত হ্রস্ব স্বরকেও গুরু বলে গণ্য করা হয়। কারণটি হচ্ছে এই যে, অনুস্বার ও বিসর্গ উভয়ই আসলে

এক-একটি হসন্ত বর্ণের রূপান্তর মাত্র। বিসর্গ তো প্রকৃত পক্ষে হসন্ত হ্-এর থেকে অভিন্ন। কাজেই প্রমত্তঃ আর প্রমত্তহ্ একই কথা ধ্বনির দিক্ থেকে; সুতরাং এখানেও অন্ত্য অকার ব্যঞ্জনান্ত বলেই গুরু। অনুস্বারকেও একটি হসন্ত বর্ণের সমান বলেই ধরা উচিত এবং প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলে অনুস্বারকে হসন্ত বর্ণে রূপান্তরিতও করা যায়; যথা পংক্তি ও পঙ্‌ক্তি, সংখ্যা ও সঙ্‌খ্যা একই কথা; বঙ্‌শ, অঙ্‌শু লেখার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়; আর বাংলা ও বাঙ্‌লা তো আমাদের অতি পরিচিত। বিসর্গের রূপান্তরের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। দুষ্‌খই বলা যাক, আর দুখ্‌খই বলা যাক, বিসর্গও হসন্ত ব্যঞ্জনের তুল্যমূল্য তাতে সন্দেহ থাকে না; আর সন্ধির সূত্র অনুসারে বিসর্গ যে অবস্থাবিশেষে শ্, ষ্, বা স্ তে পরিণত হতে পারে তা পাঠশালার বালকরাও জানে।

সুতরাং ছন্দে স্বরবর্ণের গুরুত্ববিষয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রকারদের বিধানের নিষ্কর্ষ হচ্ছে এই। দীর্ঘ স্বর তো গুরু বলে গণ্য হবেই, হ্রস্ব স্বরের পরে যদি হসন্ত বর্ণ থাকে তবে সেই হ্রস্ব স্বরও গুরুত্ব প্রাপ্ত হবে এবং এ ক্ষেত্রে বিসর্গ আর অনুস্বারকেও হসন্ত বর্ণ বলেই গণ্য করতে হবে।

এখানে আর-একটি কথা বুঝে রাখা দরকার। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন কশ্চিৎ, চঞ্চল্, বন্ধন্ প্রভৃতি শব্দে আদি স্বরের এবং অন্ত্য স্বরের গুরুত্ব কি সম্পূর্ণ সমান, তাদের গুরুত্বের মধ্যে কি কিছুমাত্র তারতম্য নেই? অর্থাৎ এই তিনটি শব্দে স্বরবর্ণের ব্যবধানের অভাবে দুটি করে ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছে তার কি কোনো মূল্য নেই? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এ স্থলে স্বরব্যবধানের অভাবে যে ব্যঞ্জনধ্বনির সংঘাত উপস্থিত হয়েছে তার যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ ওই সংঘাতের ফলে যথেষ্ট ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে ও তাতেই শ্রুতিমাধুর্য উৎপন্ন হয়েছে; কিন্তু এই ধ্বনিসংঘাতের ফলে তৎপূর্ববর্তী স্বরবর্ণগুলির গুরুত্বলাভের পক্ষে কিছুমাত্র অতিরিক্ত সহায়তা হয় নি। অর্থাৎ চঞ্চল শব্দের আদি ও অন্ত্য অকারের গুরুত্ব সম্পূর্ণ সমান; তবে অন্তস্থিত হসন্ত লকার একক থাকাতে ও পরবর্তী কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংহত হতে না পারাতে ঞ্চ-এর মতো ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে নি, এই মাত্র পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গেই আর-একটি প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রমতে লঘু স্বরকে একমাত্রক এবং গুরু স্বরকে দ্বিমাত্রক বলে ধরা হয়। যথা—

। ' । ।।
মা কুরু। ধনজন। -যৌবন। -গর্বম্

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে মাত্রা আছে। দ্বিতীয় ছেদে চারটিই লঘু মাত্রা, প্রথম ছেদে একটি স্বভাবগুরু ও দুটি লঘু, চতুর্থ ছেদে দুটি হ্রস্ব স্বর ব্যঞ্জনান্ত বলে গুরুত্ব অর্থাৎ দ্বিমাত্রকত্ব লাভ করেছে। তৃতীয় পর্বের ঔকারটিকেও দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু কেন ? ঔকার তো স্বভাবদীর্ঘ স্বর নয়, অর্থাৎ কোনো একটি মৌলিক স্বরকে দ্বিগুণ বা দীর্ঘ করে ঔকার হয় না ; কারণ ঔ হচ্ছে আসলে অউ্, অ আর উ এই দুটি ভিন্নজাতীয় স্বতন্ত্র স্বরের সংযোগে উৎপন্ন যুগ্মস্বর বা diphthong। দুটি স্বজাতীয় হ্রস্ব স্বরের যোগে তজ্জাতীয় একটি দীর্ঘ স্বর উৎপন্ন হয়। যথা—ই+ই=ঈ, উ+উ=ঊ। কিন্তু ঐ=অ+ই, ঔ=অ+উ। দুটি ভিন্নজাতীয় স্বরের সংযোগে উৎপন্ন স্বরকে দীর্ঘস্বর বলা যায় না, বলা যায় যুগ্মস্বর বা diphthong। কিন্তু 'এ' কিংবা 'ও'-কে যুগ্মস্বর বলা যায় না। কারণ এ-কার অ এবং ই-র যোগে উৎপন্ন দ্বিরুচ্চারপ্রকৃতি-সম্পন্ন স্বর নয়, এটি অ এবং ই-র মিশ্রণে উৎপন্ন একটি সম্পূর্ণ নতুন স্বর ; তেমনি ও-কারও অ এবং উ-র মিশ্রণে উৎপন্ন নতুন স্বর। এ এবং ও উভয়ই স্বভাব-দীর্ঘ। কিন্তু ঐ এবং ঔ উচ্চারণ করলেই এদের অই্ এবং অউ্, এই যুগ্মত্ব বা দ্বিরুচ্চার প্রকৃতি ধরা পড়ে যায়। অথচ এরা অ-ই কিংবা অ-উ, এরূপ স্বতন্ত্রোচ্চারিত দুটি ভিন্ন স্বরের একত্র সমাবেশমাত্রও নয় ; তাই ঐ এবং ঔ -কে যুগ্মস্বর বা জোড়াস্বর বলে অভিহিত করলুম। কারণ এখানে দুটি স্বতন্ত্র স্বর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে, অথচ এ-কার এবং ও-কারের মতো কেউ কারও মধ্যে বিলীন হয়ে যায় নি।

যা হক, দেখতে পাচ্ছি সংস্কৃত ছন্দে ঐ এবং ঔ দ্বিমাত্রক অর্থাৎ গুরু স্বর বলে গণ্য হয়েছে। এর ভিতরকার তত্ত্বটা একটু লক্ষ করা যাক। অউ্ এবং অই্ অর্থাৎ ঔ এবং ঐ, এই জোড়াস্বরগুলির অন্তরে যে দুটি করে স্বর আছে তারা স্বতন্ত্র নয়, একটি আর-একটির উপর নির্ভর করছে। এখানে পূর্বস্থিত স্বরটি সম্পূর্ণ উচ্চারিত হচ্ছে, এটি হচ্ছে আশ্রয়দাতা ; আর পরস্থিত স্বরটি অর্ধোচ্চারিত মাত্র হচ্ছে, এটি **আশ্রিত** স্বর। এই আশ্রিত স্বরটির উচ্চারণের সমস্তটা ঝুঁকি নিতে হচ্ছে পূর্ববর্তী **আশ্রেতা** স্বরটিকে এবং পরবর্তী স্বরটির সমস্ত ভার বহন করতে হচ্ছে বলেই এটির গুরুত্ব। অই্, অউ্, এখানে ই্ এবং উ্ অকারের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বলেই অকারটির গুরুত্ব হয়েছে।

আমরা পূর্বে দেখেছি, হসন্ত ব্যঞ্জন (অনুস্বার-বিসর্গও তারই শামিল) বর্ণকে

আশ্রয় দেওয়ার দরুন পূর্ববর্তী স্বর স্বভাবতঃ হ্রস্ব হলেও গুরুত্ব অর্জন করে। আর এখন দেখলুম আশ্রিত বর্ণ স্বর হলেও আশ্রয়দাতার গুরুত্ববৃদ্ধি হয়। সুতরাং আমাদের সমস্ত আলোচনার সিদ্ধান্ত এই হল যে, আশ্রিত বর্ণ স্বরই হক, অনুস্বার-বিসর্গই হক, আর হসন্ত বর্ণই হক পূর্ববর্তী আশ্রেতা স্বরকে গুরু বলে গণ্য করতে হবে। এই সূত্রানুসারে অই্, অউ্, অং, অঃ, অন্, অর্, সর্বত্রই অকারটি গুরুত্বশালী, পরবর্তী আশ্রিত বর্ণের ভার তাকেই বহন করতে হচ্ছে বলে। এখানে আর-একটু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে এই যে, উক্ত ছ-টি কথাই বাগ্‌যন্ত্রের এক-একটি প্রয়াসেই উচ্চারিত হচ্ছে, অর্থাৎ উক্ত ছ-টি কথার প্রত্যেকটিই এক-একটি সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনি। আর প্রত্যেকটি সিলেব্‌ল্-এই ধ্বনির যুগ্মতা বা দ্বিরুচ্চারতা রয়েছে, কাজেই এগুলি প্রত্যেকেই এক-একটি যুগ্মধ্বনি বা যুক্ত সিলেব্‌ল্।

সুতরাং আমাদের অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে পূর্বোক্ত সংস্কৃত সূত্রটির অর্থ এই দাঁড়ায়। আশ্রিতবর্ণান্ত যুগ্মধ্বনি মাত্রকেই (আশ্রিত বর্ণটি স্বর বা ব্যঞ্জন যা-ই হক না কেন) গুরু বা দ্বিমাত্রক বলে ধরতে হবে; অযুগ্ম ধ্বনি যদি স্বভাবতঃ হ্রস্ব হয় তবে একমাত্রক এবং স্বভাবতঃ দীর্ঘ হলে দ্বিমাত্রক। এই প্রণালীতে পূর্বোক্ত পংক্তিটিকে আবার বিচার করা যাক।—

```
 ।            +       + +
মা কুরু । ধনজন । -যউ্বন । -গর্বম্
```

এখানে তিনটি ধ্বনি (যোগ-চিহ্নিত) যুগ্ম, সুতরাং দ্বিমাত্রক; বাকি ন-টি অযুগ্ম ধ্বনির মধ্যে একটি (দণ্ড-চিহ্নিত) স্বভাবদীর্ঘ বলে দ্বিমাত্রক এবং আটটি হ্রস্ব, অতএব একমাত্রক। সুতরাং উক্ত পংক্তিতে সবসুদ্ধ ৩×২+১×২+৮×১ এই ষোল মাত্রা আছে।

শ্রুতবোধ-নামক সুপরিচিত ছন্দগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ব্যঞ্জনবর্ণকে অর্থাৎ হস্‌বর্ণকে অর্ধমাত্রক বলে ধরতে হবে—'ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্'। এ কথার কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে করি নে। গ্র অর্থাৎ গ্‌র, এখানে কি গ্-এর আধ মাত্রা ধরে মোট দেড় মাত্রা ধরতে হবে? তা হতে পারে না, কারণ গ্র বা গ্‌র দুয়ে মিলেও অযুগ্ম ধ্বনি—এখানে ধ্বনির দ্বৈতভাব বা দ্বিরুচ্চার প্রকৃতি নেই; গ্, র্ এবং অ যুগপৎ উচ্চারিত হচ্ছে। সুতরাং এটি একমাত্রক অযুগ্ম ধ্বনি। শ্রুতবোধকারেরও এখানে একাধিক মাত্রা গণনা করা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু গর্,

এখানেও দেড় মাত্রা ধরা সংগত নয়; কারণ এখানে অকারকে গুরু বলেই ধরি আর সমস্তটাকে একটি যুগ্মধ্বনি বলেই গণ্য করি, উভয়তঃই এখানে দু মাত্রাই গণনা করতে হবে; নতুবা গর্বম্ শব্দে চার মাত্রা ধরা সম্ভব হত না। আসল কথা এই যে, অনাশ্রিত হসন্ত বর্ণের উচ্চারণও সম্ভব নয়, তার মাত্রা হিসাব করাও অযৌক্তিক।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় যুগ্ম ধ্বনি সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ ধ্বনি এবং ঐ, ঔ, অয়্, অং, অঃ প্রভৃতি যুগ্ম ধ্বনির ব্যবহারগত একটা পার্থক্য আছে যা ছন্দের মাধুর্যবিচারে উপেক্ষণীয় নয়। দীর্ঘ ধ্বনিগুলি হচ্ছে ধ্বনির বিশুদ্ধ রূপ; ওদের ভিতরকার কথাটি হচ্ছে দ্বিত্ব, কারণ ই, উ প্রভৃতিকে দ্বিগুণীকৃত করেই ওদের উদ্‌ভব। কাজেই ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরগুলি উচ্চারণ করলেই ধ্বনির এমনি একটি বিশুদ্ধ রূপের আবির্ভাব হয় যা কানে সংগীতের সুরমাধুর্যের আভাস দিতে থাকে; এজন্যই সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ স্বরগুলির সাহায্যে প্রতি পদেই আমাদের চিরপরিচিত ও চিরপ্রিয় দরাজ আওয়াজের উদ্‌ভব হতে থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘ স্বরগুলি দ্বিত্বপ্রকৃতি হারিয়ে ফেলে হ্রস্বত্ব লাভ করেছে বলে বাংলা ছন্দে ওই দরাজ আওয়াজের সাক্ষাৎ মেলে না। পক্ষান্তরে যুগ্মধ্বনিগুলি ধ্বনির বিশুদ্ধ রূপ নয়, এরা ধ্বনিসংহতি মাত্র; এদের আওয়াজ দরাজ নয়, কিন্তু সে আওয়াজে বৈচিত্র্য আছে এবং এদের শেষাংশস্থিত আলগা ধ্বনিগুলি পরবর্তী ধ্বনির গায়ে আঘাত করে যে ঝংকারের সৃষ্টি করে তার মাধুর্য কম নয়। যথা—ফাল্‌গুন্, ফুল্‌বন্, মন্থর্ ইত্যাদি শব্দে হসন্ত বর্ণের ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনির উপরে আঘাত করে চমৎকার একটি ঝংকারের ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে; তা ছাড়া হসন্ত বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় পূর্ববর্তী স্বরের উপরে খুব খানিকটা ঝোঁক পড়ে এবং ওই ঝোঁকের ফলে স্বরধ্বনিটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। এক কথায় দীর্ঘ স্বরের আওয়াজ দীর্ঘায়ত ও দরাজ আর যুগ্মধ্বনির আওয়াজ বিচিত্র, ঝংকৃত ও তরঙ্গিত; ছন্দের ক্ষেত্রে এদের কারও মর্যাদা কম নয়।

সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘ ধ্বনির ব্যবহার প্রচুর, ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিও যথেষ্ট আছে; কিন্তু ঐ এবং ঔ ব্যতীত স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনি নেই। পক্ষান্তরে বাংলায় দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিগুণীকৃত ধ্বনি প্রায় নেই বললেই হয়, অন্ততঃ ছন্দ ব্যবহারের কার্যে দীর্ঘ ধ্বনির প্রয়োগ খুবই কম। বাংলায় হসন্ত বর্ণের বহুল প্রয়োগহেতু ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনির খুব প্রাচুর্য; এর একটি প্রধান কারণ এই যে, সংস্কৃতে

যেসব শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ, বাংলায় সেসব শব্দ হসন্তান্ত হয়ে গেছে। যথা—ফল, জল ইত্যাদি। এর আর-একটি কারণ বাংলায় পদান্তস্থিত হসন্ত বর্ণ পরবর্তী স্বরবর্ণের সঙ্গেও 'সংযুক্ত'ই হয়, তাতে বিলীন হয়ে যায় না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

তার্ রূপ্ । স্থাথ্ দীন্ । রুদ্রের্ । দক্ষিণ্ ।
মূর্তির্ । কর্ আজ্ । কর্ জয়্ । গান্ ।

—জয়ধ্বনি, ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে এতগুলি হসন্ত বর্ণের সমাবেশ হয়েছে যা সংস্কৃত ভাষায় কখনও পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে তিনটি মাত্র যুক্তবর্ণ আছে; বাকি সবগুলিই হসন্ত আকারে আছে, পরবর্তী বর্ণে যুক্ত করে দেওয়া হয় নি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় 'কর্ আজ' কথা দুটি; সংস্কৃত আইন অনুসারে এ-দুটি কথা দাঁড়াত 'করাজ' এই আকারে। কিন্তু বাংলায় এর প্রকৃত রূপ হচ্ছে 'কর্আজ'। স্বরবর্ণের মাথায় রেফ চিহ্ন দেওয়াতে বিস্মিত হবার কারণ নেই; সংস্কৃতেও তার নজির আছে, যথা—নৈর্ঋত, নৈরৃত নয়। বাংলা ছন্দের হসন্ত বর্ণ যে পরবর্তী স্বরবর্ণে বিলীন হয়ে যায় না, একটু লক্ষ রেখে পড়লেই বাংলা সাহিত্যে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলবে। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

তরুণী আশারে । সঙ্গী কর্ ।
আজ্ আবার, । মন্ রে মন্ ।

—প্রণাম, বেলাশেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানেও তৃতীয় পর্বে হসন্ত জ্ পরবর্তী আকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় নি।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সব চেয়ে বড় পার্থক্য (অবশ্য ছন্দবিচারের তরফ থেকে) হচ্ছে এই যে, সংস্কৃত ভাষায় ঐ আর ঔ ছাড়া স্বরান্তিব যুগ্মধ্বনি নেই, আর বাংলা ভাষায় যুগ্মস্বরের সংখ্যা বহু। যথা—অই্, অউ্, অও্, আই্, আউ্, আও্ ইত্যাদি। তার প্রমাণ বই, বউ, লও, যাই, লাউ খাও ইত্যাদি। খাঁটি বাংলায় স্বরসন্ধির ব্যবস্থা নেই বলে এসব যুগ্মস্বর বাংলা ছন্দে এমন একটি তরঙ্গায়িত লীলার সৃষ্টি করে যার সাক্ষাৎ সংস্কৃত ছন্দে খুব কমই পাওয়া যায়।

জাগিয়া, মাগিয়া । লও আশিস্, ।
গাও নবীন । ছন্দে গান ।

—প্রণাম, বেলাশেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে (লও্ আশিস্, গাও্ নবীন্) অও্ এবং আও্ এ দুটি যুগ্মস্বর যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে এমন যুগ্মস্বর সংস্কৃতে মাত্র দুটি, ঐ আর ঔ। 'লও্ আশিস্' কথার সঙ্গে তাল রাখতে পারে 'যৌবনম্' ; কিন্তু সংস্কৃত বিধান অনুসারে যদি 'লও্ আশিস্' কথা-দুটির মধ্যে সন্ধি হয়ে যেত, তবে বাংলা ভাষা তার একটি বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত হত। বাংলা 'ছন্দে গান্'-এর সঙ্গে সংস্কৃত 'ছন্দ-বিৎ' পাল্লা দিতে পারেন ; কিন্তু বাংলার যুগ্মস্বরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে সংস্কৃত ভাষার এমন শক্তি নেই। যুগ্মধ্বনির প্রাচুর্যবিষয়ে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির তুলনা চলতে পারে। ইংরেজি উচ্চারণে যে accent বা ঝোঁক থাকে তার সঙ্গে এই যুগ্মধ্বনিবাহুল্যের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। সন্ধান করলে প্রাকৃত বা চলতি বাংলায় যুগ্মধ্বনিবাহুল্যের মূলেও ওই accent বা উচ্চারণের ঝোঁকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর এই-জন্যই বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং ইংরেজি ছন্দের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

বিচিত্রা ১৩৩৮ চৈত্র

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ

সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনাতেই পারিভাষিক শব্দগুলির একটা বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ থাকে এবং আলোচনার আগাগোড়া সর্বত্রই ওই নির্দিষ্ট অর্থটিকে বজায় রাখা চাই। পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ যদি নির্দিষ্ট এবং সর্বত্র সমান না থাকে তবে অনেক সময়েই অর্থবিভ্রাট ঘটা সম্ভব। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধটি পড়ে পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে কিছু সংশয় থেকে যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। উক্ত প্রবন্ধে তিনি 'যুক্ত অক্ষর', 'যুগ্মধ্বনি', 'যুগ্মস্বর' এবং 'যুগ্মবর্ণ'—এই চারটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমি কিন্তু এ শব্দ-চারটিকে এক অর্থে ব্যবহার করি নে। যুক্তাক্ষর এবং যুগ্মবর্ণ এক হতে পারে; কিন্তু যুক্তাক্ষর এবং যুগ্মধ্বনি এক জিনিস নয়। যেমন 'প্রতি' শব্দের 'প্র' যুক্তাক্ষর বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি নয়। 'ছন্দ' শব্দের 'ন্দ'-কে যুক্তাক্ষর বলব, কিন্তু যুগ্মধ্বনি বলব না। 'ছন্দ' শব্দে যে যুগ্মধ্বনি আছে সেটা আমার পরিভাষায় 'ন্দ'-এর মধ্যে নয়, 'ছন্'-এর মধ্যে; 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্' যুগ্মধ্বনি, 'দ' অযুগ্ম ধ্বনি। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি; এ স্থলে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যুগ্মধ্বনি এবং যুগ্মস্বরও সম্পূর্ণরূপে এক জিনিস নয়। যুগ্মস্বরমাত্রকেই যুগ্মধ্বনি বলতে পারি; কিন্তু যুগ্মধ্বনিমাত্রকেই যুগ্মস্বর বলতে পারি নে। পূর্বোক্ত 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্' যুগ্মধ্বনি বটে, কিন্তু যুগ্মস্বর নয়। যেসব যুগ্মধ্বনির অন্তর্গত আশ্রেতা ও আশ্রিত উভয়ই স্বরবর্ণ সেসব যুগ্মধ্বনিকেই যুগ্মস্বর বা diphthong বলেছি। যেমন—অই্, আই্, অউ্, আউ্, ইউ্, এউ্, অও্, আও্, এও্, ইত্যাদি যুগ্মধ্বনিগুলিকে যুগ্মস্বরও বলতে পারি; কেননা এখানে অ, আ, ই, এ, এই আশ্রেতা ধ্বনিগুলিও স্বর এবং ই্, উ্, ও্ এই আশ্রিত ধ্বনিগুলিও স্বর।

ছন্দের আলোচনায় আমি 'অক্ষর' শব্দটিকে বর্জন করতে চাই। কারণ ছন্দ তো অক্ষর নিয়ে কারবার করে না; অক্ষর যে ধ্বনির প্রতীক, ছন্দের কারবার সেই ধ্বনিটাকে নিয়ে, অক্ষরটাকে নিয়ে নয়। তা ছাড়া ভারতবর্ষীয় লিপিপদ্ধতিতে অক্ষরগুলি সব সময় যথার্থরূপে ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ এক-একটি অযুক্ত অক্ষর অনেক সময়ই এক-একটি অযুগ্ম ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর

প্রতিনিধি হলেও এক-একটি যুক্তাক্ষরকে কখনও এক-একটি যুগ্মধ্বনির প্রতিনিধি বলা যায় না। যেমন 'প্রতি' শব্দের 'প্র' এবং 'ছন্দ' শব্দের 'ন্দ' যুক্তাক্ষর বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি নয়। পক্ষান্তরে 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্‌'-কে যুগ্মধ্বনি বলব, কিন্তু যুক্তাক্ষর বলা যায় না। এজন্যে আমি বিশেষভাবে যুক্তাক্ষর, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি শব্দকে ছন্দের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার পক্ষপাতী। আর এজন্যেই সংস্কৃত ছন্দের আলোচনাতেও আমি সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকারদের থেকে একটু পৃথক্ প্রণালী অবলম্বন করতে চাই। যেমন, 'কশ্চিৎকান্তা' কথাটাকে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রমতে বিশ্লেষণ করা হয় এ ভাবে—ক-শ্চি-ৎকা-ন্তা; কারণ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে সংযুক্তাক্ষর কথাটার ব্যবহার আছে, যুগ্মধ্বনি কথার ব্যবহার নেই। কিন্তু আমি ওই জিনিসটাকে বিশ্লেষণ করতে চাই এভাবে—কশ্‌-চিৎ-কান্‌-তা; কারণ আমি যুক্তাক্ষর কথাটি ব্যবহারের বিরোধী এবং যুগ্মধ্বনি শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

পূর্বেই বলেছি 'অক্ষর' শব্দটিকেই ছন্দের আলোচনায় ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দটা এত বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে যে, ও শব্দটাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কঠিন। যা হক, বাংলা ছন্দের আলোচনায় ও শব্দটাকে যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে এই শব্দটার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন থাকা প্রয়োজন। অক্ষর শব্দটার তিনটি অর্থ আছে। এর বৈয়াকরণিক অর্থ বর্ণমালার বর্ণ অর্থাৎ letter। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর শব্দে এক-একটি পূর্ণ ধ্বনি বা syllable বোঝায়। কিন্তু বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দের অর্থের স্থিরতা নেই; বাংলা ছন্দে অক্ষর শব্দ দ্বারা কখনও letter, কখনও syllable বোঝায়। যেমন—বিদ্যুৎ, মহৎ শব্দ বাংলা ছন্দে তিন অক্ষরের শব্দ; প্রথম দুটি অক্ষরে দুটি সিলেব্‌ল্ (বি, দ্যু এবং ম, হ) বোঝাচ্ছে, কিন্তু তৃতীয় অক্ষরটি একটি letter (খণ্ড-ৎ) বোঝাচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে ও-দুটি দুই অক্ষর অর্থাৎ দুই সিলেব্‌ল্-এর বেশি মর্যাদা পাবে না, যদিও মাত্রা হিসেবে বিদ্যুৎ শব্দে চার মাত্রা এবং মহৎ শব্দে তিন মাত্রা। তেমনি পুণ্যবান্, শক্তিমান্ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ছন্দে তিন অক্ষর বলে গণ্য হলেও বাংলা ছন্দে এগুলি চার অক্ষরের শব্দ বলেই গৃহীত হয়, কারণ হসন্ত ন্‌-কেও বাংলা ছন্দের প্রচলিত হিসাবে এক অক্ষর বলেই ধরা হয়। বাংলায় প্রচলিত অর্থে 'মুস্কিল' শব্দে তিন অক্ষর বটে; কিন্তু যদি লিখি 'মুশকিল' তা হলে চার অক্ষর বলে ধরা হবে। যা হক, অক্ষর শব্দের পারিভাষিক অর্থ নিয়ে এ স্থলে

আর অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

ছন্দের আলোচনায় 'মাত্রা' কথাটির ব্যবহার সম্বন্ধেও একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ সংগীতের পরিভাষায় মাত্রা শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় ছন্দশাস্ত্রে মাত্রা কথাটি অবিকল সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সংগীতে সর্বত্রই এবং সর্বদাই ধ্বনিপরিমাণ (quantity) নিখুঁতভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, অর্থাৎ সংগীত জিনিসটা সর্বদাই quantitative বা মাত্রিক ; কাজেই সংগীতে ধ্বনি-পরিমাণের unit বা ব্যষ্টিও সর্বদাই quantitative। আর ধ্বনিপরিমাণ বা quantityর যে unit তারই পারিভাষিক নাম 'মাত্রা'। সুতরাং সংগীতের unit বা ব্যষ্টিকে সর্বদাই 'মাত্রা' বলা চলে। কিন্তু ছন্দ আর সংগীত এক জিনিস নয়। ছন্দমাত্রই মুখ্যতঃ ধ্বনিপরিমাণের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ সমস্ত ছন্দই quantitative নয়। এমন অনেক ছন্দ আছে যা গৌণতঃ quantitative হলেও ধ্বনিপরিমাণ বা quantity যার মুখ্য বা মূল কথা নয়।

ইংরেজি ছন্দগুলি আসলে quantitative বা মাত্রাধর্মী কি না, এ বিষয়ে ছন্দোবিৎমহলে প্রচুর তর্ক হয়ে গেছে। এ স্থলে ইংরেজি ছন্দের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অবান্তর।

কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুএকটি কথা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সংস্কৃত ছন্দমাত্রই মূলে quantitative বা মাত্রিক নয়, এ বিষয়ে সমস্ত সংস্কৃত ছন্দোবিৎরাই একমত। ছন্দশাস্ত্রকার গঙ্গাদাস সংস্কৃত ছন্দগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।

বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ ॥ —ছন্দোমঞ্জরী ১।৪

এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে ছন্দগুলি 'জাতি' শ্রেণীর অন্তর্গত শুধু সেগুলিই 'মাত্রাকৃত' বা quantitative, আর যে ছন্দগুলি অক্ষর অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যাত সেগুলি মুখ্যতঃ মাত্রাকৃত বা quantitative নয়, এ কথা বলাই উক্ত ছন্দশাস্ত্রকারের অভিপ্রায়। অন্যান্য ছন্দশাস্ত্রকাররাও এ বিষয়ে গঙ্গাদাসের সঙ্গে একমত। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে, 'জাতি' ছন্দগুলি 'মাত্রাকৃত' বলে ছন্দশাস্ত্রে এগুলিকে অনেক সময় 'মাত্রাবৃত্ত' নামেও অভিহিত করা হয় ; আর অক্ষরসংখ্যাত 'বৃত্ত' ছন্দগুলিকেও ওই একই কারণে 'অক্ষরবৃত্ত' বা 'বর্ণবৃত্ত' নামও দেওয়া হয়ে থাকে। যা হক আমরা দেখলুম যে,

সংস্কৃত ছন্দোবিৎদের মতে একমাত্র জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দগুলিই মাত্রাকৃত অর্থাৎ quantitative; এসব ছন্দের unit বা একক হচ্ছে 'মাত্রা'। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দগুলি মাত্রাকৃত বা quantitative নয়; কারণ এসব ছন্দের unit মাত্রা নয়, এসব ছন্দের unit হচ্ছে 'অক্ষর'।

'মাত্রা' ও 'অক্ষর', এ দুটি পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ দিলে বিষয়টা অনেকের পক্ষে সহজ হবে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের 'অক্ষর' আর ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ একই জিনিস; ও শাস্ত্রে অক্ষর বলতে ব্যাকরণের বর্ণ অর্থাৎ letter বা হরফ বোঝায় না। আর 'মাত্রা' শব্দকে অর্থাৎ ধ্বনিপরিমাণ বা quantityর unitকে ইংরেজিতে বলতে পারি metrical moment বা instant। কোলব্রুক সাহেবও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের আলোচনায় 'মাত্রা' কথার ইংরেজি প্রতিশব্দরূপে moment এবং instant শব্দ ব্যবহার করেছেন। (দ্রষ্টব্য H. T. Colebrooke, *Miscellaneous Essays*, vol. II, পৃ ৬২-১৪৬।) সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে মাত্রা কথার প্রতিশব্দরূপে স্থলবিশেষে 'কলা' কথাটিও ব্যবহৃত হয়। এই 'কলা'কে ইংরেজিতে metrical digit বলতে পারি। ছন্দপরিভাষার 'মাত্রা' বা 'কলা'র আর-একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে *mora* (দ্রষ্টব্য A. B. Keith, *History of Sanskrit Literature*, পৃ ১৮৩ ও ৪১৮।) Metrical moment, instant বা digit শব্দের পরিবর্তে *mora* কথাটি ব্যবহার করাই সুবিধে। সুতরাং আমাদের আলোচনায় সংস্কৃত মাত্রা বা কলা কথার প্রতিশব্দরূপে *mora* কথাটিই ব্যবহার করব।

২

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ উপলক্ষে সংস্কৃত ছন্দের শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করার সার্থকতা আছে। এ স্থলে সে বিষয়ে সংক্ষেপে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। পিঙ্গলছন্দসূত্রের টীকাকার হলায়ুধ সমস্ত সংস্কৃত ছন্দকে গণচ্ছন্দ, মাত্রাচ্ছন্দ ও অক্ষরচ্ছন্দ, এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন (ছন্দঃসূত্রম্‌ ৪।১১, টীকা)। কিন্তু পরবর্তী কালে কেদারভট্ট (বৃত্তরত্নাকর-প্রণেতা), গঙ্গাদাস (ছন্দোমঞ্জরী-প্রণেতা) প্রমুখ ছন্দোবিৎরা সংস্কৃত ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত (বা জাতি) এবং অক্ষরবৃত্ত, এই দুটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; গণচ্ছন্দগুলিও আসলে মাত্রাকৃত বা quantitative বলে তাঁরা এ ছন্দগুলিকেও মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দের অন্তর্গত বলেই গণ্য করেছেন।

কিন্তু আমার মনে হয় এই দু-রকম শ্রেণীবিভাগের কোনোটিই নির্দোষ নয়। আমার বিবেচনায় সমস্ত সংস্কৃত ছন্দকে মাত্রিক, আক্ষরিক এবং অক্ষরমাত্রিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করাই সংগত। যেসমস্ত ছন্দ শুধু ধ্বনিপরিমাণ বা quantityর উপরে প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে বলা যায় মাত্রিক অর্থাৎ quantitative ছন্দ; যথা বৈতালীয়, ঔপছন্দসিক, মাত্রাসমক, আর্যা ইত্যাদি। যেসমস্ত ছন্দ শুধু অক্ষর বা সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে বলা যায় আক্ষরিক অর্থাৎ syllabic ছন্দ; যথা অনুষ্টুপ্‌ শ্লোক। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌ প্রভৃতি সমস্ত বৈদিক ছন্দই এই আক্ষরিক বা syllabic শ্রেণীর অন্তর্গত; শুনতে পাই অবেস্তার সমস্ত ছন্দই নাকি সম্পূর্ণরূপে আক্ষরিক প্রকৃতির। আর যেসমস্ত সংস্কৃত ছন্দে যুগপৎ অক্ষরসংখ্যা এবং ধ্বনিপরিমাণ (syllable and quantity) সুনির্দিষ্ট থাকে সেসব ছন্দকে অক্ষরমাত্রিক (syllabic-quantitative) নামে অভিহিত করা যায়। যেসমস্ত লৌকিক ছন্দকে শাস্ত্রকাররা বৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত নামে অভিহিত করে থাকেন, একমাত্র অনুষ্টুপ্‌ শ্লোক ছাড়া সেসমস্ত ছন্দ আসলে এই অক্ষরমাত্রিক শ্রেণীর অন্তর্গত; ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি সমস্ত সুপরিচিত ছন্দই আসলে অক্ষরমাত্রিক, এ কথা সংস্কৃত কাব্যপাঠককে বলা নিষ্প্রয়োজন। আর বৈদিক ছন্দগুলি আক্ষরিক (syllabic) বটে কিন্তু অক্ষরমাত্রিক নয়, আশা করি এ কথাও বলা বাহুল্য।

এবার অক্ষর (syllable) ও ধ্বনিপরিমাণ (quantity), এই দুই তত্ত্বকে অবলম্বন করে বাংলা ছন্দগুলিকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় তা দেখা যাক। পূর্বেই বলেছি যে, বাংলায় অক্ষর বলতে হরফ বা letter বোঝায়, সিলেব্‌ল্‌ বোঝায় না। তাই বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি সিলেব্‌ল্‌ কথার প্রতিশব্দ হিসেবে কোথাও 'ধ্বনি' (যথা—যুগ্মধ্বনি, অযুগ্মধ্বনি) এবং কোথাও 'স্বর' (যথা—স্বরবৃত্ত, স্বরমাত্রিক), এ শব্দ-দুটি ব্যবহার করেছি, কারণ সিলেব্‌ল্‌-এর অন্তরের তত্ত্বই হচ্ছে একটি স্বর বা ধ্বনির অস্তিত্ব। কাজেই দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় যাকে বলা হয় 'অক্ষর' বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি তাকেই বলেছি 'স্বর'। সুতরাং সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত এবং বাংলা স্বরবৃত্ত এ কথা-দুটি আসলে অভিন্নার্থক। অর্থাৎ সংস্কৃত পরিভাষায় যাকে বলেছি আক্ষরিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বাংলা পরিভাষায় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দও বলতে পারি; আর অক্ষরমাত্রিক এবং স্বরমাত্রিক, এ শব্দ-দুটিও একার্থবাচক। আমরা

দেখেছি syllable ও quantity এই দুই তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে সংস্কৃত ছন্দকে আক্ষরিক (syllabic), মাত্রিক (quantitative) এবং অক্ষরমাত্রিক (syllabic-quantitative) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন করে বাংলা ছন্দকে নিম্নলিখিত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি।

১। মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ২। স্বরবৃত্ত (syllabic)

৩। যৌগিক (mixed) ৪। স্বরমাত্রিক (syllabic-quantitative)

৩

বাংলা ছন্দের এই চার শ্রেণীর ইতিহাসটাও সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসের আদি যুগে 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দেরই প্রচলন দেখতে পাই; প্রমাণ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের শেষ যুগে অক্ষরমাত্রিক ছন্দের চেয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই অধিকতর প্রচলন একটি লক্ষ করার বিষয়। এই উক্তিটি যে বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষভাবে খাটে তার প্রমাণস্বরূপ লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৭) সভাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং আচার্য গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী এই দুখানি কাব্যের উল্লেখ করতে পারি। সংস্কৃত যুগের পরবর্তী কালের প্রাকৃত কাব্যসাহিত্যেও মাত্রাবৃত্তেরই খুব বেশি প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং প্রাকৃত থেকে উদ্‌ভূত আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলির আদি যুগে স্বভাবতঃই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাব্যের প্রধান বাহন হয়েছিল। কাজেই চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে মাত্রিক ছন্দের ব্যবহারে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগেও বৈষ্ণব পদাবলীগুলিতে ওই মাত্রিক ছন্দেরই প্রাধান্য। কিন্তু আদি যুগের বৌদ্ধ পদাবলী এবং মধ্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী, উভয়ত্রই সংস্কৃত ও প্রাকৃত উচ্চারণপদ্ধতি অবলম্বন করেই ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ স্থির করার প্রয়াস দেখা যায়। অথচ ওই উচ্চারণপদ্ধতি আধুনিক ভাষার প্রকৃতিবিরোধী। তাই আমাদের প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে সংস্কৃত উচ্চারণপদ্ধতি এবং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতির একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাই এবং সেজন্যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ছন্দপতনের এতটা প্রাচুর্য দেখা যায়। ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্য থেকে মাত্রিক ছন্দ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। তার পরে তিনি 'মানসী'র যুগেই সর্বপ্রথমে বাংলার স্বাভাবিক

উচ্চারণটিকে অব্যাহত রেখে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। তখন থেকেই এজাতীয় ছন্দ বাংলা কাব্যের, বিশেষতঃ গীতিকবিতার, একটি প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে।

বাংলা 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের ইতিহাসও কম ঔৎসুক্যকর নয়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং এমন কি গোবিন্দদাসের পদাবলীতেও স্বরবৃত্ত ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। স্বরবৃত্ত হচ্ছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কবিরা যেসব ছন্দে কাব্য রচনা করতেন সেগুলি ছিল কৃত্রিম ছন্দ, তার ফলে আমাদের প্রাচীন কাব্যের সর্বত্রই ওই স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ছন্দগুলির একটা চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন কাব্যে যেসব স্থলে আমরা সাধারণতঃ ছন্দপতন ঘটেছে মনে করে থাকি সেসব স্থলেই ওই দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়ে গেছে। আর প্রাচীন কবিদের কৃত্রিম ছন্দের বিরুদ্ধে বাংলার সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দের বিদ্রোহের ফলেই ওই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। তাই যেসব স্থলে ছন্দপতনের আকারে ওই দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে তার মধ্যে সাধারণতঃ প্রাচীন কৃত্রিম ছন্দের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাভাবিক নবীন স্বরবৃত্ত ছন্দেরই জয়ের আভাস দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা ছন্দের প্রাচীন ও নবীন ধারার এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসটি বাস্তবিকই খুব বিস্ময়কর। যা হক, বাংলার এই স্বাভাবিক স্বরবৃত্ত ছন্দটি সর্বপ্রথমে রামপ্রসাদের গানেই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তথাপি তখনকার দিনের কবিরা এ ছন্দের স্বরূপ ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্র থেকে হেমচন্দ্র পর্যন্ত অনেক কবির রচনাতেই এ ছন্দের অল্পবিস্তর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু কারও হাতেই তার যথোচিত মর্যাদা রক্ষিত হয় নি; সর্বত্রই তার অনাদর ঘটেছে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এ-ছন্দের প্রকৃত মূল্য বুঝে তাকে বাংলা কাব্যের ছন্দভাণ্ডারে সযত্নে অভিনন্দিত করেছেন। 'ছবি ও গান'-এই তিনি সর্বপ্রথমে এ ছন্দের যথার্থ প্রকৃতিটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁর এ চেষ্টা পরিশেষে 'ক্ষণিকা'র যুগে সাফল্য লাভ করেছে। এ ছন্দটির যথার্থ মর্যাদা আবিষ্কারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভারতীর বীণায় যে একটি নবতন তন্ত্রী যোজনা করতে সমর্থ হয়েছেন, তার ধ্বনিমাধুর্য অন্য কোনো ছন্দের চেয়ে কম নয়।

কিন্তু সব চেয়ে জটিল ইতিহাস হচ্ছে বাংলা 'যৌগিক' ছন্দের। এ ছন্দটিই হচ্ছে আমাদের বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রধান বাহন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ,

কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এ ছন্দেই রচিত। কিন্তু তাঁদের কাব্যে এ ছন্দের প্রকৃত মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এ ছন্দের উৎপত্তি কিরূপে হল, আমার মনে হয় বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এটি একটি গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার স্থান এটা নয়। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এ ছন্দটির প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করতে বাংলার কবিদের বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। মধ্য যুগে এ ছন্দটিকে এক দিকে প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রাবৃত্ত অপর দিকে বাংলার স্বাভাবিক স্বরবৃত্ত এ দুটি ছন্দের আকর্ষণে একটি অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে দোলায়মান দেখা যায়। তার উপরে সংস্কৃতজ্ঞ কবিদের হাতে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব, ফারসি-নবিস কবিদের হাতে ফারসি ছন্দের প্রভাব এবং সমস্ত কবিতাকেই গানের ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার প্রচলিত অভ্যাস, এ সমস্তের ফলে এ ছন্দটি কোনো সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে উঠতে পারে নি। এই অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার বহু পরিচয় আমাদের প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এইসমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে আমাদের কাব্যসাহিত্যের প্রধান বাহনটি যে একটি যৌগিক ছন্দের আকার ধারণ করছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের হাতে এ ছন্দটি একটি নতুন ধরনের 'অক্ষর'-বৃত্তের আকার ধারণ করে, অর্থাৎ সে সময় থেকে শুধু অক্ষরের সংখ্যার সংগতি রক্ষা করে ছন্দরচনার প্রথা দেখা দেয়। কিন্তু এই 'অক্ষর' জিনিসটা সিলেব্‌ল্‌ও নয়, letter ও নয়; স্থলবিশেষে সিলেব্‌ল্‌, স্থলবিশেষে letter বা বর্ণ। এইটেই 'অক্ষর' শব্দের বাংলায় প্রচলিত অর্থ। কিন্তু এই অনিশ্চিতার্থক 'অক্ষর' কখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। অথচ ধ্বনিই ছন্দের মূল তত্ত্ব, অক্ষর নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। যা হক, যখন থেকে এই অক্ষর আমাদের কাব্যছন্দের মূল তত্ত্বের স্থান দখল করল তখন থেকে আমাদের ছন্দে এক নতুন রকমের ত্রুটি দেখা গেল। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এটা নয়। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভারতচন্দ্রের সময় থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত আমাদের কাব্যছন্দের রাজ্যে ওই অনিশ্চিত প্রকৃতির অক্ষরেরই একাধিপত্য চলেছে। মেঘনাদবধের ছন্দবিচার করলে দেখা যাবে ওই কাব্যখানির আগাগোড়া প্রত্যেকটি পংক্তি চোদ্দ 'অক্ষরে' গাঁথা। সর্বত্রই চোদ্দ অক্ষরের প্রয়োগ হয়েছে; কোথাও ধ্বনিব্যষ্টির (metrical unitএর) প্রতি লক্ষ নেই। আর অক্ষরই

যে ওই ধ্বনিব্যাষ্টির কাজ সর্বত্র চালাতে পারে না এ কথা পূর্বেই বলেছি। এই ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যার সাম্যরক্ষা ছন্দের পক্ষে অস্বাভাবিক বলেই আমি মনে করি।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সহজ ছন্দপ্রতিভার স্পর্শে এই 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দের যৌগিক প্রকৃতিটি আবিষ্কৃত হল। তাঁরই রচনা থেকে সর্বপ্রথমে দেখা গেল যে, অক্ষরসংখ্যার সাম্যরক্ষা ছন্দের পক্ষে অবান্তর; ধ্বনিসাম্যই ছন্দরচনার মূল কথা। তাই তিনি শুধু ধ্বনিসাম্য রক্ষা করেই ছন্দরচনা করেছেন, অক্ষর-সংখ্যার বৈষম্যে সংকুচিত বা বিচলিত হন নি। অবশ্য তাঁরও অল্পবয়সের রচনায় অক্ষরসাম্যই দেখা যায়; কিন্তু পরিণত বয়সের রচনায় তিনি ধ্বনিসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে অক্ষরসাম্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। এভাবে স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ন্যায় আমাদের যৌগিক ছন্দটিও রবীন্দ্রনাথের হাতেই পরিণতি লাভ করেছে। [এ বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা 'জয়ন্তী-উৎসর্গে'র 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামক প্রবন্ধে ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]। আমাদের এই তথাকথিত 'অক্ষর'-বৃত্ত ছন্দটি যে আসলে একটি যৌগিক প্রকৃতির ছন্দ সে বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ এ ছন্দের এই যৌগিক প্রকৃতিটি আধুনিক কালেও যথোচিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দটিকে বলতে পারি বাংলার বৈদিক ছন্দ। আর আমাদের মাত্রাবৃত্ত ছন্দটি হচ্ছে সংস্কৃতের 'মাত্রাবৃত্ত' জাতি ও গণচ্ছন্দের প্রতিনিধি। কিন্তু আমাদের যৌগিক ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ সংস্কৃতে নেই, এটি একটি বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়। পক্ষান্তরে সংস্কৃত অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ বাংলায় ছিল না। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন যে, বাংলাতেও সংস্কৃত অক্ষরমাত্রিক ছন্দের অনুরূপ ছন্দ রচনা করা যায়। তাঁর রচিত এই নতুন-জাতীয় ছন্দকে আমি নাম দিয়েছি 'স্বরমাত্রিক' ছন্দ।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর ছন্দই আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রধান বাহন। আর বাংলা ছন্দের ওই তিনটি শ্রেণীই রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিণতি লাভ করেছে; তা ছাড়া ওই তিন ছন্দেই তিনি এত বিচিত্র রকমের ছন্দোবন্ধের উদ্‌ভাবন করেছেন যা সত্যই বিস্ময়কর। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্‌ভাবিত স্বরমাত্রিক নামে যে চতুর্থ শ্রেণীর ছন্দের উল্লেখ করেছি,

বাংলা কাব্যসাহিত্যে তার পরিসর এখনও অতি সংকীর্ণ; এ ছন্দে রচিত বাংলা কবিতার সংখ্যাও খুবই কম। এ ছন্দ রচনায় খুব সূক্ষ্ম ধ্বনিবিচারের প্রয়োজন; কারণ এ ছন্দ রচনায় ধ্বনিশিল্পের খুব সূক্ষ্ম কারুকার্যের দরকার হয়। তাই এই ছন্দে কবিতা রচনা করতে হলে কবির খুব তীক্ষ্ণ ধ্বনিবোধ এবং নিপুণ শিল্পপ্রতিভা থাকা আবশ্যক। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার অনেক সময়ই কাব্যরচনার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই ছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যা খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হলেও এ ছন্দের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে এবং এর সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর বলে মনে হয় না। তাই স্বরমাত্রিক ছন্দটিকেও বাংলা ছন্দের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে গণ্য করেছি।

৪

বাংলা ছন্দের যে চার ধারার কথা উল্লেখ করলুম এবার দৃষ্টান্তযোগে তাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করা যাক।—

। । । ।   ॥ ॥   । । । ।   ॥
আহা আহা। চীৎকার ॥ করি রঘু। নাথ
ঝাঁপায়ে প। -ড়িল জলে ॥ বাড়ায়ে দু। হাত।
আগ্রহে । যেন তার ॥ প্রাণমন। কায়
একখানি। বাহু হয়ে ॥ ধরিবারে। যায়!

—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দটির unit বা ব্যষ্টি সিলেব্‌ল্ বা স্বর নয়; সুতরাং এটিকে syllabic বা স্বরবৃত্ত ছন্দ বলতে পারি নে। এর unit হচ্ছে মাত্রা বা *mora*, অতএব এ ছন্দটিকে বলব 'মাত্রাবৃত্ত' বা quantitative ছন্দ। কেননা মাত্রা বা *mora* হচ্ছে ধ্বনিপরিমাণ বা quantityরই unit; আর এ ছন্দটিকে ধ্বনির পরিমাণ বা quantityর উপরেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, এখানে অযুগ্মধ্বনিকে এক unit বা *mora* বলে ধরা হয়েছে আর যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয়েছে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই মাত্রা বা *mora*। অযুগ্মদণ্ডের দ্বারা একমাত্রিক অযুগ্মধ্বনি আর যুগ্মদণ্ডের দ্বারা দ্বিমাত্রিক যুগ্মধ্বনি নির্দেশ করা গেল। এ দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তিপর্বে চার মাত্রা বা *mora* রয়েছে, তাই এ ছন্দের পূর্ণতর পরিচয়সূচক নাম হচ্ছে চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দ।

চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আমাদের । ছোটো নদী ॥ চলে বাঁকে । বাঁকে,
বৈশাখ । মাসে তার ॥ হাঁটুজল । থাকে।

... ...

দুই কূলে । বনে বনে ॥ পড়ে যায় । সাড়া,
বরষার । উৎসবে ॥ জেগে উঠে । পাড়া।

—ছোটো নদী, সহজপাঠ ১ম ভাগ, রবীন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্ত-দুটিতে চীৎকার, আগ্রহে, বৈশাখ এবং উৎসবে এই চারটি শব্দেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতিটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিতেই সমস্ত বাংলা ছন্দেরই বিশেষ প্রকাশটি ধরা দেয়।

এবার বাংলা ছন্দের দ্বিতীয় ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

। । । । . । । । । । । । । । ।
পাষাণ-গাঁথা । প্রাসাদ-'পরে ॥ আছেন ভাগ্য । -বন্ত,
মেহাগিনির । মঞ্চ জুড়ি ॥ পঞ্চ হাজার । গ্রন্থ—
সোনার জলে । দাগ পড়ে না, ॥ খোলে না কেউ । পাতা,
অস্বাদিত । মধু যেমন ॥ যূথী অনা । -ঘ্রাতা।

—যথাস্থান, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে সিলেব্‌ল্ বা স্বর; সুতরাং এটিকে বলব 'স্বরবৃত্ত' বা syllabic ছন্দ। এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিপর্বে চারটি করে স্বর আছে; তাই চতুঃস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ বললেই এটির পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হয়। লক্ষ করার বিষয় এ দৃষ্টান্তটিতে অযুগ্মযুগ্মভেদে ধ্বনি অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এর মাত্রা বা quantityর মুখ্যতঃ কোনো পরিমাপ করা হয় নি। তাই এ ছন্দকে মাত্রিক বা quantitative বলে নির্দেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এবার বাংলা ছন্দের তৃতীয় ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

॥ । । । । । । । । ॥ । ।
প্রাণ দিয়ে, । দুঃখ স'য়ে, ॥ আপনার । হাতে
সংগ্রাম ক । -রিতে দাও ॥ ভালোমন্দ । সাথে।
শীর্ণ শান্ত । সাধু তব ॥ পুত্রদের । ধরে
দাও সবে । গৃহছাড়া ॥ লক্ষ্মীছাড়া । করে।

—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি মাত্রা অর্থাৎ moraও নয়, স্বর বা syllableও নয়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে এ ছন্দের unit কোথাও syllable, কোথাও mora। অযুগ্মধ্বনি সর্বত্রই এক unit বটে; কিন্তু যুগ্মধ্বনি শব্দের মধ্যে থাকলে এক unit আর শব্দের অন্তে থাকলে দুই unit বা দুই mora। তাই এ ছন্দটিকে 'যৌগিক' ছন্দ নামে অভিহিত করেছি; কারণ এ ছন্দের প্রকৃতি একই শব্দের একাংশে স্বরমূলক বা syllabic এবং অন্যাংশে মাত্রামূলক বা quantitative। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি; সুতরাং এ স্থলে পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তিপর্বে চারটি করে unit বা ব্যষ্টি আছে; সুতরাং এ ছন্দটিকে চতুর্ব্যষ্টিপর্বিক যৌগিক ছন্দ বলতে পারি।

এ স্থলে এ কথা বলা দরকার যে, উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ বিভিন্ন হলেও ছন্দোবন্ধ হিসেবে এগুলি বিভিন্ন নয়। লক্ষ করলেই টের পাওয়া যাবে যে, উপরের সবগুলি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে চোদ্দটি করে unit বা ব্যষ্টি আছে এবং সর্বত্রই আট unitএর পরে একটি করে ছেদযতি আছে। অর্থাৎ সবগুলি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তি আট এবং ছয় unitএর দুই পদে বিভক্ত হয়েছে। আর এ কথা সকলেই জানে যে, যেসব ছন্দোবন্ধে পংক্তিগুলি আট এবং ছয় unitএর দুই ভাগে বিভক্ত সেসব ছন্দোবন্ধেরই নাম 'পয়ার'। সুতরাং উপরের দৃষ্টান্তগুলি ছন্দ হিসেবে বিভিন্ন হলেও ছন্দোবন্ধ হিসেবে অভিন্ন, কেননা ছন্দোবন্ধ হিসেবে এদের সবগুলিই পয়ার। প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে মাত্রিক (quantitative) পয়ার, দ্বিতীয়টি স্বরবৃত্ত (syllabic) পয়ার, আর তৃতীয়টি যৌগিক (mixed) পয়ার। ছন্দ নির্ভর করে ধ্বনির unitএর প্রকৃতির উপরে, আর ছন্দোবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় ওই unitএর সমাবেশপ্রণালী অর্থাৎ পর্ব ও পদ বিভাগপ্রণালীর দ্বারা।

এবার বাংলা ছন্দের চতুর্থ ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

তুহিনলীন । কোন্ মুনির ॥ ছিলাম কোন্ । স্বপ্নেতে !
জন্ম মোর । কোন্ চোখের ॥ কটাক্ষের । সঙ্কেতে !
কোন্ গিরির । হিমললাট ॥ ঘাম্‌ল মোর । উদ্‌ভবে,
কোন্ পরীর । টুটল হার ॥ কোন্ নাচের । উৎসবে !

—ঝর্নার গান, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিপর্বে স্বরসংখ্যা (syllables) এবং মাত্রাসংখ্যা (morae) যুগপৎ স্থির আছে; কেননা প্রতি পর্বেই তিনটি করে স্বর বা সিলেব্‌ল্ এবং পাঁচটি করে মাত্রা বা mora আছে। তাই এ ছন্দকে 'স্বরমাত্রিক' (syllabic-quantitative) আখ্যা দেওয়া যায়। এ ছন্দটির বিশেষ পরিচয় দিতে হলে বলব এটি ত্রিস্বরপঞ্চমাত্র-পর্বিক ছন্দ।

পরিচয় ১৩৩৯ বৈশাখ

ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ

বাংলা ছন্দের আলোচনায় সর্বপ্রথমেই অযুগ্ম ও যুগ্মধ্বনির ব্যবহারবৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছন্দের প্রধান সম্পদ্ যুগ্মধ্বনি, অথচ···পয়ারসম্প্রদায়ের বাইরে নির্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ চলে না।" —পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ। যুগ্মধ্বনিই যে ছন্দের প্রধান সম্পদ্, এ কথা খুবই সত্য এবং যুগ্মধ্বনিকে যে ছন্দের মধ্যে 'নির্বিচারে' ব্যবহার করা যায় না, এ কথাও সত্য। আসলে ওই যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের বিভিন্ন প্রণালীর উপরেই ছন্দের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অযুগ্মধ্বনির ব্যবহারের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই; সকল ছন্দেই এর মূল্য সমান। কিন্তু স্থলবিশেষে যুগ্মধ্বনির মূল্যে তারতম্য ঘটে। প্রকৃত পক্ষে আমি যুগ্মধ্বনির মূল্য নির্ণয়ের তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ রেখেই বাংলা ছন্দকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করেছি। একটি প্রণালী হচ্ছে অযুগ্মযুগ্ম-নির্বিশেষে শুধু ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যার হিসাব ঠিক রেখে ছন্দ রচনা করা। এই ধ্বনিসংখ্যাত ছন্দের নাম দিয়েছি **স্বরবৃত্ত**, কেননা প্রত্যেকটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর ভিতরকার তত্ত্ব হচ্ছে একটি করে অযুগ্ম (single) বা যুগ্ম (diphthong) স্বর অর্থাৎ vowel-এর অস্তিত্ব। সুতরাং ধ্বনিসংখ্যা স্থির থাকলে স্বরসংখ্যাও স্বতঃই স্থির থাকে। যুগ্মধ্বনির মূল্য নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ধ্বনিকে উচ্চারণকালের ব্যাপ্তি বা পরিমাণের (duration বা quantityর) দিক্ থেকে বিচার করে যুগ্মধ্বনিকে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ মর্যাদা দেওয়া। একটি অযুগ্মধ্বনির উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তার নাম হচ্ছে এক মাত্রা (*mora*, metrical moment বা instant); কাজেই কালব্যাপ্তির দিক্ থেকে যুগ্মধ্বনিকে দু মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। অযুগ্ম ও যুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণকালের পরিমাণ বা ব্যাপ্তির বিচারকেই ছন্দের মাত্রাবিচার বলতে পারি। কাজেই ছন্দরচনার দ্বিতীয় প্রণালী হচ্ছে অযুগ্ম ও যুগ্ম ধ্বনির মাত্রাসংখ্যার হিসাব রক্ষা করে চলা। এই মাত্রাসংখ্যাত ছন্দকেই **মাত্রাবৃত্ত** আখ্যা দেওয়া যায়। বাংলা ছন্দরচনার তৃতীয় প্রণালীটি হচ্ছে উদ্ধৃত দুটি পদ্ধতির যোগে উৎপন্ন একটি যৌগিক প্রণালী। এই যৌগিক

প্রণালীতে রচিত ছন্দকে বলতে পারি যৌগিক ছন্দ। এই যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনিগুলি একটা নির্দিষ্ট প্রণালীতে স্থানবিশেষে স্বরবৃত্তের কায়দায় এক unitএর মর্যাদা পায় এবং অন্যত্র মাত্রাবৃত্তের কায়দায় দুই unitএর মর্যাদা পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দগুলিকে 'পয়ারসম্প্রদায়' বলে অভিহিত করেছেন সেগুলিকেই আমি যৌগিক ছন্দ নাম দিয়েছি। গোড়ায় অক্ষরসংখ্যার হিসাব রক্ষা করে রচনা করার প্রথা থেকেই এ ছন্দগুলি ক্রমে ক্রমে বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে এবং বর্তমান সময়েও এসব ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা মোটামুটি ভাবে স্থির রাখা হয়। তাই এই যৌগিক ছন্দগুলিকে বিকল্পে 'অক্ষর'-বৃত্ত নামও দেওয়া যায়। কিন্তু এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অক্ষর-সংখ্যা কখনও কোনো ছন্দের মূলতত্ত্ব হতে পারে না; ধ্বনিসাম্যই সমস্ত ছন্দের মূল কথা। অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা না থাকলেও ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হওয়া সম্ভব; আবার অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা রক্ষিত হলেও ধ্বনিসাম্য বজায় না থাকতে পারে। সুতরাং বাংলা যৌগিক অর্থাৎ তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষরসংখ্যার উপরে মোটেই নির্ভর করে না, ধ্বনির সমতার উপরেই নির্ভর করে।

বোধ করি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথমে এই অক্ষরসংখ্যার হিসাব স্থির রেখে ছন্দরচনার প্রথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অর্থাৎ তিনিই বাংলা ছন্দকে অক্ষরসংখ্যার গণ্ডির মধ্যে কঠিনরূপে বেঁধে দিয়েছিলেন। অক্ষর গোনার এই অন্ধ প্রথাটা বাংলা কাব্যজগতের উপরে একশো বছরের উপর আধিপত্য করেছে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেই বাংলা ছন্দের অক্ষরসংখ্যার বন্ধনমোচন ঘটেছে।

প্রশ্ন হতে পারে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি শব্দের 'বৃত্ত' কথাটির মানে কি। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যাকে আশ্রয় করে 'বর্তমান' থাকা যায় তাকেই বলা যায় বৃত্ত বা বৃত্তি। এ শব্দটার গৌণ অর্থ হচ্ছে ধর্ম, আচরণ, জীবিকা ইত্যাদি—যথা দুর্বৃত্ত, চৌর্যবৃত্তি। কাজেই যে ছন্দ 'মাত্রা'কে আশ্রয় করেই বর্তমান থাকে অর্থাৎ যে ছন্দ 'মাত্রা'-ধর্মী তাকেই মাত্রাবৃত্ত বলা যায়, তেমনি 'স্বর'-ধর্মী ছন্দকে নাম দেওয়া যায় স্বরবৃত্ত।

আমি বাংলা ছন্দের ধ্বনিকে যুগ্ম ও অযুগ্ম এই দুটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। আর যুগ্মধ্বনির তিন প্রকার বিভিন্ন আচরণের উপরে নির্ভর করে সমস্ত বাংলা ছন্দকে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক বা তথাকথিত 'অক্ষর'বৃত্ত, এই

তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করতে চাই। আমি ছন্দ সম্বন্ধে যত আলোচনা করেছি তার সমস্তই সম্পূর্ণরূপে এই শ্রেণীবিভাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগকেই যদি স্বীকার করা না যায় তবে আমার সমস্ত আলোচনাই দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু এবং অন্যান্য কেউ কেউ এই শ্রেণী-বিভাগ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কি মনে করেন তা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় নি। কিন্তু প্রকারান্তরে বেশ বোঝা যায় যে, তিনিও ওইরকম শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা, তিনি প্রথমতঃ প্রাকৃত ছন্দ বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ এবং সাধু ছন্দ বা সাধু বাংলার ছন্দ, এ দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তার পর আবার সাধু ছন্দের মধ্যে 'পয়ারজাতীয় দ্বৈমাত্রিক' বা 'সমমাত্রিক' এবং 'ত্রৈমাত্রিক' বা 'অসমমাত্রিক' এই দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁর মতেও বাংলা ছন্দে 'প্রাকৃত', 'দ্বৈমাত্রিক' সাধু এবং 'ত্রৈমাত্রিক' সাধু— এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। কিন্তু সাধু ছন্দ ও প্রাকৃত ছন্দ এই নামকরণটি নির্দোষ নয় ; কেননা সাধু ও প্রাকৃত হচ্ছে বাংলার দুটি স্বতন্ত্র ভাষারচনারীতির নাম। কিন্তু ছন্দের প্রকৃতি ভাষারীতির উপরে নির্ভর করে না, ছন্দপ্রকৃতি নির্ভর করে ধ্বনির ব্যবহারপ্রণালীর উপরে। সুতরাং ধ্বনিব্যবহারের বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ রেখেই ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করা উচিত। যা হক, রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রাকৃত ছন্দ বলেন তাকেই আমি স্বরবৃত্ত নাম দিয়েছি। তাঁর কথিত 'দ্বৈমাত্রিক' সাধু-ছন্দ অর্থাৎ পয়ারসম্প্রদায় আর আমার কথিত যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অভিন্ন। আর রবীন্দ্রনাথ 'তিনমাত্রা'-মূলক অসমমাত্রার ছন্দ আমার কথিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের এলাকার মধ্যে পড়ে। একটু পরেই দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তাটা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করব।

২

ছন্দ এবং ছন্দোবন্ধ এক জিনিস নয় ; ও দুটি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র জিনিস। ও দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা ভালো করে বোঝা প্রয়োজন। প্রকৃতি ও আকৃতির মধ্যে যে প্রভেদ ছন্দ ও ছন্দোবন্ধের মধ্যে সেই প্রভেদ। ছন্দ নির্ভর করে ধ্বনির প্রকৃতি বা ব্যবহারবৈশিষ্ট্যের উপরে ; আর ধ্বনিসমবায়ের বহির্গঠনকৌশলের দ্বারা ছন্দের বাহ্য আকৃতি অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলা ছন্দের মৌলিক শ্রেণী তিনটি, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক ওরফে

অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু বাংলার ছন্দোবন্ধ অর্থাৎ ছন্দের বাহ্য আকৃতি বা বহির্গঠন বহু প্রকারের হতে পারে—পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি। একই ছন্দে বহু রকমের ছন্দোবন্ধ হতে পারে। আবার তিনটি বিভিন্ন ছন্দের বাহ্য আকৃতি অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ একই হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

। । । । । । । । । । । । । ।

১। আমি যদি । জন্ম নিতেম্ ॥ কালিদাসের্ । কালে
দৈবে হতেম্ । দশম্ রত্ন ॥ নবরত্নের্ । মালে।

—সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

। । ॥ ॥ । । ॥ । । ॥

২। বরষার্ । নির্ঝরে ॥ অঙ্কিত । কায়্
দুই তীরে । গিরিমালা ॥ কত দূর্ । যায়্ !

—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

। । । । ॥ । । । । ॥ । ।

৩। এলায়ে জ । -টিল্ বক্র ॥ নির্ঝরের্ । বেণী
নীলাভ দি । -গন্তে ধায়্ ॥ নীল্ গিরি । -শ্রেণী।

—নিষ্ফল উপহার, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্ত-তিনটির অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত এক-এক জাতীয় স্বতন্ত্র ছন্দে রচিত। আবার এদের বাহ্য আকৃতির প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে ওই তিনটি দৃষ্টান্তই বহির্গঠনের দিক্ থেকে সম্পূর্ণরূপে এক। এদের অন্তরের গঠন বিভিন্ন, কিন্তু বাইরের গঠন অভিন্ন ; এরা আকৃতিতে সদৃশ হলেও প্রকৃতিতে বিসদৃশ। অর্থাৎ এদের ছন্দোবন্ধ এক হলেও ছন্দ স্বতন্ত্র।

প্রথমেই দেখা যাক উক্ত দৃষ্টান্ত-তিনটির প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায়। যে ধ্বনিসমাবেশের দ্বারা ছন্দ রচিত হয় সে ধ্বনির unitএর প্রকৃতির উপরেই ছন্দের প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যেরকম unit নিয়ে ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হব ছন্দের প্রকৃতি সে unitএর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। unit শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে আমি 'একক' বা 'ধ্বনিব্যষ্টি' কথা ব্যবহার করব। এখন দেখা যাক উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির unit বা ব্যষ্টির প্রকৃতিগত পার্থক্য কি।

প্রথম দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে যুগ্ম-অযুগ্ম-নির্বিশেষে চোদ্দটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্ আছে। শুধু তাই নয়, এর প্রতি পংক্তিপর্বেও ধ্বনিসংখ্যার সমতা রয়েছে।

কেননা এর প্রতি পর্বে চারটি করে ধ্বনি বা স্বর আছে, কেবল শেষ পর্বে দুটি করে। সুতরাং দেখা গেল এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে ধ্বনি, স্বর বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যাগত সমতার দ্বারাই এ ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সুতরাং এ ছন্দকে ধ্বনিসংখ্যাত বা স্বরসংখ্যাত ছন্দ বলতে পারি; সেজন্যেই এ ছন্দের নাম 'স্বরবৃত্ত'। দ্ব্যর্থতার আশঙ্কা রয়েছে বলেই 'ধ্বনিবৃত্ত' নাম দেওয়া নির্দোষ হবে না।

এবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির unit বা ধ্বনিব্যষ্টির প্রকৃতি নির্ণয় করা যাক। এ দৃষ্টান্তটিতে কিন্তু ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌কে ছন্দের unit বা ব্যষ্টি বলে ধরা যায় না; কারণ এ দৃষ্টান্তটির পর্বে পর্বে কিংবা পংক্তিতে পংক্তিতে ধ্বনিসংখ্যার সমতা নেই। কিন্তু কোনো কিছুর সমতা নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এ ছন্দই হতে পারত না। যে তত্ত্বের সমতার উপরে নির্ভর করে এ ছন্দ বর্তমান আছে তাকেই এ ছন্দের unit বলব। সে unitটি কি তাই দেখা প্রয়োজন। প্রথম দৃষ্টান্তটির মতো এ ছন্দে ধ্বনিগুলিকে যুগ্ম-অযুগ্ম-নির্বিশেষে গ্রহণ করা হয় নি। এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ মূল্য দেওয়া হয়েছে; কারণ যুগ্মধ্বনির উচ্চারণে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ সময় লাগে। অর্থাৎ এ ছন্দে অযুগ্মধ্বনি এক unit এবং যুগ্মধ্বনি দুই unit। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রমতে এই unitএর নাম হচ্ছে 'মাত্রা'। এই 'মাত্রা' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে *mora* কথাটা ব্যবহার করতে পারি। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এই unit বা মাত্রার অপর নাম হচ্ছে 'কলা'। এই 'কলা'কে ইংরেজিতে বলতে পারি metrical digit। এ দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে মাত্রা বা কলা আছে চোদ্দটি করে। শুধু তাই নয়, এর প্রতি পংক্তিপর্বেও মাত্রাসংখ্যার সমতা আছে; কেননা এর প্রতিপর্বেই চারটি করে মাত্রা আছে, কেবল শেষ পর্বে দুটি করে। সুতরাং দেখা গেল এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে মাত্রা বা কলা। মাত্রা বা কলার সংখ্যাগত সমতার দ্বারাই এ ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সুতরাং এ ছন্দকে মাত্রাসংখ্যাত বা কলাসংখ্যাত ছন্দ বলতে পারি। মাত্রাসংখ্যাকে আশ্রয় করে বর্তমান বলে এর নাম 'মাত্রাবৃত্ত'।

আমরা দেখলুম যে, প্রথম দৃষ্টান্তটির ছন্দ হচ্ছে স্বরবৃত্ত। এর প্রকৃতি হচ্ছে স্বরসংখ্যক বা syllabic। এ ছন্দকে ইংরেজিতে বলা যায় syllabic metre। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি স্বরসংখ্যক নয়, এটির প্রকৃতি হচ্ছে মাত্রিক।

অর্থাৎ এ ছন্দের প্রকৃতিবিচার করতে হবে ধ্বনির উচ্চারণকালের ব্যাপ্তি (duration) বা পরিমাণের (quantityর) দিক্ থেকে। সুতরাং এই মাত্রিক ছন্দকে ইংরেজিতে বলতে পারি quantitative metre।

এবার তৃতীয় দৃষ্টান্তটির ছন্দবিচার করা যাক। এ ছন্দ পুরোপুরি ধ্বনিসংখ্যকও (syllabic) নয়, মাত্রিকও (quantitative) নয়। এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি কি তাই আগে দেখা প্রয়োজন। যদি শুধু ধ্বনিসংখ্যার unit অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এর হিসাব রাখা যায় তা হলে এ ছন্দের সমতা পাওয়া যায় না। আবার যদি শুধু ধ্বনিপরিমাণ বা quantityর unit অর্থাৎ মাত্রার হিসাব রাখা যায় তা হলেও এ ছন্দের সমতাতত্ত্বের সন্ধান মিলবে না। কিন্তু কোথাও সমতা আছে নিশ্চয়ই অর্থাৎ কোনো একটা তত্ত্বের unitকে আশ্রয় করে এ ছন্দ বর্তমান রয়েছে। সকলেই জানেন যে, এ দৃষ্টান্তটি 'পয়ার' ছন্দে রচিত অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতি পংক্তিতে চোদ্দটি করে unit আছে। কিন্তু সেই unitগুলি কি ও কোন্ তত্ত্বের, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। উক্ত দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে চোদ্দটি সিলেব্‌ল্ নেই; সুতরাং সিলেব্‌ল্ এ ছন্দের unit নয়। অযুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা (mora) এবং যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রা ধরে এ ছন্দের প্রতি পংক্তিতে চোদ্দ মাত্রাও পাওয়া যাবে না। সুতরাং মাত্রাও এ ছন্দের unit নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এ ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি এক unit, কিন্তু শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি দুই unit বলে গণ্য হয়েছে; একস্বর (monosyllabic) শব্দের যুগ্মধ্বনিও দুই unit। এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের কায়দা। অর্থাৎ এ ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্তধর্মী এবং শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি মাত্রাবৃত্তধর্মী। এই হিসেবে দেখা যাবে, প্রত্যেক পর্বে চার unit এবং শেষ পর্বে দুই unit করে প্রতি পংক্তিতে চোদ্দ unit ঠিক আছে। অতএব এ ছন্দকে বলতে পারি 'যৌগিক' ছন্দ, কেননা স্বরবৃত্তের প্রকৃতি ও মাত্রাবৃত্তের প্রকৃতির যোগে এ ছন্দের উৎপত্তি। স্বরবৃত্তের unit হচ্ছে স্বর বা সিলেব্‌ল্, মাত্রাবৃত্তের unit হচ্ছে মাত্রা (mora) বা কলা। কিন্তু এই যৌগিক ছন্দের unitকে কি বলা যাবে? কিছুই বলা যায় না, কারণ যে জিনিসটা আসলেই দুটি বিভিন্ন পদার্থের যোগে উৎপন্ন তার মূল উপাদানকে তো কোনো একটি বিশেষ নাম দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু একটা নাম দেওয়া চাই, কেননা তা না হলে এ ছন্দের unit নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা চলবে কি

করে? তাই এই যৌগিক ছন্দের unitকে নাম দেওয়া যাক 'অক্ষর'; কেননা লৌকিক কায়দায় এই পয়ার ছন্দকে চোদ্দ 'অক্ষরে'র ছন্দই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, এই 'অক্ষর' জিনিসটা ব্যাকরণের বর্ণ বা letter নয়, সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের 'অক্ষর' বা সিলেব্‌ল্‌ও নয়। এটি হচ্ছে বাংলায় প্রচলিত অর্থের একটা অদ্ভুত জিনিস—কখনও letter, কখনও syllable। যেমন 'জটিল' শব্দের জ এবং টি এই ছুটি সিলেব্‌ল্‌ও এক-একটি অক্ষর আর হসন্ত ল্‌-ও একটি অক্ষর। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই যৌগিক পয়ার ছন্দে চোদ্দ 'অক্ষর' না থাকলেও চোদ্দ unit ঠিক থাকতে পারে এবং চোদ্দ 'অক্ষর' ঠিক থাকলেও চোদ্দ unitএর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কারণ এক-একটি অক্ষর সকল সময় এক-একটি unitএর প্রতীক নয়। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি (বিচিত্রা, মাঘ); এ স্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যা হক, প্রচলিত প্রথায় অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই 'পয়ারজাতীয়' ছন্দের হিসাব রাখা হয় বলে এইসব যৌগিক ছন্দকে বিকল্পে 'অক্ষরবৃত্ত' নামেও অভিহিত করা যায়।

৩

এবার উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্ত-তিনটিতে যুগ্মধ্বনিগুলির উচ্চারণপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ করা যাক। প্রথম অর্থাৎ স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মধ্বনিগুলির উচ্চারণ আয়ত নয়, অর্থাৎ এদের উচ্চারণকাল অযুগ্মধ্বনিগুলির দ্বিগুণ নয়। কেননা স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে একটু ঠেসে উচ্চারণ করে অযুগ্মধ্বনির প্রায় সমান করে দেওয়া হয়। তাই এ ছন্দে মোটের উপর যুগ্ম ও অযুগ্মধ্বনিকে প্রায় সমান মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ আয়ত এবং ব্যাপ্তি বা পরিমাণের দিক্ থেকে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ। তাই এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে সব সময়ই একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

তখন তাদের । চতুর্দিকেই ॥ রাত্রিবেলার । প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার । পথিক-মতো
মন্দগমন । ছন্দে লুটায় ॥ মন্থর কোন্‌ । ক্লান্ত বায়ে;
বিহঙ্গগান । শান্ত তখন ॥ অন্ধ রাতের । পক্ষছায়ে।

—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটিকে কি ছন্দ বলব? এ দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পর্বেই ছুটি করে যুগ্মধ্বনি আছে, কেবল প্রতি পংক্তির অন্তিম পর্বগুলিতে যুগ্মধ্বনি আছে একটি করে।

যদি এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে স্বরবৃত্তের কায়দায় একটু ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করি তা হলে এটি হবে চতুঃস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ। কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে মাত্রাবৃত্তের কায়দায় একটু টেনে আয়তভাবেও উচ্চারণ করতে পারি; তা হলে কিন্তু এটিকে আর স্বরবৃত্ত ছন্দ বলা যাবে না; তখন এটিকে বলতে হবে ষণ্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যেসব ছন্দকে এমনি করে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় কায়দাতেই পড়া যায় অর্থাৎ যেসব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় প্রকৃতিই যুগপৎ বিদ্যমান থাকে সেসব ছন্দকে আমি **স্বরমাত্রিক** নামে অভিহিত করেছি। উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটিকেও তাই স্বরমাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করতে পারি। তা হলে এ ছন্দটির নাম হবে চতুঃস্বরষণ্মাত্র-পর্বিক ছন্দ। যা হক, বর্তমান প্রসঙ্গে স্বরমাত্রিক ছন্দ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান ধারায় যুগ্মধ্বনির উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করছিলুম। আমরা দেখেছি স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ আয়ত। যৌগিক অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কিরূপ তা লক্ষ করলেই এ ছন্দের যথার্থ প্রকৃতিটি বোঝা যাবে। পূর্বেই দেখেছি, এ ছন্দে প্রত্যেক শব্দের (wordএর) শেষ ধ্বনিটি মাত্রিক (quantitative) প্রকৃতির, আর অন্য অংশের ধ্বনিগুলি স্বরবৃত্ত (syllabic) প্রকৃতির। কাজেই এ ছন্দে প্রত্যেক শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনিটিকে মাত্রাবৃত্তের কায়দায় টেনে আয়তভাবে উচ্চারণ করতে হয়; আর শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে স্বরবৃত্তের ভঙ্গিতে ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করতে হয়। তাতেই এ ছন্দে ধ্বনির সমতা রক্ষা হয়। নতুবা, অর্থাৎ এই যৌগিক ওরফে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সমস্ত যুগ্মধ্বনিকেই যদি একই কায়দায় আয়ত বা সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করা হয়, তা হলে এ ছন্দের ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হবে না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

| | ‖ | ‖ ‖

শুধ্ বৈকুণ্ঠের্ তরে। বৈষ্ণবের্ গান্ ?

—বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এই 'পয়ারে'র পংক্তিটিতে ধ্বনি (syllable) আছে সবসুদ্ধ এগারটি। তার মধ্যে অযুগ্মধ্বনি পাঁচটি, কোনো চিহ্নের দ্বারা এরা নির্দিষ্ট নয়। আর বাকি ছ'টি ধ্বনিই যুগ্ম; যথা—বৈ, কুণ্, ঠের্, বৈষ্, বের্ এবং গান্। কিন্তু এ ছন্দে এই ছ'টি যুগ্মধ্বনির উচ্চারণপ্রকৃতি ও মর্যাদা সমান নয়। যদি স্বরবৃত্তের

পদ্ধতিতে যুগ্মধ্বনিগুলিকে ঠেসে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করে এক-এক unit বলে গণ্য করা যায় তবে এ পংক্তিটিতে মোট এগারটির বেশি unit বা ব্যষ্টি পাওয়া যাবে না। আবার যদি এগুলোকে মাত্রাবৃত্তের রীতিতে টেনে আয়ত উচ্চারণ করা যায় অর্থাৎ যদি যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয় তা হলে এ পংক্তিটিতে unitএর সংখ্যা বেড়ে সতের হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত কোনো পদ্ধতিতেই এ পংক্তিটিতে পয়ারের চোদ্দ unit পাওয়া যাবে না। আসল কথা এই যে, এখানে শব্দের মধ্যবর্তী তিনটি যুগ্মধ্বনিকে (বৈ, কুণ্ এবং বৈব্) স্বরবৃত্তের প্রথায় ঠেসে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করে এক unit বলে গণ্য করা হয়েছে। আর শব্দের প্রান্তবর্তী তিনটি যুগ্মধ্বনিকে (ঠের্, বের্ এবং গান্) মাত্রাবৃত্তের প্রথায় টেনে আয়ত উচ্চারণ করে দুই unit বলে ধরা হয়েছে। তাই এ পংক্তিটিতে সবসুদ্ধ ৫ (অযুগ্ম)+৩ (শব্দমধ্যবর্তী যুগ্ম)+ ৩×২ (শব্দপ্রান্তবর্তী যুগ্ম)=১৪ unit আছে। তাই এ পংক্তিটির ধ্বনি-সমতা ও ছন্দ অব্যাহত আছে, এ পংক্তিটিতে চোদ্দটি তথাকথিত 'অক্ষর' আছে বলেই নয়। যুগ্মধ্বনির স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির যোগে গঠিত বলেই এ ছন্দকে 'যৌগিক' ছন্দ বলেছি। এ ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির যে আয়ত বা দ্বিমাত্রক উচ্চারণ, তার প্রমাণ 'বৈকুণ্ঠের তরে' কথাটার মধ্যে 'কুণ্' এবং 'ঠের্' অংশ দুটির তুলনা করলেই পাওয়া যায়। 'কুণ্' অংশটাকে আমরা সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করি; আর 'ঠের্' অংশটাকে উচ্চারণ করি বিশ্লিষ্টভাবে, যেন 'বৈকুণ্ঠের' এবং 'তরে' এই দুটি স্বতন্ত্র শব্দের স্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকে। আবার যৌগিক ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে যে ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করা হয়, নীচের পংক্তিটিকে বিশ্লেষণ করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।—

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি ॥ সুরেন্দ্রবন্দিতা

—উর্বশী. চিত্রা. রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিটিকে আবৃত্তি করার ধ্বনি অর্থাৎ এর পয়ারজাতীয় ধ্বনি সকলেরই পরিচিত। পংক্তিটিতে যুগ্মধ্বনি আছে মোট ছ'টি। যথা—কুন্, শুভ্, নগ্, কান্, রেন্ এবং বন্। আর এই সবগুলিই শব্দের মধ্যবর্তী। এই ছ'টি যুগ্মধ্বনিকেই যে আমরা পয়ারের স্বাভাবিক প্রথায় ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করি এবং একটিমাত্র unitএর মর্যাদা দিই তার প্রমাণ এই যে, যদি এই ছ'টি যুগ্মধ্বনিকে

আমরা আয়তভাবে উচ্চারণ করে দুই unitএর মূল্য দিতুম তা হলে এ ছন্দ আর পয়ারই থাকত না; সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির ছন্দে পরিণত হত। এই ছ'টি যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করলে এ ছন্দটার প্রকৃতি হত এ-রকম।—

॥ । ॥ । ॥ । ॥ । । ॥ । ॥ । ।

কুন্দ শুভ্র। নগ্নকান্তি ॥ সুরেন্দ্রবন্। -দিতা

অর্থাৎ তা হলে এ ছন্দটি আর চোদ্দ unitএর পয়ার না থেকে ৬+৬+৬+২ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হয়ে দাঁড়াত। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি উচ্চারণভঙ্গির উপরে ছন্দ বিশেষভাবে নির্ভর করে। এক ভঙ্গিতে পড়লে উদ্ধৃত পংক্তিটির ছন্দ হবে যৌগিক; অন্য ভঙ্গিতে পড়লে তার ছন্দ হবে মাত্রিক।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পয়ারসম্প্রদায়ের বাইরে নির্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ চলে না। আমাদের আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, 'পয়ার'-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ 'নির্বিচার' নয়। পয়ারসম্প্রদায়ের মধ্যেও যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে এবং কবিরা স্বাভাবিক ছন্দবোধের দ্বারা চালিত হয়ে একপ্রকার অজ্ঞাতসারেই ওই নিয়ম পালন করে থাকেন। অর্থাৎ এই নিয়মটি তাঁদের কাছে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত না হলেও তাঁদের রচনার মধ্যে ওই নিয়মটি নিগূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে।

আশা করি বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান ধারার প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায় তা পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। ধ্বনির দুই রকমের unit নিয়ে দুই রকম ছন্দ (স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত) গঠিত হয় এবং ওই দুই রকম unitএর বিশেষ একপ্রকার সমাবেশের দ্বারা আর-একটি যৌগিক ছন্দ উৎপন্ন হয়। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের উপরে স্বরবৃত্ত প্রতিষ্ঠিত এবং মাত্রাবৃত্ত নিয়ন্ত্রিত হয় যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা। আর যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট, এই দুই রকমের উচ্চারণের একটি বিশেষ সমাবেশের দ্বারা বাংলা ছন্দের তৃতীয় ধারার অর্থাৎ যৌগিক বা তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গঠিত হয়।

। ॥ । ॥ । ।

বাক্য তাব্। অনর্গল্ ॥ মল্লসজ্জা। -শালী।

। । । ॥ ॥ ।

তর্কযুদ্ধে। উগ্র তেজ্ ॥ শেষ্ যুক্তি। গালি।

এই পংক্তি-দুটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যেখানে সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না, এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষায় কোনো ছন্দে এ-রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে বলে আমি তো জানি নে।"—পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ। তাঁর এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই যে অসামান্যতা, এর কৌশলটা কোন্‌খানে এ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যতিস্থাপনের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই এ ছন্দের ভারসামঞ্জস্য হয়ে থাকে। এ ছন্দে যতিস্থাপনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা এর প্রকৃতি অন্য ছন্দের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যতিস্থাপনের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এর ভার-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না; সে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় যুগ্মধ্বনির বিচিত্র ব্যবহারের দ্বারা। উপরের দৃষ্টান্তটির প্রতি মনোযোগ দিলেই এ কথাটি বোঝা যাবে। এখানে যুগ্মধ্বনি আছে বারটি—আটটি শব্দ মধ্যবর্তী (অযুগ্মদণ্ড চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট), এবং চারটি শব্দপ্রান্তবর্তী (যুগ্মদণ্ড চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট)। ওই আটটি যুগ্মধ্বনিকে আমরা সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করি এবং বাকি চারটি যুগ্মধ্বনিকে আমরা বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করে পরবর্তী শব্দ থেকে পূর্ববর্তী শব্দের বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করে থাকি। তাই পয়ার ছন্দ অসমান ভার বহন করেও সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে না।

৪

পূর্বেই বলেছি বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান ধারা প্রকৃতিতে পৃথক্ হলেও আকৃতিতে সদৃশ হতে পারে। অর্থাৎ তিনটি স্বতন্ত্র রচনা ছন্দপ্রকৃতির দিক্ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও ছন্দোবন্ধের দিক্ থেকে সম্পূর্ণরূপে এক বা সদৃশ হতে পারে। পূর্বে (পৃ ৩৮১) যে তিনটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছি সেগুলির বাহ্য আকৃতি অর্থাৎ বহির্গঠনের প্রতি লক্ষ করলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হবে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। দূর প্রবাসে। সন্ধ্যাবেলায় ॥ বাসায় ফিরে। এনু,
হঠাৎ যেন। বাজল কোথায় ॥ ফুলের বুকের। বেণু।

—চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

২। আমি তব। জীবনের ॥ লক্ষ্য তো। নহি,
ভুলিতে ভু। -লিতে যাবে, ॥ হে চির বি। -রহী।

মার্জনা । করো যদি ॥ পাব তবে । বল,
করুণা ক । -রিলে নাহি ॥ ঘোঁচে আঁখি । -জল।

—দায়মোচন, মহুয়া রবীন্দ্রনাথ

৩। প্রাণ দিয়ে, । দুঃখ সয়ে, ॥ আপনার । হাতে
সংগ্রাম ক । -রিতে দাও ॥ ভালোমন্দ । -সাথে।

—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্ত-তিনটি স্বতন্ত্র ছন্দে রচিত। কেননা তিনটি দৃষ্টান্তে ধ্বনির unit বিভিন্ন রকমের। প্রথমটির ছন্দ-স্বরবৃত্ত, এখানে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়টির ছন্দ মাত্রাবৃত্ত, এখানে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট। তৃতীয়টির ছন্দ যৌগিক, কেননা এখানে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কোথাও সংশ্লিষ্ট কোথাও বিশ্লিষ্ট। এই তিনটি দৃষ্টান্তের unitএর ধ্বনিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের ; সুতরাং এদের ছন্দপ্রকৃতিও বিভিন্ন।

ধ্বনির অন্তঃপ্রকৃতির তরফ থেকে উক্ত দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ সম্পূর্ণ পৃথক্ বটে ; কিন্তু ধ্বনিসন্নিবেশের বাহ্য আকৃতি বা বহির্গঠনের তরফ থেকে এই দৃষ্টান্তগুলি সম্পূর্ণরূপেই এক ধরণের। কারণ প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তির ব্যষ্টি-সংখ্যা চোদ্দ। এদের মধ্যে যে শুধু পংক্তিগঠনেরই সাদৃশ্য আছে তা নয় ; প্রতি পর্বের আকৃতি এবং গঠন বিষয়েও এদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কারণ প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের প্রতি পর্বে চারটি করে ধ্বনিব্যষ্টি বা unit আছে, কেবল শেষ পর্বে দুটি করে। ছন্দগঠনের এই বাহ্য আকৃতিকে বলেছি ছন্দোবন্ধ। সুতরাং দেখা গেল এ দৃষ্টান্তগুলির ছন্দের প্রকৃতি পৃথক্ হলেও আকৃতি একই। অর্থাৎ এদের ছন্দ বিভিন্ন হলেও ছন্দোবন্ধ অভিন্ন।

যে ছন্দোবন্ধে প্রথম তিন পর্বে চারটি করে ব্যষ্টি এবং শেষ পর্বে দুটি ব্যষ্টি থাকে, সে ছন্দোবন্ধকে প্রচলিত প্রথায় বলা হয় 'পয়ার'। সুতরাং ছন্দোবন্ধ হিসেবে উপরের তিনটি দৃষ্টান্তকেই 'পয়ার' বলতে পারি। কিন্তু ছন্দ হিসেবে এরা বিভিন্ন প্রকৃতির। সুতরাং ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ উভয় দিক্ থেকে এ দৃষ্টান্তগুলির নাম হবে যথাক্রমে—স্বরবৃত্ত পয়ার, মাত্রাবৃত্ত পয়ার এবং যৌগিক পয়ার। এই যৌগিক পয়ারকেই প্রচলিত প্রথায় শুধু পয়ার বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে স্বরবৃত্ত পয়ারকে 'প্রাকৃত পয়ার' এবং যৌগিক পয়ারকে 'সাধু পয়ার' বলতে পারি। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত পয়ার বা মাত্রিক পয়ারকে তিনি কি

বলবেন জানি নে। ইংরেজিতে এই তিনজাতীয় পয়ারকে যথাক্রমে syllabic (স্বরসংখ্যক), quantitative (মাত্রিক) এবং mixed (যৌগিক) পয়ার বলতে পারি।

শুধু পয়ার নয়, প্রায় সব ছন্দোবন্ধের তরফ থেকে এই তিনটি ছন্দ বাহ্য আকৃতিতে সদৃশ হতে পারে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। তেমনি করে। যখন কভু ॥ আমার পানে। চাবে
মর্মভেদী। কৌতূহলের। আঁখি,
বিধাতা যা লুকান লাজে দেখতে যে তাই পাবে
মোর রচনায় যা আছে তাঁর বাকি।

—ছায়ালোক, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

২। বন্ধু, তো। -মার পথ ॥ সম্মুখে। জানি,
পশ্চাতে। আমি আছি। বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।

—দায়মোচন, ঐ, ঐ

৩। তোমার আ। -পন কোণে ॥ স্তব্ধ করি। যবে
পূর্ণরূপে। দেখি না তো। -মায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।

—মুক্তরূপ, ঐ, ঐ

এই দৃষ্টান্ত-তিনটি যে তিনটি স্বতন্ত্র ছন্দে রচিত তা আবৃত্তি করার সময় এদের উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের প্রতি এবং বিশেষ করে এদের যুগধ্বনিগুলির তিনটি বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ করলে অতি অনায়াসেই টের পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্তরের প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র হলেও বাইরের গঠনপ্রণালীতে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ হিসেবে এরা সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। ছন্দ হিসেবে দৃষ্টান্ত-তিনটি যথাক্রমে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দে রচিত। কিন্তু ছন্দোবন্ধ হিসেবে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেরই প্রথম ও তৃতীয় পংক্তি পয়ার আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি খণ্ডিত বা একোনপর্বিক পয়ার। কারণ প্রত্যেক দৃষ্টান্তেই প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে তিনটি পূর্ণপর্ব ও একটি অর্ধপর্ব আছে; আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে দুটি

পূর্ণপর্ব ও একটি অর্ধপর্ব আছে। পর্বগঠনের প্রণালীতেও ওই তিনটি দৃষ্টান্তের ছন্দোবন্ধ অভিন্ন; কেননা তিনটিতেই প্রতি পর্বে চারটি করে ধ্বনিব্যষ্টি বা unit আছে। কিন্তু তিনটি দৃষ্টান্তের এই unit বা ধ্বনিব্যষ্টি তিনটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ ধ্বনিব্যষ্টির প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলেই তো ওই তিনটি শ্লোককে তিনটি ছন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্‌ধৃত করা হয়েছে।

আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

১। আজকে নবীন চৈত্রমাসে
পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা,
আজ জেগেছে যেসব ব্যথা
এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।

—৩৮, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

২। বুঝিয়াছি অনুভবে
বনমর্মর-রবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

—অদেখা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

৩। বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
ছুটিল সকল তার লজ্জা।

—মাধবী, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্ত-তিনটির বিশ্লেষণ করা অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ছন্দ হিসেবে এগুলি পৃথক বটে, কিন্তু ছন্দোবন্ধ হিসেবে এক। ছন্দের দিক্

থেকে এই দৃষ্টান্তগুলি যথাক্রমে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক ছন্দে রচিত; কিন্তু ছন্দোবন্ধের দিক্‌ থেকে এরা সকলেই দীর্ঘ ত্রিপদী। প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেরই তিনটি 'পদে' যথাক্রমে আট, আট ও দশটি করে ধ্বনিব্যষ্টি বা unit আছে, শুধু মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তটির তৃতীয় পদে একটি করে ব্যষ্টি বেশি আছে। যা হক, এই দৃষ্টান্ত-তিনটিকে যথাক্রমে স্বরবৃত্ত ত্রিপদী, মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী ও যৌগিক ত্রিপদী নামে অভিহিত করতে পারি।

আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হয়েছে আশা করি তার থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলা পদ্যের ছন্দ পৃথক্‌ হলেও ছন্দোবন্ধ একই রকম হতে পারে। বাংলা পদ্যের ছন্দ প্রধানতঃ ত্রিবিধ এবং ছন্দোবন্ধব হুবিধ। কিন্তু ওই বহুবিধ ছন্দোবন্ধের প্রায় প্রত্যেকটিকেই ওই ত্রিবিধ ছন্দেই প্রয়োগ করা যায়।

৫

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। যৌগিক ত্রিপদী ছন্দ বাংলা সাহিত্যে বহুকাল যাবৎই প্রচলিত আছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে স্বরবৃত্ত ত্রিপদী ছন্দের প্রবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর তাঁরই হাতে এ ছন্দটি চরম পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী ছন্দের অভাবটা খুব বেশি অনুভব করি। আমাদের আধুনিক কবিতায় এ ছন্দের বিরলতাটা বিশেষ লক্ষ করার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্য-সাহিত্যের মধ্যেও এজাতীয় ছন্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব কম। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে মাত্রাবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদীর আর-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্‌ধৃত করছি।—

যেখানে সে বুড়া বট
নামায়ে দিয়েছে জট,
        ঝিল্লি ডাকিছে দিনে দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে
বনদেবতারা নাচে
        চাঁদিনিতে রুনুঝুনু নূপুরে।

—ঘুমচোরা. শিশু, রবীন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্তটিতে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি অর্থাৎ যুক্তবর্ণ আছে মাত্র একটি। কিন্তু

যুগ্মধ্বনির প্রাচুর্যের দ্বারা এ ছন্দে ধ্বনির যে চমৎকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ওগো বধূ সুন্দরী
নব মধু মঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন,—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন।

—বধূমঙ্গল, প্রবাসী ১৩৩১ ভাদ্র, রবীন্দ্রনাথ

এ রচনাটি 'মহুয়া'তে স্থান পায় নি কেন বুঝতে পারলুম না। যা হক, আমার বিশ্বাস যৌগিক ত্রিপদী ছন্দ যেমন গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপযোগী, মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দ তেমনি গীতিকবিতার অতি সুন্দর বাহন।

আর বাংলায় মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দ রচনা করাও কিছু শক্ত নয়, এমন কি যৌগিক ত্রিপদীতে যেসব কবিতা রচিত হয়েছে সেগুলিকেও অতি অনায়াসেই মাত্রিক ত্রিপদীতে রূপান্তরিত করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। একটু পূর্বে 'মহুয়া' থেকে যে যৌগিক ত্রিপদীটি উদ্ধৃত করেছি সেটিকে অতি সহজেই নিম্নলিখিতরূপে মাত্রিক আকারে পরিবর্তিত করা যায়।—

বসন্ত-জয়রবে
দিগন্ত কাঁপে যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলবন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
টুটিল সকল তার লজ্জা।

পাঠক 'মহুয়া'র যৌগিক ত্রিপদীটির উচ্চারণধ্বনির সঙ্গে এই পংক্তি-ক'টির তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন, একটির ধ্বনি গুরুগম্ভীর আর-একটির ধ্বনিতে রয়েছে গীতিকবিতার সুর। বস্তুতঃ বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে আদি ও মধ্য যুগে এ ছন্দটিই ছিল আমাদের গীতিকবিতার প্রধান বাহন। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রথম দিকে এ ছন্দটি আমাদের কাব্যসাহিত্য থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের আজকালকার কবিরা

আবার এ ছন্দটিকে আদর করতে শুরু করেছেন এবং তার ফলে এ ছন্দটি আবার নবতনরূপে ও বিচিত্র ভঙ্গিতে আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। এ স্থলে আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। রবীন্দ্রনাথের চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দ অর্থাৎ মাত্রিক (quantitative) পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে বারান্তরে এ বিষয়ের বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

৬

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এই মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দটির উৎপত্তি ও পরিণতির ধারাটি অতি বিচিত্র ও ঔৎসুক্যজনক। বাংলা ছন্দের ইতিহাস যখন লিখিত হবে তখন এ ছন্দটি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সে আলোচনার স্থান এটা নয়। এ স্থলে আমি এ ছন্দটির গীতিকবিতার উপযোগিতা সম্বন্ধে আর একটিমাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। পূর্বেই বলেছি বাংলা কাব্যের আদি ও মধ্য যুগে এ ছন্দটি ছিল গীতিকবিতার একটি প্রধান বাহন এবং প্রাচীন বাঙালি কবিদের একটি বিশেষ আদরের বস্তু। তার প্রথম পরিচয় পাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে। যথা—

চন্দন। -চর্চিত ॥ -নীলক। -লেবর ॥ -পীতব। -সনবন। -মালী।
কেলিচ। -লমণি ॥ -কুণ্ডল। -মণ্ডিত ॥ -গণ্ডযু। -গস্মিত। -শালী ॥

—গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, চতুর্থ গীত

এ ছন্দটি আসলে চার মাত্রার সাতটি পর্বের যোগে উৎপন্ন হয়েছে। প্রতি পর্বে চার মাত্রা করে সাত পর্বে মোট আটাশ মাত্রা আছে। তাই অনেক সময় এ ছন্দকে আটাশ মাত্রার ছন্দও বলা হয়। কিন্তু শুধু আটাশ মাত্রার ছন্দ বললে এ ছন্দের আসল রূপটির কথাই বলা হয় না। এর আসল রূপটি নির্ভর করছে এর পর্ববিভাগ ও যতিস্থাপনরীতির উপরে। একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যাবে, উভয় পংক্তিতেই প্রতি পর্বের পরেই একটি করে ঈষদ্‌যতি রয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বের পর যতিটা একটু অধিকতর স্থায়ী, আর পংক্তির শেষের যতিটা পূর্ণবিরামসূচক। এই তিন রকম যতিকে যথাক্রমে ঈষদ্‌যতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতি বলতে পারি। একটি ছেদচিহ্নের দ্বারা ঈষদ্‌যতি আর যুগ্ম ছেদচিহ্নের দ্বারা অর্ধযতির নির্দেশ করেছি। ঈষদ্‌যতির দ্বারা নির্দিষ্ট এক-একটি অংশকে বলব এক-একটি 'পর্ব'; আর অর্ধযতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশকে বলব এক-একটি 'পদ'। উদ্ধৃত শ্লোকটিতে

এ-রকম পদ আছে তিনটি, প্রথম ও দ্বিতীয় পদে পর্ব আছে দুটি করে এবং তৃতীয় পদে পর্ব আছে তিনটি। সুতরাং ঈষদ্‌যতির বিভাগের দিক্ থেকে এ ছন্দকে বলব সপ্তপর্বিক। আর অর্ধযতির বিভাগের তরফ থেকে এ ছন্দ হচ্ছে ত্রিপদী। যদি একটি করে অতিরিক্ত মিল দিয়ে প্রতি পংক্তির অর্ধযতি-দুটিকে কানের কাছে আরও স্পষ্ট করে তোলা যায় তা হলেই এ ছন্দের ত্রিপদী রূপটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ-রকম পদে পদে মিল দেওয়া সুস্পষ্ট ত্রিপদীর দৃষ্টান্তও গীতগোবিন্দে আছে। যথা—

মুখরমধীরং
ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং
সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্॥

—গীতগোবিন্দ, পঞ্চমসর্গ, একাদশ গীত

বাংলা কাব্য রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের গানগুলিতেও এই মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়।—

রাউতু ভণই কট ॥ ভুসুকু ভণই কট ॥ সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া ॥ অচ্ছসি ভান্তী ॥ পুচ্ছ তু সদ্‌গুরু-পাব ॥

—চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ৪১

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতেও এ ছন্দের প্রচুর নিদর্শন আছে। তাঁদের কাছে এ ছন্দটি খুবই আদর পেয়েছিল। গোবিন্দদাসের পদাবলী থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গৌরবরণ তনু ॥ শোহন মোহন ॥ সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণকি ॥ -রণ জিনি অম্বর ॥ সুন্দর চারু বয়ান ॥
ভাবহি ভোর ॥ ঘোর দুহু লোচন ॥ মোচন ভবনদ-বন্ধ।
নব নব প্রেমভর ॥ বরতনু সুন্দর ॥ উয়ল ভকতজন-সঙ্গ ॥

রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলীতে'ও এ ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। লক্ষ করার বিষয় আদিযুগের বৌদ্ধ পদাবলী এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাতে গীতগোবিন্দের ত্রিপদীর অনুসরণ করে

সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র সে চেষ্টা সফল হয় নি। উপরের দৃষ্টান্ত-দুটি আমি এমনভাবে বেছে উদ্ধৃত করেছি যেন এ দুটিতে সংস্কৃত উচ্চারণপদ্ধতি যথাসম্ভব কম লঙ্ঘিত হয়। এ হিসাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আদি ও মধ্য যুগের কাব্যসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশ মাত্রিক ছন্দেই সংস্কৃত উচ্চারণপদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে; ছন্দরক্ষা করে আবৃত্তি করতে গেলে কোথাও হ্রস্বকে দীর্ঘ আর কোথাও দীর্ঘকে হ্রস্ব উচ্চারণ করতে হয়। এরূপ হবার কারণ এই যে, বাংলায় সংস্কৃতপদ্ধতির হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ চালাবার চেষ্টাই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি সংস্কৃত উচ্চারণের বিরুদ্ধধর্মী; বাংলার ধাতুতে সংস্কৃত উচ্চারণ বরদাস্ত হয় না। তাই দেখতে পাই পদাবলী সাহিত্যে সংস্কৃতের উচ্চারণরীতি এত ঘন ঘন খণ্ডিত হচ্ছে। তার মানে এই যে, ওই সাহিত্যে সংস্কৃত পদ্ধতি ও বাংলার স্বকীয় পদ্ধতির মধ্যে একটা বিরোধ চলছে এবং বহু স্থলেই বাংলা পদ্ধতি সংস্কৃতকে অতিক্রম করে আপন প্রাধান্য ঘোষণা করছে। তার পরে ক্রমে যখন বাংলা উচ্চারণের নিকট সংস্কৃত সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হল তখন বাংলা সাহিত্যে মাত্রিক ত্রিপদী বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তার স্থানে যৌগিক বা তথাকথিত দীর্ঘ ত্রিপদী দেখা দিল, অর্থাৎ তখন আট-আট-বার মাত্রার ত্রিপদীর স্থলে আট-আট-দশ 'অক্ষরের' ত্রিপদীর প্রচলন হল। বোধ করি 'মাত্রিক' ত্রিপদীর এই 'আক্ষরিক' রূপান্তর অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের হাতে পূর্ণতা লাভ করেছিল। সে সময় থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আক্ষরিক দীর্ঘ ত্রিপদীরই একাধিপত্য চলল। অবশেষে বাংলা ছন্দে রেনেসাঁস-এর প্রবর্তক ছন্দস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র যুগে আবার বাংলায় মা[illegible] করেন (১৮৮৮)। যথা—

তোমারে ঘেরিয়া ফেলি
কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত পবন?

—কবির প্রতি নিবেদন, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

মানসীর যুগেই তিনি খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে 'আক্ষরিক' ত্রিপদীকে 'মাত্রিক' রূপ দেবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর এই প্রথম প্রয়াস সফল হয় নি। কেন

হয় নি, এবং অবশেষে কিরূপে বহু পরীক্ষার পর বাংলার প্রাচীনতম মাত্রিক ত্রিপদীটি বিংশ শতাব্দীর ছন্দরেনেসাঁস্-এর ফলে আবার নবতন রূপ ধারণ করেছে, সে কথা বারান্তরে বিশদরূপে দেখাতে চেষ্টা করব। বর্তমান কালে এই মাত্রিক ত্রিপদীর নবীনতম ও খাঁটি বাংলা রূপ কেমন হয়েছে, দুটি দৃষ্টান্তযোগে তা দেখিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

১। অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকরগুঞ্জিত

উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া॥

—বরযাত্রা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

২। মধুকরপদভর ॥ -কম্পিত চম্পক ॥ অঙ্গনে ফোটে নি কি আজো ?…
বন্দনসংগীত ॥ -গুঞ্জনমুখরিত ॥ নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ॥

—প্রত্যাশা ২৫, প্রবাহিণী, রবীন্দ্রনাথ

বিচিত্রা ১৩৩৯ শ্রাবণ

স্বরবৃত্ত ছন্দের আইন-কানুন

বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান ধারার মধ্যে স্বরবৃত্ত অন্যতম এবং যদিও এ ছন্দটির উৎপত্তি অতি প্রাচীন কালেই হয়েছিল তথাপি বাংলা কাব্যসাহিত্যের আসরে এর আবির্ভাব হয়েছে সকলের শেষে। হালকা ভাবের কবিতার বাহন হিসেবে এর ব্যবহার ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় দেখা যায়। তার আগেও রামপ্রসাদের গানে এর যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও প্রথমে শুধু ছড়াজাতীয় কবিতায় এ ছন্দ ব্যবহার করতেন। 'ক্ষণিকা'র যুগেই তিনি এ ছন্দটিকে নানা ভঙ্গিতে প্রয়োগ করে এর যথার্থ শক্তি আবিষ্কার করেন। তার পর 'উৎসর্গে' এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে তিনি এটিকে অতি উচ্চ ভাবের কবিতায় ও গানে বহুল রূপে ব্যবহার করেছেন এবং এ ছন্দটিকে কত বিবিধ ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করা যায় তাও দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রনাথের হাতে এ ছন্দটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। আর, এই তিন জনই দেখিয়েছেন এ ছন্দের প্রকৃতিটি আসলে হচ্ছে syllabic ; অর্থাৎ সিলেব্‌ল্ বা স্বরই এ ছন্দের মূল উপাদান। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' গ্রন্থের ভূমিকা (১৩১৪), বিজয়চন্দ্রের 'কবিতার ভাষা ও ছন্দ' (প্রবাসী ১৩২২ অগ্রহায়ণ) এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী' (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ) দ্রষ্টব্য। তাঁরা আরও স্বীকার করেছেন যে, এই ছন্দটিতেই বাংলা ভাষার উচ্চারণরূপ সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে। বাংলা ছন্দের অপর দুই ধারায় অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক (অর্থাৎ তথাকথিত 'অক্ষর'-বৃত্ত) ছন্দে বাংলা ভাষার যথার্থ উচ্চারণরূপটি বজায় থাকে না। বোধ করি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। —সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ।

স্বরবৃত্ত ছন্দটি যে আসলে syllabic অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-সংখ্যার উপরেই নির্ভর করে সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। —বিচিত্রা ১৩৩৭ ভাদ্র। ইংরেজি ছন্দও প্রধানতঃ সিলেব্‌ল্ নিয়েই গঠিত। কাজেই এ স্থলে ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের তুলনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইংরেজি ছন্দও আসলে

syllabic কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে ও ছন্দ আসলে accentual, অর্থাৎ উচ্চারণের accent মানে ঝোঁক নিয়েই ও ছন্দের স্বরূপ; আবার অন্য মতে ইংরেজি ছন্দ মূলতঃ quantitative বা মাত্রিক। বাংলা ছন্দের স্বরূপ নিয়েও এরূপ মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে।

পূর্বেই বলেছি দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতে এ ছন্দটি সিলেব্‌ল্‌-এর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ ছন্দেরও মাত্রিক দিক্‌টাকেই মুখ্য বলে মনে করেন। আবার তৃতীয় মতে এক্‌সেণ্ট বা উচ্চারণের ঝোঁকই এ ছন্দের মূল কথা। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, এ ছন্দের syllabic প্রকৃতিটাই এর মুখ্য কথা এবং এর মাত্রিক দিক্‌টা গৌণ হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। আর মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক ছন্দের চেয়ে যে এ ছন্দে accentএর রূপটি অধিকতর আত্মপ্রকাশ করেছে সে বিষয়েও সন্দেহ করা চলে না।

ইংরেজি ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধু syllableকে আশ্রয় করে ও ছন্দের মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ মেলে না; শুধু accentএর প্রতি লক্ষ রেখেও সর্বদা বা সর্বত্র ও ছন্দের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আর, মাত্রা বা quantityর প্রতি লক্ষ রেখে ও ছন্দের বিশ্লেষণ করতে গেলে মাত্রার একটি স্থির মূল্য রক্ষা করা যায় না। বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধেও এ কথা অনেকটা খাটে। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বের সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা সর্বত্র সমান নয়; এ ছন্দের প্রতি পর্বেই accent পাওয়া যায় না; আর মাত্রিক সমতাও এ ছন্দে নেই। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই এ ছন্দের মাত্রানির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের এ চেষ্টা সফল হয়েছে বলা যায় না।

যা হক, ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা স্বরবৃত্তের পার্থক্য দুটি বিষয়ে খুবই বেশি। ইংরেজি ছন্দের প্রতি পর্বে সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা সাধারণতঃ দুই, তবে তিন সিলেব্‌ল্‌-এর ছন্দও ইংরেজিতে যথেষ্ট আছে। বাংলায় সাধারণতঃ প্রতি পর্বে সিলেব্‌ল্‌ থাকে চারটি করে; তিন সিলেব্‌ল্‌ এবং দুই সিলেব্‌ল্‌-এর ছন্দও বাংলায় রচিত হয়েছে, যদিও তাদের সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজিতে পর্বের আদি, মধ্য এবং অন্তে accentএর অবস্থানভেদে ছন্দের প্রকারভেদ ঘটে। কিন্তু বাংলায় তা হবার জো নেই; বাংলায় যেখানে accent থাকে সেখানে তা পর্বের প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এর উপরেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। কাজেই accentএর অবস্থানভেদে ছন্দের প্রকারভেদ বাংলায় হয় না।

এবার স্বরবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি নিয়মের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাক।—

১। সাধারণতঃ এ ছন্দের প্রতি পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্ থাকে। কিন্তু স্থানে স্থানে দু-এক পর্বে তিনটি করেও সিলেব্‌ল্ থাকতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে তিনটি (অন্ততঃ দুটি) সিলেব্‌ল্ যুগ্মধ্বনি হওয়া চাই। যথা—

আমার মা না। হয়ে তুমি ॥ আর কারও মা। হলে
ভাবছো তোমায়। চিনতেম না, ॥ যেতেম না ঐ। কোলে?

—অন্য মা, শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় পর্বে তিনটি সিলেব্‌ল্ আছে এবং তার প্রথম দুটি যুগ্মধ্বনি।

২। কখনো কখনো এক পর্বে দুটিমাত্র সিলে্‌বল্ থাকতে পারে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমের সংখ্যা খুবই কম। যথা—

বাইরে কেবল। জলের শব্দ ॥ ঝুপ্ ঝুপ্। ঝুপ্—
দস্যি ছেলে। গল্প শোনে ॥ একেবারে। চুপ।

—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রথম পংক্তির তৃতীয় পর্বে মাত্র দুটি সিলেব্‌ল্। কিন্তু ওই সিলেব্‌ল্-দুটিকে টেনে পড়ে ধ্বনির অভাবে পূরণ করতে হচ্ছে।

৩। এ ছন্দে প্রতি পর্বের মাত্রাপরিমাণ পাঁচ বা ছয় হওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কোনো কোনা স্থলে চার মাত্রাও দেখা যায়। কিন্তু সেসব স্থলে সচরাচর প্রথম সিলেব্‌ল্‌টির উপরে accent থাকায় সে সিলেব্‌ল্‌টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শোনায় এবং তাতেই এক মাত্রার অভাব পূরণ হয়ে যায়। যথা—

মরব্ না ভাই,। নিপুণিকা ॥ চতুরিকার। শোকে,
তাঁরা সবাই। অন্য নামে ॥ আছেন মর্ত্য। -লোকে।

—সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তি-দুটি ঠিক মতো আবৃত্তি করলেই দেখা যাবে, এর প্রতি পর্বের প্রথম ধ্বনিটির উপরে accent রয়েছে। আর ওই accentএর জন্যই প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় পর্বের মাত্রার অভাবটা বোধ হয় না।

৪। এ ছন্দের মাত্রাবিচার করলে দেখা যাবে যে, এটি আসলে একটি ষাণ্মাত্রিক ছন্দ। কোনো কোনো পর্বে প্রকাশ্যতঃই ছয় মাত্রা থাকে; অন্যত্র দু-এক মাত্রার ফাঁক থাকে। উপরের দৃষ্টান্তটিতে 'মরব না ভাই' এবং 'আছেন মর্ত্য',

এই দুই পর্বে পূর্ণ ছয় মাত্রা আছে। অন্যত্র পূর্ণ ছয় মাত্রা নেই। দু-এক মাত্রার যে ফাঁক থাকে তার মধ্যে দুটি তত্ত্ব বর্তমান। পর্বের প্রথম ধ্বনিটি অযুগ্ম হলেও তার উপরে accent থাকার দরুন সেটি কতকটা যুগ্মধ্বনির মর্যাদা প্রাপ্ত হয়, তাতেই এক মাত্রার অভাব পূরণ হয়। উপরের দৃষ্টান্তটিতে 'নিপুণিকা', 'চতুরিকার', 'তারা সবাই' প্রভৃতি পর্বের প্রথম ধ্বনিটি অযুগ্ম হলেও accent থাকার দরুন কতকটা যুগ্মধ্বনির মর্যাদা পেয়েছে; তাতেই এক মাত্রার অভাবও পূরণ হয়েছে। ফাঁকের দ্বিতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে এই। পর্বের শেষ ধ্বনিটি অযুগ্ম হলেও তার প্রকৃতিও দ্বৈমাত্রিক। কারণ ওই ধ্বনিটির পরেই অবকাশ থাকায় ওই অবকাশের মধ্যেই এক মাত্রার স্থান থাকে। উপরের দৃষ্টান্তটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, 'চতুরিকার' এই পর্বটির পরে ধ্বনির অবকাশ যতটা 'নিপুণিকা' পর্বের পরবর্তী ধ্বনির অবকাশ তার চেয়ে বেশি; অর্থাৎ 'নিপুণিকা' শব্দের শেষ অযুগ্ম ধ্বনিটির পরে আর-একটি আশ্রিত বর্ণের অবকাশ রয়েছে, 'অন্য নামে' এই পর্বটির পরেও তেমনি একটি আশ্রিত বর্ণের অবকাশ আছে। সুতরাং accentএর এক মাত্রা এবং অবকাশের এক মাত্রা, এই দুই মাত্রার হিসাব সহ 'নিপুণিকা' শব্দেও ছয় মাত্রার সন্ধান মিলবে। এই হিসাবে দেখা যাবে উপরের দৃষ্টান্তটির প্রতি পর্বেই ছয় মাত্রা আছে।

কিন্তু একটি বিষয়ে একটু সাবধান হওয়া দরকার। accentএর প্রভাবে ধ্বনির কতকটা দীর্ঘতা হয় বলে 'মরব না ভাই' এবং 'আছেন মর্ত্য' এই দুই পর্বে সাত মাত্রা গণনা করার প্রয়োজন নেই। পর্বের প্রথম ধ্বনিটি যদি যুগ্ম হয় তা হলে তার উপর accent থাকাতে ওই ধ্বনির মাত্রাবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু তার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি হয়; এবং সেজন্যই পর্বের প্রথম ধ্বনিটি যুগ্ম হলে ছন্দের তরঙ্গায়িত ভঙ্গিটি খরতর হয়ে ওঠে। যথা—

রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিশ্বে তারা;
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।

—হতভাগ্যের গান, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয়তঃ, 'আছেন মর্ত্য' এই পর্বটিতে প্রথম ধ্বনিটি অযুগ্ম এবং তার উপরে

একটু মৃদু accentও আছে। কিন্তু তা হলেও এই পর্বে সাত মাত্রা নেই। কারণ যেসব স্থলে পর্বের দ্বিতীয় ধ্বনিটি যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক হয় সেসব স্থলে accentএর দ্বারা ধ্বনির তীব্রতাই হয়, দীর্ঘতা হয় না। এখানেও 'আছেন' এর আ-এর উপর accent থাকা সত্ত্বেও এই ধ্বনিটি দীর্ঘত্ব লাভ করে নি, কিন্তু তীব্রতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে লক্ষ করলে টের পাওয়া যাবে 'নিপুণিকা' এবং 'চতুরিকার' পর্বে নি এবং চ ঈষৎ দীর্ঘ শোনায়।

বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের মাত্রানির্ণয় এবং তার আইন-কানুন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাব। সুতরাং এ ছন্দের কয়েকটি মাত্র নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।

পূর্বাশা ১৩৩৯ আশ্বিন

অনুষঙ্গ

পাঠপরিচয়

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি রচনাকাল অনুসারে দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে (১৩২৯-৩০) আছে মোট তিনটি প্রবন্ধ, দ্বিতীয় পর্বের (১৩৩৮-৩৯) প্রবন্ধসংখ্যা ষোল। দুই পর্বের কালগত ব্যবধান প্রায় আট বৎসর। দুই পর্বের রচনাগুলির প্রকৃতিগত পার্থক্যও কম নয়। তাই এই দুই পর্বের রচনাগুলির পরিচয়ও দুই ভাগে দেওয়া গেল।

প্রথম পর্ব

আমি যখন ছন্দ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখনও আমাদের সাহিত্যে প্রণালীবদ্ধ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত হয় নি। তার আগে অবশ্য শশাঙ্কমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এই চার কবির কয়েকটি প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের উপরে নানা দিক থেকে আলোকপাতের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু কোনোটিতেই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাংলা ছন্দের সামগ্রিক পরিচয় দেবার অভিপ্রায় লক্ষিত হয় নি। এই অতৃপ্তিই আমাকে প্রণালীবদ্ধ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার প্রবর্তনা দান করে। তার ফলেই রচিত হয় 'বাংলা ছন্দ' ও 'ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' নামে দুই ভাগে বিভক্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। রচনাকাল ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাস। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিমার্জিত হয়ে এটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রেরিত হয়। আট মাস পরে এটি ওই পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ-চৈত্র এবং ১৩৩০ বৈশাখ) বিভিন্ন নামে। 'বাংলা ছন্দ' অংশ খণ্ডিত হয়েছিল তিন ভাগে আর 'ছন্দের শ্রেণী বিভাগ' খণ্ডিত হয়েছিল দুই ভাগে। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশকালে উক্ত পাঁচটি ভাগকে কার্যতঃ পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের রূপ দেওয়া হয় এবং মূল প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশের উপনামকে মুখ্য নামের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই দ্বিধাবিভক্ত প্রবন্ধটি প্রবাসীতে যে পাঁচ নামে প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্নে তালিকা-আকারে দেখানো হল।—

১ বাংলা ছন্দ	১৩২৯ পৌষ
২ স্বরবৃত্ত ছন্দ	১৩২৯ মাঘ
৩ স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব	১৩২৯ ফাল্গুন

৪ ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ১৩২৯ চৈত্র

৫ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ১৩৩০ বৈশাখ

প্রথম ও চতুর্থ নাম দুটি ছিল মূলপ্রবন্ধের প্রধান দুই ভাগের শিরোনাম। বাকি তিনটিই ছিল ওই দুই ভাগের কোনো কোনো অপ্রধান অংশের উপনাম, পত্রিকায় প্রকাশকালে সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনায় মুখ্যত্ব প্রাপ্ত। প্রবন্ধটির উভয় ভাগের সামগ্রিক ভাবসংগতি রক্ষার প্রয়োজনে বর্তমান সংকলনে এগুলিকে আবার উপনামে পরিণত করে পূর্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা গেল।

সম্পাদনাকালে প্রবন্ধটি সর্বত্র ঠিক যথাস্থানে খণ্ডিত হয় নি বলে দু-একটি স্থানে কিছু ত্রুটি ঘটেছিল। মাসিক পত্রিকার স্বল্পায়ত দুই স্তম্ভে মুদ্রিত হওয়াতে দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলির অভিপ্রেত পঙ্‌ক্তিসজ্জাও সর্বত্র রক্ষা করা যায় নি। তাছাড়া পারিভাষিক চিহ্ন-স্থাপনে, বানানে ও অন্য কোনো কোনো বিষয়ে বহু মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছিল। বর্তমান সংকলনে এইসব ত্রুটিমোচনে যথাসাধ্য চেষ্টিত হয়েছি।

প্রবন্ধ রচনাকালে বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া ছিল। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশকালে সম্পাদকের বিবেচনায় অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির পরিচয়-অংশ প্রথম দু'তিন মাস সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। আমি তখন সম্পাদককে পত্রযোগে অনুরোধ করি ওই পরিচয় অংশগুলি যেন বর্জিত না হয়। তারপর থেকে ওগুলি বর্জিত হল না বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হল। কিন্তু লেখক ও পাঠক, সকলের পক্ষেই দৃষ্টান্তগুলির পরিচয় জানা প্রয়োজন। নতুবা আলোচনাধীন ছন্দের রূপ ও রীতির সত্যতা যাচাই করা সহজ হয় না। তাই গ্রন্থভুক্ত করার সময়ে দৃষ্টান্তগুলির পূর্ণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গিয়েছে। প্রবন্ধ রচনাকালে কার কোন্ রচনা থেকে দৃষ্টান্তগুলি সংগ্রহ করেছিলাম, তা পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল পরে সর্বাংশে স্মরণে আনা কঠিন। তথাপি দুটিমাত্র বাদে বাকি সব দৃষ্টান্তেরই পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যে দুটির পরিচয় দেওয়া যায় নি তার মধ্যে একটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে মুদ্রণ সমাপ্তির পরে। এই দৃষ্টান্তটির (পৃ ২০) প্রথম পঙ্‌ক্তি এই—

কাছে যাই যার | দেখিতে দেখিতে | চলে যায় সেই | দূরে

এই অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' গ্রন্থের 'আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই' ইত্যাদি ১৫ সংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় স্তবক থেকে। কিন্তু

দুধ দেবে, | ছানা দেবে, | ক্ষীর দেবে | আর

ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির (পৃ ২৩-২৪) উৎস-নিরূপণ এখনও সম্ভব হয় নি। কোনো সহৃদয় পাঠক যদি এটির সন্ধান দেন তাহলে উপকৃত হব।

অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সংকলিত হয়েছিল সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতা থেকে। এসব কবিতা পরে কবিদের বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পায়। পাঠকের সুবিধার কথা মনে রেখে এসব ক্ষেত্রে পত্রিকার বৎসর মাস নির্দেশ না করে যথাসম্ভব গ্রন্থ ও কবিতার নামই উল্লিখিত হল। অন্যের রচিত দৃষ্টান্তের অভাবে বর্তমান লেখককেই কতকগুলি দৃষ্টান্ত রচনা করে দিতে হয়েছিল। প্রবন্ধ রচনার সময়ে এসব ক্ষেত্রে রচয়িতার নাম উহ্য রাখা হয়েছিল। পরবর্তী কালে দেখা গেল তাতে কারও কারও মনে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ এগুলিকে সত্যেন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির রচনা বলে ধরে নিয়েছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যতদূর মনে পড়ছে কবি সুনির্মল বসু তাঁর 'ছন্দের গোপন কথা' বইটিতে সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্তমান গ্রন্থের (পৃ ৪৫)

সমুদ্রের তরঙ্গের গভীর তাল ভয়ংকর

ইত্যাদি দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করেন। এটির রচয়িতার নাম কারও জানা ছিল না। তাই তিনিও স্বভাবতঃই এটির নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু দেখা গেল অনেকেরই ধারণা এটি কবি সুনির্মল বসুরই রচনা। অনুরূপ ভ্রান্তি নিরসনের অভিপ্রায়ে এসব দৃষ্টান্ত লেখকের রচনা বলেই চিহ্নিত হল।

ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলির অধিকাংশই F. T. Palgrave-এর Golden Treasury থেকে সংকলিত। সেকালে এটি ছিল আমার প্রিয় বই। ইংরেজি কবিতার শুধু ভাবরস নয়, ছন্দরসের প্রতি আমি প্রথম আকৃষ্ট হই প্রধানতঃ এই বই পড়েই। সে সময়ে যেসব কবিতা থেকে ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছিলাম তার সবগুলি এ বই-এর আধুনিক সংস্করণে পাওয়া যায় না। কারণ এ বই-এর বিভিন্ন সংস্করণে কিছু পূর্বতন কবিতা বর্জন করে তার স্থলে নূতন কবিতা গ্রহণ করা হয়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের উৎস-নির্দেশ করার সময় বাহুল্য বোধে Golden Treasury বই-এর সংস্করণ উল্লেখ করা হয় নি। আগ্রহী পাঠক এ বই-এর বিভিন্ন সংস্করণ দেখে নিতে পারেন।

প্রবাসীতে প্রকাশকালে কোনো পাদটীকা ছিল না। গ্রন্থে গ্রহণকালে কয়েকটি পাদটীকাও যোগ করা হল। প্রবন্ধ রচনাকালে কয়েকটি দৃষ্টান্ত

সংকলিত হয়েছিল দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ থেকে। সেগুলির পূর্ণ পরিচয়ও দেওয়া গেল পাদটীকাতেই।

প্রথম পর্বের তৃতীয় প্রবন্ধটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় (১৩৩০ মাঘ-চৈত্র) তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে। কিন্তু তিন ভাগেই 'বাংলা ছন্দ ও সংগীত' নাম অপরিবর্তিত থাকে। তিন ভাগের জন্য তিন নাম স্বীকৃত হয় নি। সুতরাং এটির বেলায় কোনো অংশের নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নি। প্রথম দুই প্রবন্ধের ন্যায় এটিতেও মুদ্রণগত ত্রুটিশোধন, বানানের সমতাবিধান, অনুচ্ছেদের পুনর্বিন্যাস, বহিরঙ্গের প্রসাধন ছাড়া মূল বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। পরবর্তী কালে যেসব মত বা পরিভাষা পরিত্যক্ত হয়েছে, ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনে তাও যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। একটি শব্দও বদলানো হয় নি।

প্রথম দুই প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশের পরে তাতে কিছু ত্রুটি ও অপূর্ণতা (বিশেষতঃ যতির তারতম্য ও যতিলোপ সম্পর্কে) লক্ষিত হয়। ফলে এই তৃতীয় প্রবন্ধটিতে সেসব ত্রুটি ও অপূর্ণতা নিরসনের প্রয়াস করা গিয়েছিল। তাই এটিকে অনেকাংশে প্রথম দুই প্রবন্ধের পরিপূরক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সং যো জ ন

'ছন্দ-পরিক্রমা'র নিবেদনে জানিয়েছি, ছন্দ-প্রবন্ধ রচনায় হাত দেবার পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে ছন্দ-রচনায় হাত পাকাতে হয়েছিল। তার ফসলের পরিমাণও কম হয় নি। কিন্তু সেগুলি সব মরশুমী, প্রয়োজনের ঋতুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ছন্দ-প্রবন্ধগুলিতে সেগুলির কোনো কোনো অংশ ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত হওয়াতে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। ছন্দ-জিজ্ঞাসার প্রথম দুটি প্রবন্ধেই তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে। এসব নিদর্শন জাদুঘরে রক্ষিত প্রত্ন নিদর্শন মাত্র। তার বেশি মূল্য এগুলির প্রাপ্য নয়।

গ্রন্থের সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে প্রথম পর্বের তিনটি প্রবন্ধের পরে নিশীথে, যৌবন-বোধন ও স্মৃতিযজ্ঞ নামে তিনটি পদ্যরচনা যুক্ত করা গেল। এই তিনটি রচনাকে কেন বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে আধুনিক কালের হাতে অর্পণ করা হল, তার একটু কৈফিয়ত দেওয়া কর্তব্য। প্রথমেই বলা উচিত যে, শুধু ইতিহাস-রক্ষাই এই তিনটি রচনা পুনঃপ্রকাশের উদ্দেশ্য নয়। এগুলিকে এ গ্রন্থে স্থান

দেবার আসল উদ্দেশ্য ছন্দগত। এই ছন্দগত অভিপ্রায়টা কি, তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

'নিশীথে' রচনাটি পূর্বোক্ত হাত পাকাবার অভ্যাসেরই ফল। ছন্দ-প্রবন্ধ প্রকাশের পাঁচ-ছয় বছর আগেকার রচনা এটি। ওই জাতীয় আরও বহু রচনার ন্যায় এটিও কোথাও প্রকাশ করবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। কবিবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামের বিশেষ আগ্রহে এটি প্রকাশিত হয় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় (১৩২৮ অগ্রহায়ণ)। তাই, যে ছন্দ-উদ্ভাবনার প্রেরণায় এটি রচিত হয়েছিল সে প্রেরণার কথাটুকু আজও মনে রয়ে গেছে। নতুবা বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যেত। অনেকদিন যাবৎ আমার মনে প্রশ্ন ছিল স্বরবৃত্ত (আধুনিক পরিভাষায় দলবৃত্ত) ছন্দ কি শুধু লঘু ভাবের বাহন হবারই যোগ্য ? ইংরেজি ছন্দের মতো এই বাংলা সিলেবিক ছন্দেও কি ধ্বনিগাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলা যায় না বা এ ছন্দকে গুরুগম্ভীর কাব্যভাবনার বাহন করা যায় না ? আমার বিশ্বাস ছিল, যায়। তাই দীর্ঘকাল নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়েছি। সে পরীক্ষারই ফল এই 'নিশীথে' রচনাটি। বাংলা গুরুগম্ভীর কবিতাটির প্রধান বাহন অক্ষরবৃত্ত (আধুনিক পরিভাষায় মিশ্রকলাবৃত্ত) ছন্দ। আর অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নানা বন্ধের মধ্যে ৮+১০+১০ মাত্রার দীর্ঘায়ত মহাত্রিপদী বন্ধ হচ্ছে গম্ভীরতার ভাব প্রকাশের যোগ্যতম বাহন। এই মহাত্রিপদীর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যের 'রাত্রি' কবিতাটি। এই কবিতাটির প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এই—

মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা !
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিত তাহাদের গীতা।

আমার চেষ্টা হল এই অক্ষরবৃত্ত মহাত্রিপদীকে স্বরবৃত্ত (syllabic) রূপ দেওয়া। এই চেষ্টার ফলেই রচিত হল 'নিশীথে' পদ্যপ্রলাপটি। দুর্বল কল্পনা ও কাঁচা হাতের রচনা এটি। তবু নানা পরীক্ষার ফলে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে দৃঢ়সংবদ্ধ ধ্বনিগাম্ভীর্য আসা যেমন সম্ভব, এ ছন্দকে উচ্চতম কাব্যভাবের বাহন করাও তেমনি সম্ভব। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসটাই পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছন্দ-প্রবন্ধে। প্রথম পর্বের প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধেই (পৃ ৩৭-৩৮ এবং পৃ ৭৮-৭৯) তার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

ছন্দ-প্রবন্ধ লেখার উদ্‌যোগপর্বে শুধু যে বাংলা ছন্দেই হাত পাকাতে হয়েছিল তা নয়, কোনো কোনো সংস্কৃত এবং আরবি ছন্দকেও বাংলায় আনবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে প্রথম দুই প্রবন্ধেই। তা ছাড়া আরও দুটি সংস্কৃত ছন্দের কথা এখানে বলা প্রয়োজন—একটি পুষ্পিতাগ্রা, আর একটি শার্দূলবিক্রীড়িত। দুটিই কঠিন এবং জটিল ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমটিকে বাংলা রূপ দিতে চেষ্টা করেন নি। তখন পর্যন্ত আর কেউ করেছিলেন কিনা জানা ছিল না, পরেও জানতে পারি নি। সত্যেন্দ্রনাথ শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দকে বাংলায় আনবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা সফল হয় নি বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। তাই আমি ওই দুটি ছন্দকেই বাংলায় রূপান্তরিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। তার মধ্যে পুষ্পিতাগ্রা ছন্দের রচনাটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৩০ ভাদ্র) প্রকাশিত হয় 'যৌবনবোধন' নামে। আর শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের রচনাটি বহু বৎসর পরে 'স্মৃতিযজ্ঞ' নামে উদয়ন পত্রিকায় (১৩৪১ শ্রাবণ) প্রকাশিত হয় কবিবন্ধু প্যারীমোহন সেনগুপ্তের আগ্রহে। এ রচনা দুটির প্রকাশকালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকলেও রচনাকালের হিসাবে কিন্তু এ-দুটির মধ্যে প্রায় কোনো ব্যবধানই ছিল না। দুটিই রচিত হয় প্রথম ছন্দ-প্রবন্ধ রচনার সমকালেই। অর্থাৎ জন্মসূত্রে এই তিনটি রচনা (প্রথম ছন্দ-প্রবন্ধ ও দুটি পদ্যরচনা) পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই এ-দুটি পদ্যরচনাকেও ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথম পর্বের 'সংযোজন' বিভাগে গ্রহণ করা গেল এবং এদের স্থান নির্দিষ্ট হল পূর্বোক্ত 'নিশীথে' রচনাটির পাশেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, কিছুকাল পরে (১৩৩১ শ্রাবণ) কবিবন্ধু নজরুল ইসলামও বাংলায় শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁর প্রয়াসও নিষ্ফল হয়েছে বলেই মনে করি।[১] কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য এখানে বলা উচিত যে, দীর্ঘকাল পরে 'ছন্দকৌতুক' নামে এক প্রবন্ধে (পূর্বাশা ১৩৭০ চৈত্র) আমি আবার শার্দূলবিক্রীড়িত ও স্রগ্ধরা

ছন্দকে বাংলায় আনবার কৌশল নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম। যদি সুযোগ পাই তবে ভবিষ্যতে অন্য কোনো গ্রন্থে ওই প্রবন্ধটি সংকলন করার অভিপ্রায় আছে।

উক্ত তিনটি পদ্য রচনা ছাড়া 'সংযোজন' বিভাগে 'চঞ্চল' নামে আরও একটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটি যখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩২৫ চৈত্র) প্রকাশিত হয় তখনই এটির ছন্দ-সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তিন বৎসর পরে যখন প্রথম ছন্দ-প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হলাম তখন এই কবিতা থেকেও দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করি ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে (পৃ ৫৪)। আমার প্রবন্ধ প্রকাশের আনুমানিক কুড়ি-একুশ বৎসর পরে আকস্মিকভাবে কলিকাতায় কবি সতীশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ দেখা। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আত্মপরিচয় দিলেন 'ফাল্গুন চঞ্চল, ফোটা ফুল রয় না' ইত্যাদি আমার উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি দুটির কথা উল্লেখ করে। তার পরে তিনি জানালেন যে, কবিতাটি রচনা করে তিনি সেটি দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ এটির উপরে কলম চালিয়ে তার ভাষা ও ছন্দকে প্রায় সম্পূর্ণ বদলে বর্তমান রূপ দেন। মূল রচনার ভাবটুকু মাত্র মোটামুটি বজায় রইল। আর রবীন্দ্রনাথই এটি পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীতে। আসল কথা, কবিতাটির বর্তমান ছন্দরূপ রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। এই তথ্যটুকুর গুরুত্বের কথা স্মরণ করেই 'চঞ্চল' কবিতাটিকে প্রথম পর্বের 'সংযোজন' অংশে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই কবিতার মূল রচয়িতা কবি সতীশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন।

ইচ্ছা ছিল এই কবিতাটির নবজন্ম লাভ সম্পর্কে সতীশচন্দ্রের কাছ থেকে একটি লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করে সেটাই এখানে প্রকাশ করে দেব। কিন্তু তাঁর জীবনকালে কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি নি। তার পরে তিনি নাগালের বাইরে চলে গেলেন। তাই ওই কাহিনীটুকু নিজের ভাষাতেই বিবৃত করতে হল।

দ্বি তী য় প র্ব

প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় আট বৎসর। কিন্তু ভাবগত ব্যবধান খুবই কম। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে দ্বিতীয় পর্বের চিন্তাধারা প্রথম পর্বের চিন্তাধারার অনুবৃত্তি মাত্র, তবে দ্বিতীয় পর্বে ওই চিন্তা অনেকখানি এগিয়েছে ও অনেকখানি পরিণত রূপ লাভ করেছে। দুই ধারার মধ্যে বস্তুতঃ কোন ছেদ নেই। এই দুই পর্বের প্রবন্ধাবলী পরস্পরের পরিপূরক

রূপেই গ্রহণীয়। প্রথম পর্বের প্রবন্ধ তিনটি অধিগত না করে দ্বিতীয় পর্বের প্রবন্ধগুলি যথাযথভাবে অনুধাবন করা যাবে না। আবার দ্বিতীয় পর্বের চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে প্রথম ধারার তাৎপর্য গ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এইজন্যই দুই পর্বের প্রবন্ধাবলী একত্র গ্রথিত করা গেল।

দ্বিতীয় পর্বের মোট প্রবন্ধসংখ্যা ষোল। তার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ('ছন্দোবিশ্লেষ') প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল দুই ভাগে। ঠিক দুই বৎসরের মধ্যেই এই ষোলটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বিচিত্রা, পঞ্চপুষ্প, প্রবাসী, পরিচয়, উত্তরা ও পূর্বাশা, এই কয়খানি পত্রিকায় এবং জয়ন্তী-উৎসর্গ (১৩৩৮ পৌষ) গ্রন্থে। এই ষোলটি প্রবন্ধকে দুটি মূল ধারায় ভাগ করা যায়। একটি ধারা বিতর্ক-পর্যায়ভুক্ত, অন্য ধারাটি বিতর্ক-নিরপেক্ষ। 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রকাশের (বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ) পর দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় ছন্দ নিয়ে মহা তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। এই ছন্দ-বিতর্কে অনেকেই জড়িত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান রবীন্দ্রনাথ। উক্ত 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনিই এই বিতর্কের সূত্রপাত করেন। ইতিহাস হয়তো বলবে যে, আমার 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধের মধ্যেই বিতর্কের বীজ নিহিত ছিল, তার দ্বারাই বিতর্কের সূচনা হয়; রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের দ্বারা তাতে বেগ সঞ্চারিত হয় মাত্র। আমি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হই নি। ব্যতিক্রম শুধু অনিল-বরণ রায়। তার কারণ তিনিও রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়েই তর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর লেখাটি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার অভিমতের জন্য। দ্বিতীয় পর্বের ষোলটি প্রবন্ধের মধ্যে সাতটিই এই বিতর্ক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু মনে রাখা উচিত প্রায় একই সঙ্গে আরও নয়টি প্রবন্ধ দ্রুতপর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছিল বিভিন্ন পত্রিকায়। সেগুলি ছিল বিতর্ক-নিরপেক্ষ, সেগুলি নিয়ে কেউ কোনো তর্ক উত্থাপন করেন নি সে সময়ে। নিম্নে এই ষোলটি প্রবন্ধের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল। বিতর্ক পর্যায়ের সাতটি প্রবন্ধ নির্দিষ্ট হল তারকাচিহ্ন যোগে।

১৩৩৮

১।	বাংলা ছন্দের বিবর্তন	সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা	ভাদ্র
* ২।	বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ	বিচিত্রা	অগ্রহায়ণ

	৩। বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ	বিচিত্রা	পৌষ
	৪। বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান	'জয়ন্তী-উৎসর্গ'	পৌষ ১১
*	৫। ছন্দজিজ্ঞাসা ১	বিচিত্রা	মাঘ
	৬। ছন্দপ্রসঙ্গ	পঞ্চপুষ্প	মাঘ
*	৭। ছন্দজিজ্ঞাসা ২	বিচিত্রা	ফাল্গুন
	৮। ছন্দোবিশ্লেষ ১-২	প্রবাসী	ফাল্গুন, চৈত্র
	৯। বাংলা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা	বিচিত্রা	চৈত্র
		১৩৩৯	
	১০। ছন্দজিজ্ঞাসা ৩	বিচিত্রা	বৈশাখ
	১১। বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ	পরিচয়	বৈশাখ
*	১২। ছন্দবিচার	বিচিত্রা	জ্যৈষ্ঠ
	১৩। ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ	বিচিত্রা	শ্রাবণ
*	১৪। বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ	বিচিত্রা	ভাদ্র
*	১৫। ছন্দসংকট	উত্তরা	ভাদ্র
	১৬। স্বরবৃত্ত ছন্দের আইন কানুন	পূর্বাশা	আশ্বিন

ছন্দ-জিজ্ঞাসা গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে এই ষোলটি প্রবন্ধ কালক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয় নি। রচনাকাল, চিন্তার পর্যায়ক্রম এবং পাঠকের অনুধাবন সৌকর্যের কথা মনে রেখে এই ষোলটি প্রবন্ধকে তিন গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। বিতর্ক পর্যায়ের সাতটি প্রবন্ধকে স্থাপন করা হয়েছে মধ্যভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয় গুচ্ছে। বাকি নয়টির মধ্যে যে তিনটি বিতর্কযুগের পূর্বে রচিত বা পরিকল্পিত সেগুলি স্থাপিত হয়েছে পুরোভাগে অর্থাৎ প্রথম গুচ্ছে। আর যেগুলি বিতর্কের সমকালে রচিত ও প্রকাশিত সেগুলি স্থান পেয়েছে সকলের শেষে তৃতীয় গুচ্ছে। এবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি পর্যায়ক্রমে।

বাংলা ছন্দের বিবর্তন—১৩৩৮ ভাদ্র ১৩ (১৯৩১ আগস্ট ৩০) তারিখে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বক্তা-কর্তৃক সংক্ষিপ্ত আকারে সাধুভাষায় অনুলিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত (৩৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্যবিবরণ, পৃ ২২-২৩)। প্রবন্ধের নামটি নবপ্রদত্ত। পত্রিকায় কোনো নাম ছিল না। গ্রন্থে গ্রহণকালে এটির মূল সাধু ভাষাকে

চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করা হয় অন্য সব প্রবন্ধের সঙ্গে সমতা রক্ষার প্রয়োজনে। তা ছাড়া অন্য কোনো পরিবর্তন করা হয় নি।

বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ—রচনাকাল ১৩৩৮ ভাদ্র। এটি আসলে প্রথম গুচ্ছেরই অন্তর্গত। যেহেতু এটি উপলক্ষ করেই বিতর্কের সূত্রপাত হয় সেজন্য এটিকে বিতর্ক-গুচ্ছের প্রথমেই স্থাপন করা গেল। এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রকাশিত হয় 'বাংলা ছন্দ' (বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ) এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' (পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ) নামে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ। এই প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হয় লেখকের 'ছন্দজিজ্ঞাসা' নামক তিন প্রবন্ধে। এই উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছুকাল ধরে যে ছন্দবিতর্ক দেখা দেয় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে এই তিন গ্রন্থে—

১। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ', প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৯ কার্তিক, পৃ ৩৮১-৪১৩। পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণাধীন।

২। দিলীপকুমার রায় প্রণীত 'স্মৃতিচারণ', দ্বিতীয় খণ্ড, (শক ১৮৮৪। বাংলা ১৩৬৯ আষাঢ়) পৃ ১৪২-৪৬।

৩। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'বিগত দিন' (১৩৬৪ ভাদ্র), সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ ৩০-৪০।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—১৩৩৮ কার্তিক ২০ (ইং ১৯৩১ নভেম্বর ৬) তারিখে রচিত এবং পরবর্তী ৯ অগ্রহায়ণ তারিখে প্রুফ দেখার সময়ে ঈষৎ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামক সংকলন গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-পরিচয় সভা ও বিশ্বভারতীর যুক্ত উদ্‌যোগে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসব দিবসে (১৩৩৮ পৌষ ১১, ইং ১৯৩১ ডিসেম্বর ২৭, রবিবার)। উক্ত প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের জন্য রচিত হয়েছিল জয়ন্তী-উৎসবের প্রধান উদ্‌যোক্তা অমল হোম মহাশয়ের অনুরোধে।

জয়ন্তী-উৎসর্গের জন্য রচিত এই প্রবন্ধটির মুদ্রণকার্য শেষ হয়ে যাবার পরে মুদ্রিত ফর্মা আবার কিছু পরিমার্জিত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় এবং উৎসবের কিছুকাল পরে বিশ্বভারতীর সম্মতিক্রমে প্রকাশিত হয়। 'জয়ন্তী-উৎসর্গে' প্রবন্ধের শেষে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনার তারিখটি রাখা হয় নি। পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় এই তারিখটি (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ ৯) ছাপা হয়। মুদ্রিত ফর্মায় শেষ পরিমার্জনার তারিখ এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশের তারিখ ছাপা হয় নি।

'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধের পুস্তিকায় প্রকাশিত শেষ রূপটিই 'ছন্দজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সংকলিত হল সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতরূপে। কিন্তু এবারও অনবধানতাবশতঃ প্রবন্ধের শেষে '৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮' তারিখটি ছাপা হয় নি। তা ছাড়া, এই প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত 'উদয়রবি যে রাঙা রঙে রাঙায়' ইত্যাদি কবিতাংশটির উৎস-নির্দেশটি পাদটীকারূপে মুদ্রিত না হয়ে অস্থানে মুদ্রিত হয়েছে, আর তাও হয়েছে খণ্ডিতরূপে। এই কবিতাংশটি সংকলিত হয়েছিল 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' গ্রন্থের (১৩৩৮ আশ্বিন) 'উৎসব' কবিতাটি থেকে।

এখানে বলা উচিত যে, এ প্রবন্ধের এক স্থানে (পৃ ১৫৪) Collins-এর Ode to Evening কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল স্মৃতির উপরে নির্ভর করে। Palgrave-এর Golden Treasury বইখানি হাতের কাছে ছিল না। পরে দেখা গেল উক্ত মন্তব্যটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ কবিতার ছন্দোবন্ধ অমিল বটে, কিন্তু তাকে মুক্তক বলা চলে না।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ—এই প্রবন্ধটি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে লিখিত ও তাঁর সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৩৯ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়েছিল।

ছন্দ-বিচার—রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে 'ছন্দজিজ্ঞাসা' তিন পর্ব প্রকাশের পরে তাঁকে এ বিষয়ে পত্র লিখি। তার উত্তরে তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সাক্ষাতে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান। সেখানে কয়েক-বার সাক্ষাতে যে আলোচনা হয়, এই প্রবন্ধটি তারই অনুলিপি। প্রকাশের পূর্বে এটি কবির কাছে পাঠানো হয় তাঁর অনুমোদনের জন্য। আনুপূর্বিক দেখে ও কিছু অংশ সংযোজন করে কবি অনুমোদন করেন ও আবার সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। কেননা তখনও মতভেদের কিছু অবকাশ ছিল। এবার আলোচনা হল কলকাতায় মহর্ষিভবনে 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। এই আলোচনার ফলে কবি তাঁর অভিমত সংক্ষেপে লিখে দিলেন। এই নবলিখিত অংশটুকু মূল প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে একসঙ্গেই প্রকাশিত হল। মূল প্রবন্ধের 'ছন্দ-বিচার' নামটি কবিরই দেওয়া। আর পরিশিষ্ট অংশের নাম হল 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য'।

'ছন্দ-বিচার' প্রবন্ধটি লেখকের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৫২ আষাঢ়) পুনর্মুদ্রিত হয় 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য'-সহ। তা ছাড়া, 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য'

অংশের বিস্তৃত আলোচনাও প্রকাশিত হয় ওই গ্রন্থেই 'ছান্দসিকের নিবেদন' নামে।

বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে আলোচনার ফলেও মতভেদ সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় নি। 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' অংশে সে পার্থক্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য নিরসনের অভিপ্রায়েই লিখিত হয় 'বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধটি।

ছন্দ-সংকট—এ প্রবন্ধের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে প্রবন্ধের গোড়াতেই। এ লেখাটির উদ্দেশ্য অক্ষরবৃত্ত বা যৌগিক ছন্দের গঠনপ্রণালীর পুনর্বিচার। বস্তুতঃ এটিকে 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধের পরিপূরক এবং 'ছন্দজিজ্ঞাসা' তিন পর্বের অনুবৃত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

তৎকালীন ছন্দ-বিতর্কের দুটি ধারা—এক ধারা অক্ষরবৃত্ত (বা যৌগিক) ছন্দের গঠনপ্রণালী নিয়ে আর অন্য ধারা স্বরবৃত্ত ছন্দের গঠনপ্রণালী নিয়ে। বলা যেতে পারে, অন্ততঃ তখনকার মতো প্রথম ধারার বিতর্কের পরিসমাপ্তি হয় এই 'ছন্দ-সংকট' প্রবন্ধের দ্বারা আর দ্বিতীয় ধারার বিতর্কের পরিসমাপ্তি হয় 'বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধের 'অনুলেখ' অংশে (পৃ ৩০০)।

শেষ কথা

এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে লেখকের ছন্দজিজ্ঞাসা ও ছন্দচিন্তা দুই পর্যায় মাত্র অতিক্রম করেছে। সে জিজ্ঞাসা ও চিন্তা এখনও নিবৃত্ত হয় নি। লেখকের জিজ্ঞাসা ও চিন্তার বর্তমান পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীর যথার্থ তাৎপর্য নিরূপণ সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ছন্দচিন্তার দুই দিক—এক দিক ছন্দের বিশ্লেষণগত, দ্বিতীয় দিক পরিভাষাগত। এই দুই দিকেই লেখকের পরিণত চিন্তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থের (১৯৬৫) প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে। পরিভাষা নিয়েই মতভেদ দেখা যায় বেশি। ছন্দপরিক্রমা প্রকাশের পরেও ওই গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষা সম্পর্কে সকলের সংশয় প্রশমিত হয় নি। তাই এখানে পরিভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

পরিভাষা-পরিচয়

কোনো বস্তু বা বিষয়ের পারিভাষিক নামের মধ্যেই সংহত থাকে তার অন্তঃপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয়। বস্তু বা বিষয়ের অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের চিন্তা যতই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হতে থাকে তার পারিভাষিক নামও ততই সুষ্ঠু রূপ ধারণ করতে থাকে। পরিভাষা তো চিন্তারই প্রতিরূপ। তাই চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষা-রচনারও অগ্রগতি হয়। ছন্দ-জিজ্ঞাসা গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতেও এই অগ্রগতি লক্ষিত হবে। এখানে তার বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, বোধ করি তার প্রয়োজনও নেই। নিবিষ্ট পাঠকের কাছে তা সহজেই ধরা পড়বে। তবু কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ সম্পর্কে আমার চিন্তা-বিবর্তনের একটু পরিচয় দেওয়া সংগত মনে করি। আশা করি তাতে পাঠকের সহায়তাই হবে।

মাত্রা (Unit of measure)—ছন্দবিশ্লেষণ আসলে ধ্বনিপরিমাপের ব্যাপার। পরিমাপের জন্য চাই একটি unit। কিন্তু ইংরেজি unit-এর কি বাংলা করা যায়, তাই নিয়ে আমাকে মুশকিলে পড়তে হয়েছে। কখনও বলেছি 'একক' আবার কখনও বলেছি 'ব্যষ্টি'। কিন্তু এ দুটি শব্দ নিয়ে কাজ চালানো কঠিন, বিশেষতঃ সমাস গঠনের ক্ষেত্রে। তাই অনেক সময় ইংরেজি unit শব্দটাকেই বহাল রেখেছি। তাতে মনের কথা বোঝানো সহজ হয়। কিন্তু তাকে নিয়ে ঘর করা চলে না। অবশেষে 'মাত্রা' শব্দটাকেই মেনে নিলাম unit অর্থে। তাতে ছন্দব্যাখ্যার কাজ অনেক সহজ হল। এই শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত তথা আভিধানিক অর্থও বজায় রইল। রবীন্দ্রনাথও মাত্রা শব্দটিকে তার ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করেন।

কলা (mora)—মাত্রা শব্দকে unit অর্থে গ্রহণ করার ফলে তার অর্থব্যাপ্তি ঘটল। কিন্তু তার পারিভাষিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে শূন্যতা দেখা দিল। মাত্রা যদি হয় unit, তবে mora অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনির ক্ষুদ্রতম অংশ বোঝাবার জন্য নূতন শব্দ চাই। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে মাত্রা ও কলা এই দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয় mora অর্থে। দ্রষ্টব্য 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' দ্বিতীয় পর্ব, পৃ ২১১ এবং 'বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' পৃ ৩৬৮। 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও (১৩৫২) কলা শব্দের উল্লেখ আছে মাত্রার প্রতিশব্দ হিসাবে। পরবর্তী

কালে মাত্রা শব্দকে তার ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করার ফলে mora অর্থে কলা শব্দ প্রয়োগে কোনো বাধা থাকল না। তাই মাত্রাবৃত্তের স্থান দখল করল কলাবৃত্ত। কলা ও মাত্রা শব্দকে দুই পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করার ফলে 'কলামাত্রিক' শব্দ রচনা করাও সহজ হল। পাঠকের কাছেও সহজবোধ্য হল।

দল (syllable)—সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল ইংরেজি syllable শব্দ নিয়ে। এই শব্দটার বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে তা নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছে ছন্দ-আলোচনার প্রথম পর্ব থেকেই। প্রথম চালালাম 'স্বর' শব্দটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে। ফলে syllable অর্থে রচিত হল 'স্বরবৃত্ত'। দেখতে দেখতে এ শব্দটা বহুপ্রচলিত হয়ে গেল। আজও সে তার দখল ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু সবাই শব্দটা মেনে নিলেন একরকম রূঢ়ার্থে। ফলে লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থ অনেকের কাছেই অস্পষ্ট থেকে গেল। তাছাড়া কেউ কেউ এ শব্দটা নিজেদের অভিপ্রেত অর্থেও গ্রহণ করলেন। যেমন, কেউ কেউ 'স্বরবৃত্ত' কথাটাকে ইংরেজি stressed কথার প্রতিশব্দ বলে ধরে নিলেন, তাঁদের কাছে স্বরবৃত্ত ছন্দ মানে হল stressed metre। অথচ লেখকের কাছে স্বরবৃত্ত মানে syllabic। প্রচলিত শব্দকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারের এই বিপদ। যাঁরা সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার করেন তাঁদেরও এই বিপদ্‌। মেঘদূত, জয়দেব, মসজিদ, আফগান প্রভৃতি শব্দকে দুই অক্ষরের শব্দ বললে পাঠকের ধাঁধা লাগে। অক্ষর-পরিচয় বললে কি সিলেব্‌ল্‌-পরিচয় বোঝাবে? নিরক্ষর বললে কি বোঝাবে? এসব কারণে সিলেব্‌ল্‌ অর্থে অক্ষর শব্দ আমি কখনও ব্যবহার করিনি। 'স্বর' শব্দটাও বিভ্রান্তিকর। কিছুদিন 'ধ্বনি' শব্দটাকেই আশ্রয় করলাম সিলেব্‌ল্‌ অর্থে। Open syllable ও closed syllable হল যথাক্রমে অযুগ্মধ্বনি ও যুগ্মধ্বনি। কিন্তু মন প্রসন্ন হয় নি। কারণ ছন্দের আলোচনায় ধ্বনি শব্দ তার স্বাভাবিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কোনো শব্দকে একই রচনায় পারিভাষিক ও অপারিভাষিক দুই অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তাছাড়া কেউ কেউ মনে করলেন যুগ্মধ্বনি মানে যুক্তাক্ষর, অযুগ্মধ্বনি মানে অযুক্তাক্ষর। ফলে ধ্বনি শব্দটাও ছাড়তে হল।

অবশেষে সিলেব্‌ল্‌ অর্থে বেছে নিলাম 'দল' শব্দটি। শব্দটি আমার মনে জমা ছিল দীর্ঘকাল ধরে। দু'এক বার ব্যবহারও করেছি কোনো কোনো প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান', পৃ ১৫৫ এবং 'ছন্দবিচার', পৃ ২৭৩।

শব্দটা রবীন্দ্রনাথেরও অনুমোদন লাভ করেছিল। তবু দীর্ঘকাল এ শব্দটাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার মতো সাহস হয় নি মনে। অবশেষে যখন শব্দটাকে ব্যাপকভাবে চালানো শুরু হল তখন কিন্তু এটি অনেকের কাছে, বিশেষতঃ তরুণদের কাছে সহজেই স্বীকৃতি পেল। প্রবীণদের মধ্যে কালিদাস রায় এবং দিলীপকুমার রায় এই নূতন পারিভাষিক শব্দটিকে সাগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু অন্য কারও কারও মনে এখনও সিলেব্‌ল্ অর্থে দল শব্দ প্রয়োগের সমীচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। তাই পরবর্তী 'অনুষঙ্গ' অংশে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা গেল।

যতি (pause)—এই শব্দটি নিয়ে সাধারণভাবে কোনো বিতর্ক নেই। বিতর্ক আছে যতির প্রকৃতি, তারতম্য ও অবস্থিতি সম্পর্কে। 'বাংলা ছন্দ ও সংগীত' প্রবন্ধের 'যতি ও তাল' বিভাগে যতির বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। ভাবগত যতি, ছন্দোগত যতি, পূর্ণযতি, অর্ধযতি, ঈষদ্‌যতি, এসব পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগও দেখা দেয় ওই অংশেই। পরবর্তীকালে 'ঈষদ্‌যতি' শব্দের স্থলে আসে 'লঘুযতি'। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় শব্দটা আপন লঘুতাগুণেই বেশি সচল হতে পেরেছে। পরবর্তীকালে 'উপযতি' নামে লঘুতর প্রকৃতির আর এক শ্রেণীর যতির কথাও স্বীকৃত হয় নানা রচনায়।

যতির তারতম্যের ন্যায় যতিলোপের প্রভাবও কম নয় ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে। যতিলোপ প্রসঙ্গেরও প্রথম আভাস পাওয়া যায়, ওই 'যতি ও তাল' শীর্ষক উপবিভাগেই। পরবর্তীকালে যতির তারতম্য ও যতিলোপ, এই দুটি বিষয় বর্তমান লেখকের চিন্তার ক্রমেই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে, ফলে তাঁর নানা প্রবন্ধে বিশদতর রূপে আলোচিত হয়।

পর্ব (foot)—আমি যখন প্রথম ছন্দ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখন আমার মনে ছিল ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের আদর্শ। বাংলা ছন্দশাস্ত্রকে যথাসম্ভব ইংরেজি আদর্শে গড়ে তোলাই ছিল আমার লক্ষ্য। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম দুটি প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যাবে আমার মনে ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের প্রভাব কত প্রবল ছিল। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তার প্রমাণও পাওয়া যাবে ওই দুই প্রবন্ধে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারি নি। কারণ আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা নেই, সে শাস্ত্র যুক্তিবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সে শাস্ত্র বস্তুতঃ

কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ছন্দের লক্ষণসংগ্রহ মাত্র। তাতে ছন্দের শ্রেণীবিন্যাসের বা যুক্তিসম্মত পরিভাষা-রচনার প্রয়াসমাত্রও নেই। তাই বাংলাছন্দের শ্রেণীবিন্যাসে ও পরিভাষা রচনায় ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের আদর্শকে অনুসরণ করতে চেষ্টিত হই। কিন্তু ছন্দ-আলোচনার ভাষা ও পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-পদ্ধতিকে উপেক্ষা করি নি। কারণ সংস্কৃত ভাষা ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আমি চিরকালই শ্রদ্ধান্বিত। নূতন নূতন শব্দ রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তরও নেই।

এই মনোভাব নিয়েই বাংলা ছন্দ ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হই। ফলে বাংলা ছন্দের যতি-বিভাগকে ইংরেজি ছন্দের foot-এর প্রতিরূপ বলেই আমার মনে হয়েছিল। তাই foot-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'পদ' শব্দকেই বাংলা যতিবিভাগের পারিভাষিক নাম বলে স্বীকার করে নিই। আর যেহেতু পদ, পাদ ও চরণ অভিন্নার্থক শব্দ সেজন্য ছন্দের যতিবিভাগকে প্রয়োজন মতো এই তিন নামের যে-কোনো নামেই অভিহিত করেছি। এই বই-এর প্রথম দুই প্রবন্ধেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। লক্ষ করার বিষয় এই যে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অনুসরণে শ্লোকের চতুর্থাংশকে বা পূর্ণযতির বিভাগকে আমি পদ, পাদ বা চরণ বলি নি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দের যতিবিভাগকে পর্ব বলতেন তাও আমার জানা ছিল। কিন্তু আমি ওই যতিবিভাগকে পর্ব না বলে পদ, পাদ বা চরণ বলাই সমীচীনতর বলে মনে করেছিলাম। তাতেও ইংরেজি পরিভাষার প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমার চিন্তায় যতির তারতম্যবোধ স্পষ্টতর হয় তখন অর্ধযতি ও লঘুযতির বিভাগের জন্য দুটি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন বোধ করি। আগে বাংলা ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি শব্দকে পূর্বাগত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করতাম। পরে বোঝা গেল এসব নামের সার্থকতা আছে। দেখা গেল বাংলায় সাধারণতঃ অর্ধযতির বিভাগকেই বলা হয় 'পদ', লঘুযতির বিভাগের কোনো নাম নেই। আমি তখন বাংলা পদ শব্দটি অর্ধযতির বিভাগ অর্থে স্বীকার করে নিয়ে লঘুযতির বিভাগকে 'পর্ব' বলাই সমীচীন মনে করলাম। যেমন—

নদীতীরে। বৃন্দাবনে॥ সনাতন। একমনে॥
জপিছেন। নাম।

এই ছন্দ পঙ্‌ক্তিটিতে আছে তিনটি পদ (অর্ধযতির বিভাগ), আর প্রতি পদে দুই পর্ব (লঘুযতির বিভাগ)। লঘুযতি =। অর্ধযতি = ॥

পূর্ণযতির বিভাগকে পারিভাষিক অর্থে 'পঙ্‌ক্তি' বলাই সংগত মনে করি। কারণ অর্ধযতির বিভাগকেই পদ বা চরণ বলে স্বীকার করে নিয়েছি। মুদ্রিত বা লিখিত বিভাগকে ছত্র (line) বললে ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

উত্তরকালীন এসব পরিভাষার কথা মনে রেখে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি অনুসরণ করলে পাঠকের মনে কোনো সংশয় বা ভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না বলেই আশা করি। উত্তরকালীন পরিভাষার পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যাবে 'ছন্দপরিক্রমা'র প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে। তার পরেও কোনো কোনো পরিভাষার (বিশেষতঃ 'দল' শব্দের) সমীচীনতা সম্বন্ধে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাই নীচে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সমীচীনতা সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা গেল।

অ নু ষ ঙ্গ

পর্ব, দল ও কলা, এই তিন শব্দেই বোঝায় অংশ। কিন্তু এই তিন শব্দ পরস্পরের প্রতিশব্দ নয়। কেননা, এগুলির অর্থের দ্যোতনায় কিছু পার্থক্য আছে। তাই ছন্দ-পরিভাষাতেও এই তিন শব্দে তিন ভিন্ন বস্তু বোঝায়।

পর্ব শব্দের আসল অর্থ গ্রন্থি বা অনুরূপ কোনো-কিছুর দ্বারা নির্দিষ্ট অংশ বা খণ্ড, part, period, division (মহাভারতের বনপর্ব, ইতিহাসের মৌর্যপর্ব, অঙ্গুলিপর্ব, বংশপর্ব, ইক্ষুপর্ব)। ছন্দ-পরিভাষায় পর্ব শব্দের অর্থ হল লঘুযতির দ্বারা নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিখণ্ড (foot)। এই অর্থে পর্ব শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)। এখন তা সকলেই মেনে নিয়েছেন। পর্ব শব্দের তদ্ভব রূপ পাব, পাবড়া, পাবড়ি, পাপড়ি (রূপকার্থে)।

কলা শব্দের আসল অর্থ অংশ (part), সাধারণতঃ অতি ক্ষুদ্র (minute) অংশ বা কণা (particle)। ছন্দ-পরিভাষায় উচ্চারিত ধ্বনির ক্ষুদ্রতম অংশ (mora)। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দী ছন্দশাস্ত্রে এই অর্থে কলা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রষ্টব্য বৃত্তরত্নাকর ১।৮ এবং ২।১২ ; ছন্দোমঞ্জরী (*Calcutta Sanskrit Series No. XIV*) ১।১০ এবং ৬।১৩; প্রাকৃতপৈঙ্গলম্‌ ১।১২, ১৫-৩০ ; এবং 'ছন্দোপ্রভাকর' প্রভৃতি হিন্দী ছন্দগ্রন্থ। বিখ্যাত

প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ H. T Colebrooke ১৮০৮ সালে *Asiatic Researches* পত্রিকায় *On Sanskrit and Prakrit Poetry* নামক তথ্যবহুল প্রবন্ধে বহুলভাবে 'কলা' শব্দ এবং তার সাংকেতিক চিহ্ন হিসাবে *k* অক্ষর ব্যবহার করেছেন—যেমন চার, পাঁচ, ছয় কলা বোঝাতে লিখেছেন *4k*, *5k*, *6k*। প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তাঁর *Miscellaneous Essays* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের E. B. Cowell-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৭৩), পৃ ৫৭-১৮৭। বাংলায় 'কলা' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় নরহরি চক্রবর্তীর (অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ) 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থে। আধুনিক কালে বোধ করি আমিই এ শব্দটি চালাই কোনো কোনো প্রবন্ধে এবং 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৫২ আষাঢ়)। তারপর থেকে আমি সর্বদাই এ শব্দটি ব্যবহার করছি। হিন্দী অঞ্চলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছেও এ শব্দটি সুপরিচিত। বাংলায় এটিকে অচল মনে করার কোনো হেতু দেখি না বরং সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দীর চেয়ে বাংলাতেই এ শব্দটি চালাবার প্রয়োজন বেশি। সে কথা 'মাত্রা' শব্দের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যাবে।

অংশ অর্থে 'কলা' শব্দের অপারিভাষিক প্রয়োগ দেখা যায় সাধারণতঃ চন্দ্রকলা সকল ও বিকল এই তিনটি মাত্র শব্দে। আর রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের মাত্রা' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধে পর্ব বা উপপর্ব অর্থে অংশবোধক 'কলা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কলা শব্দকে পর্ব বা উপপর্বের স্থলবর্তী পরিভাষা রূপে গ্রহণের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি না।

দল-শব্দের মুখ্যার্থ অর্থাৎ ধাতুগত তথা আভিধানিক অর্থ অংশ, খণ্ড, বিভাগ part, piece, division। ছন্দ-পরিভাষায় একপ্রযত্নোচ্চারিত শব্দাংশ (syllable)। সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ হিসাবে আমি 'দল' শব্দ প্রয়োগ করছি দীর্ঘকাল যাবৎ। দুই, তিন ও চার সিলেব্‌ল্-এর শব্দকে যথাক্রমে বলি দ্বিদল, ত্রিদল ও চতুর্দল শব্দ। 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থে (১৩৩৮ পৌষ) প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধে আছে সিলেব্‌ল্-বোধক 'দল' শব্দের প্রথম প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মৌখিক আলোচনাকালে এ শব্দটি তাঁরও অনুমোদন পেয়েছিল। দ্রষ্টব্য 'ছন্দ-বিচার' প্রবন্ধ, বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ।

সিলেব্‌ল্ অর্থে 'দল' শব্দ প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দিহান। তাঁরা মনে করেন 'অক্ষর'-ই সিলেব্‌ল্-এর যথার্থ প্রতিশব্দ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত

ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর ও বর্ণ সমার্থক শব্দ। অক্ষরবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত অভিন্নার্থক। হিন্দীতেও তাই। প্রাকৃত ও হিন্দী ছন্দশাস্ত্রে অক্ষরের চেয়ে বর্ণ শব্দেরই প্রয়োগ বেশি। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দী ছন্দশাস্ত্রের বর্ণ বা অক্ষর আর ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ এক বস্তু নয়। কেননা সিলেব্‌ল্‌ মানে শব্দের উচ্চারণবিভাগ, আর অক্ষর হচ্ছে শব্দের লিপিবিভাগ। অর্থাৎ একটি হল উচ্চারিত শব্দাংশের শ্রুতরূপ, অপরটি লিখিত শব্দাংশের দৃষ্টরূপ। এই দুই বস্তু সব সময় এক হয় না। যেমন 'সুপ্তি' শব্দের সিলেব্‌ল্‌-বিভাগ হল সুপ্‌-তি, আর অক্ষরবিভাগ সু-প্তি। এই দু-রকম বিভাগ যে অভিন্ন নয় তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া 'ঘুম' শব্দে দুই বর্ণে এক 'অক্ষর', কিংবা man শব্দে তিন বর্ণে এক 'অক্ষর' বললে খটকা লাগে। পক্ষান্তরে 'ঘুম' শব্দে দুই অক্ষরে এক সিলেব্‌ল্‌ কিংবা man শব্দে তিন অক্ষরে এক সিলেব্‌ল্‌ বললে কোনো খটকা লাগে না। তাই অক্ষর-কে সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিশব্দ বলে বলে গ্রহণ করা যায় না। আসল কথা, যে কারণেই হোক ভারতীয় মনে পাশ্চাত্ত্য সিলেব্‌ল্‌-এর ধারণাই ছিল না, তাই ভারতীয় ভাষাতেও সিলেব্‌ল্‌-বোধক কোনো শব্দ রচিত হয় নি। আর পাশ্চাত্ত্য ভাষাতেও ভারতীয় ধাঁচের অক্ষর-বোধক কোনো শব্দ নেই। তাই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা অগত্যা সিলেব্‌ল্‌কেই ভারতীয় ছন্দশাস্ত্রের অক্ষর তথা বর্ণ শব্দের প্রতিরূপ বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।[১] কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, অক্ষর বা বর্ণ শব্দের দ্বারা open syllable বোঝালেও কখনও closed syllable বোঝায় না। যুক্তাক্ষর বা যুক্তবর্ণের স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। যুক্ত সিলেব্‌ল্‌ বলে কোনো বস্তু নেই। 'কশ্চিৎ কান্তা' অংশের অক্ষর- বা বর্ণ-বিভাগ হল ক-শ্চি-ৎকা-ন্তা। এর প্রত্যেকটিই open syllable। অথচ ওই অংশের শ্রুতিসম্মত সিলেব্‌ল্‌-বিভাগ হল কশ্‌-চিৎ-কান্‌-তা। এর প্রথম তিনটি closed, শেষটি open।

অক্ষর আর সিলেব্‌ল্‌ যে এক বস্তু নয়, এ কথাটি প্রথম বুঝেছিলেন রামমোহন রায়। আধুনিক কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাখালরাজ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায় এবং রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ অনেকেই স্পষ্ট ভাষায় এ

১. দ্রষ্টব্য N. B. Halhed প্রণীত A Grammar of the Bengal Language গ্রন্থের (১৭৭৮) ছন্দ-প্রকরণ, পৃ ১৯৬-২০৭ এবং H. T. Colebrooke-এর Miscellaneous Essays দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৮৭ ও ১৪১।

কথা বলেছেন। কিন্তু সিলেব্‌ল্‌-এর বাংলা কি হবে, সে বিষয়ে তাঁদের মতসাম্য নেই। রামমোহন বলেছেন 'ধ্বন্যাঘাত', সত্যেন্দ্রনাথ চালিয়েছেন 'শব্দ-পাপড়ি', দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ 'মাত্রা' শব্দকেই এ কাজে লাগিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ধ্বন্যাঘাত ও শব্দ-পাপড়ি পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহারযোগ্য নয়। ছন্দ-আলোচনায় 'মাত্রা' শব্দ চলে অন্য অর্থে, তাই ওই একই শব্দ দিয়ে সিলেব্‌ল্‌ বোঝাতে গেলে বিভ্রান্তি ঘটে। কোনো বিশেষ আলোচনায় একই শব্দকে দুই অর্থে চালানো বিভ্রান্তিকর। তাই সিলেব্‌ল্‌-এর অন্য প্রতিশব্দ প্রয়োজন।

কিছুকাল আমি সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'ধ্বনি' এবং closed syllable ও open syllable অর্থে 'যুগ্মধ্বনি' ও 'অযুগ্মধ্বনি', এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছি। কিন্তু মন প্রসন্ন ছিল না। কারণ ছন্দ-আলোচনাতেই ধ্বনি শব্দের অন্যবিধ প্রয়োগ অনিবার্য,—যেমন ধ্বনিগাম্ভীর্য, ধ্বনিমাধুর্য। তাই রাজশেখর বসু মহাশয়ের সঙ্গে পত্রালাপ করি সিলেব্‌ল্‌-এর সুষ্ঠুতর প্রতিশব্দের জন্য। তিনি জানালেন অক্ষর ও ধ্বনি সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে একমত, তার জন্য নূতন শব্দ চাই; তবে সন্তোষজনক প্রতিশব্দ না পাওয়া পর্যন্ত 'ধ্বনি'-ই চলুক। পরবর্তীকালে তিনি 'বাংলা ছন্দের শ্রেণী' নামে এক প্রবন্ধে (পরিচয় ১৩৫২ কার্তিক) এই অভিমতই ব্যক্ত করেন। এখানে ওই প্রবন্ধের একটা অংশ উদ্ধৃত করি।—

> "সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দে সিলেব্‌ল্‌ ও হরফ দুই-ই বোঝায়। তা ছাড়া ইংরেজি ও সংস্কৃতের syllable একই উপায়ে নিরূপিত হয় না। এই গোলযোগের জন্য অন্য প্রতিশব্দ দরকার। প্রবোধবাবু 'ধ্বনি' চালিয়েছেন কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে কিছু আপত্তি করবার আছে।…নূতন পরিভাষা স্থির করবার সময় যথাসম্ভব দ্ব্যর্থ পরিহার বাঞ্ছনীয়। বহুকাল পূর্বে কোনও প্রবন্ধে syllable-এর প্রতিশব্দ 'শব্দাঙ্গ' দেখেছিলাম। এই সংজ্ঞায় দ্ব্যর্থের আশঙ্কা নেই, কিন্তু শ্রুতিকটু। সেজন্য এখন প্রবোধবাবুর 'ধ্বনি'ই মেনে নিচ্ছি। আশা করি পরে আরও ভাল সংজ্ঞা উদ্ভাবিত হবে।"

এই প্রবন্ধটি পরে রাজশেখরের 'লঘুগুরু' গ্রন্থে সংকলিত হয়।—দ্রষ্টব্য 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী', প্রথম খণ্ড (১৩৭৬ পৃ ৫১০)। সিলেব্‌ল্‌ অর্থে শব্দাংশ, শব্দাণু শব্দের প্রয়োগও দেখেছি। কিন্তু শব্দাঙ্গের ন্যায় এ দুটি ভারী শব্দও চালানো কঠিন। কালিদাস রায় চালিয়েছেন 'পদাংশ' বা 'পাদক'। এ শব্দটি দুর্বহ নয়, তাই অচলও নয়। দেখা যাচ্ছে 'অক্ষর' যে সিলেব্‌ল্‌ নয়, এ ধারণা

বহুব্যাপক, রামমোহন থেকে রাজশেখর পর্যন্ত বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই ধারণা পোষণ করেন এবং এই ধারণা দৃঢ় ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

'পাদক' শব্দটি অচল নয়। কিন্তু এটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া ছন্দশাস্ত্রে প্রচলিত 'পাদ' শব্দের রূপভেদ বলে মনে সংশয়ও দেখা দিতে পারে। তাই 'দল' শব্দ সুষ্ঠুতর বলে মনে করি। দল্ ধাতুর অর্থ খণ্ডিত করা, বিভক্ত করা, বিদীর্ণ করা, to divide, to split। তাই 'দল' শব্দের ধাতুগত অর্থ খণ্ড, ভাগ। বাংলায় এই অর্থ সুপ্রচলিত নয়। তবে তার পরোক্ষ প্রয়োগ আছে। যেমন সেনাদল মানে *division* of an army। একই সঙ্ঘ ভেঙে নানা খণ্ডে বিভক্ত হলে এক-এক খণ্ডকে বলি 'দল', আর বিভিন্ন দলের কলহকে বলি 'দলাদলি'। মুগ-জাতীয় দ্বিদল শস্য যখন অখণ্ডিত অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলি মুগ, ছোলা ইত্যাদি, যখন ভেঙে দ্বিধাবিভক্ত করা হয় তখন বলি মুগের 'দাল', ছোলার 'দাল' ইত্যাদি, রূপান্তরে 'ডাল'। দ্রষ্টব্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে দাল ও ডাল শব্দ। দাল (দাইল) 'দ্বিদল' শব্দ থেকে উদ্ভূত কিনা তা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য বিষয়। হিন্দীতে দল্ ধাতুজাত শব্দের চল অপেক্ষাকৃত বেশি। 'হিন্দী শব্দার্থ-পারিজাত' অভিধান থেকে কয়েকটি শব্দের অর্থ উদ্ধৃত করছি। দল—খণ্ড, টুকড়া, আধা; দলদার—মোটে দল-ওয়ালা; দলন—টুকড়ে টুকড়ে করনা; দলনা—দাল বনানা, দো টুক করনা, দাল অলগ অলগ করনা; দলিয়া—অধকুট্টা, মোটা পীসা হুয়া অন্ন (খণ্ড খণ্ড করা গম, গমের খুদ); দলী—দলিত, দো টুক কী গঈ; দাল—দলা হুয়া চনা অরহর মুঁগ আদি। সংস্কৃত 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থের (*Calcutta Sanskrit Series, No. XIV*) ষষ্ঠ স্তবকের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রে আছে 'দল' আর পঞ্চম সূত্রে আছে 'শকল'। দল ও শকল শব্দ সমার্থক। টীকাতে আছে 'দলয়োঃ খণ্ডয়োঃ, শকলয়োঃ খণ্ডয়োঃ'। স্পষ্টতঃই দল ও শকল শব্দ সাধারণভাবেই শ্লোকখণ্ড অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, কোনো বিশেষ পারিভাষিক অর্থে নয়। প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'দল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় গন্ধাণ, উল্লাল, ঝুল্লণা, খঞ্জা, দণ্ডকল প্রভৃতি ছন্দের লক্ষণ-নির্দেশ-প্রসঙ্গে। সর্বত্রই এ-শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে শ্লোকাংশ (অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ) অর্থে, কোনো বিশেষ পারিভাষিক অর্থে নয়।

অতএব বাংলায় এক-প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দাংশ, এই নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে 'দল' শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখি না। ইংরেজি

সিলেব্‌ল্‌ শব্দের দ্বারা এক-এক বারে উচ্চার্য শব্দাংশ (part of a word) বোঝায়। তাই বাংলায় অনুরূপ অর্থ বোঝাবার জন্য অংশবোধক 'দল' শব্দের নির্বাচন সর্বতোভাবেই সমীচীন মনে করি। কারণ 'দল' শব্দের এই অর্থ নিঃসন্দেহে ব্যাকরণ ও অভিধান-সম্মত। অধিকন্তু শব্দটি ছোট, সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য। তাই দল, মুক্তদল (open syllable) ও রুদ্ধদল (closed syllable), এই শব্দ তিনটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে বহু পাঠকের অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রবীণ ছান্দসিক কালিদাস রায় এবং দিলীপকুমার রায় সিলেব্‌ল্‌ অর্থে দল শব্দ-প্রয়োগের সমীচীনতা স্বীকার করেছেন।[১] বর্তমানে অন্য ছান্দসিকদের মধ্যেও, বিশেষতঃ তরুণ ছান্দসিকদের মধ্যে, এই তিন পরিভাষা ব্যবহারে মনের দ্বিধা ও সংশয় ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে।

দল শব্দের ধাতুগত মূল অর্থ খণ্ড, অংশ। ইংরেজি part ধাতু থেকে উৎপন্ন party শব্দও মূলতঃ অংশ (part)-সূচক। তাই party শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ দল। দল শব্দের গৌণার্থ বা রূপকার্থ পাপড়ি (ত্রিদল, চতুর্দল বা পঞ্চদল পুষ্প, শতদল কমল) বা পাতা (দূর্বাদল, বিল্বদল, নলিনী-দলগত-জলমতিতরলম্‌)। এই অর্থ প্রত্যক্ষতঃ দল্‌ ধাতু থেকে উৎপন্ন নয়।

মাত্রা শব্দের মৌলিক অর্থাৎ ধাতুগত অর্থ পরিমাপের উপকরণ, সে উপকরণের সংখ্যা-অনুসারে কোনো কিছুর পরিমাণ নিরূপণ করা হয়, unit of measure। বস্তুভেদে তার মাত্রাও অর্থাৎ unit of measureও বিভিন্ন হয়। যেমন কঠিন বা তরল বস্তুর, দৈর্ঘ্যের, কালের, তাপের মাত্রা। আবার পরিমেয় বস্তুর আয়তনভেদেও মাত্রা বিভিন্ন হয়। যেমন গজ, ফুট, ইঞ্চি ; বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড। ঘণ্টার মাত্রা মিনিট, মিনিটের মাত্রা সেকেণ্ড। ছন্দের বেলাতেও তাই। পঙ্‌ক্তির মাত্রা পদ, পদের মাত্রা পর্ব, পর্বের মাত্রা কলা বা দল।[২] রবীন্দ্রনাথ মাত্রা শব্দটিকে সর্বদাই এই মৌলিক অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

১. দ্রষ্টব্য যথাক্রমে 'নবপ্রবেশিকা ব্যাকরণ' (দ্বিতীয় সং), ছন্দ-প্রকরণ, পৃ ২১০ এবং 'ছান্দসিকী' (দ্বিতীয় সং ১৯৬৮), প্রথম অধ্যায়, পৃ ২১-২৩ ও পরিশিষ্ট-খ, পৃ ২৮৮-৮৯।

২. ইংরেজিতে pentameter ও hexameter মানে পঞ্চমাত্রক ও ষন্মাত্রক ছন্দপঙ্‌ক্তি। এস্থলে এক-একটি পর্বই (foot) পঙ্‌ক্তির মাত্রা (metros বা metron) বলে স্বীকৃত।

দ্রষ্টব্য তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৬২ সং), পৃ ৩৪-৩৫ এবং ২৬৯-৭৮। তিনি যখন বলেন, 'ফল' শব্দ ছড়ার ছন্দে এক মাত্রা, অথচ সাধু ছন্দে দুই মাত্রা তখন স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর মতে ছড়ার ছন্দে এক সিলেব্‌ল্ অর্থাৎ এক দলই এক মাত্রা আর সাধু ছন্দে ওই দলের অর্ধাংশ অর্থাৎ এক কলাই এক মাত্রা। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে শুধু কলা-ই ছন্দের মাত্রা রূপে গণ্য হত। তাই কলা ও মাত্রা শব্দকে অভিন্নার্থক বলে মনে করা হত। বাংলায় দু-রকম মাত্রাই (unit of measure) চলে, তাই কলা ও মাত্রাকে সমার্থক মনে করা সংগত নয়। কলামাত্রা ও দলমাত্রা, এ দু-রকম মাত্রা স্বীকার করাই যুক্তিসংগত।

পর্ব, কলা, দল ও মাত্রা, এই চারটি পরিভাষার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য লেখকের 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থের (১৯৬৫) 'পরিভাষা-পরিচয়' অধ্যায় এবং দিলীপকুমার রায় প্রণীত 'ছান্দসিকী' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সং ১৯৬৮) 'পরিশিষ্ট-ক' অংশ।*

* এই 'অনুষঙ্গ' অংশটুকু 'ভাষা' পত্রিকা (প্রথম বর্ষ, তৃতীয় প্রকাশ) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বাংলা ছন্দের পরিভাষা

দিলীপকুমার-প্রবোধচন্দ্র-পত্রসংলাপ

উত্তরপক্ষ ‘রুচিরা’

১ শান্তিনিকেতন

১৭ বৈশাখ ১৩৭৩

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুহৃদ্‌বরেষু

আপনার পত্র যথাসময়েই পেয়েছি স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ নীলরতনের মধ্যস্থতায়। কিন্তু কর্মচক্রের আবর্তনে এমনই বিভ্রান্ত হয়ে ছিলাম যে, যথাসময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। নীলরতনের কাছে যে সময় প্রার্থনা করে রেখে-ছিলাম তার মেয়াদও ফুরিয়ে এল। তাই আর কালহরণ না করে উত্তর লিখতে বসেছি। কিন্তু বসেও তেমন উৎসাহ পাচ্ছি নে কেন? দেখলাম তার উত্তরটা আপনিই দিয়ে রেখেছেন।—"সত্তর বৎসর বয়স হল তো। কবে ডাক আসে কে জানে?…এখন ছন্দবিতর্কে রসও পাই না তেমন।"

আপনাতে ও আমাতে বয়সের তফাত তো মাত্র তিনচার মাসের। এই ১৫ই বৈশাখ সত্তরে পা দিলাম। এখন কি আর কোনো বিতর্কেই রস পাওয়া যায়? তবু তর্কের জবাব দিতে বসলাম কেন? তারও উত্তর দিচ্ছি আপনার ভাষাতেই।—"আমি সত্যজিজ্ঞাসু। তর্কের জন্যে তর্ক করি না।"

সারাজীবন ধরে তর্ক তো আমি কম করি নি। কিন্তু মজা এই যে, অন্যের সঙ্গে যত না তর্ক করেছি, তার চেয়ে ঢের বেশি তর্ক করেছি নিজের সঙ্গে। নিজের মত খণ্ডন করতে করতে, নিজের চিন্তার আবরণ মোচন করতে করতেই এগিয়ে চলেছি। জানি না এগোবার আর কোনো উপায় আছে কি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পরজন্ম সত্য হলে

"আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।"

আমার তো মনে হয় নিত্য নব নব জন্মলাভ করেই চলেছি, ফলে নিত্যই নিজের

লেখার সমালোচনাও করতে হচ্ছে। তাই নিজের সঙ্গে নিজের তর্কেরও বিরাম নেই। এটাই বোধ হয় জীবনের নীতি। আপনার সঙ্গে যে তর্ক করতে বসেছি, সেটাও তো আসলে নিজের সঙ্গেই তর্ক। যাঁরা সহৃদয়তার সঙ্গে আমার চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেন, আমার তর্কবুদ্ধিকে সজাগ করে রাখেন, তাঁদের আমি পরমাত্মীয় বলেই মনে করি। আপনার সবরকম লেখার মধ্যেই আমি একটা গভীর হৃদয়বত্তার স্বাদ পাই। যাঁরা নিছক তার্কিক, নীরস তার্কিক, তর্কের খাতিরেই তর্ক করেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। আমার বিশ্বাস আপনি জীবনে জ্ঞানকে বুদ্ধিকে একান্ত করে দেখেন না, হৃদয়কে প্রেমকেই আপনি বড় বলে জানেন। আপনি তর্ক তুললেও তাতে প্রীতির রস থাকে। তাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহের অভাব হয় নি। নইলে তর্ককুস্তির আখড়ার ধারও আমি মাড়াতাম না। তবু বলে রাখছি আমি খুব সংক্ষেপেই জবাব দিতে চেষ্টা করব। অন্যকে বোঝাতে হলে হয়তো অনেক কথা দরকার। আপনাকে বেশি কথা বলা বোকামি মাত্র। সে বোকামি করব না। আপনি ভাবগ্রাহী। যদি আমার কথার মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে, আপনি হৃদয় দিয়ে তা পূরণ করে নেবেন।

আমার 'ছন্দপরিক্রমা' বইখানির আলোচনা-প্রসঙ্গেই আপনি কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নগুলি প্রায় সবই পরিভাষাবিষয়ক। আমার কয়েকটি পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা বা সুষ্ঠুতা সম্বন্ধে আপনার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পেশ করছি। কিন্তু তারও আগে কবুল করছি যে, আপনার কোনো কোনো উক্তি বা মন্তব্য আমি পুরোপুরি মেনে থাকি।

১. আপনি বলেছেন ছন্দে 'গণনার য়ুনিটকেই আমি মাত্রা নাম দিতে চাচ্ছি'। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তবে কি না বিভিন্ন রীতির ছন্দে তো বিভিন্ন রকম য়ুনিট থাকতে পারে। যেমন মাত্রাবৃত্ত (quantitative) রীতির ছন্দের য়ুনিট ও দলবৃত্ত (syllabic) রীতির ছন্দের য়ুনিট এক নয়। দলবৃত্ত মানে 'দলমাত্রিক', অর্থাৎ সেই ছন্দোরীতি যে রীতিতে প্রত্যেকটি দলই (syllable) এক য়ুনিট বলে গণনীয় হয়। এই রীতিতে দলই মাত্রা। তা হলে মাত্রাবৃত্ত মানে হয় 'মাত্রামাত্রিক'। অর্থাৎ এই রীতিতে মাত্রাই মাত্রা। আরও পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করি। ইংরেজি 'য়ুনিট' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'মাত্রা'। বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণে বিভিন্ন রকম য়ুনিট বা মাত্রার প্রয়োগ হয়। এই য়ুনিটভেদ বা মাত্রাভেদ প্রকৃতিগতও হতে পারে, আয়তনগতও হতে পারে।

যেমন—কোনো জিনিষের মাপের য়ুনিট (মাত্রা) হল মিটার, আর-এক রকম জিনিস মাপার মাত্রা হল লিটার। এই পার্থক্য প্রকৃতিগত। এগুলিরই আয়তনগত পার্থক্য বোঝাতে কিলোমিটার, মিলিমিটার প্রভৃতি মাত্রানাম ব্যবহার করতে হয়। ছন্দের বেলাতেও তাই। একজাতীয় ছন্দের য়ুনিট বা মাত্রা হল 'দল'—এই জাতীয় ছন্দকে বলা যায় 'দলমাত্রিক' বা 'দলবৃত্ত', আর-এক জাতীয় ছন্দের য়ুনিট বা মাত্রা হল 'কলা'—এইজাতীয় ছন্দকে বলা যায় 'কলামাত্রিক' বা 'কলাবৃত্ত'। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে দলই মাত্রা, আর অন্য ক্ষেত্রে কলাই মাত্রা। দল, কলা এগুলি মাত্রার নাম। মনে রাখতে হবে পর্ব, পদ, পংক্তি এগুলিও মাত্রানাম। শ্লোক বা স্ট্যানজার মাত্রা পংক্তি, তাই বলি এই শ্লোকে চার পংক্তি, ওই স্ট্যানজায় দশ পংক্তি পংক্তির মাপের য়ুনিট বা মাত্রা পদ—ত্রিপদী, চৌপদী পংক্তি বললে 'পদ'কেই মাত্রা বলে ধরা হয়। যখন বলি চৌপর্বিক বা পঞ্চপর্বিক পংক্তি তখন পর্বকেই মাপের মাত্রা ধরা হয়। যখন বলি চার দলের পর্ব তখন দলকেই পর্বমাপের মাত্রা (য়ুনিট) বলে ধরা হয়। আবার যখন বলি পাঁচ কলার পর্ব তখন কলাই হয় মাত্রা বা য়ুনিট। দলমাত্রিক, কলামাত্রিক নামের দ্বারা বিশেষ বিশেষ রীতির ছন্দের মাত্রাপ্রকৃতি সূচিত হয়। বলাবাহুল্য, কলা বলতে বুঝি কলাগত মাত্রা বা য়ুনিট, একটি হ্রস্ব বর্ণের উচ্চারণকাল। এই কালগত য়ুনিটকে যদি বলি 'মাত্রা', তাহলে quantitative ছন্দকে বলতে হয় 'মাত্রামাত্রিক'। এই নাম চলতে পারে না, আর তাহলে 'দলমাত্রিক' নামটাও হবে নিরর্থক। আর-এক ভাবে বলি। যেমন দিনের মাত্রা ঘণ্টা, ঘণ্টার মাত্রা মিনিট, মিনিটের মাত্রা সেকেণ্ড, তেমনি শ্লোকের মাত্রা পংক্তি, পংক্তির মাত্রা পদ, পদের মাত্রা পর্ব, পর্বের মাত্রা দল অথবা কলা—কোনো রীতিতে কলা, কোনো রীতিতে দল। এই বাক্যটিতে মাত্রা শব্দের স্থলে ইংরেজি য়ুনিট কথাটা বসিয়ে যান কিংবা সমস্ত বাক্যটাতে ইংরেজিতে অনুবাদ করুন তাহলেই আশা করি 'কলা' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা বোঝা যাবে। মাত্রা বলতে যদি শুধু time unitই বোঝাত তাহলে উক্ত বাংলা বাক্যটির কোনো মানে হত না এবং ডাক্তার যদি ছয় মাত্রা ওষুধ ব্যবস্থা করে যান তাহলে ছন্দোবিৎ রোগী ভাববেন যে, ডাক্তারেরই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা আশু প্রয়োজন। বস্তুতঃ মাত্রা বলতে যে-কোনো রকম য়ুনিটই বোঝায়, শুধু time unit নয়। তাহলেই প্রত্যেক রকম য়ুনিটের জন্য আলাদা আলাদা নাম দরকার। আমাদের ভাষায় ছন্দের time unit-এর কোনো 'বিশেষ'

নাম নেই, সাধারণ unit-সূচক 'মাত্রা' শব্দটি দিয়েই কাজ চালানো হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় ওরকম নাম থাকা বিশেষ প্রয়োজন, এমন কি অত্যাবশ্যক। তাই আমাকে 'কলা' শব্দটা চালাতে হয়েছে।

এই তর্কটা বিশুদ্ধ লজিকের তর্ক। জানি না এখনও আমার মনোগত যুক্তিটাকে পরিষ্কার করে বোঝাতে পেরেছি পেরেছি কিনা।

এখানে বলা উচিত যে, 'কলা' শব্দটি আমি নিয়েছি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র থেকেই। ওটা আমার বানানো নয়। ওই শাস্ত্রে চার কলার বা পাঁচ কলার পর্ব বলতে প্রায়ঃশই 'চতুষ্কলগণঃ', 'পঞ্চকলগণঃ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কলা শব্দের ইংরেজি mora কথাটাও আপনার ভালো লাগে না। ইংরেজিতে মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় ও শব্দটার প্রয়োজন হয় না। এক সময়ে কোলব্রুক সাহেব সংস্কৃত ও প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত (Quantitative) ছন্দের য়ুনিট বোঝাতে ইংরেজিতে metrical moment বা instant ব্যবহার করতেন। বলা বাহুল্য, এরকম নাম চালানো কঠিন, তার প্রকৃতিও ঠিক পারিভাষিক নয়। পারিভাষিক নাম হওয়া চাই সংক্ষিপ্ত, কিছু পরিমাণে সাংকেতিক এবং নির্দিষ্টার্থক বা রূঢ়ার্থক। Mora শব্দটা এই হিসাবে বেশ ভালোই বলতে হবে। পারিভাষিক শব্দের রূপভেদ ঘটানোও সহজসাধ্য হওয়া চাই। Mora থেকে বিশেষণ moric সহজেই হয়। কিন্তু moment, instant বা beat শব্দকে এভাবে রূপান্তরিত করা যায় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিচয়প্রসঙ্গে ইংরেজিতেও mora শব্দের প্রয়োগ বিরল নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত A. B. Keith তাঁর *History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে (১৯২৮) The Metres of Classical Poetry নামক উপচ্ছেদে সংস্কৃত মাত্রাছন্দ-প্রসঙ্গে লিখেছেন (পৃ ৪১৮)—

"Probably from popular poetry, there come to be used metres in which only the sum total of *morae* was absolutely fixed, there being indeed certain restrictions as to the mode in which these morae could be made up, but such restrictions allowing a variation in the number of syllables, the Matrachandas."

অন্যত্র আছে—

"More complex is the case of the Arya, which is recognised by metrical treatises as Ganacchandas, the number of *morae* and the number of feet (*gana*) being fixed. Thus the ordinary form of the Arya has 7½ feet to the half-verse with *4 morae* in each, 30 in all."

Morae শব্দগুলির বক্রতা গ্রন্থকারের নয়, বর্তমান লেখকের। আশা করি ইংরেজিতে mora শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই। এখানে এ কথাও বলা উচিত যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই মাত্রাছন্দ ও গণচ্ছন্দের প্রসঙ্গেই 'কলা', 'চতুষ্কলগণঃ' প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

২. মাত্রা শব্দের দ্বারা সবরকম য়ুনিটই বোঝায়। বিশেষভাবে time unit বোঝাবার মতো কোনো শব্দ আমাদের ছন্দশাস্ত্রে নেই। তাই কলামাত্রা বোঝাবার জন্য 'কলা' শব্দটি reserve করে রাখতে হয়েছে। তেমনি অক্ষর বা বর্ণ শব্দের দ্বারা letter বোঝায়, পরোক্ষে syllableও বোঝায়। কিন্তু বিশেষভাবে সিলেব্‌ল্‌ বোঝাবার মতো কোনো শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। তাই সিলেব্‌ল্‌ বোঝাবার জন্য 'দল' শব্দটিকে reserve করতে হয়েছে। বলা উচিত যে, 'দল' কথাটিও নিয়েছি আমাদের ছন্দশাস্ত্র থেকেই। সে শাস্ত্রে 'দল' কথাটি ব্যবহৃত হয় সাধারণভাবে 'খণ্ড' অর্থে। তাছাড়া ওটা বিশেষ পারিভাষিক অর্থেও স্বীকৃত নয়। আমি 'দল' কথাটিকে বিশেষভাবে 'শব্দখণ্ড' অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌ অর্থে নূতন পরিভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছি। সুখের বিষয়, সিলেব্‌ল্‌ অর্থে দল কথাটি অনেকেরই পছন্দ হয়েছে। আপনারও হয়েছে। এটা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। আপনি লিখেছেন—

"আপনার মুক্তদল ও রুদ্ধদল চমৎকার নাম হয়েছে, দলকে syllable-এর প্রতিশব্দ ধরে।"

পরিভাষা হিসাবে 'দলবৃত্ত' শব্দটিও আপনি সমর্থন করেছেন, ব্যবহারও করেছেন। সুতরাং দাঁড়াল এই।—দল (syllable), মুক্তদল (open syllable), রুদ্ধদল (closed syllable) দলবৃত্ত (syllabic) এই কয়টি পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগে আপনার পূর্ণ সম্মতি আছে। এটা আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয়। কেননা, অন্য অনেকের চেয়ে আপনার সম্মতির মূল্য অনেক বেশি বলেই আমি মনে করি।

৩. অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন—"আমার বক্তব্য এই যে, possession শুধু যে nine-tenths in law তাই নয়, ছন্দেও তাই।" আপনার এ কথার সত্যতা অস্বীকার করি না, করা যায় না। তার পরে আপনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—"অবশ্য বলতে পারেন অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত তো মাত্র সেদিনের নামকরণ—(আপনিই করেছিলেন না?)—হক। কিন্তু এ নামগুলি চলে গেছে iambic, anapaest, trochee, dactyl-এর মতন।"

'এখন কেউ এদের পদভ্রষ্ট করে' অন্য নাম চালাবার চেষ্টা করুক, তা আপনি চান না। আপনার মনোভাবেও যথেষ্ট জোর আছে এবং আমিও তা একেবারে উড়িয়ে দিতে চাই না। কিন্তু তার পরেই আপনি বলেছেন—"আমি বলি মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত ও দলবৃত্ত এই নামই থাক—সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা থাক এদের প্রকৃতির, যে ব্যাখ্যায় আপনি অদ্বিতীয়।"

তথাস্তু। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু 'স্বরবৃত্ত' গেল কোথায়? 'স্বরবৃত্ত' শব্দটাও অক্ষরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের মতো দখলদার পরিভাষা। কিন্তু আপনি তার দখলী স্বত্ব অস্বীকার করে সে স্বত্ব তুলে দিতে চাইছেন 'দলবৃত্তে'র হাতে। কেননা, possession nine-tenths in law হলেও সবটা নয়, one-tenth-এর আইনসম্মত ফাঁক থাকে। সেই ফাঁকেই তো আপনি 'স্বরবৃত্ত'কে স্বত্বচ্যুত করে সে স্বত্ব দিতে চান 'দলবৃত্ত'কে। আমিও তাই চাই, আপত্তি করি না। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের গায়ে আইনের আঁচড় একেবারেই লাগতে পারে না, তাও নয়।

কিন্তু আমি নির্মম নই। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত এই তিনটি নাম তো আমিই চালু করেছিলাম প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর আগে (১৯২২ সালে)। সুতরাং এগুলির প্রতি আমার মমতা আছে, থাকা স্বাভাবিক, কেননা আমার পক্ষে তো এরা 'মামকাঃ'। তার উপরে প্রায় অর্ধশতাব্দীর স্বত্বাধিকারী। এই অবস্থায় ভিন্ন পরিভাষারূপী পাণ্ডবরা যদি অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত প্রভৃতি মামকদের রাজ্যচ্যুত করতে উদ্যত হয় তবে ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে কি উদাসীন থাকা সম্ভব? কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী গান্ধারী যে বলেছেন, 'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর দুষ্টপরিভাষাগণে'।

এই উভয়সংকটে আমি কি করি বলুন তো? শ্যাম ও কুল, দুই দিক্ বজায়

রাখি কি করে? কেউ কেউ বলছেন, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত এরা নিখুঁত না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের বর্জন করতে হবে কেন—যেমন আপনি বলেন। অনবদ্য পরিভাষা কি কোথাও আছে? তা ছাড়া আপন সন্তান সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেই কি ত্যাগ করতে হয়? 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম্ অসাম্প্রতম্'—এই চিরাগত উক্তির তাৎপর্যটাও তো উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আর এক পক্ষ বলছেন, অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি ত্রুটিপূর্ণ পরিভাষা চালু থাকলে ছন্দ সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত সংস্কার কখনও দূর হবে না, ভ্রান্তিগুলিই ক্রমে দৃঢ়তর হবে—অতএব এক শ্রেণীর আপত্তি সত্ত্বেও কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত প্রভৃতি নূতন পরিভাষা চালাবার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। ভ্রান্ত সংস্কার দূর করা দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ, তা বলে যে তাকে পোষণ করতে হবে এমন কথা মানা যায় না। এই হল দুই পক্ষের মত। এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কি?

এবার আমার মনের আসল কথাটা খুলে বলি। আমি মনে করি চালু পরিভাষা নিরর্থক হলেও কিংবা সামান্য খুঁত থাকলেও সর্বথা বর্জনীয় নয়। এগুলিকে রূঢ়ার্থক নাম হিসাবে রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, অথচ লোকের তাতে সুবিধা হয়। যেমন—'পয়ার'। এই নামটার ব্যুৎপত্তিগত কোনো তাৎপর্য নেই, অর্থাৎ নাম শুনেই তার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার কোনো উপায় নেই। অথচ 'পয়ার' নামটার একটা রূঢ়ার্থ আছে, অর্থাৎ পয়ার কাকে বলে তা সকলেরই জানা আছে। এরকম পরিভাষা বর্জন করবার কোনো আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই ছন্দের পূর্ণপরিচায়ক একটা স্পষ্টার্থক নাম থাকাও আবশ্যক। তাই বলতে হয়, 'আট-ছয় মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপদী'রই প্রচলিত নাম 'পয়ার'। আর-একটা প্রচলিত নাম 'অমিত্রাক্ষর'। সকলেই জানেন এই নামটাও ছন্দের প্রকৃতিপরিচায়ক নয় অর্থাৎ, নামটাতে যথেষ্ট খুঁত আছে, অথচ অমিত্রাক্ষর কাকে বলে তাও সকলেই জানেন অর্থাৎ এ নামটা রূঢ়ার্থক। সুতরাং এই নামটাও বর্জনীয় নয়। কিন্তু তার একটা বিশুদ্ধ পারিভাষিক নাম থাকাও দরকার। তাই অমিত্রাক্ষরকে বলতে হয় 'অমিল প্রবহমান অপূর্ণ দ্বিপদী'। তা ছাড়া উপায় নেই। উদ্ভিদ্ বা প্রাণী-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রচলিত নাম ও পারিভাষিক নাম পাশাপাশি চলে। যেমন প্রচলিত ভাষায় যাকে বলা হয় *banana*, তারই পারিভাষিক নাম *Musa paradisiaca* (বা *sapientum*)।

এই দুই নামের কোনোটাই ছাড়া যায় না। একটা নাম আটপৌরে, আর একটা পোশাকি। দুটোরই দরকার আছে। যেমন, আপনার ঘরোয়া নাম 'মণ্টু', অনেকের কাছে এই নামটারই আদর বেশি। কিন্তু আপনার সামাজিক নাম 'দিলীপকুমার', ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্র এই নামটাই স্বীকার্য, অন্যটা নয়।

আমি তাই বলি অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি চলতি নাম চলুক, তার সঙ্গে থাকবে সেগুলির উন্নততর পারিভাষিক নাম। এই উভয়বিধ নামের সঙ্গে সেগুলির ব্যাখ্যা তো অবশ্যই থাকবে। আমার কোনো কোনো বন্ধু 'স্বরবৃত্ত' নামটা ছাড়তে রাজি নন, 'দলবৃত্ত' নামটা তাঁদের পছন্দ নয়। আপনার অনুরাগ কিন্তু দলবৃত্তের প্রতি, স্বরবৃত্তের প্রতি নয়। এইজন্যই আমি পারিভাষিক নাম হিসাবে 'দলবৃত্ত' নামটাই ব্যবহার করি; কিন্তু চলতি 'স্বরবৃত্ত' নামটাও উল্লেখ করে থাকি। তেমনি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত নাম-দুটোকেও দেশছাড়া করতে চাই না।

৪. "কলাবৃত্ত ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বললে ক্ষতি হয় কোথায় অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারি নি।"—আপনার এ কথার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে পরোক্ষভাবে। এবার প্রত্যক্ষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি। syllabic ছন্দের য়ুনিট বা 'মাত্রা' হল সিলেব্‌ল্। যেমন—ফরাসি ছন্দের মাত্রা (য়ুনিট) হল দল বা সিলেব্‌ল্। এখন প্রশ্ন—quantitative ছন্দের (ধরুন পজ্‌ঝটিকা) মাত্রা বা য়ুনিট কি ?

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্‌।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্‌॥

এটা তো quantitative ছন্দ। এই quantity-র unit বা মাত্রা কি? 'মাত্রা'ই এর মাত্রা, এরকম কথা তো বলা চলে না। আমি বলি এর প্রতি পংক্তিতে আছে ষোল কলা, ষোল কলায় ষোল মাত্রা। কলার ইংরেজি যদি হয় mora তবে বলতে হয় mora-ই এক unit এবং ষোল mora-তে ষোল unit। অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রে এক দলে এক য়ুনিট, অন্যত্র এক কলায় এক য়ুনিট (মাত্রা)। এবার বোঝাতে পেরেছি ?

৫. 'পয়ার' নামটা আপনার অপছন্দ কেন? এ নামটা তো শত শত বৎসর যাবৎ চালু আছে। এটা বাঙালির মনে এমন বদ্ধমূল হয়েছে যে, একে স্থানচ্যুত করার সাধ্য কারও নেই। এর স্বরূপও নির্দিষ্ট হয়ে আছে শত শত

বৎসর ধরে। কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ পয়ারের বর্ণনা দিয়েছেন এরকম।—

"আট-ছয় আট-ছয়,
পয়ারের ছাঁদ কয়।"

অর্থাৎ পয়ার ছন্দের দুই পংক্তিতেই আট-ছয় হিসাবে চোদ্দ মাত্রা থাকে। পয়ারের এই আকৃতিটাই চিরকালের পরিচিত। কিন্তু ইদানীং শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কয়েকটা উক্তির ফলে পয়ার সম্বন্ধে একটা নূতন ভ্রান্ত ধারণা বেশ ব্যাপক হয়েছে। জানি না এ বিষয়ে আপনার ধারণা কি। তবে এক জায়গায় 'পয়ারজাতীয়' কথাটা দেখে সন্দেহ হয়, আপনিও হয়তো এ বিষয়ে বুদ্ধদেবকে সমর্থন করেন। এখানে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমার 'ছন্দপরিক্রমা' বইএর দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'পয়ারপরিচয়'। তাতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ওই অধ্যায়ের 'পয়ার নামের অপপ্রয়োগ' উপচ্ছেদটার (পৃ ২২-২৮) প্রতি আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই।

৬. "গানে একটিমাত্র য়ুনিট আছে।…তাল কাটে মাত্রাসাম্য না হলেই। …আমরা সুরে যেভাবে মাত্রা গুণে তাল বজায় রাখি, কাব্যেও সেইভাবে মাত্রা গুণে তাল রাখি।"—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, থাকতে পারে না। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, গান যেহেতু মুখ্যতঃ কালাশ্রয়ী শিল্প তাই তার মাত্রা স্বভাবতঃই কালগত, অর্থাৎ time unitই গানের একমাত্র unit। গান অনেক সময় বাক্‌রীতির অনুবর্তন করে বটে, কিন্তু তাহলেও গান মুখ্যতঃ বাক্‌শিল্প নয়। তার প্রমাণ যন্ত্রসংগীত। কিন্তু কবিতার ছন্দ মুখ্যতঃ বাক্‌শিল্প, গৌণতঃ কালাশ্রয়ী। তাই সব রীতির ছন্দকেই সবসময় কালগত য়ুনিট অর্থাৎ কালমাত্রা বা কলা-সংখ্যার উপরে নির্ভর করতে হয় না। যেমন ফরাসি syllabic ছন্দ বা বাংলা দলবৃত্ত ছন্দ। কিন্তু এসব ছন্দও যখন গানের রাজ্যে প্রবেশ করে তখন তাকে কালমাত্রা (time unit) মেনে চলতে হয়। যে রাজ্যের যে আইন তা মানতে হবেই তো। আপনি লিখেছেন যে, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত গানের সুরে ও তালে 'কাব্যের উচ্চারণ বজায় থকে'—'সচরাচর' বা 'প্রায়ই'। 'কেবল দলবৃত্তে যথেচ্ছ বৈচিত্র্যের অবকাশ আছে।' আপনার মতো গায়ক-ছান্দসিকের এই মন্তব্যের মূল্য খুবই বেশি সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আমার মতো গীতানভিজ্ঞ শুধু এটুকুই বলতে পারে যে, দলবৃত্ত ছন্দ যেহেতু মুখ্যতঃ কালাশ্রয়ী নয় (মুখ্যতঃ দলসংখ্যাত), সেজন্যই দলবৃত্ত ছন্দের গানে 'যথেচ্ছ বৈচিত্র্যের অবকাশ' থাকে।

অন্য দুই রীতির ছন্দ মুখ্যতঃ কালাশ্রয়ী (তাই আমি দুটোকেই কলাবৃত্ত বলি), তাই ওই অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের গানে 'যথেচ্ছ' বৈচিত্র্যের অবকাশ থাকে না। তবু কিছু বৈচিত্র্য অনেক সময় থাকে। আপনাকে বলা আমার পক্ষে দুঃসাহসিকতা। তবু দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি নিজ মতের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে।—

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে।

কবিতায় অর্থাৎ বাক্‌রীতিতে এটা ছয়মাত্রা পর্বের ছন্দ, কিন্তু গানে অর্থাৎ গীতরীতিতে চারমাত্রা পর্বের। যেমন—

ঐ আসে | ঐ অতি | ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্‌ | চিত ক্ষিতি | সৌরভ | রভসে।

বলা বাহুল্য, এই গানের ছন্দে বাক্‌রীতি পদে পদেই খণ্ডিত হয়েছে। তবে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতা গানেও বজায় আছে। কারণ এটা তো মাত্রাবৃত্ত ওরফে কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ। আর একটা দৃষ্টান্ত—

তোমারি রাগিণী | জীবনকুঞ্জে |
বাজে যেন সদা | বাজে গো।

এটা মূলতঃ গান। কিন্তু কবিতা হিসাবে পড়তে হবে ছয়মাত্রা পর্বের তালে। গানে হবে সাতমাত্রার তেওরা তাল। ছন্দ বিশ্লেষণের কায়দায় এর মাত্রাবিভাগ অর্থাৎ তালবিভাগ হবে এরকম—

তোমারি রা-গিণী | জীবনকুঞ্‌জে- |
বা-জে যেন সদা | বা-জে গো··· ।

ঠিক হল তো? যা হক, একটিমাত্র রুদ্ধদল আছে এটিতে। সে দলটির দ্বিমাত্রকতা বজায় আছে। মনে রাখতে হবে এটাও মাত্রাবৃত্ত রীতিতে লেখা। কিন্তু অনেক স্থলেই মুক্তদলের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে গীতরীতির খাতিরে। তাতে বাক্‌রীতি লঙ্ঘিত হয় প্রত্যেক পর্বেই। কিন্তু গান তো বাক্‌রীতির কাছে দাসখত লিখে দেয় নি।

গানের কথা বলতে গিয়ে কিছু বেফাঁস বলি নি তো? ভুল হয়ে থাকলে শুধরে দেবেন। এ বিষয়ে আরও কিছু বলা যেত। কিন্তু সাহস হল না।

৭. দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন তাতে বেশি কথা বলার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বিষয়ে বহুকাল পূর্বে 'উদয়ন' পত্রিকায় দীর্ঘ

প্রবন্ধ লিখেছিলাম আপনারই অনুরোধে। তার পরেও নানা প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দোবৈশিষ্ট্য (বিশেষতঃ তাঁর দলবৃত্ত) সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। আপনি 'দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঞ্চয়ন' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা (পূর্বে 'বসুধারা' পত্রিকায় প্রকাশিত) করেছেন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা আছে। সুতরাং আজ এ প্রসঙ্গ থেকে নিরস্ত রইলাম।

৮. আপনার প্রথম পত্রের শেষ কথা এই।—"দোহাই ধর্ম, সংকোচক প্রসারক দলমাত্রিক বা সরল কলামাত্রিক বিশিষ্ট কলামাত্রিক -জাতীয় পারিভাষিক মঞ্জুর করবেন না। অকরুণ হবেন না মাদৃশ অভাজন অথচ কাব্যপ্রিয় ছন্দানুরাগীর প্রতি।"

অকরুণ আমি হতে চাই না। নিজের ও অপরের জ্ঞান ও কানকে তুষ্ট করাই তো আমার কাজ। 'বিশিষ্টকলামাত্রিক'-এর মতো ইষ্টক ছুঁড়ে মেরে যে পাঠককে জখম করা যায়, হৃদয় জয় করা যায় না, তা আমি জানি। আর পাঠকের হৃদয় যদি জয় করতে না পারি তবে তো লেখকজীবনের কোনো সার্থকতাই থাকে না। আমাকে আর যা-ই মনে করেন হৃদয়হীন মনে করবেন না। 'সংকোচক' লিখতেও সংকোচ বোধ করি। আর 'প্রসারক' পরিভাষাটাও কেমন 'প্রহারক'-এর মতো শোনায়। তাই দেখবেন 'ছন্দ পরিক্রমা' বইটাতে এসব প্রহারক শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করতেই চেষ্টা করেছি। আপনার মতো সহৃদয় ছন্দরসিক পাঠকদের রসানুভূতির প্রতি দৃষ্টি রেখে সম্ভব হলে ভবিষ্যতে এসব পারিভাষিক শব্দগুলিকে আরও মোলায়েম করতে সচেষ্ট হব।*

প্রীতিমুগ্ধ
প্রবোধচন্দ্র সেন

*চতুষ্কোণ, ১৩৭৩ আশ্বিন

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

আপনার ১৭ই বৈশাখের চমৎকার চিঠিটি আজ পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। ভালো করে আরও দু' চার বার পড়ে ফের লিখব।

আপনার সঙ্গে মৌলিক (fundamental) কোনও মতভেদই যে আমা

নেই, আপনি তা ভাল করেই জানেন। বলতে কি, ছন্দ সম্বন্ধে আপনিই যে আমাদের সকলেরই শিক্ষক এ কথা প্রথম থেকেই সকৃতজ্ঞেই মেনে নিয়েছি আমি —এও আপনার অজানা নেই। 'কলা' সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন প্রাণপণ চেষ্টা করে বোধ হয় বুঝবার কিনারায় এসেছি। এখানে শুধু বলে রাখি কলাকে মাত্রা বলে মেনে নেবার কোনো আপত্তিই আমার নেই—যদি কলা বাহুল্য হয় তা হলেও। কেন বলি সংক্ষেপে। সম্প্রতি কটক থেকে এক ছান্দসিক (নামটা মনে পড়ছে না) একটি ছন্দব্যাকরণ পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে আমি লিখেছি যে, আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হয়ে নতুন নতুন পরিভাষা গড়ার স্বাধীন (?) চেষ্টা করলে এ চর্চায় একান্ত পরাধীন থাকতে হবে—অর্থাৎ অসহায়। সবাইকেই এখন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের পরিভাষা মেনে নিতে হবে—না নিলে হবে বিশৃঙ্খলা—chaos…ইত্যাদি। তিনি রাগ করে উত্তর দেন নি আমার পত্রের।

এই নীতি মেনে আমি চাই আমার 'ছান্দসিকী'তে আপনার পরিভাষা মেনে নিতে। আরো এই জন্যে যে, কোনো মৌলিক মতভেদ খুঁজে পাচ্ছি না। পরিভাষা নিয়ে একটু আধটু grumbling (গুঞ্জন এর বাংলা নয়, গোঙানি বলাও সুশ্রাব্য নয়, অসত্যও বটে), এতে কার কী ক্ষতি? তাই আমি আপনার অনুমতি চাই এ চিঠিটি 'ছান্দসিকী'র দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে ছাপিয়ে সই করব—'তথাস্তু'। এ সইয়ের দরকার আছে। সংস্কৃতে বলেছে—তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ—বিরুদ্ধ ছান্দসিক কোন্ ছার। আমায় তাই অন্যতম তৃণ বলে স্বীকার করে আপনার মূল ছন্দরজ্জুতে জড়িয়ে নেবেন। হলামই বা তৃণ—জুড়লে তো তার শক্তি বাড়ে একটুও অন্ততঃ।

আপনার এ পত্রটির ছত্রে ছত্রে রসিকতা ফুটে উঠেছে চমৎকার। আপনি বয়সে আমার চেয়ে দেখছি তিন মাসের ছোট। তাই হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ সহসা আপনার রসিকতার তৃণাঙ্কুর দেখে। আপনার পাষাণদুর্ভেদ্য যুক্তিদুর্গে এ তৃণের আবির্ভাব বড়ই উপাদেয়। আমি বরাবরই আপনার সঙ্গে তর্ক করবার সময়ে মনে মনে ভয়ে ভয়ে বলেছি—"এ রাম মনুষ্য নয়"। আপনার আকস্মিক হাস্যসরসতায় আমার সে ধারণা আরো পুষ্ট হল।

কিন্তু ঠাট্টা না। সত্যিই সময় আসছে ছন্দপরিভাষা চালু করবার। আপনিও সংকোচক-প্রসারকের প্রশ্রয় দিতে চান না জেনে বিপুল হর্ষ আমায় পেয়ে বসেছে।

পরে আপনার পত্রের বড় করে উত্তর দেবার ইচ্ছা রইল, কিন্তু হয়ে উঠবে কিনা বলতে পারি না। তাই আরো ঝটিতি অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, আপনার রসিকতা যাকে বলে disarming—আপনার কোনো পত্রেই এর আগে রসিকতার আমেজ পাই নি। আমি আমার পিতার ধর্মী তো, তাই আরো পুলকিত হয়েছি।

যাই হোক, আপনি আশা করি অনুমতি দেবেন এ পত্রটি ছাপতে। 'ছান্দসিকী' আজো প্রকাশিত হয় নি। 'মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল' বেরিয়েছে। এটি আপনাকে পাঠাচ্ছি। 'ছান্দসিকী' বেরুতে দেরি হয়ে ভালোই হয়েছে। "ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যে" ঘরোয়া প্রবচনটি সত্যভিত্তিক বৈকি। কারণ ছান্দসিকী আগে বেরিয়ে গেলে আপনার পত্রটি পরিশিষ্টে জুড়ে দেওয়া অসম্ভব হত।

আপনার শরীর ভাল যাচ্ছে না শুনে চিন্তিত হই মাঝে মাঝে। আপনার কাজ এখনো ফুরোয় নি। শতায়ু হোন—এই প্রার্থনা। কেবল আমাকে ও শুভেচ্ছাটি ফিরিয়ে দেবেন না to return the compliment। ইতি

শতায়ুসম্ভাবনাত্রস্ত গুণগ্রাহী

দিলীপ

৩

১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দোবিশারদেষু

আপনার ১৭ই বৈশাখের পত্রটি পেয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। খুব মন দিয়েই পড়েছি দু-দুবার। ফলে আমার মনের মধ্যে অনেক ঝাপসা ধারণার কুয়াশা কেটে গেছে আপনার স্বচ্ছ ভাষ্যকিরণে।

আমি আপনার 'ছন্দপরিক্রমা'র পথে আবার পা পা করে চলতে গিয়ে অবশেষে 'কলা'-কে কেন আপনি আবাহন করেছেন বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যা বুঝেছি তা আর বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা বলে আপনার চিঠিটিকেই আমার 'ছান্দসিকী' গ্রন্থে বিন্যস্ত করে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করতে চাই যে, সব জড়িয়ে আপনি যে তিনটি পারিভাষিক নাম তথা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের ছন্দের মূল ত্রিধারার, সে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমাদের সকলেরই সাদরে স্বীকার করা কর্তব্য, নৈলে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে এক এক অনির্বাচিত পরিভাষা গড়ে তুলতে চাইলে সেটা হয়ে দাঁড়াবে—যাকে বলে : **Confusion grown worse confounded**।

তা ছাড়া আপনি তো এমন কিছু বলেন নি যা মানতে বাধে। আমার শুধু বুঝতে বেগ পেতে হয়েছিল ঠিক কী জন্যে আপনি 'বাহুল্য' কলাদেবীকে বাহাল করেছেন মাত্রাদেবী হাজির থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু আপনার 'ছন্দপরিক্রমা' তথা এ প্রাঞ্জল পত্রটির প্রসাদে আমার অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরাকরণ হয়েছে। ফলে আমার মনে হয়েছে যে, স্বরবৃত্ত (ওরফে দলবৃত্তের) য়ুনিট 'দল' আর মাত্রাবৃত্ত (ওরফে কলাবৃত্তের) য়ুনিট 'কলা', এ ভেদজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরও আপনার নব নামকরণ 'মিশ্রকলাবৃত্ত'কেও অভিনন্দন না করার কোনোই হেতু নেই। আপনাকে বহু ধন্যবাদ যে, এ ছন্দটির য়ুনিট হিসেবে 'ব্যষ্টি' রূপ দুরবগাহ তথা শ্রুতিকটু শব্দকে তলব করার আর প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আমার মনে হয়, এখন আমাদের সকলেরই স্বীকার করার সময় এসেছে যে, বাংলা ছন্দের ধারা ও প্রগতি বুঝতে হলে সব আগে দরকার দুটি জিনিষ। এক, সর্বগ্রাহ্য শ্রুতিমধুর পারিভাষিক (সরল কলামাত্রিক, বিশিষ্ট কলামাত্রিক, সংকোচক, প্রসারক -বর্গীয় ভয়াবহ নামকরণ নয়)। দুই, 'রুদ্ধদল'-এর (closed syllable) হাতেই যে বাংলা ছন্দের বোধিমহলের চাবিকাঠি এই স্বীকার। এ চাবিকাঠিটির মর্ম আপনিই সব প্রথম প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনার পঞ্চাশ বৎসরের ছন্দবিচারে, ব্যাখ্যায়, গণনায়। পরিশেষে, আমি যে আপনার সঙ্গে এ যাবৎ তর্কের জন্যেই তর্ক করি নি, বুঝতে চেয়েই আপনাকে জেরা করেছি —এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ আপনার পত্রটির শেষে আমার এ পত্রটি আনুগত্য-অঙ্গীকারের দলিল হিসাবেই পেশ করে আপনাকে সকৃতজ্ঞে আবার অভিনন্দন জানিয়ে শান্তিপাঠ করতে চাই :

হে অনন্য অভিনব পথিকৃৎ! কাব্যের কাননে
অশঙ্ক চরণপাতে, অবান্তরের নির্বাসনে,
বহুজ্ঞ অপরাজেয় অর্ধশতকের সাধনায়,
শ্রুতিধর বিশ্লেষণে, অক্লান্ত প্রবুদ্ধ জিজ্ঞাসায়,
কাঁটা দলি' ছন্দফুল ফোটাবার ভ্রান্তিজয়ী দিশা
ঝরালে প্রতিভাবলে তোমার—পোহাল তাই নিশা।

ইতি
প্রতিভামুগ্ধ
শ্রীদিলীপকুমার রায়

পুনশ্চ—কেবল একটি ক্ষেত্রে মতভেদ রইল। 'লঘুগুরু' ছন্দ সম্বন্ধে। বাংলা কাব্যকাননের বিশেষ করে গীতিকুঞ্জে এটি একটি অপরূপ ফুল বলে আমি মনে করি যে, কমনীয় বলেই বরণীয়। আপনি মনে করেন—বর্জনীয়, নয় কি? না, আপনাকে ভুল বুঝেছি?

শ্রীদিলীপকুমার রায় ২৮ ভাদ্র, ১৩৭৩

পরমপ্রীতিনিলয়েষু

আপনি যাকে বলেন 'লঘুগুরু' ছন্দ, সাধারণ ভাষায় আমি তাকে বলি 'জয়দেবী' ছন্দ। পারিভাষিক নাম প্রত্ন (অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল) কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত। জয়দেবের গানগুলির ছন্দে যে ক্লাসিক্যাল আভিজাত্য ও শোভনতা আছে তার মর্যাদা আমি সম্ভ্রমসহকারে ও নতমস্তকে স্বীকার করি। এ ছন্দের পরিমণ্ডলের মধ্যে কোথাও অর্বাচীন কালের ইতরতার লেশমাত্র নেই। এই ক্লাসিক্যাল ছন্দের মধ্যে যে একটি উদাত্ত মহিমা আছে, কোনো নব্য ছন্দে সে মহিমা সঞ্চার করা সম্ভব বলেও মনে করি না। সুতরাং বলা বাহুল্য, ও ছন্দকে আমি অবশ্যই 'বর্জনীয়' মনে করি না, বরং আপনার মতোই 'কমনীয়' ও 'বরণীয়' বলে মনে করি। শুধু তাই নয়, বালকবয়সে যখন প্রথম এ ছন্দের সাক্ষাৎ পাই তখনই এ ছন্দের বিশেষ রসের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই, সে অনুরাগ আজও সমভাবেই প্রবল আছে। আমি যে সংস্কৃত ছন্দের ভক্ত। আমি কি এ ছন্দের প্রতি বিরূপ বা উদাসীন হতে পারি?

কিন্তু বর্তমান যুগটা যে সেই ক্লাসিক্যাল মহিমা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, আমরাও বর্তমানের ইতরতার মধ্যে নির্বাসিত। তাই নিত্যপ্রয়োজনের কাজে ওই মহিমময় ছন্দকে প্রয়োগ করবার শক্তি আমরা হারিয়েছি। আমাদের আটপৌরে উচ্চারণে সে মহিমা পদে পদেই কুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত হয়। তাই 'তে হি নো দিবসা গতাঃ' বলে বিগত দিনের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। গতি কি একেবারেই নেই? আছে। এতখানি হতভাগ্য আমরা এখনও হই নি। আমরা যুগভ্রষ্ট হয়েছি বটে, কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট হই নি। মানুষ স্বর্গভ্রষ্ট হলেও দেবতার করুণাভ্রষ্ট হয় না, দেবতা তার পুনরুদ্ধারের উপায় নির্দেশ করে দেন। আমরা জয়দেবের যুগ ছেড়ে এসেছি বহুদিন পূর্বে। কিন্তু সে যুগে

ফিরে যাবার পথ দেবতা একেবারে রুদ্ধ করে দেন নি। আমাদের আটপৌরে কাজে আমরা যখন-তখন জয়দেবকে তলব করে নামিয়ে আনতে পারি না বটে, কিন্তু যখনই আমাদের চিত্ত ভাবের উর্ধ্বস্তরে উন্নীত হয় তখনই সে জয়দেবী ছন্দের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের কথা ছেড়েই দিলাম। অষ্টাদশ শতকে দেখি ভারতচন্দ্র, যিনি 'যাবনীমিশাল' ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন তিনিও দেববন্দনার ক্ষেত্রে জয়দেবী ছন্দ ও তদুপযোগী ভাষা ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন নি। আর যে রামপ্রসাদ তাঁর সাধনসংগীতগুলির আটপৌরে ভাষা ও ছন্দে বাঙালি জাতির হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন তাঁকেও রণরঙ্গিণী কালিকার বর্ণনায় অনেকাংশেই জয়দেবী ছন্দ ও তার উপযোগী ভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্ত এবং হেমচন্দ্রও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখনই রচনায় ভাব-অনুযায়ী মহিমা আরোপের প্রয়োজন বোধ করেছেন তখনই জয়দেবী ছন্দের শরণ নিয়েছেন। এমন কি, মধুসূদনও তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকে (১৮৬০) একটি রাজবন্দনাগীতিকে রাজোচিত মহিমা-দানের অভিপ্রায়ে ওই জয়দেবী ছন্দেরই দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কেননা, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'শারদোৎসব' নাটকের রাজবন্দনাগুলিতেও এই জয়দেবী ছন্দই ধ্বনিত হয়েছে।

কিন্তু রাজবন্দনার যুগ আর নেই। একমাত্র নাটকেই তার স্থান। দেববন্দনা ও দেশবন্দনার স্থান তার অনেক উপরে। জাতীয় জীবনের কর্মবেদীতে তার অধিষ্ঠান। এ জাতীয় বন্দনাগীতি রচনায় সার্থকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল।

ভুবনেশ্বর হে—
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে

এই প্রার্থনাগীতিটিকে যে দেবমহিমার তুঙ্গতায় তুলে ধরা হয়েছে, জয়দেবী ছন্দ ছাড়া আর কোন্ ছন্দ এই রচনাটিকে সেই তুঙ্গতায় তুলে ধরতে পারত? কিংবা—

নীলসিন্ধুজল-ধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত-ভালহিমাচল

ইত্যাদি রচনায় যে উদাত্ত গাম্ভীর্য ধ্বনিত হয়েছে, অন্য কোনো ছন্দে কি সে গাম্ভীর্যের একাংশও আনা যেত? মনে রাখতে হবে ছন্দ কবিতার প্রাণেরই প্রকাশ, কৃত্রিম অলংকরণমাত্র নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের গঙ্গাস্তবটি একাধারে দেববন্দনা ও দেশবন্দনা। কেননা, গঙ্গার জলস্রোতের মধ্যেই ভারতের প্রাণস্রোত চিরকাল প্রবাহিত হয়েছে ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ পেয়ে। এই দ্বৈত মহিমা কি প্রকাশ করা সম্ভব হত বাংলার কোনো ঘরোয়া ছন্দে? সেইজন্যই তো যে কবি 'আষাঢ়ে', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী' প্রভৃতি কাব্যে সগর্বে চলতি ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ ও তার জয়ঘোষণা করেছেন, এই গঙ্গাস্তবক রচনাকালে তাঁকেও স্মরণ করতে হয়েছে জয়দেবকেই। আর যিনি 'ক্ষণিকা' থেকে শুরু করে বহু কাব্যে অজস্রধারায় 'প্রাকৃত ছন্দ' প্রয়োগ করেছেন এবং যিনি এ ছন্দের গুণকীর্তনে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নি, ভারতবিধাতার প্রশস্তিরচনায় তাঁকেও শরণ নিতে হয়েছে ওই জয়দেবের কাছেই। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', এ গান রচনায় প্রাকৃত ছন্দ চলে—শুধু চলে না, সবচেয়ে ভালো চলে। কিন্তু ভারতবিধাতার প্রশস্তিতে চাই সংস্কৃত ছন্দের ক্লাসিক্যাল মহিমা। গঙ্গাস্তবেও তাই। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই বুঝেছিলেন। তাই তিনি দেশবন্দনা রচনায় সংস্কৃত ভাষারই আশ্রয় নিয়েছিলেন—যদিও সর্বত্র তা রক্ষিত হয় নি। তারই ফলে 'বন্দে মাতরম্' গানটি এমন অমোঘ মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান্ হতে পেরেছে।

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। জয়দেবের—

চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বন -মালী

ইত্যাদি রচনাটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের—

কত নগনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অব -গাহি
বহিছ জননি এ ভারতবর্ষে কত শত যুগযুগ বাহি

এবং রবীন্দ্রনাথের—

পতন-অভ্যুদয় -বন্ধুর পন্থা যুগযুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন -রাত্রি।

এই অংশগুলির তুলনা করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'গঙ্গাস্তব' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবিধাতা' জয়দেবের আদর্শেই রচিত, তিনের

ছন্দ একই ছাঁচে ঢালা। বোঝা যাচ্ছে জয়দেব আজও বেঁচেই আছেন। তিনি চিরজীবী হোন। আমি তাঁর ছন্দের জয়ধ্বনি করি।

কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের কাজে সে ছন্দকে টেনে এনে তার মহিমা খর্ব করতে চাই নে। পুজামণ্ডপেই মন্ত্র আবৃত্তি শোভা পায়, হাটেবাজারে বা রাস্তাঘাটে নয়। "বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" —ঠিক তেমনি।

আরও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সুরের রাজ্যেই জয়দেবী ছন্দের মহিমা প্রকাশ পায়, অ-সুরের নয়। অ-সুরের হাতে তার লাঞ্ছনা। আর বর্তমান ছাপাখানাশাসিত যুগে অ-সুরেরই আধিপত্য, কবিকণ্ঠে সুর নিরস্ত। তাই জয়দেবী ছন্দও অনেকাংশেই যেন 'শাপেনাস্তং-গমিতমহিমা'। কিন্তু যেখানে সুরের প্রকাশ অবারিত, সেখানে এই সুরবিহারী ছন্দের লীলাও অতুলনীয়। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রের অনেক গানেই সে লীলা আমাদের হৃদয়মনকে নিয়ে যায় ইন্দ্রিয়বোধের সীমার বাইরে। কেননা,

> দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,
> আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

কিন্তু হায়! আমাদের দেশে এখন সুরসাধক কবিরা গেলেন কোথায়? 'চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে!' সে দিন তো বিগত হয়েছে বহু পূর্বে। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-প্রমুখ কবিদের কণ্ঠ নীরব হবার পরে আর তো কোনো কবির কণ্ঠই সুরে বিলসিত হয় না। (অবশ্য আপনার কথা বাদে।) তাই বলছিলাম জয়দেবী ছন্দ যেন আজ 'শাপেনাস্তং-গমিতমহিমা'।

তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, তালমানলয়যোগে সুরের ক্ষেত্রে এ ছন্দের লীলা ও মহিমার পূর্ণ প্রকাশ হলেও ছন্দোময় কণ্ঠের আবৃত্তিতেও এর লীলা-মাধুর্য সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে না। তবে সে ক্ষেত্রে ছন্দের পূর্ববিভাগ বাক্‌পর্বের অনুযায়ী হওয়া চাই। নতুবা ছন্দের প্রাণবস্তুটাই মারা পড়ে। গানের তাল ছন্দপর্ব তথা বাক্‌পর্ব-অনুযায়ী না হলেও চলে। য়ুরোপে কোনো জনসভায় একবার একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেছিলেন আমাদের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' রচনাটি। কবে কোথায় এখন মনে নেই। এখানে রবীন্দ্রভবনে তার সবাক্ চলচ্চিত্র রক্ষিত আছে। তার

থেকে আমি কবিকণ্ঠে 'জনগণমন' রচনার আবৃত্তি শুনেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত কণ্ঠের আবৃত্তিতে ওই রচনাটির প্রত্যাশিত ছন্দোমাধুর্য অতি সুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আমি অনুভব করেছি যে, অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, দেশ দেশ নন্দিত করি, মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন, দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে প্রভৃতি বহু রচনাই সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠের আবৃত্তিতে জয়দেবী ছন্দের লীলামাধুর্যে স্বতোবিলসিত হয়ে ওঠে। আমি গীত-রসমুগ্ধ শ্রোতা, কিন্তু আমার কণ্ঠে সুর নেই। তাই ছেলেবেলা থেকেই শ্রুতি-সুখের প্রেরণায় আমি ওসব রচনা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করে নিজের কানের রায় নিয়েছি। সে রায় সর্বদাই আবৃত্তির অনুকূলে গিয়েছে। অর্থাৎ ওসব রচনার গীতরসের ন্যায় আবৃত্তিরসেও আমি মুগ্ধ। কিন্তু শুধু ভাবগ্রহণের জন্য এসব রচনা নীরবে পড়া যায় না। ওরকম নীরব পাঠ বীণাযন্ত্রের ঝংকার না শুনে তার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার মতোই নিরর্থক। কেন না, এসব রচনায় ভাবরস ও ছন্দোরস বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।

ভেবেছিলাম সংক্ষেপেই কাজ সারব। কিন্তু অবাধ্য লেখনী লাগামছেঁড়া টাট্টুর মতো যথেচ্ছ ছুটতে শুরু করেছে। তাই এবার তাকে তর্জনী-সংকেতে নিরস্ত করতে হল।

আমাকে দীর্ঘকাল আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। প্রতিপক্ষের সুতীক্ষ্ণ সওয়াল শুনেছি অনেকবার। এ বিচারে হাকিমও নেই, উকিলও নেই। তাই আসামীকেই যথাসাধ্য জবাব দিতে হল। এখন স্বয়ং ফরিয়াদীর রায় শোনার জন্য দুরু দুরু হৃদয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম।*

প্রীতিরসপিপাসু
প্রবোধচন্দ্র সেন

*চতুষ্কোণ ১৩৭৩ কার্তিক

পত্রধারা ৮

ছন্দ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ

১

RETREAT,
SHAHIBAG,
AHMEDABAD.
৪ এপ্রিল ১৯২৩

কল্যাণীয়েষু

ছন্দ সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধগুলি আমি পূর্বেই প্রবাসীতে পড়েছি এবং পড়ে খুসি হয়েছি। তোমার বয়স অল্প কিন্তু তোমার লেখার মধ্যে প্রবীণতা আছে। তোমার লেখাটি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করি এমন সময় আমার নেই—যদি তোমার সঙ্গে কখনো দেখা হয় তবে এ বিষয়ে আমার যা বলবার কথা তা বল্‌তে পারব।

নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেম বলে তোমার চিঠি পেতে বিলম্ব হল। আগামী বৎসরের আরম্ভে দেশে ফিরব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খামের উপরে কবির হাতে লেখা ঠিকানা ছিল এরকম—

Babu Prabodhchandra Sen
c/o Dr B. K. Nandi
Jail Road
Sylhet Bengal

আমার দেওয়া ঠিকানায় ছিল Assam। কিন্তু কবি লিখলেন Bengal। এটুকু তখন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রেরণাস্থানের পোস্টমার্ক অস্পষ্ট, অপাঠ্য। প্রাপ্তিস্থানের পোস্টমার্ক—Sylhet, DELI. 9 APR 23, 11·30 A. M.

এই চিঠিখানির লক্ষ্য প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৩২৯ পৌষ-চৈত্র) 'বাংলা ছন্দ' ও 'ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' নামে আমার দুটি প্রবন্ধ। প্রবাসী থেকে আমার প্রবন্ধাংশ সংকলন করে কবির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনের ঠিকানায়। একই সঙ্গে স্বতন্ত্র খামে একখানি চিঠিও তাকে দিয়েছিলাম। কবি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। তাই আমার পত্র ও প্রবন্ধ পেতে বিলম্ব হয়েছিল। আমার প্রবন্ধের শেষ কিস্তি (১৩৩০ বৈশাখ) তখনও প্রকাশিত হয় নি।

কবির লেখা 'আগামী বৎসর' মানে বাংলা বৎসর ১৩৩০। আর 'দেশ' মানে বাংলাদেশ (তৎকালীন)। কবির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় পরের বৎসর (১৩৩১) গ্রীষ্মকালের পরে কোনো সময়, জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের উপস্থিতিতে। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু নীহাররঞ্জন রায়। তখন আমার 'বাংলা ছন্দ ও সংগীত' প্রবন্ধটিও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল (১৩৩০ মাঘ-চৈত্র)। এই প্রবন্ধ পড়েও কবি খুশি হয়েছিলেন। দেখা হওয়া মাত্র প্রথমেই জানালেন সে কথা। আগের প্রবন্ধগুলির কথাও তাঁর মনে ছিল। এই সবগুলি প্রবন্ধ সংকলন করে অবিলম্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা উচিত, এই ছিল কবির প্রধান বক্তব্য। আমি সবিনয়ে জানিয়েছিলাম, প্রকাশের পূর্বে এগুলিকে কিছু পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন করতে হবে, সে কাজ একটু সময়সাপেক্ষ। সেদিন ছন্দ নিয়ে আর বেশি আলোচনা হতে পারে নি। কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। তা ছাড়া একটু পরেই কয়েকজন মহিলা কবির দর্শনপ্রার্থী হলেন। তাই প্রণাম করে বিদায় নিতে হল।

3/2, Heysham Road
Calcutta

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরী হয়ে গেলো—আশা করি অপরাধ নেবেন না। কবির অভিমতপত্র যে আপনার কাজে লেগেছে তাতে ভারি খুশি হয়েছি।

RETREAT,
SHAHIBAG,
AHMEDABAD.
৪ এপ্রিল ১৯২০

কল্যাণীয়েষু

ছন্দ সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধগুলি আমি পূর্ব্বেই প্রবাসীতে পড়েছি এবং পড়ে খুসি হয়েছি। তোমার বয়স অল্প কিন্তু তোমার লেখার মধ্যে প্রবীণতা আছে। তোমার লেখাটি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করি এমন সময় আমার নেই — যদি তোমার সঙ্গে কখনো দেখা হয় তবে এ বিষয়ে আমার যা বলবার কথা তা বলতে পারব।

নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেম বলে তোমার চিঠি পেতে বিলম্ব হল। আগামী বৈশাখের আরম্ভে দেশে ফিরব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃ ৪৪৭

মাত্রাসমক: বাঁধা নিয়মে বাংলা
ছন্দ বিচারে চলে না, তার প্রকৃতি-
স্বাতন্ত্র্য বিচার করতে হয়।

ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক করতে আ
আমার রুচি নেই। ছন্দের নিয়ম
জানবার যোগ্য বিষয় বটে — কিন্তু প্র
ব্যবহার করবার কালে আরো কোনো
কিছু আবশ্যক হয় সেটা কাউকে
বুঝিয়ে দেওয়া যায় না — এর বেলায়
[illegible] "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
বিবেচনার জন্য রাখি। ইতি

২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি কাল শান্তিনিকেতন থেকে ফিরেছি। কবি আপনার sensibility-র খুব সুখ্যাতি করছিলেন। বলছিলেন যে আপনার কাছ থেকে বাঙলা সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি তিনি আশা করছেন। ইতি ৭ই আশ্বিন ১৩৩৫।

ভবদীয়

শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ

১লা মে ১৯৩১

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আপনার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলাম। আপনার রচনাটি রবীন্দ্রনাথ দেখেচেন, তাঁর পড়ে ভালো লেগেচে আপনাকে জানাতে বললেন। প্যারীবাবুর মেঘদূত অনুবাদগ্রন্থে ছন্দ সম্বন্ধে আপনি যা লিখেচেন তা পড়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষরকম আনন্দ হয়েচে। এ বিষয়ে তিনি পূর্বেই প্যারীবাবুকে লিখেচেন। চিঠিখানি আমি নিজের হাতে পোষ্ট করি—এখনো কি সেটা প্যারীবাবু পান নি? ভাগ্যক্রমে সে চিঠিখানির একটা কপি আমি রাখি—যদি প্যারীবাবু না পেয়ে থাকেন তাঁকে সেই কপি পাঠিয়ে দিতে পারি। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে আপনি প্যারীবাবুর কাছে অনুসন্ধান করে জানাবেন?

মেঘদূতের অনুবাদ কবির বিশেষ পছন্দ হয় নি। তা ছাড়া প্যারীবাবুর ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা বলে মানতে রাজি নন। উনি উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আপনি আমার প্রীতিনমস্কার জানবেন।

ভবদীয়

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

প্যারীবাবুর 'মেঘদূত' অনুবাদগ্রন্থে ছন্দ বিষয়ে আমি যা লিখেছিলাম তা আমার 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' গ্রন্থে (১৩৭৯ পৌষ) সংকলিত হয়েছে। তাই 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে গৃহীত হল না।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

জয়ন্তীতে আমার ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেচ তা পড়ে খুশী হয়েছি। দেখা হলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। পারস্যে যাবার পথে মার্চ মাসের শেষ ভাগে কলকাতায় যাব। ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি যেদিন পারস্য যাত্রা করেন সেদিনই কলকাতায় বিচিত্রা-ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। সেদিন ছন্দ-আলোচনা হয় নি। বিষয়ান্তরে সামান্য কথা হয়েছিল।

৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ব্যস্ত আছি এবং ক্লান্ত আছি। তাই তোমার চিঠির বিস্তারিত উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। যদি তোমার অবকাশ থাকে তবে শান্তিনিকেতনে এসো। তা হলে ছন্দ সম্বন্ধে মোকাবিলায় আলোচনা করতে পারব। কলকাতার চেয়ে এখানে আলাপ করবার সুযোগ সহজ হবে। ছন্দটা কানের জিনিষ। তাই লেখনীর চেয়ে কণ্ঠ এই তর্কের পক্ষে বেশী উপযোগী। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন
২২।৩।৩২

প্রিয়বরেষু

আপনি শনিবারে এখানে আসলে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হবেন। Guest House-এ খবর দিয়ে রাখচি—আপনাদের সব আয়োজন প্রস্তুত থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো সোমবার নাগাদ কলকাতা যাবেন। যদি কোনো কারণে এখন আপনাদের না আসা হয় তা হলে জানাবেন। আশা করচি শীঘ্রই দেখা হবে।

প্রীতিনমস্কারান্তে

ভবদীয়
শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বুদ্ধির দোষে, শিক্ষার অভাবে এবং মনোযোগের দুর্বলতায় এমন অনেক ভুল ক'রে থাকি যার স্বপক্ষে কোনো কথাই চলে না। তাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় আমি অভ্রান্ত নই। ত্রুটি যাঁরা মার্জনা করেন ঔদার্য তাঁদেরই, যাঁরা না করেন তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। অনতিকাল পূর্বে আমার একটি প্রবন্ধে "ব্যঞ্জনান্ত" শব্দের স্থলে "হলন্ত" শব্দ ব্যবহার করেছিলুম। প্রবোধচন্দ্র তাঁর পত্রে আমার এই ভুল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তিনি উল্লাস বা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নি। আমি সেজন্যে কৃতজ্ঞ। সবুজপত্রে আমার লিখিত কোনো প্রবন্ধে ঠিক এই ভুলটিই দেখা যায় তার থেকে প্রমাণ হয় এটার কারণ অন্যমনস্কতা নয়, ব্যাকরণের পারিভাষিকে আমার অজ্ঞতা। ইতি ২১ জুলাই ১৯৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচিত্রা-পরিচালক শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্রকে লেখা পত্র (অংশ)।
বিচিত্রা, ১৩৩৯ ভাদ্র, পৃ ১৬১

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ভুল হয়েছে। হলন্ত শব্দের স্থলে ব্যঞ্জনান্ত ব্যবহার করা উচিত ছিল। কোনো কালে ব্যাকরণ পড়ি নি। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান

নেই। যেটুকু ছিল বয়সের ধর্মে ভুলে এসেছি। লেখাতেও অন্যমনস্কতা প্রবেশ করেছে। সময় হয়েছে লেখা বন্ধ করা। ইতি ২৬ জুলাই ১৯৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজ্যপাদেষু

ভাদ্রের বিচিত্রায় দেখলুম প্রদোষ শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি আমার পত্রখানির সস্নেহ উল্লেখ করেছেন, তাতে আমি নিজেকে খুবই অনুগৃহীত মনে করছি। এই পত্রে সে প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই।—বিচিত্রায় আপনি "ব্যঞ্জনান্ত" ও "হলন্ত" এই শব্দ দুটির কথা যে-ভাবে উল্লেখ করেছেন তাতে পাঠকের মনে কিছু ভ্রান্তি থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। "হলন্ত" ও "ব্যঞ্জনান্ত" এই দুটি শব্দের একই অর্থ। সুতরাং "ব্যঞ্জনান্ত" শব্দের স্থলে "হলন্ত" শব্দ ব্যবহার করা ভুল নয়। শ্রাবণের 'পরিচয়ে' "ছন্দবিতর্ক" প্রবন্ধে আপনি স্বরান্ত অর্থে "হলন্ত" শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তাতেই আমার মনে কিছু সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কারণ "হলন্ত" মানে "স্বরান্ত" নয়, "হলন্ত" মানে "ব্যঞ্জনান্ত"। সুতরাং "ছন্দবিতর্ক" প্রবন্ধটির আলোচ্য অংশে "হলন্ত" শব্দটির পরিবর্তে "স্বরান্ত" শব্দটি প্রয়োগ করাই সঙ্গত কিনা, আমি তাই আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলুম। আপনার প্রতি ও আপনার রচনার প্রতি আমি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি, আমার পত্রযোগে আপনার নিকট তা নিবেদন করতে সমর্থ হয়েছি জেনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

শ্রদ্ধাবনত স্নেহার্থী

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্র (অংশ)—বিচিত্রা, ১৩৩৯ আশ্বিন, পৃ ৪২৯। মূলপত্র (২১, ৮, ১৯৩২) বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

১০

কল্যাণীয়েষু

আবার একটা ভুল করেছি। এ ভুলটা অজ্ঞানকৃত নয়, অনবধানবশত। অর্থাৎ আমার যে ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলে সেটা স্বীকার করবার সময় ভুল করেছি। কুষ্টির প্রমাণের চেয়ে এতে জোর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমার বয়স সত্তর পেরিয়েছে।…২৩ অগাস্ট ১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবোধচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র (অংশ)। বিচিত্রা ১৩৩৯ আশ্বিন পৃ ৪২৯।

এই পত্রের সঙ্গে ছিল শ্রীসুধীরচন্দ্র করের এই সংক্ষিপ্ত পত্র (৯ ভাদ্র ১৩৩৯) "কবির উত্তর এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনার পত্র এবং এই উত্তরটি একসঙ্গে 'বিচিত্রা'য় পাঠানো হইল কবির নির্দেশে।"

১১

দৌলতপুর

২১. ৮. ১৯৩২

পূজ্যপাদেষু

ভাদ্রের বিচিত্রা ও প্রবাসীতে 'জরতী' ও 'ভীরু' কবিতার অমিল মুক্তক ছন্দ এবং 'মানবপুত্র' রচনার গদ্যচ্ছন্দ দেখে আমি যে কতখানি উল্লসিত হয়েছি তা আপনাকে না জানিয়ে পারি নে। এই রচনাগুলি বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি নোতুন পদ্ধতির সূচনা করছে। যথাসময়ে এসব ছন্দের আলোচনা করবার ইচ্ছা পোষণ করছি। 'ভীরু' কবিতায় জান্‌ত, বল্‌তে,ধর্‌ল, হাঁক্‌ল প্রভৃতি হসন্তমধ্য প্রাকৃত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আমার মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এই প্রয়োগের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ও অভিনবতা আছে যে, তার প্রতি লক্ষ্য না করে থাকা যায় না। কিন্তু চিঠিতে সে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি ৫ই ভাদ্র, ১৩৩৯

শ্রদ্ধাবনত স্নেহার্থী

প্রবোধচন্দ্র সেন

১৩৩৯ আশ্বিন সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত পত্রের শেষাংশ (অপ্রকাশিত)। মূলপত্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

১২

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

যুগ্মস্বরবর্ণ অথবা স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা ছন্দে মাত্রাগণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার পরিমাণ পেয়ে থাকে। 'আইহন', 'হইল', 'আইলা', 'তুইও' শব্দে এই নিয়ম। হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগেও এই বিকল্পের উদ্ভব হয়। যথা 'ভেবেছিলাম তুমি'। যাকে আমরা সবাই সাধু ভাষা বলি সে হসন্ত শব্দের দাবী মানতে চায় না—হসন্তের আদর চলতি ভাষায়। শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের ভেদে একই ভাষায় দু রকমের প্রথা চলচে।

'নিষ্ফল কামনা'র স্থলে 'নিষ্ফল প্রয়াস' ব্যবহার করেছি সে আমার জরাগ্রস্ত মস্তিষ্কের প্রমাদবশত।

মাত্রাগণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দবিচারে চলে না, তার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করতে হয়।

ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক করতে আর আমার রুচি নেই। ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বটে—কিন্তু ছন্দ ব্যবহার করবার কালে আরো বেশি কিছু আবশ্যক হয়। সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না—এর বেলাও খাটে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। নিরতিশয় ব্যস্ত আছি। ইতি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবোধচন্দ্রকে লেখা পত্র (অপ্রকাশিত)।

১৩

২৫।৩।৪১

নমস্কার নিবেদন,

আপনার চিঠি খানিক আগে পেয়েছি—আমার ধন্যবাদ জানবেন।

ত্রৈমাসিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃপালিনীকে আমিই আপনার কথা বলেছিলাম —তাঁর কাছে লেখা আপনার চিঠিও দেখেছি। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লেখা প্রায় 'সোনার পাথরবাটি' সমতুল্য। তবুও যদি সহজবোধ্য ভাষায় মোটামুটিভাবে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারেন ভালো হয়।

জন্মসংখ্যা ত্রৈমাসিকে তাঁর একটা সম্পূর্ণ ছবি তোলবার ইচ্ছা আমাদের—ছন্দকে বাদ দিলে চলবে কেন? আর আপনি ছাড়া কে এই কাজ করবেন?…

সশ্রদ্ধ নমস্কার।

ভবদীয়

শ্রীঅনিলকুমার চন্দ

এই অনুরোধের ফলেই রচিত হয় Rabindranath and Bengali Prosody নামে ইংরেজি প্রবন্ধ। এটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত Visvabharati Quarterly-র বিশেষ সংখ্যায় (1941 May-October) এই ইংরেজি ত্রৈমাসিকের সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি।

১৪

Daulatpur College, 20th June, 1941.

Dist. Khulna

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বরেণ্যপাদেষু

আমি বাংলা ছন্দের উপর একখানি বই লিখছি। অনেকখানি লেখা হয়েছে। লিখতে লিখতে মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে। পত্র লিখে আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা নিবেদন করার দুর্নিবার ইচ্ছা হয়। আপনার বর্তমান স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অনেকবার সে ইচ্ছাকে সংযত করেছি। পৌষ উৎসব উপলক্ষ্যে যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম তখনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে আপনার মানসিক বিশ্রামের বিঘ্ন জন্মাতে ইচ্ছে হয় নি।

আশা করি বর্তমানে আপনার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো আছে। তাই এই পত্রখানি লিখতে সাহস করছি। আপনার স্বাস্থ্য যদি অনুকূল থাকে তা'হলেই আপনার কাছ থেকে উত্তর পেলে উপকৃত হ'বো। স্বাস্থ্য অনুকূল না হ'লে পত্রের উত্তর না পেলেও ক্ষুণ্ণ হ'বো না।

এ পত্রে একটি-মাত্র প্রশ্ন করবো। কিন্তু প্রশ্নের চাইতেও আরেকটা জরুরি বিষয় আছে। আপনার অজস্র কবিতা থেকে নানা রকম ছন্দের আদর্শ খুঁজে

বের করছি। করতে গিয়ে কোনো কোনো রকমের ছন্দের অপ্রয়োগ বা অতি অল্প প্রয়োগ লক্ষ্য করছি। আমি ক্রমে এবিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি যদি সঙ্গত বোধ করেন এবং বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি ছন্দের আদর্শ রচনা করেন তা'হলে আমি অনুগৃহীত হ'বো, কারণ আমার পুস্তকে ব্যবহার করার নূতন আদর্শ পাব। তা-ছাড়া, বাংলা সাহিত্যেও, বিশেষ ক'রে তার ছন্দোবিভাগ, তাতে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

অনেকখানি ভূমিকা ক'রে ফেলেছি। এখন আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।—

(১) 'পুণ্যবান্' ও 'পুণ্যবতী'—এ দুটি বাংলা শব্দেই 'মাত্রা' আছে পাঁচটি করে; অর্থাৎ ও দুটি শব্দই 'পঞ্চমাত্রক'। বিদেশী পরিভাষায় 'মাত্রা' কথাটিকে mora এবং 'পঞ্চমাত্রক' শব্দটিকে Pentamoric ব'লে অনুবাদ করা চলে। আরেক হিসাবে 'পুণ্যবান্' শব্দে আছে তিন সিলেব্‌ল্, কিন্তু 'পুণ্যবতী' শব্দে চার সিলেব্‌ল্; অর্থাৎ 'পুণ্যবান্ trisyllabic এবং 'পুণ্যবতী' tetrasyllabic।

'মাত্রা' শব্দ নিয়ে কোনো অসুবিধে নেই। অসুবিধে হচ্ছে 'সিলেব্‌ল্' কথাটি নিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে syllable, syllabic, trisyllabic, tetrasyllabic প্রভৃতি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি হ'তে পারে? অনেকেই এগুলির বাংলা প্রতিশব্দ রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু কারও চেষ্টাই সফল হয়েছে বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন syllable-এর বাংলা হচ্ছে 'অক্ষর' কিন্তু 'উৎসব' শব্দে দুই অক্ষর এবং 'পুণ্যবান্' শব্দে তিন অক্ষর বললে বাঙালির খট্‌কা লাগে। আমি বলি 'উৎসব' শব্দ দ্বিস্বর (অর্থাৎ dissyllabic), 'পুণ্যবান্' শব্দ trisyllabic বা ত্রিস্বর।

এ বিষয়ে আপনার মতামত জানালে অনুগৃহীত হ'বো।

(২) আমার দ্বিতীয় কথা পরিভাষা-বিষয়ক নয়। ছন্দের প্রয়োগ-বিষয়ক। সাধু পয়ার ছন্দে প্রবহমানতা প্রথম আনেন মধুসূদন। কিন্তু সে প্রবহমান ছন্দ সমপংক্তিক ও অমিল। আপনার রচনাতে ওই প্রবহমান ছন্দ বহু বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। সমিল ('মেঘদূত', 'বসুন্ধরা'), অমিল ('বিসর্জন'), সমপংক্তিক, অসমপংক্তিক (শাজাহান), চৌদ্দ মাত্রার আদর্শ, আঠারো মাত্রার আদর্শ ইত্যাদি প্রবহমান ছন্দের সমস্ত রকম সম্ভবপর রূপই আপনার রচনাতে ধরা দিয়েছে। একটাও বাদ পড়ে নি।

কিন্তু প্রাকৃত বাংলা ছন্দে প্রবহমানতার কতকগুলি রূপ আপনার রচনায় বাদ পড়েছে; অতএব বাংলা সাহিত্যেই বাদ পড়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কেন না, যে ছন্দ আপনি ব্যবহার করেন নি সে ছন্দ অন্য কারও রচনায় এখনও দেখা দেয় নি এবং সে সম্ভাবনাও দেখছিনে। যাক, সে কথা।

আপনার 'ছন্দ' নামক বইখানির ৫৩-৪ পৃষ্ঠায় আছে—"এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদ বধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হোত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হোতেই। ইত্যাদি

(বাহুল্যবোধে সবটুকু উদ্ধৃত করলুম না।) এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না। এই যে-বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ—এ ভাষা প্রাণবান।"

আপনার এই উক্তির সার্থকতা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি। প্রায় কুড়ি বছর আগে 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধে আমি ঠিক এই কথাই ব'লেছিলুম। আমি বিশ্বাস করি প্রাকৃত বাংলায় মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর অর্থাৎ প্রবহমান ছন্দ রচনা করা যেতে পারে। শুধু যে পারে তা নয়, প্রাকৃত বাংলায় অতি সুন্দর প্রবহমান ছন্দই রচিত হতে পারে বলে আমি মনে করি। অমিল, সমিল, সমপংক্তিক, অসমপংক্তিক প্রভৃতি সাধু প্রবহমান ছন্দের সমস্ত রূপই প্রাকৃত বাংলায় প্রতিফলিত হ'তে পারে। 'বলাকা'-র 'শা-জাহান', 'ছবি' প্রভৃতির ছন্দ কি প্রাকৃত বাংলায় রচিত হতে পারে না?

আপনার উদ্ধৃত উক্তিতেই স্বীকৃত হয়েছে যে, পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সাধু প্রবহমান ছন্দের ওই কয় পংক্তির প্রাকৃত তর্জমা ছাড়া ওই সম্ভাব্যতার আর কোনো নিদর্শন বাংলায় নেই। আপনি নিজেও কোথাও 'বসুন্ধরা', 'মানসী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি কবিতার সাধু প্রবহমান ছন্দের অনুরূপ ছন্দ প্রাকৃত বাংলায় রচনা করেন নি। তার ফলে পূর্বোদ্ধৃত তর্জমার দৃষ্টান্তটুকুকে উপলক্ষ্য ক'রে কারও কারও পক্ষে উপহাস-রসিকতা করার সুযোগ ঘটেছে। সাধু বাংলায় প্রবহমান ছন্দ রচনা করতে গিয়ে মধুসূদনকে যে উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বহুকাল হ'লো তার নিরসন

ঘটেছে। কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় প্রবহমান ছন্দের যে অঙ্কুরটুকু দেখা দিয়েছে আপনার রচিত উদ্ধৃত অংশটিতে, তার উপলক্ষ্যে যে উপহাস-রসিকতা করা হয়েছে, তাকে নিরস্ত করার দায়িত্ব আপনারই।

যা হোক 'বসুন্ধরা', 'এবার ফিরাও মোরে', 'শা-জাহান' ইত্যাদি কবিতার আদর্শে যদি প্রাকৃত বাংলার প্রবহমান ছন্দে কয়েকটি কবিতা রচিত হয়, তা হ'লে বাংলা সাহিত্যের একটি মস্ত অভাব মোচন হয় এবং প্রাকৃত-বাংলার প্রকাশ-শক্তির যথার্থ পরিচয়ও ঘটে—এইটুকু মাত্র আমার নিবেদন।

ত্রুটি-মাত্র প্রসঙ্গেই পত্রখানি অপ্রত্যাশিত ভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়াতে কুণ্ঠা বোধ করছি। অতএব এখানেই নিরস্ত হচ্ছি।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণতি গ্রহণ করুন। ইতি ৫ই আষাঢ়, ১৩৪৮।

স্নেহার্থী

প্রবোধচন্দ্র সেন

মূলপত্র রক্ষিত আছে রবীন্দ্রভবনে। তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা আছে: R 24/6/41—keep for future reference.

রবীন্দ্রনাথকে লেখা এটিই আমার শেষ চিঠি। তিনি এ চিঠির উত্তর দিতে পারেন নি। এ চিঠির প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়েছিলেন অনিলকুমার চন্দ মহাশয়।

১৫

২৪।৬।৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গুরুদেব আপনার চিঠি পেয়েছেন। তাঁর শরীর আবার বেশ একটু ভেঙেছে, জোর চিকিৎসা চলেছে। চিকিৎসা খুব কড়া রকমের—অসুখের চাইতে বোধ হয় ওষুধের প্রতাপ ও অত্যাচারই বেশী। অসুখের পালা গেছে, বর্তমানে ওষুধের ক্রিয়া-উপক্রিয়া চলেছে।

আপনার চিঠি তাই আপাতত cold storage-এ রইল। অবশ্যি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি। কিন্তু দীর্ঘকাল উত্তর পাবেন না। তাই জানিয়ে রাখলুম।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীঅনিলকুমার চন্দ

প্রমথ চৌধুরী

২০, মেফেয়ার
বালিগঞ্জ
২১।১।৩২

কল্যাণীয়েষু

তোমার ছন্দ-বিচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়লুম। বিচিত্রায় তোমার কৈফিয়ত অবশ্যই পড়ব। আমি এ বিষয়ে যে কোন মতামত প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করি, তার কারণ ছন্দ সম্বন্ধে আমার কোনও বিশেষ জ্ঞান নেই। আমি পদ্যও লিখেছি, কিন্তু সে শুধু একমাত্র কানের উপর ভরসা রেখে অর্থাৎ যে সাহসে আমি গদ্যও লিখি।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এর পরে আমি প্রমথ চৌধুরীকে যে চিঠি (২৫।১।৩২) লিখি তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

"মাঘের বিচিত্রায় আমার ছন্দ-বিচারের কৈফিয়ত নিশ্চয়ই পড়েছেন। আমার ছন্দ-আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পৌষের বিচিত্রায় যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি, কারণ ছন্দ সম্বন্ধে আমি যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছি তার একটারও উত্তর ওই প্রবন্ধে নেই, অথচ কয়েকটি অবাস্তব বিষয় নিয়ে নিরর্থক তর্ক উঠেছে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা সুখবর আছে। আমার মনে হয় পৌষের প্রবন্ধে যে আমার আসল কথারই উত্তর দেওয়া হয় নি, এ কথা রবীন্দ্রনাথ যথা সময়েই অর্থাৎ আমার কৈফিয়ত পাওয়ার পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মাঘের 'পরিচয়ে' আবার আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন। মাঘের 'পরিচয়ে' তাঁর 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' পড়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি, তাঁর কাছ থেকে আমি ওরকম জিনিষেরই প্রত্যাশা করেছিলুম। তা ছাড়া, আমি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে এমন কতগুলি কথা 'জয়ন্তী-উৎসর্গে' লিখেছি যা আমাকে শুধু তাঁর কাব্যগুলি থেকেই অনুমান করে নিতে হয়েছিল। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছ থেকেই সেসব কথার স্পষ্ট সমর্থন পেয়ে আমি যে কত খুশি হয়েছি তা বলতে পারি নে। যা হক, 'পরিচয়ে' তিনি আমার প্রশ্নগুলির যে উত্তর দিয়েছেন তার পরেও আমার আরও কয়েকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় রয়ে গেছে। আর-এক প্রবন্ধে আমি আবার সে কথাগুলি তুলব মনে করেছি। আমার

বিশ্বাস আবার যদি আমি বাকি বিষয়গুলির উত্থাপন করি তবে রবীন্দ্রনাথ আমার উপর আরও সন্তুষ্ট হবেন। ও-রকম প্রশ্ন দেখে তিনি খুশি না হয়ে পারবেন না বলেই আমি মনে করি। আমার ইচ্ছা ছিল এ মাসের বিচিত্রায়ই ও-বিষয়ে লিখব। কিন্তু পরিচয়ের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত দিলীপবাবুর নিকট তাঁর নিজেরই লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। ওই চিঠি আশ্বিনের উত্তরায় প্রকাশিত হয়েছে। আশ্বিনের উত্তরা আমি দেখি নি বলে ফাল্গুনের বিচিত্রার জন্য ও-বিষয়ে লিখতে পারলুম না। যা হক, দুদিন হল আমি আশ্বিনের উত্তরা সংগ্রহ করেছি। তাতে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়ে মনে হল যদি তা আমি আগেই দেখতে পেতুম তা হলে বড়ই ভাল হত। কেন না, তা হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে আমার মতের কোনো পার্থক্য নেই তা অতি সহজেই দেখাতে পারতুম। যা হক, সামনের মাসেই তা দেখাব। আশ্বিনের উত্তরায় দিলীপবাবু যে প্রশ্ন করেছেন তাতে খুবই খুশি হয়েছি। কারণ আমিও কার্যতঃ ওই প্রশ্নই তুলেছি। তবে আমার প্রশ্নটা ছিল আরও ব্যাপক। তিনিও আমারই মতো ছন্দ-জিজ্ঞাসু, তা দেখে স্বভাবতঃই খুশি হয়েছি। তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্বন্ধে 'ছন্দো-নিপুণদের রায় জানার ইচ্ছা' প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আমি কি মনে করি তা তিনি আগামী মাসেই জানতে পারবেন আশা করি।"

বলা উচিত যে, এ সময়ে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র যোগাযোগ ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ শুরু আরও দীর্ঘকাল পরে। যা হক, আমার এ চিঠির উত্তরে (২৬।১।৩২) প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে লেখেন—

"বিচিত্রায় তোমার ছন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়লুম। ও-প্রবন্ধে যা আমার সব চাইতে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে তার tone। রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের প্রতিবাদ করতে হলে সে প্রতিবাদের ভিতর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার সুরটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠা দরকার। এবং তোমার লেখাটি আগাগোড়া সশ্রদ্ধ। আমি বহুকাল পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করে যে প্রবন্ধটি লিখি তাতেও এই মত প্রকাশ করি। সে প্রতিবাদটি বীরবলের হাল-খাতায় 'সাহিত্যে চাবুক' এই নামে প্রকাশিত হয়েছে। সে যা-ই হোক। রবীন্দ্রনাথ এখন খড়দহে আছেন। এরি মধ্যে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব ও তোমার চিঠিখানি তাঁকে পড়তে দেব। আমার বিশ্বাস এ চিঠি পড়ে তিনি খুসী হবেন।

আমি তোমাকে পূর্বেই লিখেছি, ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনায় আমি কেন যোগ দিই নে। তবে তোমাদের পাঁচজনের আলোচনা পড়ে এ বিষয়ে দু কথা বলবার আমারও লোভ হচ্ছে।"

দিলীপকুমার

১

৩০।১২।৩১

ভাই অমিয়,

আজ কবির ছন্দালোচনা (প্রবোধ সেন মহাশয়ের উত্তরে) বিচিত্রায় পড়ে এত উপভোগ করেছি যে বলতে পারি না। সেন মহাশয়ের যুক্তি আমার ওরিজিন্যাল লেগেছিল বটে, কিন্তু ওরিজিন্যাল কিছু বলতে হবে এই রোখ করে লেখা যেন। কবির ঠাণ্ডা বিদ্রূপগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী (সেন মহাশয়ের পক্ষেও)। দেখি তিনি কি জবাব খুঁজে পান এর উত্তরে। অক্ষর গুণে গুণে চলাটা আমার কোনো দিন ভালো লাগে নি। বরাবরই মনে হয়েছে সত্য অনুভূতি তার ছন্দের সুরের বেগ আপনিই সৃষ্টি করে, কান চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের রসবোধের সহজ প্রণালী দিয়ে চলে। ভাষার ও ছন্দের পরিণতি এই জাগতিক সত্যেরই একটা অন্যতম প্রমাণ মাত্র।...

দিলীপ

অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা দিলীপকুমারের পত্র (অংশ)। মূলপত্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

৬।৯।৩২

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ব'লে 'পরিশেষে' আপনার নাম লেখা—(তা আগেকার মতন সস্নেহভাবে নাই হোক) দেখে বড় খুসি হয়েছি ও কৃতজ্ঞ। আমি ভেবেছিলাম—এখনও যে ভাবি না তা নয়—যে এ ধরনের উপহার স্মারকচিহ্ন প্রভৃতি আর আমি আশা করতে পারি না...তার উপর আমি সম্প্রতি কয়েকটি

প্রবন্ধ লিখেছি, তাতে প্রবোধচন্দ্রের nomenclature ও ছন্দোবিশ্লেষের পূর্ণ সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমার দৃঢ় ও আন্তরিক বিশ্বাস জন্মেছে এসব ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্রই ঠিক বলেছেন (যথা প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত ছন্দ syllabic, মাত্রিক নয়, ও চারের ছন্দ, তিনের না)।...পরিচয়েও আপনি একটু বিরক্ত মনে হল। আমি কিন্তু convinced নই, কাজেই আপনার মতামতের প্রতিবাদ করব, যথাসাধ্য নম্রভাবেই করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সংগীত স্বরলিপি প্রভৃতির ---logy থেকে খুব জোর করেই বলেছি যে, ছন্দ গোনা প্রভৃতিরও একটা আছে, তার সঙ্গে শোনার অহিনকুল সম্বন্ধ নেই।...

প্রণত

মণ্টু

রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপকুমারের পত্র (অংশ)। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

শান্তিনিকেতন

১০ সেপ্টেম্বর [১৯৩২]

কল্যাণীয়েষু

"পরিশেষ" বই দুই খণ্ড আমার হাতে আসবামাত্র প্রথম খণ্ড তোমার কাছে পাঠিয়েছি, দ্বিতীয়টা আমার নিজের জন্য। আমার নিকট-আত্মীয় ও বন্ধুদের আমি নিরলঙ্কতভাবে কেবলমাত্র পরস্পরের নাম লিখে বই পাঠাই, তার চেয়ে বেশি কিছু বলিনে, বললে সম্ভাষণের মূল্য কমে যায়।

দ্বিতীয় কথা, তুমি প্রবোধ সেনের সমর্থন করে কিছু লিখেচ সে কথা আমি জানিই নে। অনেকদিন থেকে কাগজপত্র পড়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, মনকে নিরাবিল রাখবার জন্য। স্বয়ং প্রবোধ সেনের সঙ্গে মত নিয়ে আমার কোন ব্যবহারের বিকৃতি হয়নি—তিনি দেখাসাক্ষাৎ করে থাকেন এবং চিঠিপত্রও লেখেন। তুমি তাঁর মতকে স্বীকার করেচ বলে তোমাকে অপরাধী করব এ

বয়সে সে ছেলেমানুষী মার্জনীয় নয়।...আগামী সংখ্যক পরিচয়ে ছন্দ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ বেরবে—সেটা কিছুকাল পূর্বের লেখা।

তোমাদের

দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (অংশ)। প্রতিলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের কাছে বাংলা ছন্দেবিৎদের ঋণ কম নয়। তাঁর মতন সূক্ষ্ম কান, ভূয়োদর্শন, অভিনিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ছন্দের জটিল তত্ত্বাদির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করার ক্ষমতা যে-কোনো দেশের ছান্দসিকদের মধ্যেই বিরল বই কি। বাংলা ছন্দের কত ঝাপসা জিনিষ যে তিনি তাঁর সাফমাথা দিয়ে ভেবে ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের আলো ফেলে পরিষ্কার করে দিয়েছেন তা হয়ত আজকের দিনে সর্ববাদিসম্মত হবে না কিন্তু দুদিন বাদে হবেই হবে। এক হিসেবে কিন্তু তার আলোচনাদির বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদের সাড়া পড়ে যাওয়াটা ভালোই। পুরাতনের একটা জড়িমা—inertia—আছে যা নিত্যই নূতন সত্য নূতন তত্ত্ব নূতন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণপণে বাধা দেয়। এই-ই তার ধর্ম। কিন্তু এই বাধার বাঁধে প্রতিহত হয়েই আবার নূতনের বেগ, অনাগতের স্রোত শক্তিসঞ্চয় করে থাকে।

... ...

প্রবোধচন্দ্রের বিশ্লেষণ ও যুক্তি আমার মনে হয়—invulnerable—অনবদ্য। তিনিই সব প্রথম বাংলা ছন্দকে 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে যথাযথভাবে প্রতি ছন্দের স্বরূপটি দেখিয়েছেন। শুনেছি ওয়েল্‌স্ সাহেব কোন্ এক লেখকের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—'Take your hats off, men!—a great genius at last!' আমরাও আজ বলি প্রবোধচন্দ্রকে অভিনন্দন করে: 'Take your hats off, metrists! a great prosodist at last—and at long last!.'

দিলীপকুমার রায়—'বাংলা ছন্দ ও প্রবোধচন্দ্র', বিচিত্রা ১৩৩৯ পৌষ, পৃ ৮৫৭ ও ৮৬৫

স্নীতিকুমার

3, SUKIAS ROW
Calcutta
3, December 1923

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলুম। 'প্রবাসী'তে আপনার প্রবন্ধ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন পড়ে আমি অত্যন্ত খুশী হই, আর আগ্রহের সঙ্গে প্রতি মাসে মুদ্রিত অংশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। আপনার সঙ্গে পরিচয় আর আলাপ করতে বড়ই ইচ্ছা হয়। আর শ্রীযুক্ত চারুবাবুকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করি। মনে করেছিলুম, আপনাকে অভিনন্দন আর ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখবো, কিন্তু পরে স্থির করলুম, চারুবাবুর মারফৎ আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পত্র-ব্যবহার করবো। আপনার প্রবন্ধগুলিতে যে রীতিতে বাঙলা ছন্দের প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে তা আমার খুবই ভাল লেগেছে। বাঙলা ছন্দের প্রকৃতি, আর তার পর্য্যায় আর শ্রেণীবিভাগ এইরকম যথার্থ বিচারের সঙ্গে, 'বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে' (এই ভয় দেখানো শব্দসমষ্টি ব্যবহার করলুম!) আপনার পূর্ব্বে আর কেউ তো করেন নি। আপনার প্রবন্ধের কথা আমি অনুসন্ধিৎসু ছাত্র আর বন্ধুদের মধ্যে কয়েছি। চারুবাবুর কাছে শুনলুম, আপনি ঐ বিষয়ে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, আর লিখছেনও বোধ হয়। সেগুলি প্রকাশিত হবার আশায় রইলুম। সবগুলি বার হয়ে গেলে পর, একত্র করে, আরও বেশী বেশী উদাহরণ দিয়ে (বাছা বাছা উদাহরণের থেকে দু-এক ফোঁটা রস পেয়ে অনেকেই মূল কবিতাগুলির দিকে যেতে চায়), বই করে প্রকাশ করা চাই; কারণ এই রকম একখানি বইয়ের আবশ্যক আছে। বাঙ্গালা ছন্দ সম্বন্ধে দু-একটী কথা আমারও মনে হয়েছিল,—এমন কিছু গভীর কথা নয়— ইচ্ছা ছিল আপনার প্রবন্ধাবলীর উপযোগিতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে করতে সে বিষয়ে কিছু লিখবো—কিন্তু নেহাৎ সময়াভাব বলে তা ঘটে উঠল না।

আপনি যে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনার কাজে নেমেছেন, তাতে শিক্ষার্থী আর জিজ্ঞাসু আমার, আর আমার মত আর সকলকারই

আন্তরিক সহানুভূতি আছে। আমরা সকলেই এক পথের যাত্রী। আমার নিজের চর্চ্চা আর জ্ঞান দুইই অতি অল্প—গুরুর আসন নিতে আমার লজ্জা বোধ হয়, যদিও বাইরের দিক্ থেকে দেখতে গেলে আমি দু-এক বিষয়ে পড়িয়ে যাচ্ছি। কার্য্যক্ষেত্রে এসে দেখছি, বাইরের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, যে পুঁজি কত কম। তবুও, যদি আমার দ্বারা আপনার জিজ্ঞাস্য কোনও বিষয়ের কিছুমাত্র সমাধান হতে সাহায্য মেলে, আমি সানন্দে যথাশক্তি আপনাকে সে সাহায্য করবো। আপনি কোনও দ্বিধা না করে আমায় প্রশ্ন করবেন। আমি নিজেও শিখবার আশা আর ইচ্ছা রাখি।

চারুবাবুর কাছে শুনলুম, আপনি এখন কলেজের ছাত্র। এখন কি করছেন, কোন্ বিষয়ে পড়াশুনা আপনার ভাল লাগে, ইত্যাদি বিষয়ে খবর পেলে খুসী হবো।

উপস্থিত আমি আমার বই ছাপাচ্ছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় ছাপানো হচ্ছে—The Origin & Development of the Bengali Language, লণ্ডনে D. Lit. পরীক্ষার জন্য যে thesis দিয়েছিলুম, তাকেই পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করে এই বই। প্রায় ৮০০ পাতা দাঁড়াবে। বইখানা তিন খণ্ডে লিখেছি—(১) Introduction—এতে ভারতে আর্য ভাষার প্রগতি, বাংলাভাষার উৎপত্তি, অন্যান্য আর্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সম্বন্ধ, বাঙলার শব্দসাধন প্রভৃতি বিষয় আছে। এই অংশ (২৩৫ পাতা) ছাপা হয়ে গিয়েছে। (২) Phonology—ছাপা শুরু হয়েছে—এতে প্রাচীন আর মধ্যযুগের আর্যভাষার তথা বাঙলার ধ্বনিতত্ত্ব আর ধ্বনিগুলির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এতে বাঙলা ছন্দের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলেছি—আর আপনার প্রবন্ধগুলির উপযোগিতা আর মূল্যবত্তারও উল্লেখ করেছি। (৩) Morphology—এতে বাঙলার প্রত্যয়, কৃৎ তদ্ধিত সুপ্‌তিঙের ইতিহাস আর উৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। বইটা ১৯২৪ সালের মে-জুনের আগে বার হবে, এমন ভরসা হয় না।

আপনি মাঝে মাঝে কলকাতায় নিশ্চয়ই আসেন,—এইবার এলে পরে আশা করি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের সুযোগ ঘটবে। কোন সময়ে আসছেন, আশা করি আমায় জানাবেন। সিলেটে আমার দুই একটি বন্ধু আর পরিচিত আছেন, তাঁদের আপনি নিশ্চয়ই চেনেন—যেমন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র শ্যাম—

উকীল—কলকাতায় আর শিলঙে এঁর মোটরকারের যন্ত্রপাতির দোকান আছে আর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দেব, যিনি M. L. C. নির্বাচিত হলেন।

শনিবারদিন আমার একটি ছোট পুস্তিকা—A Brief Sketch of Bengali Phoneties—পাঠিয়েছি, বোধ হয় পেয়েছেন।

ভাষাতত্ত্বসংক্রান্ত বিষয়ের প্রশ্নের অবতারণা করে মাঝে মাঝে চিঠি লিখলে বিশেষ আনন্দিত হবো। আমাদের ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাপারগুলির আলোচনার পক্ষে আমাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ দরকার। এ বিষয়ে যোগ্য লোক দেশে নিতান্ত বিরল। আপনার প্রবন্ধ পড়ে, আপনাকে একজন উপযুক্ত অনুসন্ধিৎসু ব'লে পেয়ে আমাদের আনন্দ।

আশা করি কুশলে আছেন। ইতি

বশংবদ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠিখানি আমাকে লেখা সুনীতিকুমারের দ্বিতীয় পত্র। প্রথম চিঠিখানি দীর্ঘকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট। সেখানি ছিল সংক্ষিপ্ত। সে চিঠিতে তিনি আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে' প্রভৃতি কতকগুলি দৃষ্টান্ত কার লেখা কোন্ কবিতা থেকে সংকলিত ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। আমি সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিলাম। তার পরেই তাঁর এই দীর্ঘ চিঠি।

সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতেই আমার প্রথম দেখা হয় প্রায় দেড় বৎসর পরে, আনুমানিক ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে। তখনও তাঁর O. D. B. L. বই ছাপা শেষ হয় নি। তবে তার ছন্দ অংশ ছাপা হয়ে গিয়েছিল। সেটুকু আমাকে পড়তে দিলেন আমার মতামতের জন্য। কোনো কোনো বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিলেও তখনই মতভেদ জানানো সংগত মনে হয় নি। তবে 'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায়' ইত্যাদি কবিতাংশকে 'স্বরবৃত্ত' বলা ঠিক হয় নি, আর প্রাকৃতপৈঙ্গলের যে সূত্রটির নজির দেখানো হয়েছে তাও এখানে প্রযোজ্য নয়, একথা স্পষ্ট করেই জানালাম। তারপরে ওই কবিতাংশটুকু দুজনেই আবৃত্তি করা গেল। দুজনের আবৃত্তিভঙ্গি হল দু-রকম। স্থির হল তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবৃত্তি শুনে শেষ সিদ্ধান্ত করবেন। তৃতীয় দিনে রায় আমার অনুকূলেই গিয়েছে। এই সংশোধনটুকু তখনই টুকে রাখলেন। ইদানীং

প্রকাশিত O. D. B. L. গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (১৯৭২, পৃ ৪৮) এই সংশোধনের উল্লেখ আছে।

O. D. B. L. গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের শেষার্ধে। প্রবাসীতে প্রকাশিত ছন্দ প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে এই গ্রন্থে পৃ (২৮৯ পাদটীকা ১) নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়।—

"The most systematic study of Bengali versification hitherto published, is by Prabodhchandra Sen, in a recent series of articles to the Pravasi, which clearly distinguishes between the three types of metre in Bengali, and classifies them on a scientific basis. Some of the examples quoted from Mr. Sen's articles."

O. D. B. L. প্রকাশের প্রায় পাঁচ বৎসর পরেও কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' বই-এর সমালোচনা উপলক্ষে আমার লিখিত ভূমিকা সম্পর্কে সুনীতিকুমার প্রসঙ্গক্রমে বলেন—

"প্রবোধবাবু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে করিতেছেন; ওদিকে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার লেখাগুলি এতাবৎ এবিষয়ে যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাদের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছে।"

—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প', ১৩৩৮ বৈশাখ, পৃ ৮৮

মোহিতলাল

২৭ বাদুড়বাগান লেন
কলিকাতা
১১ এপ্রিল, '২৪

প্রীতিভাজনেষু,

......তোমার ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধটি তোমার সম্বন্ধে সংবাদের মত আমাকে নিশ্চিন্ত রেখেছিল। ঐ প্রবন্ধ তোমার একটা খুব বড় কীর্তি হয়ে রইল—তুমি যশস্বী হয়েছ। আমি বড় আনন্দিত হয়েছি। প্রবন্ধ বোধ হয়

শেষ হল ? খুব পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় ওতে আছে। এর পর, ছন্দ ও কাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কতখানি ও কিরূপ এইরকম একটা আলোচনা করলে মন্দ হয় না। 'ছন্দশাস্ত্রে'র আলোচনা বোধ হয় খুব সম্পূর্ণ রকমেরই করেছ।...

আমি প্রবন্ধ লিখছি না, চিঠি লিখছি—যেমন মনে এল যা তা লিখলাম—তোমার মত ছন্দবিদের কাছে হয়ত হাস্যাস্পদ হব। সত্যি তোমার ছন্দশাস্ত্র রচনা খুব বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে—এটা তোমার একটা কীর্তি হয়ে রইল।[১]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এই চিঠি যখন লেখা হয় তখন প্রবাসীর আট সংখ্যায় 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা'র প্রথম পর্বের তিনটি প্রবন্ধই (বাংলা ছন্দ, ছন্দের শ্রেণীবিভাগ, বাংলা ছন্দ ও সংগীত) শেষ হয়ে গিয়েছিল। মোহিতলালের মন্তব্য ওই তিন প্রবন্ধের সামগ্রিক পূর্ণতা সম্পর্কে। পরবর্তীকালেও তিনি তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থের (১৩৫২ শ্রাবণ) ভূমিকায় এই প্রবন্ধাবলি সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।—

"একদা প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল ; ঐ প্রবন্ধগুলিতে একটা বাংলা prosody রচনার উদ্যম লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এবং তাহা আমাকে আশান্বিত করিয়াছিল। ...বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত রসজ্ঞান একমাত্র তাঁহার মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম।"

এস্থলে বলা উচিত যে, আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের ছন্দ-প্রবন্ধগুলি মোহিতলালকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। উক্ত ভূমিকাতেই তিনি সেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তার কারণ বোধ হয় এ সময়কার কতকগুলি প্রবন্ধে ব্যাকরণ বিশ্লেষণের প্রাধান্য ও যথেষ্ট সাহিত্যগুণের অভাব। আর বোধ করি এই সাহিত্যগুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই এই দ্বিতীয় পর্যায়েরই একটি বই সম্পর্কে তিনি আন্তরিক অনুকূলতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—"সদ্য প্রকাশিত তাঁহার এক গ্রন্থে ('ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ') আমি তাঁহার আলোচনার ভাষা ও ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়াছি।"

১ এই চিঠিখানির পূর্ণ রূপ দ্রষ্টব্য আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'মোহিত-লালের পত্রগুচ্ছ' গ্রন্থে (১৩৭৬ আশ্বিন) পৃ ৯-১৪।

করুণানিধান

১০ চৌধুরী লেন, কলকাতা
২৫।৩।১৯৩২

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধটি পাইয়া অন্তরে আনন্দিত হইলাম। বাংলা ছন্দোবিজ্ঞানে আপনার অসাধারণ অধিকার। আপনি যদি বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একখানি বহি প্রকাশ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। প্রবাসীতে প্রকাশিত লেখাগুলি ও মেঘদূতের ভূমিকাটি এবং নূতন যাহা কিছু লিখিতেছেন—সবগুলিই একত্র প্রকাশিত করা দরকার। পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের 'হলন্ত ও হসন্ত' সম্বন্ধে নূতন কিছু লিখিতেছেন কি? যদি ইতিমধ্যে কলিকাতায় আসেন, দয়া করিয়া আমার সহিত একবার দেখা করিবেন। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আপনার সহিত আলোচনা করা যাইবে। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ঢাকা-হল, রমনা, ঢাকা।
২১।৩।১৯৩২

প্রীতিভাজনেষু সবিনয় নিবেদন,

আপনার উপহার-পুস্তিকা [বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান] আর পত্র পেয়ে আনন্দিত হলাম।...আপনার সব প্রবন্ধই আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়ি, আর অনেক কিছু শিখি। আপনার সমস্ত প্রবন্ধের একত্র সংগ্রহ দেখবার জন্য অনেকদিন থেকে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি, শীঘ্রই বইখানি প্রকাশ করে ফেলুন। আপনার সঙ্গে কবিগুরুর ছন্দ-যুদ্ধ আমি কৌতুকের সঙ্গে পড়ছি, এবং এই উপলক্ষ্যে যে তাঁর আর আপনার কতকগুলি প্রবন্ধ লেখা হয়ে যাচ্ছে তাতে সমগ্র বাংলা দেশেরই লাভ হচ্ছে। আমি বরাবর আপনার লেখার প্রশংসমান পাঠক। আপনার অক্ষয় যশ কামনা করি। আপনি বঙ্গসাহিত্যে নূতন অলঙ্কার দান করছেন।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

২

University of Dacca
Dacca Hall, Ramna, Dacca
৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩২

পরমপ্রীতিভাজন,

আপনার পত্র পেয়ে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত দুই-ই হয়েছি। কিন্তু আপনারা আমাকে যে-রকম শক্তিমান্ মনে করেন, তা আমি মোটেই নই। আমি আমার অক্ষমতায় বড় সঙ্কুচিত থাকি। এককালে মনের আনন্দে সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছিলাম। নিজে সুন্দর সৃষ্টি করতে না পারলেও, যাঁরা সুন্দর কিছু রচনা করেছেন তাঁদের সমাদর করেছি, মন খুলে তাঁদের অভ্যুদয় কামনা করেছি। আজ আমার এই আনন্দ জীবনশেষের পাথেয় হয়ে রয়েছে যে, আজ যাঁরা বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী গৌরবান্বিত তাঁদের অনেককে আমিই প্রথম অভিনন্দন করেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দসরস্বতী প্রকাশিত হওয়ার পরে আপনার ছন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি যখন প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাই তখন কী আনন্দে যে আমি সেই সংবাদ সত্যেন্দ্রকে বলেছিলাম তা আর কী বলব! সত্যেন্দ্রকে আমি বলেছিলাম যে, তোমার ছন্দ সম্বন্ধে মত অনেক বদলাতে হবে অথবা তোমাকে জবাব দিতে হবে। তাতে সত্যেন্দ্র বলেন যে, আগে সবগুলো ছাপা হোক তারপর দেখব, এখন আমার শরীরটা ভালো নেই। তখন কে জানত যে, তাঁকে কালব্যাধি আক্রমণ করেছে। আমার সঙ্গে ঐ কথা হওয়ার পরেই তিনি কার্বাঙ্কল রোগে শয্যাশায়ী হলেন ও আট দিন পরেই মারা গেলেন। তিনি বেঁচে থাকলে আপনার সমাদর তিনি করতেন। পরে সুনীতিবাবু তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে যে আপনার কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

…আপনার লেখায় আমি সাহিত্যরস পাই, তাই আমার আপনার লেখা ভালো লাগে। কিন্তু আমি জানি না, অঙ্ক কষায় আপনি কোথাও ভুল করেছেন কি না।

…আমি ছন্দশাস্ত্রের কি-ই বা জানি। না আমি কবি, আর না আমি আঙ্কিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাকে ভালোবাসেন তাঁর কবিতার রসগ্রাহী

ব'লে, কিন্তু সমালোচনার বিশ্লেষণের শক্তি আমার নেই। আপনার সঙ্গে কবির যে উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়েছিল, সেগুলি আমি উপভোগ করেছি।······

আপনি যেসব শব্দের প্রতিশব্দ চেয়েছেন, সেগুলি কবিগুরুকে পাঠালে তিনি অনায়াসে চমৎকার শব্দ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। তাঁর এতে অসাধারণ শক্তি আছে।

···আপনি নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-সাধনায় ব্যাপৃত থাকুন। আপনার অভ্যুদয় আমি সানন্দে অভ্যর্থনা করেছিলাম, এবং এখনো অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাবে এ আশা আমার আছে। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।

* * * *

আপনার নব নব রচনা পড়বার প্রতীক্ষায় রইলাম। একখানি পুস্তকে সব প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করলে লোকের উপকার হয়। এ অনুরোধ আমি অনেকদিন থেকে করছি। এইবার সব সমাপ্ত করে বই ছাপুন।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

অমূল্যধন

Carmichael College, Rangpur
13. 4. 1932

প্রিয়বরেষু

আপনার অনুগ্রহলিপি ও প্রবন্ধ পাইলাম। 'জয়ন্তী-উৎসর্গে' আপনার প্রবন্ধটি কিছুদিন পূর্বে পাঠ করিয়াছিলাম, তখন হইতেই প্রবন্ধটি সংগ্রহ করার ইচ্ছা ছিল। উপহৃত প্রবন্ধটির জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বিগত ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মতিথি উপলক্ষে যখন বোলপুরে যাই, তখন তাঁহার ছন্দ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি কবিকে দিয়াছিলাম। 'জয়ন্তী' উপলক্ষে সেইটি প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কর্মবাহুল্য এবং দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার দরুণ আমার প্রবন্ধের কিয়দংশ রচনা করার পর আর অগ্রসর হইতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনার প্রবন্ধেই আমার বক্তব্য

অনেক কথা লেখা হইয়াছে, সুতরাং কবির ছন্দ সম্পর্কে উপযুক্ত প্রবন্ধের অভাবে উৎসর্গ-গ্রন্থ অপূর্ণ রহে নাই।

আপনার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার মতামত বিস্তারিতভাবে লিখিতে গেলে প্রায় একটি অনুরূপ প্রবন্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। বর্তমানে এত সময়াভাব যে বাংলা প্রবন্ধাদি লেখার কিছুমাত্র অবসর হয়ও না। জীবিকার জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মভারে এতদূর প্রপীড়িত থাকি যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও "মাতৃকোষে রতনের রাজি"র সন্ধানের সময় পাই না। আগামী গ্রীষ্মাবকাশে যদি আপনার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হয় তবে সকল কথার আলোচনা হইতে পারে। সপ্তাহ দুই পরে বোধ হয় এখান হইতে বাড়ী (বাঁশবেড়িয়া পোঃ—হুগলী) যাইব। সে সময় ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। আশা করি উপযুক্ত আলোচনার দ্বারা যে যে স্থানে আমাদের মতদ্বৈধ আছে তথায় পরস্পরের সন্দেহভঞ্জন হইয়া যাইবে।

আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ও আলাপের সৌভাগ্য এ পর্যন্ত হয় নাই। তত্রাচ প্রিয়জনমধ্যে যে আমাকে স্থান দিয়াছেন তজ্জন্য পুনশ্চ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

পত্রধারা ২

পরিভাষা-প্রসঙ্গ

১

২৪, চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা-১৩
ইং ১৯।৩।৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার 'ছন্দের পরিভাষা' পড়িয়াছি—খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। পড়িয়া একটি কথাই মনে হইয়াছে, আপনি সত্যই নিষ্ঠার সহিত, এবং সত্যকার জিজ্ঞাসা লইয়া এই বিষয়টি পর্যালোচনা করিতেছেন, আজও আপনি শ্রান্তি বোধ করেন নাই। আমার মনে হয়, এই বস্তুকে আর কেহ এমন ভালবাসে নাই—এই শ্রদ্ধাই সিদ্ধিলাভের সহায় হইবে। আপনার গবেষণা ও বিচারপ্রণালী দুই-ই উচ্চাঙ্গের, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিভাষা-নির্মাণের আপনি যে নজির ও যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। সম্ভবতঃ উহার চেয়ে ভালো কিছু উদ্ভাবন করা যাইবে না। কিন্তু আমার, তৎসত্ত্বেও, নামগুলি খুব সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয় না, তার কারণ আমার মনোভঙ্গি আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়—আমার 'ছন্দ-বিচার'-পদ্ধতি হইতে তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন; অতএব এ বিষয়ে আমার মতামত গ্রাহ্য হইতে পারে না। আপনি সেজন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবেন না। তবে, আপনার ঐ প্রবন্ধটি যে মূল্যবান্—সেটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার আছে। আমি আমার আপত্তির কারণ কিছু লিখিতে পারিতাম, কিন্তু আমার সে সময় নাই। কিন্তু সে আপত্তি সাহিত্যিক আপত্তি—তাহার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। আসল কথা, ঐ শব্দগুলির পারিভাষিক প্রয়োগ অপরিহার্য হইলেও—অর্থ অতটা দৃঢ় করিবার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, এবং একটু শিথিলার্থ করিয়া সৌষ্ঠবের বৃদ্ধি করিলে ভালো হইত। কিন্তু সেগুলির পারিভাষিক প্রয়োগ যাহাতে দোষশূন্য হয়, আপনি সেই দিকে যেরূপ সাবধান হইয়াছেন, হয় তো তাহাই আরো যুক্তিযুক্ত। তবু আমার মনে হয়, পরিভাষা সৃষ্টিতেও ভাষার একটু পরিচিত রূপ রক্ষা করিতে পারিলে কাজটি অতিশয় সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু উহা আমার ব্যক্তিগত পছন্দের কথা। আর যেসকল বিষয়ে

মতভেদ আছে, তাহা থাকিবেই—তাহার কারণ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। মোটের উপর আপনার এই গবেষণা যে মূল্যবান্ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করি।

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এই চিঠিখানি 'মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ' গ্রন্থে (১৩৭৬ আশ্বিন) সংকলিত হয় নি। যথাসময়ে এটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। দ্রষ্টব্য উক্ত গ্রন্থের ভবতোষ দত্ত-লিখিত ভূমিকা, পৃ ৪২। এখানে এটির প্রাসঙ্গিক অংশটুকু মাত্র মুদ্রিত হল।

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা

১৮-২-৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ২৫ মাঘের পত্র ও 'ছন্দপরিভাষা' যথাসময়ে পেয়েছি উত্তর দিতে দেরী হল, মার্জনা করবেন। এই প্রবন্ধ 'পূর্বাশা' পত্রিকায় পূর্বেই পড়েছি। আমাকে যে কপি পাঠিয়েছেন তা দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিয়েছি। তিনি সম্প্রতি নূতন বাড়িতে গেছেন, ঠিকানা জেনে নিতে ভুলে গেছি; এবারে দেখা হলে জেনে নেব। আপনার নূতন পরিভাষা মোটের উপর ভালই মনে হল।

বিনীত

রাজশেখর বসু

প্রেসিডেন্সি কলেজ

২৭-১১-৫৫

বিদগ্ধবরেষু

আপনার চিঠি ও 'ছন্দপরিভাষা' পেলাম। আপনার প্রীতি ও পাণ্ডিত্যের এই দুটি নিদর্শন স্বতই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমাদের অধ্যাপনার প্রথম পর্ব থেকেই আপনার জ্ঞান-গবেষণার খ্যাতির সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় ঘটেছে। ছন্দোব্যাখ্যাতা রূপে আপনি শুধু

ছান্দসিকদিগের নহে, কাব্যরসিক ও অধ্যাপককর্মীরও আচার্যস্থানীয়। ছন্দোব্যাখ্যানে আপনি পথিকৃৎ, এতে সন্দেহ নেই।

জনার্দন চক্রবর্তী

৪

Ashutosh Building
Calcutta-7
৭ ৩।৪৯

প্রিয়বরেষু

আপনার প্রবন্ধের অফ্‌প্রিণ্ট দুখানি পেয়েছি। বেশ হয়েছে। ছন্দের পরিভাষা বেঁধে দিতে আপনার উদ্যোগ সময়োপযোগী হয়েছে। আমি আপনার দৃগ্‌ভঙ্গি সমর্থন করি। এ বিষয়ে আমার যৎসামান্য বক্তব্য পরে জানাবো। আপাতত একটু ব্যস্ত আছি।

আশা করি আপনাদের সব কুশল।

আপনার
সুকুমার সেন

98/4, Russa Road,
Calcutta-20
8. 2. 49.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার 'ছন্দ-পরিভাষা' ভাল করিয়া পড়িলাম। আমার নিকট নিশ্চয়ই কোন জজের মত আশা করেন না ; এ-বিষয়ে আমার 'জুরি'র মত দিতেছি।

মোটামুটি আপনার পরিভাষা আমার ভালই লাগিল। শুধু দু-এক জায়গায় দু-একটা কথা মনে হইয়াছে। তাহা অবশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর, তথাপি লিখিতেছি।

১। দল—'একপ্রযত্নোচ্চারিত শব্দাংশের নাম দল'। ইহা কি কোন প্রাচীন

সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সংজ্ঞা? যদি তাহা হয় তবেই ভাল হয়। নতুবা বাঙলায় দল শব্দটি অংশার্থ অপেক্ষা সমূহার্থই গ্রহণ করে বেশী, সুতরাং বাঙলায় সাধারণতঃ 'শব্দদল' শব্দের অংশ না বুঝাইয়া শব্দের সমূহও বুঝাইতে পারে। অবশ্য পারিভাষিক অর্থে চালু হইয়া গেলে বোধ হয় এই দ্ব্যর্থতার গোলমাল নাও থাকিতে পারে।

২। আশ্রিত স্বরের চিহ্ন '্' না করিয়া অন্য কিছু করিলে ভাল হয়। '্'-এর হস্‌চিহ্ন বুঝাইবার প্রসিদ্ধি খুব বেশী, অতএব গোলমাল এড়াইয়া চলাই বোধ হয় ভাল।

৩। Accent-এর অর্থ 'প্রস্বর' করিয়াছেন। 'প্র' উপসর্গের ভিতরে এখানে একটা superiority-র অর্থ আছে, আপনি ইংরেজি নজীর দ্বারা এই superiority বা প্রকর্ষতার অর্থকেই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু stress accent-এর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্বরের যে 'বল-জনিত' প্রাধান্য তাহা কি সর্বত্র তাহার প্রকর্ষতারও পরিচায়ক? অর্থাৎ বলের দ্বারাই necessarily qualitative superiority লাভ হয় কি না?

৪। 'জটিল কলামাত্রিক' নামটি আমার ভাল লাগে নাই। 'জটিলতা' কোন বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ নহে; সুতরাং সংজ্ঞানির্দেশের ক্ষেত্রে শুধু 'জটিল' বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত মনে হয় নাই। উহার স্বরূপ-লক্ষণ-জ্ঞাপক অন্য কোন শব্দ দিতে পারিলে ভাল হয়।

৫। পূর্ণিমা চন্দ্রের ॥ জ্যোৎস্না ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা ॥ তন্দ্রা হারায়।

ইহাকে 'সরল কলামাত্রিক পয়ার' বলিয়াছেন। উপরের পংক্তি দুটিকে যদি সামান্য একটু বদল করিয়া দি—

পূর্ণিমা চন্দ্রের ॥ জ্যোৎস্নাধারা
সান্ধ্য বসুন্ধরা ॥ তন্দ্রাহারা।

ইহাতে ছন্দের pattern-টি কি একেবারে বদলিয়া যাইবে? যদি একেবারে না বদলায়, তবে ইহার নাম কি দিবেন?

জুরির মতামতে হয়ত হাসিবেন; তবু গুরুগম্ভীরভাবেই লিখিলাম।

আপনাদের
শশিভূষণ দাশগুপ্ত

মন্তব্য—১। পরিভাষা রচনার সময় আমি সর্বদাই তার প্রাদেশিকতার চেয়ে ভারতীয়তার দিকেই বেশি নজর রাখি। অর্থাৎ সর্বভারতে একই পরিভাষা প্রচলিত হওয়া কাম্য মনে করি। তাই যথাসম্ভব সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। সংস্কৃতে 'দল' শব্দে অংশ বা খণ্ড বোঝায়, সমূহ বোঝায় না। বাংলাতেও দল শব্দের মূল বা আসল অর্থ খণ্ড। 'দলা' শব্দেই তা সুস্পষ্ট। ডেলা, ঢেলা ও ঢিল শব্দ দল বা দলা শব্দের রূপান্তর কিনা তা বলার অধিকার আমার নেই। যদি তা হয় তবে এগুলির দ্বারাও দল শব্দের মৌলিক খণ্ডার্থই সূচিত হয়। দল শব্দের সমূহার্থ এসেছে পরোক্ষে, এ শব্দটির অর্থান্তর প্রাপ্তির ফলে।

২। আশ্রিত স্বর ও আশ্রিত ব্যঞ্জনের জন্য দু-রকম চিহ্ন ব্যবহারেই বেশি বিভ্রান্তির আশঙ্কা। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ উভয়েই আশ্রিত স্বর ও আশ্রিত ব্যঞ্জনকে একই পর্যায়ভুক্ত করতেন।

৩। 'প্রস্বর' শব্দটি শুধু ইংরেজির নজিরে রচিত নয়। এ শব্দের দ্বারা সব ভাষার সব রকম accent-ই বোঝানো যায়। প্রকর্ষ বা superiority শব্দ এখানে ধ্বনির গুণবোধক অর্থাৎ quality-বোধক নয়, বিশিষ্টতাবোধক মাত্র।

৪। ব্যাকরণের ইংরেজি complex sentence-কে বাংলায় বলা হয় 'জটিল বাক্য'। তাতে কারও আপত্তি হয় না। সে নজিরেই 'জটিল কলামাত্রিক' নাম রচিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল তাতে পাঠকের মনে হয়েছে 'জটিল' মানে 'গোলমেলে'। তাই এ নামটি পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন বলি 'মিশ্র কলাবৃত্ত', সংক্ষেপে 'মিশ্রবৃত্ত' (composite)। তাতে বিভ্রান্তি ঘটেছে বলে শুনি নি।

৫। দুটি দৃষ্টান্তই 'কলাবৃত্ত পয়ার'। প্রথমটি পূর্ণ, দ্বিতীয়টি অপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করতেন।

'বাসশ্রী'
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
২২ মার্চ, ১৯৪৯

শ্রীচরণেষু

আপনার প্রবন্ধটি ভালো করে পড়লাম। প্রবন্ধটি পড়বার আগে কলকাতায় কোনো অধ্যাপকের কাছে এর সপ্রশংস উল্লেখ শুনেছিলাম। তিনি আপনার

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটি পড়ে তাঁর অনুরূপ উক্তির কারণ বুঝলাম। বাংলা ছন্দকে এমন সুনিয়মিত বিশ্লেষণ আর কেউ যথার্থভাবে করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। আপনার 'ছন্দোগুরু' বইখানা পড়ে আমার এই ধারণা জন্মে। সঙ্গী হিসাবে আমি যে কয়খানা বই এখানে এনেছি, ও বইখানা তার অন্যতম। এই প্রবন্ধে আপনার মত যা ব্যক্ত হয়েছে, ছন্দোগুরুতে ব্যক্ত মত থেকে তার বৈলক্ষণ্য মৌলিক নয়। প্রবন্ধটি পড়বার সময় আমি এই জন্য ভালো করে বুঝে নেবার জন্য বইখানাও পাশাপাশি মিলিয়ে গেছি। মৌলিক ছন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার বলবার কিছু নেই। কেবল নূতন পরিভাষা সম্পর্কে আমার কয়েকটি কথা মনে হয়েছে, সসঙ্কোচে তাই আপনাকে জানাব। আমার বোঝবার ভুল হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। সে-ক্ষেত্রে আমার বাচালতার জন্যে প্রথমেই আপনার ক্ষমা চেয়ে রাখি।

প্রথমত, 'অক্ষর' শব্দটি। আপনি বলেছেন, অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্ হতে পারে না। "প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অক্ষর ও বর্ণ উভয়কেই শব্দাংশ অর্থে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এই শব্দাংশ ঠিক সিলেব্‌ল্ নয়।"

কিন্তু ছান্দসিক যখন বলেন, সংযোগপূর্ব বর্ণ গুরু, সুতরাং দ্বিমাত্রা হবে তখন তাঁরা কি বর্ণকে শব্দাংশ অর্থে ব্যবহার করেন? তাঁদের মতে সংস্কৃত ছন্দোরীতিতে 'ধর্মক্ষেত্রে' এই শব্দটিতে সংযোগপূর্ব বর্ণ 'ধ' দুইমাত্রা এবং 'র্ম' একমাত্রা। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে যদি তাঁরা শুধু একক 'ধ'-কেই বর্ণ (= শব্দাংশ) বলে ধরতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এর দ্বৈমাত্রিক মূল্য নির্ধারণ করতেন না। আসলে 'সংযোগপূর্বঃ বর্ণঃ' বলতে তাঁরা ধর্ম শব্দের 'ধর্' সিলেব্‌ল্ কিংবা ছন্দ শব্দের 'ছন্' সিলেব্‌ল্, কশ্চিৎ শব্দের 'কশ্' সিলেব্‌ল্ প্রভৃতি বুঝছেন। শ্রুতবোধ থেকে উদ্ধৃত শ্লোকেও 'সংযুক্তাদ্যম্ অক্ষরং গুরু' বলতেও শাস্ত্রকার অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্ ধরছেন। অবশ্য শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ আমার পড়া নেই। বাংলায় 'অক্ষর' শব্দটির অর্থ-বিভ্রাটের জন্য আপনি যে আপত্তি উত্থাপিত করেছেন, তা আমার যুক্তিযুক্তই মনে হয়। তবে আধুনিক কালে কেউ কেউ অক্ষরকে যে সিলেব্‌ল্ অর্থে ব্যবহার করছেন তার একটা ঐতিহ্য পাওয়া যায়, যদি ওপরে আমি যা বললাম তাতে ভুল না হয়।

আধুনিক বাংলায় সিলেব্‌লের প্রতিশব্দ 'অক্ষর' যদি বাদ দিতে হয়, তবে ব্যবহারোপযোগী (handy) বলে 'দল' শব্দটি সুন্দর। শব্দটি ছোটো, শুনতেও ভালো। এর সম্বন্ধে আপত্তি শুধু এই হতে পারে : শব্দটি direct নয়। এটার ব্যবহার হচ্ছে রূপকার্থে (figurative)। এবং সেজন্য দল শব্দটিতে এ বস্তুটার যথার্থ বৈশিষ্ট্য পাওয়া শক্ত। এটা যে সত্যেন্দ্রনাথের 'পাপড়ি' শব্দেরই সাধুরূপ তাও স্মরণীয়। স্বরবৃত্ত বলার চাইতে দলবৃত্ত বা দলমাত্রিক বলায় স্বধর্ম অধিকতর প্রকাশিত হয় বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, 'ধ্বনি' শব্দে আপনার যে আপত্তি সেটাও অযথার্থ নয়।

ছন্দোবিশ্লেষে আপনি কলা ও মাত্রার যে সূক্ষ্ম প্রভেদ নির্ণয় করেছেন, সেটা বিশেষ কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। যৌগিক ছন্দে আপনি কলাগণনার বিশিষ্ট প্রণালীটি দেখিয়েছেন—শব্দের আদি বা মধ্যবর্তী রুদ্ধদল এককলা এবং প্রান্তবর্তী রুদ্ধদল দুই কলা। যৌগিক এবং কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দে রুদ্ধদলের কলাগণনার বৈলক্ষণ্যহেতু আপনার এই উক্তি অতিশয় যথার্থ : বাংলা ছন্দে রীতিভেদে মাত্রা বিভিন্ন হয়। এই জন্য mora অর্থে 'কলা' এবং unit অর্থে 'মাত্রা' ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য।

সাধারণভাবে বলব, আপনার পরিভাষা রচনা বিস্ময়করভাবে সুন্দর ও সুষ্ঠু হয়েছে। যা উপরে বললাম, তাতে আমার বোঝবার ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেজন্য আমি আবার আপনার মার্জনা ভিক্ষা করি।

ভবতোষ দত্ত

অক্ষর ও দল শব্দের পারিভাষিক যোগ্যতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে 'পরিভাষা-পরিচয়' বিভাগের 'অনুষঙ্গ' অংশে। এখানে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে বলা উচিত যে, 'দল' শব্দের ধাতুগত অর্থ খণ্ড। তাই 'দল' শব্দকে তার মৌলিক অর্থেই syllable-এর প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করা সমীচীন, রূপকার্থে (অর্থাৎ পাপড়ি বা পাতা অর্থে) নয়।

বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল

(দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

কর্ণ ও মনকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য পরিমিত বর্ণ যোজনার নাম ছন্দ। লৌকিক সংস্কৃতে দুই জাতীয় ছন্দ আছে, বৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। বৃত্তছন্দে প্রতি চরণে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বর থাকে এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গুরুস্বরকে দুই মাত্রা ও লঘু-স্বরকে এক মাত্রা ধরিয়া প্রতি চরণে সমসংখ্যক মাত্রা থাকে। ইহাতে স্বরের সংখ্যা অসমান হইতে পারে কিন্তু বৃত্তছন্দে সাধারণতঃ স্বরসংখ্যা ও মাত্রা উভয়ই প্রতি চরণে সমান থাকে।

বাঙ্গলায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ চলিয়াছে। প্রথম—অক্ষর গণনা করিয়া অর্থাৎ স্বরের উচ্চারণ হউক আর নাই হউক মোট অক্ষর প্রতি চরণে সমান থাকা চাই যথা—পয়ার, পূর্বের ত্রিপদী চতুষ্পদী প্রভৃতি। ২য় প্রকার—মাত্রা গণনা করিয়া। বাঙ্গলার মাত্রা গণনায় সংস্কৃতের সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, বাঙ্গলায় আ দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ এ ও, এই পাঁচ স্বরকে এক মাত্রা গণনা করা হয়, সংস্কৃতে এগুলি দুই মাত্রা। বাঙ্গলায় ঐ ঔ যুক্ত স্বর বলিয়া দুই মাত্রা এবং সংস্কৃতের ন্যায় বিসর্গ অনুস্বার ও যুক্তাক্ষরের পূর্ব বর্ণ দুই মাত্রা গণনা করা হয়, আর একপ্রকার ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলী ছড়ায় আবদ্ধ হইল। ব্যঙ্গ কবিতায় স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় এবং স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন।

প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষরমাত্রিক' ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ত' এবং ৩য় প্রকারের 'স্বরমাত্রিক' বা 'ছড়ার ছন্দ' নাম দেওয়া যাইতে পারে। ছন্দের মাত্রা ও তালের মাত্রা একই জাতীয়, কারণ কতকগুলি মাত্রার সমষ্টিকেই তাল বলে। সমপরিমিত সময়ে সুরসহযোগে পদ্য আবৃত্তি করিলেই গীত হয়, আর সমপরিমিত সময়ে এক এক মাত্রা কবিতা আবৃত্তি করিলেই ছন্দোবদ্ধ পদ্য হয়।

যে সকল তালে এক এক পদে সমান মাত্রা থাকে, সাধারণ লোকে সে সকল তাল বা তাহার অনুরূপ তাল সহজেই বুঝিতে পারে; যেহেতু মানুষ সমপরিমিত সময়ে সমসংখ্যক অঙ্গ সঞ্চালন করিতেই স্বভাবতঃ আনন্দ অনুভব করে।

একাধিক লোকে একত্র কার্য করিতে গেলেই এইরূপ তালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য না করিলে তাহা সুশৃঙ্খলভাবে হইতে পারে না। নূতন ঘরের ছাদ পিটিতে মজুরেরা একসঙ্গে পিটনা পিটায়, তাহারও একটা তাল আছে। সৈনিকেরা কুচ-কাওয়াজ করে একটা তালের দিকে মন রাখিয়া। একটা বৃহৎ দ্রব্য উঠাইতে বা ঠেলিতে হইলে যখন বহু মজুরে একসঙ্গে বলিয়া ওঠে 'মার ঠ্যালা হাঁইয়ো', আর কথার শেষে একত্র বল প্রয়োগ করে। পাল্কীবাহকেরাও তালে তালে পদক্ষেপ করে আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দুর্বোধ শব্দ আবৃত্তি করে। এই সকল স্থলেই মাত্রার ব্যবহার আছে।

সংস্কৃতে সাধারণতঃ দুই বা চারি পাদে এক চরণ ও দুই চরণে এক শ্লোক হয়। বাঙ্গলার পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতিতেও চারি পাদ ও দুই চরণ আছে। পয়ারের প্রথম আট অক্ষরের পরে যতি, সেই পর্যন্ত প্রথম পাদ তৎপরে ৬ অক্ষরে ২য় পাদ। যাঁহারা সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন এই ৬ অক্ষরের পরে দুই অক্ষর-কাল সুরটা টানিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে চার পদেই সম সময়ে পঠিত হয়। মধ্যযুগে যেমন অক্ষরের বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল প্রথমে পয়ারের অক্ষর সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম ছিল না। ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রা কালের মধ্যে যতগুলি অক্ষর উচ্চারণ করা যাইত তাহাই পয়ারের অন্তর্গত হইত। পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর উত্তরকাণ্ড রামায়ণে দেখিতে পাই—

মনের সুখে সুখী রেণুকা পুত্রে দিল বর।
সূর্য সমান তেজ হৈছে তোমার কলেবর॥

কৃত্তিবাস, রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড

ইহাতে উভয় চরণেই ১৬ অক্ষর আছে। অথচ ইহা খাঁটি পয়ার। স্বরমাত্রিক ছড়ার ছন্দে ইহার অন্য উদাহরণ পাওয়া যায়।

ত্রিপদীতে প্রথম দুই পাদে সমান সমান অক্ষর থাকে, তৃতীয় পাদে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক থাকে। যথা লঘুত্রিপদীতে ৬+৬+৮ অক্ষর ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে সাধারণতঃ ৮+৮+১০ অক্ষর থাকে। লঘু বা দীর্ঘ ত্রিপদীর তৃতীয় পাদের প্রথম ৬ বা ৮ অক্ষরকে তৃতীয় পাদ ধরিলেই অবশিষ্ট দুইটি অক্ষরকে টানিয়া লইয়া ৪র্থ পাদ করিলেই চলে, সুতরাং ত্রিপদী ও চতুষ্পদীতে মাত্রাগত ভেদ নাই; ভেদ মিলের। চতুষ্পদীতে তিন পাদেই মিল থাকে, ত্রিপদীতে প্রথম দুই পাদে মিল থাকে। আবার পয়ারের প্রথম ৮ অক্ষর যদি ৪ অক্ষর

৪ অক্ষর করিয়া ভাগ করা থাকে তবে তাহাকে ত্রিপদীর সদৃশ গঠন বলা যায়। ইহার প্রথম দুই পাদে মিল থাকিলে নাম তরল পয়ার যথা—

দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র, সমনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি ॥

—কাশীরাম দাস, মহাভারত

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে মিল না থাকিলে কবি হেমচন্দ্র সেরূপ ছন্দের নাম দিয়াছেন ত্রিপদী পয়ার যথা—

মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল।

—হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা, শিবকর্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত

প্রথম পাদে ৮ অক্ষর ও ২য় পাদে ৭ অক্ষর থাকিলে কেহ কেহ তাহাকে মালতী ছন্দ বলেন। কবি হেমচন্দ্র সেরূপ ছন্দকে লঘু ভঙ্গ পয়ার ও ললিত পয়ার উভয়ই বলিয়াছেন।

পয়ারের ৪ পাদে দুই চরণ ধরিলে সংস্কৃত অনুষ্টুভ্ ছন্দের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। বৃত্ত ছন্দের প্রায় সকলগুলিতেই স্বর ও মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু অনুষ্টুভে স্বর অর্থাৎ বাঙ্গলার অক্ষর নির্দিষ্ট আছে কিন্তু মাত্রা ঠিক নাই অথচ মানবের প্রকৃতিই এই যে, সে সম সময়ে এক এক পাদ উচ্চারণ করিবে অর্থাৎ মোট মাত্রা বা তালটা ঠিক থাকিবে। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময়ে অধিক মাত্রার ও অল্প মাত্রার পাদ উচ্চারণ করিতে গেলেই হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ উঠিয়া যায়। যথা,—শারদি বিমলাকাশে, চন্দ্র নক্ষত্র ভূষণৈঃ—একটি অনুষ্টুভের দুই পাদ। ইহার প্রথম পাদে ১১ মাত্রা কিন্তু ২য় পাদে ১৩ মাত্রা। হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ উঠিয়া গেলে আর বাঙ্গলার পয়ারের শেষে দুই মাত্রাকাল টান রাখিতে হয়, ইহা মনে রাখিলেই বুঝা যাইবে যে অনুষ্টুভ্ হইতেই পয়ারের জন্ম।

এইবার পয়ারের সহিত তালের সম্বন্ধ নির্ণয় করিব। বাঙ্গলার পয়ার যখন প্রথম রচিত হয়, তখন গানের জন্যই রচিত হইত এ কথা বলা বাহুল্য। সুতরাং মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অর্থাৎ তাল মনে রাখিয়া রচয়িতা পয়ার লিখিতেন। তজ্জন্য যে অক্ষর বেশী কম হইবে ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সাধারণ তালের মধ্যে ৩ ও ৪ মাত্রার তালই অধিক। একতালা, খেম্‌টা, আড়খেম্‌টা, দাদ্‌রা, কাশ্মীর খেম্‌টা প্রভৃতি ৩ মাত্রার তাল এবং কাওয়ালী,

তেতালা, ঠুংরি, ছেপ্‌কা প্রভৃতি ৪ মাত্রার তাল। প্রতি তালেই ২টি বা ৪টি পাদ থাকে। এই এক পাদের মধ্যে ৩টি সমান সময়সূচক আঘাত করিলেই ত্রিমাত্রিক তালের তাল থাকিবে। আর ঐ সময়ে ৪টি আঘাত করিলে চতুর্মাত্রিক তালের তাল থাকিবে। পয়ারে ১৪ অক্ষর ও দুই মাত্রা-কাল টান থাকে বলিয়া ১৬ মাত্রা আর কাওয়ালীর প্রতি পাদে ৪ মাত্রা করিয়া মোট ১৬ মাত্রা। সুতরাং পয়ারকে চতুর্মাত্রিক কাওয়ালীর তালের ছন্দ বলা চলে।

সুতরাং যে সকল ছন্দের প্রতি পাদে ৮ অক্ষর থাকে তাহাই পয়ারের ন্যায় কাওয়ালী তালের ছন্দ। নিম্নলিখিত বিভিন্ন ছন্দ ইহার অন্তর্গত।

(১) সাধারণ পয়ার, তরল পয়ার, মালতী ছন্দ, লঘুভঙ্গ পয়ার।

(২) দীর্ঘ ত্রিপদী—

ডাকিতে জীবন গেল, শকতি ফুরায়ে এল
ভকতি পড়িয়া রল পিছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, আকিঞ্চন, মর্মগীতি

তেমনি কি আসে ঊষা, সে সোনালী সুষমায়
সাজায়ে শ্যামল দেহ শরতের।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেঁয়ালি, সঙ্কল্প

আনন্দে হৃদয় ভরি দেব-ঋষি বীণা ধরি
তারে তারে মিলাইয়া ঝঙ্কার তুলিল।

—হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা

এই তিনটি দীর্ঘ ত্রিপদীর মধ্যে প্রথমটির শেষে ১০, ২য়টির শেষে ১২ এবং ৩য়টির শেষে ১৪ অক্ষর আছে। কিন্তু তালের ব্যত্যয় হইবে না কারণ যাহাতে অক্ষর কম তাহাতে টান দিয়া অভাব পূরণ করিতে হইবে।

(৩) চতুষ্পদী—

তরিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে।

এখানে ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর মধ্যে প্রভেদ কেবল মিলের, মাত্রার নহে।

(৪) ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি পয়ার—

ভাল করে বুঝিলি নে,   হল তোরি পরাজয়,
কি আর ভাবিতেছিস্   ম্রিয়মাণ হা হৃদয়।

—রবীন্দ্রনাথ, সন্ধ্যাসঙ্গীত, পরাজয়সঙ্গীত

(৫) কুসুম মালিকা ছন্দ—

যথা, দুখী দেখে দ্রবীণ প্রবীণ চিত হয়,
যথা, হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়।

এই ছন্দের শেষের টানের স্থানে প্রথম দুই অক্ষর পঠিত হইবে। এই উভয় ছন্দেই তালে বিশ্রামের স্থান নাই।

(৬) একাদশাক্ষরা বৃত্তি—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

—রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, সোনার তরী

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ও স্বরমাত্রিক বা ছড়ার ছন্দের যে সকল উদাহরণ ইহার অন্তর্গত তাহা পরে প্রদত্ত হইবে। এইবার ত্রিমাত্রিক তালের ছন্দের বিষয় বলিব। সাধারণতঃ ইহার এক এক পাদে ৩-এর দ্বিগুণ ছটি করিয়া মাত্রা থাকে। নিম্নে ছন্দগুলির নাম প্রদত্ত হইল,—

(১) লঘু ত্রিপদী—

নবীনে হেরিয়া,   ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিলিতে চায়।

—হেমচন্দ্র, বিবিধ কবিতা, নববর্ষ

সুখ দুঃখ ফেলে,   আপনাকে ফেলে
তোমার সকাশে আসিব।

হিরণ বরণ   তরুণ অরুণ
কিরণ তরুর মধুর গায়।

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মন্দিরা, বাণীর প্রতি

ইহার প্রথমটির ৩য় পাদে ৮, দ্বিতীয়ে ৯ এবং তৃতীয়ে ১১টি অক্ষর আছে। এই

তালের প্রতি চরণে ১২ পর্যন্ত যে কোন মাত্রা দিলেই চলিবে। অক্ষর অল্প থাকিলে টান দিয়া অভাব পূরণ করিতে হইবে। যখন ত্রিপদীর ৩য় পাদে ১২ মাত্রা হয়, তখন তাহাকে দীর্ঘ একাবলী বলে। একাবলীতে প্রথম চরণের শেষ পাদে এক মাত্রা কম।

(২) বরুণতনয়া পাতালে ধাম। ভগিনী ক'জনা. শুনহ নাম।

—হেমচন্দ্র, বীরবাহু

(৩) দরিদ্র কাঙ্গাল কতদিন আর। জঠর অনলে করে হাহাকার।

—হেমচন্দ্র

গান রচয়িতা অনেক সময়ে এই দিকে লক্ষ্য রাখেন না বলিয়া কোন কোন পাদে অক্ষর কম করিয়া ফেলেন। অক্ষরের অভাব টান দিয়া পূরণ করেন। অন্য গায়কে গাইবার সময় কোথায় টান দিবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন না। যথা—কে ও রমণী, নীরদবরণী, স্মর হরহৃদে, সমরে নাচিছে। ইহার প্রথম পাদে একটি অক্ষর কম পড়িয়াছে। এখন টানটা 'কে'র উপরে পড়িবে কি 'ও'র উপরে পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। শেষ পাদে অক্ষর কম থাকিলে এ গোল থাকে না, শেষের স্বর আবশ্যক মত টানিয়া রাখিলেই চলে।

অনেকে হয় ত আপত্তি করিতে পারেন এরূপভাবে অক্ষর সংখ্যার বাঁধাবাঁধি থাকিলে তাল মিলিবে, কিন্তু গায়কের পক্ষে স্বরের খেলা দেখাইবার সুবিধা থাকিবে না। কিন্তু তাহার কোন আশঙ্কা নাই। গায়ক ইচ্ছা করিলেই ঢিমা তালে গান গাইলেই ইচ্ছামত কোথাও দ্রুত মাত্রা কোথাও বিলম্ব মাত্রা গাইয়া এক এক পাদে তাল ঠিক রাখিতে পারেন। সাধারণতঃ বাঙ্গলার সমস্ত ছন্দেই শেষ কালে অক্ষর বা মাত্রা কম থাকে—সেখানে বিশ্রাম বা যতি। তালেরও সেখানে শেষ বলিয়া বিশ্রামের সময় আছে। আবার পয়ারে ৮ অক্ষরের পরে যতি, তালেরও ঠিক সেই স্থানে বিশ্রাম পাওয়া যায়।

পূর্বে বাঙ্গলার অক্ষরমাত্রিক কবিতায় পাঁচ মাত্রার তাল—ঝাঁপতাল ও ৭ মাত্রার তাল—তেওরার ব্যবহার ছিল না। যাঁহারা গান রচনা করিতেন তাঁহারা অক্ষর কমি বেশির দিকে তত দৃষ্টি দিতেন না, অক্ষর কম থাকিলে টান দিয়া কাজ সারিতেন। যথা—

হর নিদয়, হরি নিদয়, মোরে হর, কামিনী।

এখানে ৩য় পাদের 'মোরে হর' এই ৪টি অক্ষর আছে। বর্তমান বাঙ্গলার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কথা বলিবার পূর্বে বাঙ্গলায় সংস্কৃত ছন্দের কথা বলিব। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথমে এ পথের পথিক। বাঁকিপুরের স্বর্গীয় কবি বলদেব পালিত মহাশয় তাঁহার ১২৭৯ সালে মুদ্রিত ভর্তৃহরি কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, 'ভারতচন্দ্র অসাধারণ রচনাশক্তি সত্ত্বেও কেবল ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক, পজ্‌ঝটিকা, গীতিকা, পঞ্চচামর প্রভৃতি কতিপয় সামান্য অত্যুৎকৃষ্ট ছন্দ লিখিয়াই নিশ্চিত [নিশ্চিন্ত ?] রহিলেন।…বঙ্গভাষায় আদিকবিরা (বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি) সংস্কৃত ছন্দে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা পূর্বতন মহাকবিদের মনোনীত ছন্দ সমুদায় আয়াসজনক বোধে, হিন্দি ভাষার সরল ও সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কিংবা কবিবর জয়দেবের মধুর কান্ত পদাবলীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া পজ্‌ঝটিকা প্রভৃতি কতকগুলি মাত্রাবৃত্ত মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। তথাপি যদি তাঁহাদের পশ্চাদ্‌বর্তী করিয়া সেই সকল মাত্রাবৃত্তও জীবিত রাখিতেন, তাহা হইলেও বাঙ্গলা কবিতার যথেষ্ট উপকার হইত সন্দেহ নাই।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রায় সমসাময়িক। জয়দেব [জয়দেবের ?] সমস্ত গীতগুলিই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ইহাতে প্রধানতঃ পজ্‌ঝটিকা ও মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে যতি, রূপক, একতালী—সে কালের এই ত্রিবিধ তাল থাকিলেও আধুনিক চতুর্মাত্রিক কাওয়ালী তালেই মিলিয়া যায়।

পজ্‌ঝটিকার উদাহরণ—

নয়ননলিনমিব, বিদলিত নালম্‌।

—জয়দেব, গীতগোবিন্দ, গীত ৯।৪

ইহার সহিত বিদ্যাপতির—শৈশব যৌবন, দুহুঁ মিলি গেল—তুলিত হইতে পারে। তবে হ্রস্বদীর্ঘ উদাহরণে বিশেষ পার্থক্য আছে—জয়দেব সংস্কৃতে গীত রচনা করিয়াছেন তিনি সংস্কৃত নিয়মই মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও বাঙ্গলার অন্যান্য পদাবলীকার—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম দাস, রাধামোহন ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস, যদুনন্দন, কবিশেখর, বল্লভ দাস ব্রজবুলিতে গান রচনা করিবার সময় সংস্কৃতের এই নিয়ম অনুসরণ করেন নাই। এই পদকর্তাগণের ব্রজবুলির পদগুলি প্রায় সমস্তই চতুর্মাত্রিক কাওয়ালী তালে গেয় এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত। যেখানে অক্ষর কম না থাকে সেখানে

দীর্ঘস্বরকেও হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় কিন্তু অক্ষর কম থাকিলে কোন একটি দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা উচ্চারণ করিলেই চলে।* তবে সাধারণতঃ শব্দের প্রথম দীর্ঘ স্বর দুই মাত্রা উচ্চারণ করিতে পারিলে দ্বিতীয় স্বর দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হয় না। আবার ৮ মাত্রার মধ্যে প্রথম ৪ মাত্রা প্রথমে হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া পূর্ণ হইয়া গেলে, ২য় চার মাত্রা পূর্ণ করিবার সময় অবশিষ্ট দীর্ঘস্বর বর্ণগুলির মধ্যে কোন একটাকে দুই মাত্রা উচ্চারণ করিতে হয়। স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায় যেখানে প্রথম পাদে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া এক মাত্রা কম থাকিয়া যায় তখন ২য় পাদ হইতে ১টি মাত্রা লইয়া তাল ঠিক রাখিতে হয় যথা,—

সব জন কানু কানু করি ঝ্‌রয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর।

—বিদ্যাপতি, পদাবলী

এখানে প্রথম পাদে ৬টি অক্ষর 'সব জন কানু' তন্মধ্যে মাত্র একটি দীর্ঘস্বর ইহাকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেও ৭ মাত্রা হয় অর্থাৎ এক মাত্রা কম থাকে আর ২য় পাদে ৭টি বর্ণ তন্মধ্যে 'কানু'র আকার দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে ১ মাত্রা পূর্ব পাদের অভাব পূরণ করিল। তখন দুই মাত্রা অবশিষ্ট থাকিলে ইহার সহিত 'করি'র দুই মাত্রা মিলিলে ৪ মাত্রা ঠিক হইল এখন অবশিষ্ট ৪ মাত্রার জন্য একটি কথা থাকিল 'ঝ্‌রয়ে'। এ স্থানে ত্রিপদী ছন্দের চরণের শেষ নহে সুতরাং ইহার শেষে টান হইতে পারে না তাই 'ঝ্‌'র উপরে টান দিয়া অর্থাৎ 'ঝ্‌'কে দুই মাত্রা উচ্চারণ করিয়া ৪ মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। ব্রজবুলীতে রচিত পদাবলী পাঠের নিয়ম এইরূপ কঠিন বলিয়া প্রথম পাঠের সময় স্থানবিশেষে তালভঙ্গ হইয়া যায়। ২য় পাদটি দেখিলে তখন ঠিক হয়, প্রথম পাদের কোন্‌টিকে দীর্ঘ করিতে হইবে। আবার স্থানবিশেষে দুইরূপ পাঠও চলে। যথা,—

কত যে কলাবতি যুবতি সুমুরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।

—গোবিন্দদাস, পদাবলী

* হিন্দি কবি তুলসীদাসের চৌপাই সংস্কৃতের পজ্‌ঝটিকা। ইহাতে ঠিক সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ করিবার প্রথা—

বহুবিধ লখন সিয় প্রীতি বখানী।
শোক সনে হাম্‌—গণ মুনি জ্ঞানী।

প্রথম পাদের 'কত যে' এই ৩ অক্ষরে যদি ৪ মাত্রা শেষ করিতে চাহি তবে 'যে' দীর্ঘ হইবে আর যদি 'কত যে ক—' পর্যন্ত লইয়া ৪ মাত্রা শেষ করি, তবে 'লাবতি'-র 'লা' দীর্ঘ করিয়া ২য় ৪ মাত্রা শেষ করিতে হইবে। আমার কানে ২য় রূপ পাঠই মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

জয়দেবের ২য় ছন্দ—মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদীতে—৮+৮+১২ মাত্রা থাকে। পদকর্তাদিগের দীর্ঘ ত্রিপদীতেও ঠিক তাই। যথা—

জয়দেব—চন্দন চর্চিত, নীল কলেবর, পীত বসন বনমালী।

—গীতগোবিন্দ, গীত ৪।১

বিদ্যাপতি—কনকলতা অব-লম্বনে উরল, হরিণী হীন হিম যামা। —পদাবলী

গোবিন্দদাস—অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরু সুরধুনী তীরে উজোর। —পদাবলী

এখন জয়দেবের দুটি নূতন তালের কথা বলিব। একটির নাম নিঃসার তাল, অপরটির নাম অষ্টতাল। নিঃসার তাল ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ প্রতিপাদ [প্রতিপাদে] তিনের দ্বিগুণ ৬ মাত্রা আছে। কিন্তু মোট পাঁচটি পাদ, ইহার সহিত ধুয়া ২ মাত্রা মিলাইলে ৭ পাদ হয়। কিন্তু আধুনিক একতালায় ৪টি পাদ থাকে সুতরাং একতালার সহিত ঠিক মিলে না।—নিঃসার তাল—

কালিয় বিষ-ধরগঞ্জন, জনরঞ্জন, যদুকুল নলি-ন দিনেশ।

জয় জয় দেব হরে॥

—জয়দেব, গীতগোবিন্দ, গীত ২।৩

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'ফুলশর' ও আধুনিক 'হেঁয়ালিতে' এই ছন্দে একটি কবিতা মুদ্রিত করিয়াছেন—

নব কিশলয় দল শোভিল মৃদু দোলিল
বনলতিকা তরু সঙ্গে
নন্দন বন ফুল-গঞ্জন বন রঞ্জন
ফুটিল কুসুম শত অঙ্গে।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেঁয়ালি, বসন্তে

জয়দেবের অষ্টতালে প্রতি পাদে ৫ মাত্রা, সুতরাং আধুনিক ঝাঁপতালের তুল্য। যথা,—

স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

—গীতগোবিন্দ, গীত, ১০।৭

আধুনিক যুগে স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র, পূর্ববঙ্গের ৺হরিশচন্দ্র মিত্র, বাঁকীপুরের ৺বলদেব পালিত, এবং (বলদেববাবুর মতে) ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ ও জীবিত গ্রন্থকারগণের মধ্যে শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী ও শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা লিখিয়াছেন। শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থের মালিনী ছন্দে রচিত বাঙ্গলা কবিতাও মাসিক পত্রে দেখিয়াছি। কিন্তু বলদেব বাবুর ন্যায় এত অধিক সংখ্যক ছন্দে কেহ কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে নিম্নলিখিত ছন্দগুলির ব্যবহার আছে—আর্য্যা, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, একাবলী (বাঙ্গলার নহে, সংস্কৃতের) করিৎ (হিন্দির সংস্কৃতানুসারী ছন্দ), কুসুমবিচিত্রা, গজগতি, গীতিকা, জলোদ্ধতগতি, তামরস, তোটক, ত্বরিতগতি, দোধকবৃত্ত, দ্রুত বিলম্বিত, পঞ্চচামর, পৃথ্বী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মদিরা, মধুমালতী, মন্দাক্রান্তা, মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী, মালিনী, পজ্ঝটিকা, রথোদ্ধতা, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, বিয়োগিনী, শার্দুল-বিক্রীড়িত, শিখরিণী, স্বাগতা, স্রগ্ধরা ও হরিণী মোট ৩২টি। ইহার মধ্যে ১২টি ছন্দে সাধারণ তালের মাত্রা পাইয়াছি—৮টি চতুর্মাত্রিক কাওয়ালী, ১টি ত্রিমাত্রিক একতালা ও ৩টি পঞ্চমাত্রিক ঝাপতাল। কবি বলদেবের ছন্দের উদাহরণের সহিত কবি বিজয়চন্দ্রেরও কবিতা মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিব।

কাওয়ালী—

(১) অপরূ | প বিলা | স বিলো | কি বনে,
কবি 'তো | টক' বৃ | ত্ত সকা | ম ভণে।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী ?

(২) কাম বি | মোহিত | লোলুপ | চিত্তে
গান র | মাপ্রিয় | 'দোধক' | বৃত্তে।

বলদেব, ললিতকবিতাবলী ?

(২ ক) নিদ্রিত চন্দ্র সুনির্ম্মল নীরে
সুপ্ত বনান্তে শ্যামল তীরে।

-বিজয়চন্দ্র, হেঁয়ালি, শরদে

(৩) হত যত | দুঃখ | প্রিয় সহ | যুক্তা
কুসুম বি | চিত্রা | কবিবর | উক্তা।

বলদেব, ললিতকবিতাবলী ?

(৪) গোপ নি | তম্ব ব | তী গণ | ভাষণ | বৃষ্টি ক | রে অমি | য়া শ্রব | ণে
কৃষ্ণ হৃদে ধরি হৃষ্ট মনে কবি কেলিকলা মদিরায় ভণে।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী ?

(৫) উপরের 'মদিরা' ছন্দ ও নিম্নের হিন্দি 'করিৎ' ছন্দে পার্থক্য যৎসামান্য, করিৎ ছন্দে একেবারে শেষে একটির পরিবর্তে দুইটি দীর্ঘ মাত্রা। যথা,—

সিন্ধুনদের তটে বসুধাধিপ শাসি সমস্ত বিজাতি দুরন্তে—
দুর্জয় দুর্গ বিনির্মি তথা করিলে নিজ কীর্তিবিকাশ দিগন্তে।

—বলদেব, ভর্তৃহরি কাব্য, ভাটকৃত বন্দনা

(৬) মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী—

কিশলয় বিরচিত, চন্দন চর্চিত, যুবজন মান সহায়ী।
কোমল তল্পে, রতিরস কল্পে বসিলা বিপিনবিহারী।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী,. শ্রীরাধার অভিসার ও রাসলীলা বর্ণন

অঞ্জনরঞ্জিত নীলগগন পট, দীপ্ত রবির করজালে।
শ্যামল তৃণ শোভিত তটিনীতট, বেষ্টিত তাল তমালে ॥

—বিজয়চন্দ্র, হেঁয়ালি, শরদে

(৭) প্রাতর্বর্ণন পরমানন্দে।
করিছে কবি 'পজ্‌ঝটিকা' ছন্দে।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী; বাসন্তপ্রভাত বর্ণন

(৮) তব মুখ | তামর | সাসব | আশে,
সুললিত 'তামরসে' কবি ভাষে।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী

ঝাঁপতাল—

(১) 'ভুজঙ্গপ্রয়াতে' কবি প্রীতি ভাষে।
বলে গোপবালে চল শ্যামপাশে।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী, শ্রীরাধার অভিসার ও রাসলীলা বর্ণন

(২) গজগতি—

ঘন ঘটা দরশনে যত সুখী হয় শিখী।
সুমিলনে হরি সনে তত সুখী শশিমুখী।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী, শ্রীরাধার অভিসার ও রাসলীলা বর্ণন

(৩) মানবতি মান হর রাখ পতি ভারতী।
প্রীতি অভিলষি কবি গায় 'মধুমালতী'।

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী ?

(৩ ক) ফুটিল নব পুষ্পবন শষ্পদল ছাইয়া,
সুরভি মৃদু পবন অতি | তাহে।
বিহগ কত কুসুম নত বায়ু পরিচালিত,
শ্যাম তরু শাখ পর | গাহে॥

—বিজয়চন্দ্র, হেঁয়ালি, ঘনাগমে

একতালা—

(১) ত্বরিতগতি ছন্দ—
হরির সনে সুখ মিলনে।
চলিল ধনী প্রমোদ বনে॥

—বলদেব, ললিতকবিতাবলী, শ্রীরাধার অভিসার ও রাসলীলা বর্ণন

(ক) মাত্রাবৃত্ত লঘু ত্রিপদী—
তব পঞ্চপুষ্প রচিত কান্তি
মিশিতকুসুম চাপে
সিত ইন্দুকিরণ রঞ্জিত তনু
অতনু ভরিল তাপে।

—বিজয়চন্দ্র হেঁয়ালি, ফুলশর

কবি বিজয়চন্দ্র বহুদিন হইল সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কবি বলদেব ৩২ প্রকারের সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলায় চালাইতে চেষ্টা করিয়া শেষে কর্ণার্জুন কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে বাঙ্গলা পদ্যে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকায়, ঐ সকল ছন্দ সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার ভর্তৃহরি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণবশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না।' তিনি তাঁহার ভর্তৃহরি কাব্যের ভূমিকাতেও বাঙ্গলা উচ্চারণের এই ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ লিখিতে হইলে

প্রত্যেক শব্দের প্রত্যেক বর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্ব নিরূপণ করা আবশ্যক। যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক তাহাদের উচ্চারণে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু 'যেন' 'হেন' 'কোন' 'কেন' 'আমি' প্রভৃতি আরও অনেক শব্দ আছে যাহাদিগকে সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে উচ্চারণ করিতে হইলে সুশ্রাব্য হয় না। কারণ আমরা উক্ত 'এ'কার 'আ'কার 'ও'কার হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া থাকি।... শব্দের অন্তে যে 'ও'কার সংস্কৃত 'অপি'র অর্থে প্রয়োগ হয় (যেমন, তাহাও) তাহা হ্রস্ব বলিয়া গণনা করিয়াছি। এরূপ না করিলে অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়।"

কবি হেমচন্দ্র সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ রাখিয়া 'দশমহাবিদ্যা'য় অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রজভাষার পদ রচয়িতাদিগের ন্যায় দীর্ঘস্বরের সর্বত্র দুই মাত্রা উচ্চারণ ধরেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাকে দুই মাত্রা উচ্চারিত দীর্ঘস্বরের উপর চিহ্ন দিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। একটি উদাহরণ দিতেছি—

সেহ যোগ সাধন, কি হেতু ঘুচাইলি
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি
সে সাধ এতদিন পরে॥

—হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা, মহাদেবের বিলাপ

এখানে 'সেহ' 'হেতু' 'সাধ' প্রভৃতির স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় নাই। কবিবর দশমহাবিদ্যায় বহুবিধ ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এগুলি পয়ার ও ত্রিপদীর প্রকার ভেদ মাত্র। লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী উভয়ই আছে। সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদীতে ৮+৮+১২ মাত্রা থাকে। কবিবর সেরূপ ছন্দের নাম দিয়াছেন দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর এক প্রকার ছন্দ আছে তাহাতে ৮+৮+১৫ মাত্রা আছে। এগুলির নাম ধীর ললিত ত্রিপদী, ঘনদ্রুত-পদী ছন্দ, ধীর ঘনপদী ছন্দ ও ললিত দীর্ঘত্রিপদী। তিনি পাঁচ প্রকারের পয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ৪টিতে ৮+৭ মাত্রা এবং একটিতে ৮+৮ মাত্রা। নিম্নে তাঁহার ভঙ্গপদী পয়ারের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

সুরলোক মোহিত মোহন কুহকে।
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতাল পুলকে॥

—হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা, নারদের বীণাবাদন

জীবিত কবিগণের মধ্যে সম্ভবতঃ কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ চালাইবার প্রয়াস করিয়া পয়ারে ইহার প্রথম প্রয়োগ করিয়াছিলেন—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
ঊর্দ্ধে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।

—রবীন্দ্রনাথ, মানসী, নিষ্ফল উপহার

পরে তিনি পয়ার বা দীর্ঘ ত্রিপদীতে ইহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং লঘু ত্রিপদীতে বা ত্রিমাত্রিক একতালার ছন্দেও সম্ভবতঃ অন্যত্রও ইহার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীকালিদাস রায় তাঁহার 'ব্রজবেণু'তে মাত্রাবৃত্ত পয়ারের দৃষ্টান্ত

দুলিছে যমুনা ঐ কূলে কূলে পুলকে।
দামিনী দুলিছে হাসি, স্বর্লোকে ভূলোকে।

—কালিদাস রায়, ব্রজবেণু

ইহা চতুর্মাত্রিক কাওয়ালী তালে মিলিবে। ব্রজবেণুতে কাওয়ালী তালের আর এক প্রকার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ আছে,—

যদি—বচন দুটি কহ—উঠিবে ফুটি
ঘোর—ব্যাপ্ত বিনাশি' তব দণ্ড ভাতি।

—কালিদাস রায়, ব্রজবেণু

এখানে 'বচন দুটি'র সহিত ১ মাত্রা টান রাখিয়া পর পাদের 'সহ' ['কহ' ?] যোগ করিলে ৮ মাত্রা হইবে। কবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থরেণু'তে কাওয়ালী তালের একটি ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে—

ইংলণ্ড্ ইংলণ্ড্ সিন্ধুর প্রহরী
রাষ্ট্রের স্রষ্টা মানুষের ধাত্রী।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তীর্থরেণু, সঙ্গীত-মিস্ত্রীর নিবেদন

আধুনিক বাঙ্গলার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ত্রিমাত্রিক তালের ব্যবহারই অধিক। কেহ কেহ ক্বচিৎ পঞ্চমাত্রিক ঝাঁপতাল ও সপ্তমাত্রিক তেওরা তালের ছন্দও ব্যবহার করেন। কবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সপ্তস্বরা' হইতে ইহার বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) লঘু ত্রিপদী—

কুঞ্জে, কুঞ্জে, বিহরে পুলকে, পুষ্পবীথিকা দলি

চরণ পীড়নে, নবীন জীবনে, ফুটে উঠে ফুলকলি। (৬+৬+৮)

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সপ্তস্বর

চির শোভা শ্যাম, হরিৎশষ্প পুষ্প আলোকে উজলি
বিরাজে সুখের কল্পনালোক, কল্পনা স্বর বিজলি। (৬+৬+৯)

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সপ্তস্বর

(২) লঘু চৌপদী—দ্রুত ললিত পয়ারের বা দীর্ঘ একাবলীর তুল্য—
হাজার তোরণ কাহার দেউল মাঙ্গলি ফুল গন্ধ লিপ্ত
কোন্ সে পুরীর ভিতর নিত্য রত্ন প্রদীপ উজল দীপ্ত? (৬+৬+৬+৬)

— বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সপ্তস্বর

এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বাঙ্গলার হসন্ত উচ্চারণ বজায় রাখিয়া 'হাজার্ তোরণ্' করা যায় তখন উপান্ত্য বর্ণটি দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে। আবার হসন্ত না করিয়া 'হা-জা-র তো-র-ণ' করিয়া প্রত্যেক বর্ণে সমান মাত্রা দেওয়া চলে। স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমস্ত গানগুলি এই ছন্দে রচিত। আবার ত্রিমাত্রিক তালের বিভিন্ন চরণে বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা যোজনা দ্বারা ছন্দের নানা রূপ হইয়া থাকে। কোন চরণের প্রারম্ভে একটি অধিক শব্দ যোজনা করা হয় অথবা অন্তে—মাত্রা কম থাকে, তখন টানিয়া মাত্রা পূরণ করিতে হয় যথা,—

সেথা, | মত্ত ভ্রমর | গুঞ্জরে.........
নৃত্য পুলকে | তটিনী.........
নিত্য আদরে | মুঞ্জরে.........
কুসুমোৎসবে ধরণী.........

এখানে প্রথম ও তৃতীয় চরণে দুই মাত্রা করিয়া এবং ২য় ও ৪র্থ চরণে ৩ মাত্রা করিয়া কম আছে বলিয়া ততখানি টানিয়া রাখিতে হয়।

পঞ্চমাত্রিক ঝাঁপতালের উদাহরণ—

নন্দপুর | চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার
বহে না চল | মন্দানিল | লুটিয়া ফুল | গন্ধভার।

—কালিদাস রায়, পর্ণপুট, বৃন্দাবন অন্ধকার

সপ্তমাত্রিক তেওরা তালের উদাহরণ,—

তোমারি নিরজনে, ভাবনা আনমনে
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ।

—রজনীকান্ত, বাণী, তোমারি

সংস্কৃতের যে সকল ছন্দের প্রতি গণে (ইংরাজী ফুট্) এক প্রকারের যথা তোটক, দোধক, ভুজঙ্গপ্রয়াত বা মধুমালতী, তাহাতে পাঠক একবার লঘুগুরু উচ্চারণের ক্রম বুঝিতে পারিলে আর ভাবনা থাকে না, তালে তালে আপনি লঘুগুরু উচ্চারণ হইয়া যায় তখন 'রাম' বা 'যাদব' অকারান্ত উচ্চারণ করা কঠিন হয় না কিন্তু 'যাও' 'খাও' 'আমার' 'নাই' শব্দগুলি স্বরান্ত উচ্চারণ করা দুরূহ কার্য, সেইজন্য এখন যাহারা বাঙ্গলায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের অধিক ব্যবহার করিতেছেন এবং যাঁহারা ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ অধিক ব্যবহার করিতেছেন। ছড়ার ছন্দে বাঙ্গলার খাঁটি উচ্চারণ বজায় থাকে ইহাতে কেবলমাত্র উচ্চারিত স্বরগুলি গণনা করিয়া মাত্রা নির্ণীত হয়।

ছড়ার ছন্দে প্রতি পাদে দুয়ের দ্বিগুণ ৪ মাত্রা করিয়া থাকে। ইহা চতুর্মাত্রিক কাওয়ালী তালের অন্তর্গত। যেখানে একটি স্বর অল্প থাকে সেখানে পূর্ব বা পরের স্বরে টান দিয়া মাত্রা পূরণ করিতে হয়। যথা—

খাটে খাটায় | লাভের গাঁতি
তার অর্ধেক | কাঁধে ছাতি।

—খনা

ছেলেভুলান বা মেয়েলী ছড়ায় সাধারণতঃ ৪+৪+৬ মাত্রা থাকে। সেই হিসাবে ইহাকে আক্ষরিক মাত্রার তরল পয়ারের [সহিত] তুলনা করা যাইতে পারে,—

তরল পয়ার—দেখ দ্বিজ, মনসিজ জিনিয়া মুরতি

—কাশীরাম দাস, মহাভারত

ছড়ার ছন্দ—বুদ্ধারা সব | জপের মালা | তুললো | হাতের | পরে।

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সপ্তস্বরা

কিংবা ইহাকে লঘু ত্রিপদী বলা যাইতে পারে। সুকবি বিজয়চন্দ্র তাঁহার 'হেঁয়ালী'তে ছড়ার ছন্দের নানা রূপ দেখাইয়াছেন,—

(১) তাজা শোকের চেয়ে কাল
ঘন দুঃখ হতে গভীর
একি আঁধার তুমি ঢাল।
ও গো জড়ার [জরার] বাড়া স্থবির ?

—বিজয়চন্দ্র হেঁয়ালি, কোজে

(২) রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস।

—বিজয়চন্দ্র, হেঁয়ালি, লক্ষ্যপথে

(৩) সংসারটা ফাঁকি রে, যেন ভোজের বাজী
জীবাত্মাটা পাখী রে, উড়ে পালায় পাজী।

—বিজয়চন্দ্র, হেঁয়ালি, ঔষধ

এখন বাঙ্গলার ছন্দ সম্বন্ধে সাধারণভাবে ২।৪ কথা বলিব। মানব যখন প্রথম গান করিত তখন সুর ছিল, হয়ত তাল ছিল না, তার পরে কবিতা হইল কিন্তু ছন্দের বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। যখন প্রথম ছন্দ বা তাল হইল তখন এই নূতন ব্যবস্থায় সকলেই আনন্দ বোধ করিত। কিন্তু ইহাতে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় বলিয়া মানব আবার বন্ধনমুক্ত হইতে চাহিল। সে তালের বন্ধন ছাড়িয়া শুধুই সুর ভাঁজিতে লাগিল তাহার নাম রাগরাগিণীর আলাপ। বাঙ্গলা কবিতার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নূতন অসম ছন্দ এই শ্রেণীর উদাহরণ। মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইলেন, রাজকৃষ্ণ রায় বা গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রতি পংক্তিতে মধুসূদনের ন্যায় চতুর্দশ অক্ষর না রাখিয়া অসমান সংখ্যক অক্ষর রাখিলেন তখন ইহার নাম হইল গৈরিশ ছন্দ, জনৈক মুসলমান কবি ইহা গদ্যের ন্যায় সাজাইয়া নাম রাখিলেন হোসেনী ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই উভয় প্রকার ছন্দেই মিল রাখিয়া আবার স্বাধীনতার উপর একটা বন্ধন জুড়িয়া দিলেন। ইহাদের নাম হইয়াছে মিত্রাক্ষর পয়ার ও মিত্রাক্ষর অসম ছন্দ। এগুলি মিলের দাসত্ব করিলেও তালের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে। কবিতায় মিল কোথা হইতে আসিল ইহা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রবাসী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, 'জয়দেবের ললিতকান্ত পদাবলীর অনুকরণেই যে বাঙ্গলায় মিত্রাক্ষরের প্রচলন হইয়াছে একথা মনে হয় না কারণ ডাক ও খনার বচনের মিল তাহার বহু পূর্ব হইতেই প্রচলন ছিল। সুর সহযোগে কবিতা আবৃত্তি করিলেই গান, আর গানের সঙ্গে তাল থাকিলেই মিলের প্রয়োজন। অমিত্রাক্ষর শব্দ শুনিতে শুনিতে যখন মনে বিরক্তির উদয় হয় তখন মিত্রাক্ষর শুনিলে মনে একটা সাড়া পড়ে এবং আমরা পূর্বের চরণের

ঙ্গে মিলাই বা তুলনা করি। প্রায় সর্বদেশেই কবিতায় মিল আছে। কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে বলা কঠিন।'

ব্রজভাষার পদকর্তাগণ গানের মুখে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিতেন সুতরাং তাঁহারা র্বত্র সংস্কৃতের উচ্চারণ মানেন নাই। কবিবর হেমচন্দ্রও সর্বত্র সে নিয়ম পালন রেন নাই। স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' নামক ানে সংস্কৃতের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ মানিয়া চলিয়াছেন কিন্তু ২।১ স্থলে তাঁহার ছন্দ তন হইয়াছে। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যাঁহারা কবিতা লিখিয়াছেন যথা স্যার রবীন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্তকুমার, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, ভুজঙ্গধর, তাঁহারা বেশ কটা নিয়ম মানিয়া চলিতেছেন, কিন্তু মাসিকপত্রের লেখকগণের মধ্যে অনেকেই এখনও বাঙ্গলার আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ ও মালঞ্চ পত্রে মাঝে মাঝে তাহার দৃষ্টান্ত পাই! তালজ্ঞানের অভাবেই তাঁহাদের ছন্দপতন হইতেছে।

বাঙ্গলার যে সকল ছন্দ তালের আমলে আইসে না, উপসংহারে তাহাদের কথা বলিয়া লই। গায়ক রাগিণী আলাপ করিবার সময় যেরূপ তালের বন্ধনে থাকে না, কবিও সেইরূপ তালের বন্ধন ছাড়াইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করিয়াছেন। ইহাতে যতিপতনের কোন স্থান নির্দেশ নাই। যতিপতনের স্থান নির্দেশ থাকে না বলিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিল থাকিলেও তালের মধ্যে ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের অসমছন্দও তালহীন ছন্দ এবং তালহীন অসমছন্দ।*

শ্রীরাখালরাজ রায়।

পরিচারিকা [নবপর্যায়] সম্পাদিকা : রাণী নিরুপমা দেবী
প্রথম বর্ষ। ৭ম সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। পৃ ৪৫৭-৪৬৭

*এই প্রবন্ধের দৃষ্টান্তগুলির উৎস-নিরূপণ করেছেন শ্রীশঙ্খ ঘোষ। মূল প্রবন্ধে তা ছিল না।—গ্রন্থকার

পরিশেষ

ক। বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্রমবিকাশ

উপক্রম-পর্ব : ১৩০৭-১৩৬০

বিহারীলাল গোস্বামী (১৮৭১-১৯৩১)

কবিতায় ছন্দ ও মিল	ভারতী	১৩০৭ কার্তিক
ছন্দ ও মিলের খুঁটিনাটি	ভারতী	১৩০৭ মাঘ

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবাবুর কবিতার ছন্দ	সাহিত্য	১৩০৮ চৈত্র

হরগোবিন্দ লস্কর

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ : বিজ্ঞাপন	*দশাননবধ কাব্য	১৩১০ ...

রমেশচন্দ্র বসু

পয়ার ছন্দের উৎপত্তি	সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা	১৩১১ কার্তিক-পৌষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

জাপানি ছন্দ : জাপানের প্রতি ভাণ্ডার		১৩১২ আষাঢ়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

স্বাভাবিক বাংলা ছন্দ : ভূমিকা	*আলেখ্য (কাব্য)	১৩১৪ বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ : সন্ধ্যাসংগীত	প্রবাসী	১৩১৯ বৈশাখ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মাত্রিক (syllabic) ছন্দ : ভূমিকা	*ত্রিবেণী (কাব্য)	১৩১৯ শ্রাবণ

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ	প্রবাসী	১৩২০ বৈশাখ

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯)

'বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ' (আলোচনা-১)	প্রবাসী	১৩২০ জ্যৈষ্ঠ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৮-১৯২২)

সনেটের ছন্দঃ 'সনেট পঞ্চাশৎ'	ভারতী	১৩২০ শ্রাবণ

প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৯)		
সনেটের ছন্দ : 'সনেট পঞ্চাশৎ'	সাহিত্য	১৩২০ শ্রাবণ
প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)		
সনেট কেন চতুর্দশপদী	ভারতী	১৩২০ ভাদ্র
শরৎচন্দ্র ঘোষাল		
'বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ' (আলোচনা-২)	প্রবাসী	১৩২০ কার্তিক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
বাংলা ছন্দ-১ (পত্রপ্রবন্ধ)	সবুজপত্র	১৩২১ জ্যৈষ্ঠ
শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭৩-১৯২৮)		
বাঙ্গালা ছন্দ	প্রবাসী	১৩২১ আষাঢ়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
বাংলা ছন্দ-২ (পত্রপ্রবন্ধ)	সবুজপত্র	১৩২১ শ্রাবণ
বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)		
কবিতার ভাষা ও ছন্দ	প্রবাসী	১৩২২ অগ্রহায়ণ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
বাংলা বানান ও ছন্দ : বাংলা বানান	প্রবাসী	১৩২৩ বৈশাখ
রাখালরাজ রায়		
বাংলার ছন্দ ও তাল	পরিচারিকা	১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
সংগীত ও ছন্দ : সংগীতের মুক্তি	সবুজপত্র	১৩২৪ ভাদ্র
ছন্দের অর্থ-১ : ছন্দ	সবুজপত্র	১৩২৪ চৈত্র
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত		
ছন্দ-সরস্বতী	ভারতী	১৩২৫ বৈশাখ
অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)		
বিষম ছন্দ : 'বিজয়ী' (সমালোচনা)	ভারতী	১৩২৫ বৈশাখ
কবিতার ছন্দ : মাসকাবারি	ভারতী	১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ
প্রমথ চৌধুরী		
পয়ার (সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা পত্র)	সবুজপত্র	১৩২৫ ভাদ্র

যাদবেশ্বর তর্করত্ন

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দ নারায়ণ ১৩২৬ মাঘ

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ মে ২৫)

আরবী ছন্দ প্রবাসী ১৩২৮ চৈত্র

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯)

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ (ধারাবাহিক ১-৩) মানসী ও মর্মবাণী ১৩২৯ শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক

প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭ এপ্রিল ২৭)

বাংলা ছন্দ (ধারাবাহিক ১-৫) প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ-১৩৩০ বৈশাখ

বাংলা ছন্দ ও সংগীত (ধারাবাহিক ১-৩) প্রবাসী ১৩৩০ মাঘ-চৈত্র

খ। গ্রন্থকারের ছন্দ প্রবন্ধ

ছন্দপরিক্রমার অনুবৃত্তি

শেষ পর্ব : ১৩৭২-৮১

৩৫ক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মাত্রাগণনা ছায়াবীথি ১৩৪১ ফাল্গুন

কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদিরকে লেখা (১৯৩৫ জানুআরি ২৯) এই পত্র প্রবন্ধটি 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থের তালিকায় বাদ পড়েছে।

৬৯ বাংলা ছন্দের প্রাথমিক পরিচয়	'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থ	১৩৭২ বৈশাখ
৭০ 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি-এক[১]	আনন্দবাজার	১৩৭২ আশ্বিন ১৬
৭১ 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি-দুই	আনন্দবাজার	১৩৭২ কার্তিক ২
৭২ 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি-তিন	আনন্দবাজার	১৩৭২ কার্তিক ৭
৭৩ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-পরিচয়[২]	চতুষ্কোণ	১৩৭৩ বৈশাখ
৭৪ ব্যঙ্গরচনায় সংস্কৃত ছন্দ	ভারতবর্ষ	১৩৭৩ জ্যৈষ্ঠ
৭৫ বাংলা ছন্দের পরিভাষা[৩]	চতুষ্কোণ	১৩৭৩ আশ্বিন
৭৬ জয়দেবী ছন্দ[৪]	চতুষ্কোণ	১৩৭৩ কার্তিক
৭৭ ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র ১	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৭৩ কার্তিক-পৌষ
৭৮ ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র-২	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৭৩ মাঘ-চৈত্র
৭৯ কয়েকটি অ-বাংলা ছন্দের বাংলা রূপ-১	কবি ও কবিতা	১৩৭৪ আশ্বিন
৮০ ছন্দ ও বাংলা ছন্দ (১৯৬৫ মার্চ)	'ভারতকোষ' ৩য় খণ্ড	১৩৭৪ পৌষ
৮১ কয়েকটি অ-বাংলা ছন্দের বাংলা রূপ-২	কবি ও কবিতা	১৩৭৪ মাঘ

৬. এই রচনাটি যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার-অনূদিত 'মেঘদূত' গ্রন্থের (১৩৭৫, ফাল্গুন ২০, দোল-পূর্ণিমা) ভূমিকার (রচনাকাল ১৩৭৫ আষাঢ়) অংশবিশেষ। পরে বহুলাংশে পরিবর্ধিত রূপে বর্তমান লেখকের 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' গ্রন্থে সংকলিত। দ্রষ্টব্য পরবর্তী ৮৮ সংখ্যক প্রবন্ধ।